দেশবিদেশের সাধক ও মহাপুরুষ

(প্রথম খণ্ড)

রতন চন্দ্র গুড়িয়া

BlueRose ONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

BLUEROSE PUBLISHERS
India | U.K.

Copyright © Ratan Chandra Guria 2025

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author. Although every precaution has been taken to verify the accuracy of the information contained herein, the publisher assume no responsibility for any errors or omissions. No liability is assumed for damages that may result from the use of information contained within.

BlueRose Publishers takes no responsibility for any damages, losses, or liabilities that may arise from the use or misuse of the information, products, or services provided in this publication.

BlueRose ONE
Stories Matter
NewDelhi • London

For permissions requests or inquiries regarding this publication, please contact:

BLUEROSE PUBLISHERS
www.BlueRoseONE.com
info@bluerosepublishers.com
+91 8882 898 898
+4407342408967

ISBN: 978-93-7139-511-3

Cover design: Daksh
Typesetting: Tanya Raj Upadhyay

First Edition: July 2025

লেখকের প্রতিবেদন

অনাদিকাল হতে ঋষি, সাধক এবং মহাপুরুষদের জ্ঞান এবং মহান কর্ম দ্বারা মনুষ্য জগৎ আলোকিত হয়ে আসছে। যুগ যুগ ধরে তাঁদের শিক্ষা এবং দর্শন আমাদের অস্তিত্বের জটিলতায় পথ দেখিয়ে আসছে এবং আমাদেরকে উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। পৃথিবীর মহাপুরুষগণ সর্বদা জ্ঞান ও দর্শনের উজ্জ্বল মশাল হাতে ধরে জীবনের অন্ধকারে আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে চলেছেন। 'দেশাবিদেশের সাধক ও মহাপুরুষ' এই বইটিতে ভারত ও বিদেশের কয়েকজন স্মরণীয় ঋষি, সাধক ও মহাপুরুষের অসাধারণ জীবন কাহিনী ও দর্শন তুলে ধরা হয়েছে। পাঠকরা এই সকল ঋষি, সাধক ও অতিমানবীয় শিক্ষকদের জীবনের রহস্যের গভীরে প্রবেশ করে জ্ঞানের রত্নভাণ্ডারের আলো উন্মোচন করবে। যদিও বইটি মূলত স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে, তবুও অনুসন্ধিৎসু তরুণ এবং প্রবীণ পাঠকরাও বইটি পড়ে তাদের জীবন সংগ্রামে একটি নতুন পথ খুঁজে পেতে পারেন।

যেহেতু বিশ্বে ঋষি, সাধক এবং মহাপুরুষদের সংখ্যা অনেক, তাঁদের জীবন কাহিনী ও দর্শন কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম খণ্ডে যীশু খ্রিস্ট, মোশি (Moses), সেন্ট পল, সক্রেটিস, কনফুসিয়াস, আব্রাহাম লিং কন, ঋষি বাল্মীকি, ঋষি বিশ্বামিত্র, মহাঋষি বশিষ্ঠ, গৌতম বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ এ পি জে আব্দুল কালাম প্রমুখ দেশবিদেশের ঋষি,সাধক ও মহাপুরুষের বিস্ময়কর জীবনকাহিনী ও দর্শন তুলে ধরা হয়েছে।

আমার বিস্বাস, ঋষি, সাধক এবং মহাপুরুষদের উপর লেখা এই বই পাঠকদের ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতা-বোধগম্যতা বৃদ্ধি করবে এবং তাদের আত্ম-প্রতিফলন ও আত্মদর্শনকে উৎসাহিত করবে। যার ফলে তারা নিজের অন্তরের সত্ত্বা সম্পর্কে আরও গভীর উপলব্ধি লাভ করবে। এই বই পাঠকদের ব্যক্তিগত শক্তি

এবং দুর্বলতা সনাক্ত করতে, তাদের মূল্যবোধগুলি অন্বেষণ করতে এবং আরও ইতিবাচক আত্ম-চিত্র বিকাশে সহায়তা করতে পারে এবং আধ্যাত্মিক বিবর্তনের জন্য নির্দেশনা এবং অনুপ্রেরণা প্রদান করতে পারে। এটি বিশেষ করে পাঠকদের মানসিক চাপ কমাতে এবং মানসিক সুস্থতা আনতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করবে। কারণ এই বইটিতে আধ্যাত্মিক বিষয় এবং অনুশীলন সম্পর্কে অনেক সংলাপ, আলোচনা ও বিশ্লেষণ রয়েছে।

বহু সাধক ও মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী পড়ে এবং বিভিন্ন উৎস যেমন Google Search, AI search থেকে প্রামানিক ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে এই বইটি লিখেছি। ঐ সকল জীবনকাহিনীর লেখকদের প্রতি এবং উইকিপেডিয়া মুক্ত-বিশ্বকোষ এবং AI computer System এর প্রতি আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। উল্লেখ্য, প্রতিটি প্রবন্ধের মধ্যে বা শেষ প্রাসঙ্গিক বই বা article এর রেফেরেন্স দেওয়া হয়েছে; আগ্রহী পাঠক সাধারন, ঐ রেফেরেন্স বই এবং article পড়ে, যে কোন সাধক ও মহাপুরুষ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারে।

পরিশেষে যে কথাটা না বললেই নয়, এই বইটি পড়ে পাঠকরা যদি বিশ্ববিখ্যাত সাধক, ঋষি ও মহাপুরুষদের সম্বন্ধে আরও বেশি জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেন, তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক মহাপুরুষ ও সাধক সম্পর্কে বিস্তৃত আকর গ্রন্থ পাওয়া যায়। সেই সকল গ্রন্থ পড়লে পাঠকরা বুঝতে পারবেন একজন সাধক বা মহাপুরুষ আমাদের জন্য কি বিশাল কর্ম বা যোগ সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ধন্যবাদান্তে –

রতন গুড়িয়া

সূচীপত্র

১ ঈশ্বর পুত্র- যীশু খ্রীষ্ট	1
মোশি (Moses)	34
মোশির মৃত্যু	65
মহাজ্ঞানী সক্রেটিস	74
4. কনফুসিয়াস	99
৫- সেন্ট পল দ্য অ্যাপোস্টেল	129
৬ আব্রাহাম লিংকন	146
গৌতম বুদ্ধ- বিষ্ণুর নবম অবতার	165
৭; সুজাতার সাথে সিদ্ধার্থের সাক্ষাৎ;	180
১০; গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম	185
8. মহর্ষি বশিষ্ঠ	205
৯ ব্রহ্মার্ষি বিশ্বামিত্র	225
10. মহর্ষি বাল্মীকি	242
11. মহর্ষি ব্যাস (বেদব্যাস)	258
12. শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস	267
১৩; বেদান্তের জীবন্ত প্রতীক-স্বামী বিবেকানন্দ	356
14. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	478
15. ডঃ এ পি জে আব্দুল কালাম	553

১ ঈশ্বর পুত্র- যীশু খ্রীষ্ট

যীশু খ্রীষ্ট নাজারেথের যীশু নামেও পরিচিত। যীশু খ্রীষ্ট প্রথম শতাব্দীর একজন ইহুদি ধর্মীয় নেতা এবং ধর্মপ্রচারক ছিলেন। এটি বিশ্বের বৃহত্তম ধর্ম খ্রিস্টধর্মের কেন্দ্রীয়স্থল। বেশিরভাগ খ্রিস্টান বিশ্বাস করেন যে যীশু খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বর পুত্র বা অবতার এবং Old Testament এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মশীহ। তিনি ছিলেন অত্যাচারিত জাতির ও দেশের মুক্তিদাতা বা ত্রাণকর্তা। আমরা পরের অধ্যায়ে জানব, বনী মোশি আজ থেকে ৩৫০০ বৎসর আগে তথা যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ১৫০০ বৎসর আগে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে ঈশ্বর পুত্র বা ঈশ্বরের অবতার ইহুদিদের ত্রাণকর্তা হিসেবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। প্রায় সমস্ত আধুনিক ও প্রাচীন পণ্ডিত একমত যে যীশুর আবির্ভাব ইতিহাসে বিদ্যমান। ঐতিহাসিক যীশুর জীবন ছিল সম্পূর্ণ অলৌকিক যার নির্ভরযোগ্য অন্বেষণ করেছে পবিত্র বাইবেল ধর্মগ্রন্থ এবং সুসমাচারের বইগুলি। উল্লেখ্য, খ্রিস্ট ধর্ম অনুসারে, সুসমাচার (গসপেল) যিশুর জীবন, শিক্ষা, কর্মকান্ড, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে নিখুঁত বিবরণ দিয়েছে। চারটি প্রধান সুসমাচার হল- মথি (Matthew), মার্ক (Mark), লূক (Luke) এবং যোহন (John)। বাইবেলের ঐ চারটি প্রামাণিক সুসমাচার ছাড়াও, কিছু সুসমাচার

রয়েছে যা বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত নয়, যেমন -টমাস, পিতর, বা থমাস। পবিত্র বাইবেল এবং সুসমাচারের বইগুলির তথ্য অনুসারে যীশু ছিলেন একজন গ্যালিলিয়ান ইহুদি এবং যোহন ব্যাপটিস্ট থেকে তিনি বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন এবং এরপর তিনি তাঁর খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার শুরু করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাগুলি মূলত মৌখিক প্রেরণের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছিল এবং তাঁকে প্রায়শই একজন "রব্বি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়। যীশু অন্যান্য ইহুদিদের সাথে বিতর্ক ও বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছিলেন কিভাবে ঈশ্বরকে আরও ভালভাবে অনুসরণ করা যায়, নিরাময় লাভ করা যায়। এইভাবে তিনি সকল মানুষদেরকে বিভিন্ন, দৃষ্টান্ত দিয়ে ধর্ম-শিক্ষা দিতেন। ফলে তাঁর অসংখ্য অনুসারী হয়। ঐতিহ্যগতভাবে যীশু খ্রিস্টের জীবন কাহিনীতে বিশ্বাস করা হয় যে, ইহুদি কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিচার করে, রোমান সরকারের হাতে তুলে দেয় এবং রোমান গভর্নর পন্টিয়াস পিলেটের আদেশে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়। । যীশু খ্রিস্টের জীবনীতে লেখা আছে যে, তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর অনুসারীরা বিশ্বাস করতেন যে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং তারা যে সম্প্রদায়টি তৈরি করেছিলেন তা অবশেষে প্রাথমিক গির্জায় পরিণত হয়েছে।

খ্রিস্টীয় পবিত্র ত্রিত্ব মতবাদ (Trinity of god)

খ্রিস্টানদের বড় অংশ বিশ্বাস করে যে যীশু হলেন ঈশ্বর পুত্র, ঈশ্বরের ত্রিত্বের অংশ, যা ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র (যীশু খ্রীষ্ট) এবং ঈশ্বর পবিত্র আত্মা। এটি হল মূল খ্রিস্টীয় মতবাদ; এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর তিনজন সম-সমান এবং সহ-শাশ্বত ব্যক্তিতে এক সত্তা হিসেবে বিদ্যমান: ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র (যীশু খ্রীষ্ট), এবং ঈশ্বর পবিত্র আত্মা। ত্রিত্ববাদ নিশ্চিত করে যে ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি অথচ অবিচ্ছেদ্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনটি সত্তা। পিতা ঈশ্বর যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং পালনকর্তা, ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের উৎস এবং মানবতার প্রেমময় পিতামাতা হিসেবে বিবেচিত হন। দ্বিতীয় সত্তা হল ঈশ্বর পুত্র এবং যীশু খ্রীষ্ট হলেন তাই। অর্থাৎ যীশু হলেন ঈশ্বর পুত্র বা ঈশ্বরের অবতার, যিনি

মানবজাতির মধ্যে মানুষ হিসেবে বসবাস করেছিলেন, পাপের ক্ষমার জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং আবার পুনরুত্থিত বা জীবিত হয়েছিলেন। ত্রিত্ববাদের তৃতীয় সত্তা হল -ঈশ্বর এক পবিত্র আত্মা যা হল ঈশ্বরের ঐশ্বরিক উপস্থিতি এবং শক্তি, যিনি বিশ্বাসীদের পথ দেখান, অনুপ্রাণিত করেন এবং ক্ষমতায়ন করেন। বলা বাহুল্য, আমাদের হিন্দু ধর্ম একই ধারণা বা মতবাদ পোষণ করে। ত্রিত্ববাদ মূল খ্রিস্টীয় বিশ্বাস। এটাই হল খ্রিস্টানদের একটি কেন্দ্রীয় বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং মানবতার সাথে সম্পর্ক বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা।

যীশু খ্রিষ্ট ও খ্রিস্টধর্ম

আমরা প্রায় সকলে জানি, যীশু খ্রিস্ট বিশ্বের বৃহত্তম ধর্ম খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। বাইবেলে বলা হয়েছে, যীশু হলেন ঈশ্বরের অবতার, সম্পূর্ণ মানব এবং সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক। খ্রিস্টানরা যীশুকে বিশ্বের স্রষ্টা এবং ত্রাণকর্তা বলে বিশ্বাস করে, যেমন হিন্দুরা ভগবান কৃষ্ণকে বিশ্বের স্রষ্টা এবং ত্রাণকর্তা বলে বিশ্বাস করে। খ্রিস্টানদের কিছু অংশ বিশ্বাস করে যে যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র এবং বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মশীহ (খ্রীষ্ট)। তারা বিশ্বাস করে যে যীশু, মশীহ হিসেবে, মানবতার ত্রাণকর্তা হিসেবে ঈশ্বর কর্তৃক অভিষিক্ত হয়েছিলেন। খ্রিস্টানরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যীশুকে খ্রীষ্ট, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মশীহ এবং ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বলে বিশ্বাস করে। সুসমাচার যীশুকে খ্রীষ্ট এবং ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে দুটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সাথে বিবেচনা করে। (মার্ক (১:১), ঠিক খ্রিস্টধর্মের সূচনা হয়েছিল যীশুর মানবিক জীবনের পরিচর্যার মাধ্যমে, যিনি একজন ইহুদি শিক্ষক এবং নিরাময়কারী বা ত্রাণকর্তা ছিলেন যিনি ঈশ্বরের আসন্ন রাজ্য ঘোষণা করেছিলেন। খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যীশুকে ৩০-৩৩ খ্রিস্টাব্দে রোমান প্রদেশের জুডিয়ার জেরুজালেমে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। বেশিরভাগ খ্রিস্টান বিশ্বাস করেন যে যীশু মানুষের মুক্তির জন্য বিশ্বের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তাঁর জীবন উৎসর্গ করার জন্য রোমান ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

পিউ-এর মতে, খ্রিস্টান জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। খ্রিস্টানদের বেশিরভাগই ইউরোপ এবং আমেরিকায়। খ্রিস্টধর্মের অনুসারী প্রায় ২.৩৮ বিলিয়ন এবং জনসংখ্যার দিক থেকে এটিই বৃহত্তম ধর্ম। বিভিন্ন পণ্ডিত এবং বিশ্লেষকদের মতে, উচ্চ জন্মহার এবং ধর্মান্তরিতকরণ খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। ২০২৩ সালে, বলা হচ্ছে যে ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বব্যাপী ২.৬ বিলিয়নেরও বেশি এবং ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ৩.৩ বিলিয়ন খ্রিস্টান বিশ্বব্যাপী অবস্থান করবে।

যীশুর অলৌকিক জীবন কাহিনী

আমরা প্রায় সকলেই জানি, যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়েছিল এক ইহুদি পরিবারে, - যোষেফের স্ত্রী মরিয়মের গর্ভে। বাইবেলে মথি এবং লূক যীশুর জন্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন, বিশেষ করে যখন ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বেথলেহেমে মরিয়ম নামে এক কুমারীর গর্ভে যীশুর জন্ম হয়েছিল। লূক মরিয়ম বা মেরীকে কেন্দ্র যীশুর জন্মের পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি বিশেষভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যদিকে মথি জোষেফকে কেন্দ্র করে যীশুর জন্মের পরের পরবর্তী ঘটনাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। উভয়ের বর্ণনা থেকে এটা নিশ্চিত হয় যে যীশু বেথলেহেমে যোষেফের বাগদত্তা কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং উভয়ই এই মতবাদকে সমর্থন করে যে যীশু একজন কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই ব্যাখ্যা অনুসারে, যীশু খ্রীষ্ট অলৌকিকভাবে পবিত্র আত্মা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আবার ম্যাথুর সুসমাচারে, জোসেফ চিন্তিত ছিলেন যে তার বাগদত্তা মরিয়ম গর্ভবতী, কিন্তু জোসেফের তিনটি স্বপ্নের প্রথমটিতে, দেবদূত তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে তিনি মরিয়মকে তার স্ত্রী হিসাবে বিয়ে করতে যেন না ভয় পান। তার পুত্র পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভধারণ করবেন। অর্থাৎ পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মেরীর গর্ভে যিশু জন্মগ্রহণ করেন বলে সকলের বিশ্বাস এবং বাইবেলে এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, যিশু ঈশ্বরের পুত্র

এবং মসীহ, যিনি পৃথিবীতে পাপ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে এসেছিলেন।

মরিয়ম ও যোষেফের সাথে দেবদূতদের দেখা

প্রায় ২০০০ বছরের কিছু আগে, নাসরৎ শহরের মেরি নামে এক ইহুদি অবিবাহিতা যুবতীর কাছে গ্যাব্রিয়েল নামে এক দেবদূত এলেন। গ্যাব্রিয়েল দেবদূত সেই ইহুদি মহিলাকে বললেন যে ঈশ্বরপুত্র যীশু নামে একটি পুত্র সন্তান তাঁর গর্ভে জন্ম নেবেন। এই কথা শুনে মেরি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। মেরি তখন ভাবলেন যে এটা কিভাবে সম্ভব যখন তিনি কোনও পুরুষের সাথে ছিলেন না বা তিনি এখন বিয়ে করেন নি। মেরিকে ভীষণ বিচলিত দেখে দেবদূত মেরিকে বললেন; *"মরিয়ম, ভয় করো না, কারণ তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ। আর দেখ, তুমি তোমার গর্ভে ধারণ করবে ঈশ্বরের পরম আত্মাকে, একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে এবং তাঁর নাম রাখবে যীশু। তিনি মহান হবেন এবং তাকে পরাৎপর অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। আর প্রভু ঈশ্বর তাঁকে তার পিতা দাউদের সিংহাসন দেবেন, এবং সে চিরকাল যাকোবের বংশের উপর রাজত্ব করবে, এবং তার রাজ্যের কোন শেষ হবে না।"* (লুক ১:৩০-৩৩) দেবদূতের এই সকল কথা শোনার পরেও *মরিয়মের সংশয় থেকে যায়। তাই তিনি দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করেন ,"এটা কি ভাবে হবে, যেহেতু আমি কুমারী?" স্বর্গদূত তাঁকে আবার বললেন, "পবিত্র আত্মা তোমার উপর আসবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমাকে ছায়া দেবে; ফলে শিশুটিকে পবিত্র বলা হবে - ঈশ্বরের পুত্র। আর দেখ, তোমার আত্মীয়া ইলীশাবেতের বৃদ্ধ বয়সেও একটি পুত্র সন্তান হয়েছে; যাকে এতদিন বন্ধ্যা বলা হয়েছিল ; তার এখন ষষ্ঠ মাস। কারণ ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।" মরিয়ম তখন দেবদূতকে বললেন, "দেখ, আমি প্রভুর দাসী; তোমার কথা অনুসারে আমার প্রতি তাই হোক।" মরিয়মের এই উত্তর শুনে স্বর্গদূত তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন ।"* (লূক ১:৩৪-৩৮)

ঐ সময়, মরিয়ম তাঁর হবু স্বামী যোষেফের (বিবাহের জন্য) বাগদত্তা ছিলেন। যোষেফকে যখন দেবদূতের ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলা হল,

তখন যোষেফ ভীষণ দুখী ও বিভ্রান্ত হলেন কারণ তিনি মরিয়মের কথা বিশ্বাস করতে পারেন নি। দেবদূত গ্যাব্রিয়েল তখন যোষেফের সাথে দেখা করলেন এবং তাঁকে বললেন, "মরিয়মকে তোমার স্ত্রী হিসেবে বাড়িতে নিয়ে যেতে ভয় পেও না, কারণ তাঁর গর্ভে যা আছে তা পবিত্র আত্মা থেকে এসেছে," এবং তাঁর পুত্র হবে ঈশ্বর পুত্র যীশু যিনি লোকেদের তাদের পাপ থেকে রক্ষা করবেন। প্রসঙ্গত ম্‌থির লেখা থেকে পাওয়া যায়, প্রথম অবস্থায় মরিয়মের কথা বিশ্বাস না করে যোষেফ ভীষণ দুখী ও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন কিন্তু *জনসমক্ষে মরিয়ম*কে *অপমানিত* করতে তিনি চাননি; তিনি চুপিচুপি মরিয়মকে ত্যাগ করার কথা ভেবেছিলেন। তার এই কথা ভাবার পর, প্রভুর একজন দূত স্বপ্নে তাকে দেখা দিয়ে বললেন, "দায়ূদের পুত্র যোষেফ, মরিয়মকে তোমার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে ভয় করো না, কারণ তার গর্ভে যা আছে তা পবিত্র আত্মা থেকে এসেছে। তিনি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবেন এবং তুমি তার নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনি তাঁর লোকদের পাপ থেকে রক্ষা করবেন।" (মথি ১:১৯:২১) পণ্ডিতেরা মনে করেন, প্রয়োজনে ঈশ্বর নিজেকে জগতে কাজে নিয়োজিত করেন, মানুষের কাজে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনে প্রাকৃতিক আইনকে অগ্রাহ্য করেন। যা হিন্দু ধর্মে আমরা গৌতম বুদ্ধ, জগদ্গুরু আচার্য শঙ্কর বা শ্রী চৈতন্যদেবের ক্ষেত্রে দেখেছি । এখানে তিনি কুমারী গর্ভে মানবদেহে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর দেবত্বকে ত্যাগ করেননি, বরং তিনি তাঁর দেবত্বের সাথে মানবতাকে যুক্ত করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ ঈশ্বর এবং সম্পূর্ণ মানুষ উভয়ই ছিলেন (ফিলিপীয় ২:৬-৮ ; কলসীয় ১:১৫-২০ ; ইব্রীয় ১:৮-৯)।তিনি পিতা যোষেফের ইচ্ছা থেকে জন্মগ্রহণ করেনি, বরং ঈশ্বর থেকে জন্মগ্রহণ করেছে" (যোহন ১:১৩)।

বেথলেহেমে খ্রিস্টের জন্ম

বাইবেল অনুযায়ী যিশু খ্রিস্টের জন্মস্থান জেরুজালেম থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত বেথলেহেম। বাইবেলের সুসমাচার

অনুসারে, যিশুর জন্ম রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে জুডিয়ার বেথলেহেমে একটি আস্তাবলে হয়েছিল। আসুন আমরা জেনে নেই আস্তাবলে যীশুর জন্মের প্রেক্ষাপট কি ছিল। রোমান সম্রাট ঐ সময় আদেশ জারি করেন যে প্রত্যেককে তার নিজের নগর/ শহরে গিয়ে আদমশুমারিতে নাম লেখাতে হবে। যোষেফের জন্মস্থান ছিল বেথলেহেমে; তাই যোষেফ মেরিকে নিয়ে বেথলেহেম নগরে যাত্রা করলেন। ঐ সময় (যিশুর জন্মের সময়) রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন অগাস্টাস সিজার এবং জুডিয়ার স্থানীয় শাসক ছিলেন হেরোদ দ্য গ্রেট। মেরি গর্ভবতী হওয়া সত্ত্বেও, বেশ কয়েকদিন ধরে গাধার পিঠে চড়ে মেরি এবং যোষেফ বেথলেহেমে পৌঁছান। কিন্তু সেখানে তারা থাকার কোনও জায়গা পেল না। সরাইখানাগুলি একেবারে ভর্তি ছিল। এদিকে আবার মেরিকে যে কোনও মুহূর্তে প্রসবের জন্য প্রস্তুত দেখে, একজন সরাইখানার মালিক যোষেফকে বলেছিলেন যে তাঁরা তার আস্তাবলে থাকতে পারেন। বাধ্য হয়ে মেরি এবং যোষেফ একটি আস্তাবলে খড়ের উপর বসলেন যেখানে পশুরা ঘুমাচ্ছিল। সেখানেই মরিয়মের প্রসববেদনা শুরু হল এবং যীশু আস্তাবলেই জন্মগ্রহণ করলেন। ঘুমন্ত শিশুটির বিশ্রামের জন্য একমাত্র জায়গা ছিল সেখানে পশুদের যাবপাত্র। মেরী *শিশুকে কাপড়ে জড়িয়ে একটি যাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ সরাইখানায় তাদের জন্য জায়গা ছিল না।"* (**<u>লুক ২:৪-৭</u>**)

যিশুর জন্মের কিছু সময় পর, তিনজন জ্ঞানী পুরোহিত ব্যক্তি, আকাশে সেই উজ্জ্বল তারাটি দেখতে পেলেন যা যীশুর জন্মস্থানের উপরে অবস্থান করছিল। তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্বের এক দূর দেশ থেকে ঈশ্বর-পুত্র নতুন রাজার খোঁজে ভ্রমণ করেছিলেন। জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভ্রমণের সময়, যিহূদার রাজা হেরোদ জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে দেখা করেছিলেন। *"তারপর হেরোদ গোপনে ঐ* তিনজন জ্ঞানী *পণ্ডিতদের ডেকে তাঁদের কাছ থেকে তারাটি কখন দেখা দিয়েছিল তা জানতে পারলেন। তিনি তাঁদের বেথলেহেমে পাঠিয়ে বললেন, "যাও, শিশুটিকে ভালোভাবে খুঁজে বের করো। যখনই*

তোমরা তাকে পাবে, আমাকে খবর দাও, যাতে আমিও গিয়ে তাকে উপাসনা করতে পারি।" রাজার কথা শুনে তাঁরা তাঁদের পথে চলে গেলন, এবং উদয়ের সময় যে তারাটি তাঁরা দেখেছিলেন তা তাঁদের আগে আগে চলল। শিশুটি যেখানে ছিল তারাটি তার উপরে থামল। তাঁরা তারাটি দেখে আনন্দিত হলেন। বাড়িতে এসে তারা শিশুটিকে তার মা মরিয়মের সাথে দেখতে পেলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর তারা তাঁদের ধনভাণ্ডার খুলে তাকে সোনা, ধূপ এবং গন্ধরস উপহার দিলেন। এবং স্বপ্নে তাঁদেরকে হেরোদের কাছে ফিরে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল, তাঁরা অন্য পথ দিয়ে তাদের দেশে ফিরে গেলন।" (মথি 2:7-12) এদিকে হেরোদ এবং জেরুজালেমের সকল লোকজন যখন এটা শুনলেন, তাঁরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। তাই হেরোদ পুরোহিতদের সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তারা কোথায় তাকে খুঁজে পেয়েছেন ফিরে এসে তা জানাতে বলেছিলেন। কিন্তু পরে ঐ তিন জ্ঞানী পুরোহিত ব্যক্তি অন্য পথে বাড়ি ফিরে গেলেন, কারণ তাঁরা জানতেন যে রাজা হেরোদ যীশুর উপাসনা করতে চাননি বরং শিশুটিকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route." (Matthew 2:7-12)

রাজা হেরোদের নির্দোষদের গণহত্যা,

হেরোদ যখন জানতে পারলেন যে পুরোহিতমণ্ডলী তার সাথে প্রতারণা করেছে, তিনি ভীষণ রেগে যান এবং বেথলেহেমের আশেপাশের দুই বছরের কম বয়সী সব শিশুকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। খ্রিস্টান ধর্ম অনুসারে, যিশুর জন্মের পর মাগিরা (পূর্ব দেশের পুরোহিতমণ্ডলী) বেথলেহেমে এসে যখন ঘোষণা করেন যে, "ইহুদিদের রাজা" জন্মগ্রহণ করেছে; সেই খবর শুনে রাজা হেরোদ ভীত হয়ে যান এবং তিনি বেথলেহেমের দুই বছর বা তার কম বয়সী সব শিশুপুত্রের হত্যা করার নির্দেশ দেন। এটাকে নির্দোষদের গণহত্যা বলা হয়েছে। এই ঘটনা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এবং এর স্মরণে তারা প্রতি বছর "পবিত্র নির্দোষদের স্মরণে উৎসব" পালন করে ।

প্রসঙ্গত, প্রায় ৩২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে (৫০০০ বছরেরও বেশি আগে) রাজা কংস ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার চেষ্টার ঘটনাটির সঙ্গে হেরোদের যীশু খ্রিস্টকে হত্যা করার চেষ্টার ঘটনার সাথে কমবেশি মিল রয়েছে। কিন্তু রাজা কংস ভগবান কৃষ্ণকে হত্যা করতে পারেননি। বিপরীতে, রাজা কংসকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হত্যা করেছিলেন।

ঐ সময় একজন স্বর্গদূত জোসেফের স্বপ্নে দেখা দেন এবং তাঁকে সতর্ক করে বলেন যে, তিনি যেন শিশু ও তার মাকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ লুকিয়ে মিশরে পালিয়ে যায় এবং হেরোদের শিশু গণহত্যা থেকে শিশুকে রক্ষা করেন। পণ্ডিতেরা বলেছিলেন ঈশ্বর নিজেই জোসেফের পবিত্র পরিবার এবং তাঁর পুত্রকে ডেকে নিয়েছিলেন। হেরোদের মৃত্যুর পর একজন স্বর্গদূত জোসেফকে আবার স্বপ্নে দেখা দেন এবং তাকে শিশু ও তার মাকে নিয়ে বনী ইস্রায়েলে ফিরে যেতে বলেন, কিন্তু হেরোদের পুত্র তখন যিহূদিয়ার শাসক ছিলেন এবং পুণরায় স্বপ্নে সতর্ক করার পর জোসেফ গ্যালিলে চলে যান, সেখানে তিনি নাজারেতে তার বাড়ি করে সেখানে থাকেন; এরফলে দেবদূতের মাধ্যমে জোসেফকে যা বলা হয়েছিল তা মানা হয়েছিল।

দেবদূতের নির্দেশ ছিল ঐ শিশুকে নাসরানি বলে ডাকা হবে।" (উৎস ম্যাথিউ-২)

উল্লেখ্য, “নাসরিন “নামের অর্থ হলো "বন্য গোলাপ" বা "সাদা বিশুদ্ধ ফুল"। ম্যাথিউর লেখা অনুযায়ী দেখান যে "নাসরাতের যিশু" প্রকৃতপক্ষে বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে শহরে ডেভিডের জন্ম হয়েছিল, কেননা "ডেভিডের পুত্র" হিসেবে জন্মগ্রহণকারী "ইহুদিদের রাজা" হবে। বেথলেহেমকে "বংশগতভাবে ডেভিডের শহর" হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। খ্রিস্টীয় ২য় শতক থেকে লোকেরা বিশ্বাস করে যে চার্চ অফ দ্য নেটিভিটি, বেথলেহেম এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই যিশুর জন্ম হয়েছিল।

স্বর্গদূত কতৃক মেষপালকদেরকে যীশুর জন্মের আনন্দ সংবাদ প্রদান;

এক সময়, বেথলেহেমের একটি মাঠে কিছু মেষপালক *রাতের বেলায়* তাদের মেষপাল পাহারা দিচ্ছিল। এমন সময় সেখানে মেষপালকদের কাছে এক স্বর্গদূত আবির্ভূত হলেন। স্বর্গদূতের আবির্ভাব ও মহিমা তাদের চারপাশে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। *মেষপালকরা ভীষণ* ভয় পেয়ে গেল। তিনি তাদেরকে ত্রাণকর্তা যীশু খ্রিস্টের জন্মের সুসংবাদ জানালেন। *স্বর্গদূত তাদের বললেন, "ভয় পেও না, আমি তোমাদের কাছে এক মহানন্দ সংবাদ নিয়ে এসছি যা সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদ । কারণ আজ দায়ূদের নগরীতে তোমাদের জন্য একজন ত্রাণকর্তা জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি হলেন খ্রীষ্ট প্রভু। আর তাঁকে জানার জন্য একটি বিশেষ চিহ্ন হবে: তোমরা ঐ শিশুটিকে কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় একটি যাবপাত্রে শুয়ে থাকতে দেখতে পাবে।" হঠাৎ স্বর্গীয় বাহিনীর একদল লোক সেই স্বর্গদূতের সাথে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে বলল, "ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের মহিমা, এবং পৃথিবীতে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট তাদের মধ্যে* শান্তি আনবে!" (লূক 2:8-14)

স্বর্গদূতেরা তাদের কাছ থেকে স্বর্গে ফিরে গেলে মেষপালকরা মাঠে পরস্পর আলোচনা করে প্রভুকে দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং বেথলেহেমে স্বর্গীয় শিশুটিকে দেখতে ছুটে গেল। সেখানে গিয়ে তারা মরিয়ম ও যোষেফ দেখল এবং শিশুটিকে একটি জাবনা খাবার পাত্রে শোয়ানো অবস্থায় দেখল। শিশুটির বিষয়ে তাদের যা বলা হয়েছিল মেষপালকেরা শিশুটিকে ঠিক সেইভাবে দেখতে পেল এবং সেই কথা সকলকে জানাতে লাগল। মেষপালকদের মুখে ঐ কথা যাঁরা শুনল তারা সকলে অবাক হয়ে গেল৷ কিন্তু মরিয়ম এই কথা মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে সব সময় এবিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।এরপর মেষপালকরা তাদের কাছে যা বলা হয়েছিল সেই অনুসারে সব কিছু দেখে ও শুনে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে ঘরে ফিরে গেল।। (Luke;2.8-14) এর আট দিন পরে শিশুটির নাম রাখা হল যীশু৷ বলা বাহুল্য, তাঁর মাতৃগর্ভে আসার আগেই স্বর্গদূত তাঁর এই নাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

যীশুর শৈশব ও কৈশোর;

নাজারেতেই যীশু জ্ঞানে, উচ্চতায় এবং ঈশ্বর ও মানুষের অনুগ্রহে বেড়ে ওঠেন। (লূক ২:৫১-৫২)। বিভিন্ন লেখা এবং বাইবেলের উপর ভিত্তি করে, আমরা জানতে পারি যে যীশু তাঁর পরিবারের সাথে তাঁর বাড়িতে একজন সাধারণ শিশু হিসেবে বেড়ে উঠেছিলেন যতক্ষণ না তাঁর ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার সময় এসেছিল। তাঁর শৈশব নাজারেতের অন্যান্য শিশুর মতোই সাধারণ ছিল বলে জানা যায়। একদিন নাজারেতে হঠাৎ যীশু নিখোঁজ হয়ে যায়। জেরুজালেমে তিন দিন পর যীশুকে খুঁজে পেলেন তাঁরা। মন্দিরে তাঁকে এক প্রবীণ পন্ডিতের সাথে আলোচনা করতে দেখা গেল, " বালক যীশু মন দিয়ে তাঁদের কথা শুনছিলেন এবং তাদেরকে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন "। বিশেষ করে অল্প বয়সে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান দেখে, তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন। উল্লেখ্য, তাঁর জীবদ্দশায় যীশুকে যোষেফের পুত্র যীশু বা নাসরতের যীশু বলা হত - (লূক ৪:২২; যোহন ১:৪৫, ৬:৪২), তাঁর দৈহিক মৃত্যুর পর তিনি যীশু খ্রীষ্ট নামে সারা বিশ্বে পরিচিত হলেন। 'খ্রীষ্ট' হল একটি

গ্রীক শব্দ যা 'ক্রিস্টোস' থেকে উদ্‌ভূত একটি উপাধি; যার অর্থ হল মুক্তিদাতা।

Humanity of Jesus and Lord Krishna

যীশু ও ভগবান শ্রী কৃষ্ণের মানবতা

যীশু সম্পর্কে অনেক অলৌকিক ঘটনা রয়েছে, যা সত্যিই আমাদের অবাক করে। পৃথিবীতে মানবদেহে যীশুর আবির্ভাব তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটা কল্পনা করা খুব কঠিন যে যীশু আমাদের মতোই একজন মানুষ ছিলেন। প্রভু যীশুও ভগবান কৃষ্ণের মতো পৃথিবীতে এসেছিলেন মানবজাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে। আমরা হয়তো ভাবতে পারি, ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে তিনি তাঁর মানব জীবনে খুব বেশি সমস্যার সম্মুখীন হননি। কিন্তু বাইবেল পড়ে জানতে পারি, বাস্তব জীবনে আমরা যেমন বিপদ এবং সংগ্রামের সম্মুখীন হই, তেমনই তিনিও আমাদের মত সকল ধরণের বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশি বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

যীশু খ্রীষ্ট বা ভগবান কৃষ্ণের মানব জীবনের কথা বলতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দের একটি বিশেষ উক্তি মনে পড়ে। স্বামীজি একবার বলেছিলেন, "আমার কেবল প্রচার করতে হবে যে ঈশ্বর বারবার আসেন, এবং তিনি ভারতে কৃষ্ণ, রাম এবং বুদ্ধ রূপে এসেছিলেন এবং তিনি আবার আসবেন। এটি প্রায় প্রমাণিত যে প্রতি ৫০০ বছর পর পৃথিবী ডুবে যায়, এবং একটি প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক তরঙ্গ আসে, এবং যীশুও ঠিক তেমনি ভাবে পৃথিবীতে এসেছিলেন।" তিনি আরও বলেছিলেন যে, "খ্রিস্ট, মানুষ হয়েও, তাঁকে অপবিত্রতা দেখতে হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর, অসীম উচ্চ, অন্যায় দেখেন না এবং রাগ করতে পারেন না।" স্বামী বিবেকানন্দ যীশুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা করতেন। তাই, তিনি বলেছিলেন, আমি সেই হিন্দুর প্রতি করুণা করি যারা যীশু খ্রীষ্টের চরিত্রের সৌন্দর্য দেখতে পায় না। আমি সেই খ্রিস্টানের প্রতি করুণা করি যারা হিন্দু

খ্রীষ্টকে শ্রদ্ধা করে না। বিবেকানন্দের মতামত, "যদি যীশু খ্রীষ্ট নিখুঁত না হতেন, তাহলে তাঁর নামের ধর্ম মাটিতে পড়ে যেত।"

Swamiji said, "I have only to preach that God comes again and again, and that He came in India as Krishna, Rama, and Buddha, and that He will come again. It can almost be demonstrated that after each 500 years the world sinks, and a tremendous spiritual wave comes, and so also Jesus came to the world". He further said that "Christ, being man, had to see impurity and denounced it; but God, infinitely higher, does not see iniquity and cannot be angry." Swami Vivekananda had enormous reverence for Jesus. So, he said, I pity the Hindu who does not see the beauty in Jesus Christ's character. I pity the Christian who does not reverence the Hindu Christ. Vivekananda is the opinion "If Jesus Christ was not perfect, then the religion bearing his name falls to the ground."

যিশুর বাপ্তিস্ম

যিশুর বাপ্তিস্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা বাইবেলে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। যিশু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন "সমস্ত ধার্মিকতা পূর্ণ করার জন্য"। বাপ্তিস্মের মাধ্যমে ঈশ্বরপুত্র যিশু পিতার প্রতি তাঁর বশ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন, পাপীদের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন যাদের তিনি উদ্ধার করতে এসেছিলেন। যীশু তাঁর চাচাতো ভাই, যোহন বাপ্তিস্মদাতার দ্বারা বাপ্তিস্ম হয়েছিলেন জর্ডন নদীর জলে। বলা হয় ঐ সময়কালে স্বর্গ খুলে গিয়েছিল, ঈশ্বরের আত্মা যিশুর উপর নেমে এসেছিল, এবং ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল। যিশুর বাপ্তিস্মের বর্ণনা ম্যাথিউ, মার্ক এবং লুকের বাইবেলে রয়েছে। লূকের বর্ণনায়, যোহন যীশুকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, তা স্পষ্টভাবে বলা হয় না, বরং বলা হয়েছে "যীশু বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন"। মথি, মার্ক এবং লূকের নতুন নিয়মের সুসমাচার অনুসারে, যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম একটি মহান ঘটনা যা মানুষ

স্পষ্টভাবে স্মরণ করে থাকে। যখন যোহন বাপ্তিস্মদাতা জর্ডান নদীতে লোকেদের বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, তখন যীশু যোহনের কাছে এসেছিলেন। যোহন তাকে তার মন পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যীশু উত্তর দিয়েছিলেন, "এইভাবে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত কিছু করব" তখন যোহন যীশুর বাপ্তিস্মে রাজি হলেন। বাপ্তিস্মের ঠিক আগে, যোহন যীশুকে জর্ডান নদীর জলে সম্পূর্ণরূপে ডুবে স্নান করতে বললেন। বাপ্তিস্ম নেওয়ার সাথে সাথেই জল থেকে যীশু উঠে এলেন; তাঁর জন্য স্বর্গ খুলে গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের মতো নেমে এসে তাঁর উপর আবির্ভূত হতে দেখলেন: "এবং স্বর্গ থেকে একটি বাণী হল, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এর প্রতি আমি প্রীত" (মথি ৩:১৩, ১৬-১৭)।

বাপ্তিস্মদাতা যোহন দ্বারা যীশুর বাপ্তিস্ম

যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের সময়, যোহন যীশুকে সম্পূর্ণরূপে জলে ডুবিয়েছিলেন। এই ধরণের বাপ্তিস্মকে নিমজ্জন দ্বারা বাপ্তিস্ম (Baptism by immersion) বলা হয়। ঈশ্বর যোহনকে বাপ্তিস্ম দেওয়ার জন্য বিশেষ ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব প্রদান করেছিলেন বলে বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে।

বাপ্তিস্মের পূর্বে যোহনের সঙ্গে যীশুর কথোপকথন

বাপ্তিস্মের পূর্বে যোহনের সঙ্গে যীশুর যে কথোপকথন হয়েছিল তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যোহন ধর্ম প্রচার শুরু করার প্রায় ছয় মাস

পরে, যীশু তাঁর কাছে জর্ডনে আসেন। তখন যীশুর বয়স ৩০ বৎসর। তাঁর কাছে গিয়ে যীশু যোহনকে বলেন তাঁকে বাপ্তাইজিত করতে। সঙ্গে সঙ্গে যোহন বাধা দেন: "আপনার দ্বারা আমারই বাপ্তাইজিত হওয়া অবশ্যক; আর আপনি আমার কাছে এসেছেন বাপ্তাইজিত হওয়ার জন্য? এ কি করে হয়?" যোহন জানতেন যে তাঁর মাসতুত ভাই যীশু ঈশ্বরের বিশেষ পুত্র। কেন, যোহন মায়ের জঠরে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলেন যখন মরিয়ম, যীশুকে গর্ভে নিয়ে, তাদের পরিদর্শন করেন! যোহনের মা, ইলিশাবেৎ, কোন সন্দেহ নেই এই সম্বন্ধে পরে তাকে বলেছিলেন। আর নিশ্চয় তিনি তাকে যীশুর জন্ম সম্বন্ধে দূতের যে ঘোষণা, এবং যে রাত্রিতে যীশু জন্ম নেন তখন মেষপালকদের কাছে দূতেদের আগমনের কথাও তাঁর মা বলেছিলেন। অর্থাৎ যীশু যে ঈশ্বরের বিশেষ পুত্র তা যোহন ভালভাবে জেনেছিলেন।

যিশু মানবদেহে জীবনকালের কিছু অলৌকিক ঘটনা

বাইবেল পড়ে জেনেছি যিশু তাঁর মানবদেহে জীবনকালে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন যা বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে। সেই অলৌকিক ঘটনার কথা অনেকের জানা আছে। অলৌকিক ঘটনাগুলোর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; যেমন অসুস্থকে সুস্থ করা, মৃতকে জীবিত করা, প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ এবং আরও অনেক কিছু। আমাদের মনে রাখতে হবে- যিশুর এই সব অলৌকিক ঘটনাগুলো আমাদের কাছে তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রমাণ। বাইবেল অনুসারে যীশুর পরিচর্যা বা "Ministry of Jesus" শুরু হয়েছিল যর্দন নদীর তীরে বাপ্তিস্মদাতা যোহন কর্তৃক যীশুর বাপ্তিস্ম হওয়ার পর এবং শেষ হয়েছিল যিহূদিয়ার জেরুজালেমে, তাঁর শিষ্যদের সাথে শেষ নৈশভোজের পর। লূকের সুসমাচারে (লূক ৩:২৩) বলা হয়েছে যে যীশু তাঁর পরিচর্যা শুরু করেছিলেন যখন তাঁর বয়স প্রায় ৩০ বছর। বাইবেলের মতবাদ অনুসারে, যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পার্থিব পরিচর্যার সময় বিশেষ করে তিনটি কাজ সম্পাদন করেছিলেন: নবী, পুরোহিত এবং রাজার কাজ। মথির সুসমাচার অনুসারে, যীশুর পরিচর্যার মধ্যে ছিল প্রধানত শিক্ষাদান, ধর্ম প্রচার,

এবং আরোগ্য প্রদান। এখানে বেছে বেছে তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিক ঘটনা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

১) অন্ধকে দৃষ্টিদান:

যীশু যখন তাঁর অনুসারীদের নিয়ে জেরিকো ছেড়ে যাচ্ছেন, তখন বার্তিমায়ুস নামে এক অন্ধ লোক রাস্তার ধারে বসে ভিক্ষা করছিল। রাস্তায় ভীষণ ভীড় ছিল। ভিড়ের কথা শুনে সে ভীড়ের কারণ জানতে চাইলে লোকজন তাকে বলল, "নাসরতীয় যীশু সেই পথ দিয়ে যাচ্ছেন।। তাই পথে এত ভিড়। সে চিৎকার করে বলল, "হে যীশু, দায়ূদের পুত্র, আমার প্রতি দয়া করুন!" যারা সামনে ছিল তারা তাকে ধমক দিয়ে চুপ থাকতে বলল। কিন্তু সে আরও জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "হে দায়ূদের পুত্র, আমার প্রতি দয়া করুন!" যীশু থামলেন এবং তাকে তাঁর কাছে আনতে বললেন। সে কাছে আসতে তাকে যীশু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি চাও আমি তোমার জন্য কি করি?" সে বলল, "প্রভু, আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিন।" যীশু তাকে বললেন, "তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে; তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করবে।" আর তৎক্ষণাৎ অন্ধ লোকটি দৃষ্টি ফিরে পেল। এরপর সে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে প্রভুর পিছনে পিছনে গেল। আর সমস্ত লোক তা দেখে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল। (লূক ১৮:৩৫-৪৩) এইভাবে যিশু বহু মানুষের বিভিন্ন রোগ যেমন কুষ্ঠরোগ, পক্ষাঘাত, এবং অন্যান্য কঠিন অসুখের নিরাময় করেছিলেন। বাইবেলের তথ্য অনুসারে বহু অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টি দান করেছিলেন; যেমন, যীশু একবার একজন অন্ধ ব্যক্তির চোখে কাদা লাগিয়ে তাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছিলেন, এবং তারপর তাকে পুকুরে তা ধুয়ে দিতে বলেছিলেন।

২) মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা যীশুর অলৌকিক ঘটনা:

বাইবেলে বেথানির লাজরাসের মতো মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার যিশুর অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ রয়েছে যা যোহনের সুসমাচারে (যোহন ১১:১-৪৪) বর্ণিত হয়েছে। বাইবেলে এটাও পাওয়া যায় যে জাইরাসের (Jairus) মৃত মেয়েকে তিনি জীবিত

করেছিলেন। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যীশু ২/৩ জন মৃতকে জীবিত করেছিলেন। এখানে একটা ঘটনা বাইবেল থেকে সংক্ষেপে বর্ণনা করছি;

একদিন যীশু নায়িন নামক এক নগরে যাচ্ছেন; তাঁর বহু শিষ্য এবং বহু লোকও তাঁর সাথে চললেন। তিনি যখন নগরের ফটকের কাছে পৌঁছালেন, তখন একজন মৃত ব্যক্তিকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই মৃত ব্যক্তিটি ছিল বিধবা মায়ের একমাত্র পুত্র। ঐ বিধবা পুত্রহারা মায়ের কান্না ও দুঃখ দেখে প্রভু তার প্রতি হৃদয়ে ভীষণ কষ্ট পেলেন এবং বললেন, "কেঁদো না।" তারপর তিনি উঠে গিয়ে কফিনটি স্পর্শ করলেন; মৃতদেহ বহনকারিরা দাঁড়িয়ে পড়ল। এরপর তিনি মৃত ব্যক্তিটিকে বললেন, "যুবক, আমি তোমাকে বলছি, ওঠো!" উঠে বসল এবং কথা বলতে শুরু করল, আর যীশু তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর সেখানে সকলে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল। যীশুকে ধন্য ধন্য করতে লাগল । তারা বলল, "আমাদের মধ্যে একজন মহান ভাববাদী বা ঈশ্বরের অবতার আবির্ভূত হয়েছেন।" "ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাহায্য করার জন্য তাঁকে পাঠিয়েছেন" যীশুর এই অলৌকিক কাহিনী যিহূদিয়া এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে নিমেষে ছড়িয়ে পড়ল। (লূক ৭:১১-১৭)

৩) যীশুর অসাধারন পরিচর্যা (Ministry of Jesus)

জর্ডান নদীর তীরে বাপ্তিস্মদাতা যোহন কর্তৃক যীশুর বাপ্তিস্মের পর যীশুর অসাধারন পরিচর্যা (Ministry of Jesus) শুরু হয়। যীশু যখন শুনলেন যে যোহনকে কারাগারে বন্দী করা হয়েছে, তখন তিনি গালীলে চলে গেলেন; যীশু গালীলে এসে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। যীশু সকলকে বললেন, "সময় পূর্ণ হয়েছে, ঈশ্বরের রাজ্য এখন শুরু হচ্ছে; তোমাদের এখনই অনুতাপ করা উচিত এবং অকাট্য সত্য হিসেবে সুসমাচারে বিশ্বাস করা উচিত।" সেই সময় থেকে যীশু তাঁর ধর্ম প্রচার করতে শুরু করলেন এবং সকলকে বলতে লাগলেন "মন ফেরাও, কারণ

স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।” “Repent, for the Kingdom of Heaven is at hand.

৪) যীশু কর্তৃক জনগণের সেবা শুশ্রূষা এবং ঈশ্বরের বাণী প্রচার;

যীশু সমগ্র গালীল জুড়ে ভ্রমণ করলেন, তাদের উপাসনালয়ে তিনি ঈশ্বরের বাণী সকলকে বোঝাতে লাগলেন শিক্ষা দিলেন, স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন এবং লোকদের মধ্যে সমস্ত রোগ, দুঃখ ও কষ্ট নিরাময় করতে লাগলেন। এইভাবে তাঁর খ্যাতি এবং ঈশ্বরের বাণী প্রচারের কথা সমগ্র সিরিয়াতে ছড়িয়ে পড়ল। দূর দূর থেকে বহু অসুস্থ, নানা রোগ ও যন্ত্রণায় আক্রান্ত, ভূতগ্রস্ত, মৃগীরোগী এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী তাঁর কাছে আসতে লাগল। তিনি সকলকে সুস্থ করলেন। (মথি-৪:২৩-২৪)।

ম্যাথিউর বাইবেল অনুসারে, যীশু সমগ্র গালীলী ভ্রমণ করেছিলেন এবং ঈশ্বরের বাণী সম্পর্কে শিক্ষা দান করেছিলেন, রাজ্যের বার্তা ও সংবাদ প্রচার করেছিলেন এবং লোকেদের রোগ ও অসুস্থতা নিরাময় করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে সংবাদ সমগ্র সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং লোকেরা বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত অসুস্থদের তাঁর কাছে নিয়ে এসেছিল।

উল্লেখ্য, গ্যালিলি উত্তর ইসরায়েলে অবস্থিত একটি অঞ্চল যা গ্যালিলি সাগরের পশ্চিমে রয়েছে। এটি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং বাইবেলের তাৎপর্যের জন্য বিশেষ ভাবে পরিচিত। এখানে যীশু তাঁর পরিচর্যা করেছিলেন। সেখানে অনেক বাইবেলের গল্প বা কাহিনী স্থাপিত হয়েছে। যেমন যীশুর শৈশবের বাড়ি নাজারেথ যা গ্যালিল অঞ্চলে অবস্থিত। জর্ডান নদী, যেখানে যোহন বাপ্তিস্মদাতা যীশুকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, সেটাও গ্যালিলি এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

৫) যীশুর অসাধারণ ধর্মীয় শিক্ষা দান;

আগেই জেনেছি, যীশু তাঁর শিষ্যদের উপাসনালয়ে বা প্রার্থনার স্থানে ধর্মীয় শিক্ষা দান করতেন; তাছাড়া সমুদ্র তীরে বা পাহাড়ের মতো খোলা জায়গায় জনতাকে ভালো ভালো দৃষ্টান্ত বা উপকথা দিয়ে ঈশ্বরের কথা সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। তাঁর অসংখ্য শিষ্য এবং বিশাল জনতাকে শিক্ষা দেওয়ার সময়, তিনি তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে, শেষ সময় বা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করতে বলতেন। তিনি তাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি এবং উপায় উন্নত করতে শেখাতেন যাতে ঈশ্বর তাদের সকলের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে।

তিনি তাদেরকে ধর্মগ্রন্থের পদগুলিও (verses from the scripture) শিক্ষা দিতেন। তিনি ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন শ্লোক বা চরণ উদ্‌ধৃত করে ঈশ্বরের বাণী বা বাক্যগুলি যার অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতেন। তাঁর শিষ্যদের বা সাধারণ জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার সময় তিনি সামাজিক প্রতিযোগিতার উপর গ্যালিলির ভাষায় দৃষ্টান্ত ব্যবহার করতেন যেমন ভগবান কৃষ্ণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাধারণ ভাষা এবং উদাহরণ ব্যবহার করতেন অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য গ্রাম্য ভাষা, দৃষ্টান্ত ও উপকথা ব্যবহার করতেন। যীশু শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে দৃষ্টান্তগুলি ব্যবহার করতেন তার মধ্যে জমির মালিক এবং প্রজা কৃষক, প্রভু এবং দাস ইত্যাদির মতো অনেক চরিত্র অন্তর্ভুক্ত হত।

বিভিন্ন তথ্য অনুসারে, সেই সময়ে ইহুদিদের কাছে বাইবেল বা Old Testament এর মতো অনেক পবিত্র গ্রন্থ ছিল। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার সময় যীশু সাধারণত তোরাহের কথা উল্লেখ করতেন। আমরা জানি তোরাহ হল হিব্রু বাইবেলের প্রথম পাঁচটি বইয়ের সংকলন, যথা আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, সংখ্যা এবং দ্বিতীয় বিবরণ (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy) । যীশু প্রায়শই লোকেদের শিক্ষা দেওয়ার সময় মূলত ইহুদি ঐতিহ্যে তোরাহের শ্লোক বা পদগুলি উল্লেখ করতেন। তিনি হিব্রু বাইবেলের শ্লোক বা পদগুলির ব্যাখ্যা এবং

আলোকপাতের মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব উপায়ে ঈশ্বরের বানী বা বাক্য বলতেন, বিশেষ করে মোশির পাঁচটি বই, তোরাহ, অথবা নবী যিশাইয়ের বই থেকে বিশ্লেষণ।

(Ref.bs.org/wgbh/pages/frontline/shows/religion/jesus /ministry)

৬) কান্নায় বিয়ের অনুষ্ঠানে জলকে মদে রূপান্তর;

বাইবেল অনুসারে, গালীলের কান্নায় এক বিয়ে অনুষ্ঠানে যীশু তাঁর প্রথম অলৌকিক কাজ করেছিলেন, জলকে মদে পরিণত করেছিলেন। যীশু, তাঁর মা এবং তাঁর শিষ্যদেরকে ঐ বিবাহ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। অনুষ্ঠানে মদ কম পড়ে গেলে, যীশুর মা মরিয়ম তাঁকে বললেন, "তাদের মদ শেষ হয়ে গেছে; অতিথিরা আর মদ পাবে না। ঐ পরিবারের অসম্মান হবে।" মরিয়মের কাছ থেকে এই কথা শুনে যীশু প্রায় ১২০ গ্যালন জলকে মদে পরিণত করেছিলেন এবং ভোজের পরিচালক বা উদ্যোক্তা ঐ মদের গুণমানের প্রশংসা করেছিলেন। জলকে মদে পরিণত করে তিনি তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন । কেউ কেউ বলেন যে যীশু বিবাহের পবিত্রতা তুলে ধরার জন্য গালীলের কান্নায় একটি বিয়ে বেছে নিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে মরিয়ম ঐ বিষয়ে সাহায্যের জন্য তার ছেলের কাছে গিয়েছিলেন কারণ মদের অভাবের জন্য অসম্মান হলে বিয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবারের বড় অপমান হবে। **(Refer Verses 2:1-11in the Bible of John)**

৭) যীশু এক রাজকর্মচারীর মরণাপন্ন ছেলেকে সুস্থ করেন;

বাইবেল অনুসারে, যীশু যখন গালীলে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করছিলেন, তখন তিনি কফরনাহূমের একজন রাজকর্মচারীর ভীষণ অসুস্থ ছেলেকে সুস্থ করেছিলেন। ঐরাজকর্মচারী হেরোদ অ্যান্টিপাসের রাজসভায় কাজ করত। রাজকর্মচারী বিশ্বাস করতেন যে যীশু তার মৃত্যুশয্যায় থাকা পুত্রকে সুস্থ করতে পারবেন। সেই রাজকর্মচারী গালীলে যীশু যেখানে ধর্ম প্রচার

করছিলেন সেখানে গিয়েছিলেন এই আশায় যে যীশু তার সাথে যাবেন এবং তার পুত্রকে সুস্থ করবেন। তাই তিনি যীশুকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করলেন তিনি যেন তার পুত্রের জীবন রক্ষা করার জন্য কফরনাহূমে তার বাড়িতে যান। তার সাথে যাওয়ার পরিবর্তে, যীশু সেই কর্মচারীকে বললেন যে তার পুত্র তখন সুস্থ হয়ে উঠেছে। তাই যীশু সেই কর্মচারীকে তার পুত্রকে সুস্থ দেখতে বাড়িতে ফিরে যেতে বললেন। কর্মচারী যীশুর কথা মেনে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। বাড়িতে পৌঁছানোর আগেই রাজকর্মচারী খবর পেয়েছিলেন যে তার পুত্র অলৌকিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠেছে। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে ছেলেটি ঠিক কখন সুস্থ হয়ে উঠেছে। এই একই সময়ে যীশু যখন তাকে বলেছিলেন যে তার পুত্র সুস্থ হয়ে উঠেছে। **(Verses 4:39-41in the Bible of John)**

৮) যীশু কফরনাহুমে একজন লোকের মধ্য থেকে অপদেবতা (Evil Spirit) তাড়িয়ে ছিলেন

যীশু গালীলের কফরনাহূমে গেলেন। বিশ্রামবারে (Sabbath day) তিনি উপাসনালয়ে লোকদেরকে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিচ্ছিলেন। লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে গেল। উপাসনালয়ে এক ব্যক্তি ছিল, যাকে ভূত বলে অভিহিত করা হয়েছিল। হঠাৎ সেই মন্দ আত্মায় পূর্ণ লোকটি তীব্র স্বরে চিৎকার করে বলল, "চলে যাও! নাসরতীয় যীশু, আমাদের সাথে তোমার কি দরকার? তুমি কি আমাদের ধ্বংস করতে এসেছ? আমি জানি তুমি কে। তুমি ঈশ্বরের পবিত্রজন!" যীশু তাকে দৃঢ়ভাবে বললেন, "চুপ কর!" "ওর মধ্য থেকে বেরিয়ে যাও।" তখন সেই ভূত লোকটিকে সকলের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং তাকে কোন ক্ষতি না করে বেরিয়ে গেল। সেখানে উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে গেল। যীশু একজন লোকের মধ্য থেকে মন্দ আত্মা তাড়িয়ে দেওয়ার কথা সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। (Refer Verses 4:33–37in the Bible of Luke)

৯) যীশু পিটারের অসুস্থ শাশুড়ীকে সুস্থ করেন

যীশুর বারোজন প্রচারক বা প্রেরিতের মধ্যে পিটার সম্ভবত সবচেয়ে বিশিষ্ট ছিলেন। যীশু যে পাথরের উপর তাঁর গির্জা নির্মাণ করেছিলেন পিটারকে সেই পাথরের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পর যীশুর অনুসারীদের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল। যীশু সেই পিটারের বাড়িতে গিয়ে দেখলেন পিটারের শাশুড়ি প্রচণ্ড জ্বরে বিছানায় শুয়ে আছেন। তিনি খুব অসুস্থ ছিলেন। যীশু তার হাত স্পর্শ করলেন এবং তার জ্বর তৎক্ষণাৎ চলে গেল। যীশু পিটারের শাশুড়িকে মুহূর্তের মধ্যে সুস্থ করে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে যীশুর সেবা করতে শুরু করলেন। **(Refer Verses 8:14-15 in the Bible of Matthew)**

১০) যীশু একজন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেন;

যীশু যখন পাহাড় থেকে নেমে এলেন, তখন অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলল। ভিড়ের মধ্যে একজন কুষ্ঠরোগী এসে তাঁকে প্রণাম করল। কুষ্ঠরোগী তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বলল, "প্রভু, যদি আপনি চান, তাহলে আপনি আমাকে শুদ্ধ করতে পারেন।" করুণায় উদ্বেলিত হয়ে যীশু হাত বাড়িয়ে লোকটিকে স্পর্শ করলেন। তিনি বললেন "আমি চাই, তুমি শুদ্ধ হও!" তখনই সেই লোকটি কুষ্ঠরোগ থেকে শুদ্ধ হয়ে গেল। তারপর যীশু তাকে বললেন, "দেখো, কাউকে একথা বলো না। বরং যাও, পুরোহিতের কাছে নিজেকে দেখাও এবং মোশি যা বলেছেন তা তোমার শুদ্ধির জন্য উৎসর্গ করো, তাদের কাছে সাক্ষ্য হিসেবে।" লোকটি বাইরে গিয়ে যীশুর আশ্চর্য কাজের কথা প্রচার করার জন্য মুক্তভাবে ঘোষণা করতে লাগল এবং তারপর দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা যীশুর কাছে আসতে লাগল।**(Ref-Verses 8:1-4 in Bible of Matthew and Verse 1.40-45 in Bible of Mark)**

উল্লেখ্য, আমরা জানি, "কুষ্ঠরোগী" হল সেই ব্যক্তি যাকে সমাজের লোকেরা বহিষ্কার করে, ঘৃণা করে, নির্যাতন করে এবং এড়িয়ে চলে। কুষ্ঠরোগীরা সাধারণত সমাজ থেকে দূরে থাকে যতক্ষণ না তাদের

রোগ নিরাময় হয় এবং একজন পুরোহিত দ্বারা নিশ্চিত করা হয় যে সে রোগমুক্ত হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত কুষ্ঠরোগীর সাথে সমাজের কোনও যোগাযোগ থাকে না। কিন্তু যীশু কোনও দ্বিধা ছাড়াই কুষ্ঠরোগীকে গ্রহণ করেন, তাকে স্পর্শ করেন এবং তৎক্ষণাৎ তার কুষ্ঠরোগ থেকে তাকে শুদ্ধ করেন।

১১) যীশু সন্ধ্যাবেলা অনেক অসুস্থ ও নিপীড়িতদের সুস্থ করতেন;

কফরনাহূমে পিটারের শাশুড়ি, কফরনাহূমের একজন রাজকর্মচারীর ছেলে এবং পাহাড়ের ধারে একজন কুষ্ঠরোগীকে যীশু কীভাবে সুস্থ করেছিলেন তা বাইবেলে বর্ণনা করার পর, মথি, মার্ক এবং লূকের সুসমাচার বর্ণনা করে যে কীভাবে যীশু একটি নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় অনেক লোককে বিভিন্ন ধরণের রোগ থেকে সুস্থ করেছিলেন। উপাসনালয় থেকে বেরিয়ে আসার পরপরই যীশু যাকোব এবং যোহনের সাথে শিমোন ও আন্দ্রিয়ের বাড়িতে প্রবেশ করলেন। তিনি জানতে পারলেন যে শিমোনের শাশুড়ি জ্বরে আক্রান্ত। যীশু এসে তাকে হাত ধরে তুললেন, তাতে তার জ্বর তৎক্ষণাৎ চলে গেল এবং তিনি তাদের সেবা করতে লাগলেন।

সেই সূর্যাস্তের সময় তারা শহরের সমস্ত অসুস্থ বা ভূত দ্বারা নির্যাতিত লোকদের তাঁর কাছে নিয়ে আসত। বাস্তবিকই, সমস্ত নগরবাসী শিমোনের দরজায় জড়ো হত। আশ্চর্যজনকভাবে তিনি তাদের প্রত্যেকের উপর হাত রেখে তাদের সুস্থ করলেন। সে ছিল এক অলৌকিক ঘটনা। তারপর অনেকের মধ্য থেকে ভূতও বেরিয়ে এলো এবং চিৎকার করে বলতে লাগল, "তুমি ঈশ্বরের পুত্র!" যীশু তাদের ধমক দিলেন এবং তাদেরকে কথা বলতে দিলেন না, কারণ তারা জানত যে যীশুই খ্রীষ্ট।**(Refer The Bible of Mark 1:29-34 and Luke 4:38-41)।** তারপর সকলে বুঝতে পেরেছিল যে তিনি ছিলেন ঈশ্বর-পুত্র এবং পাপীদের অনন্ত মৃত্যু এবং নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পৃথিবীতে এসেছিলেন।

১২) যীশু ৫০০০ এর বেশি মানুষকে খাওয়ান;

যোহন বাপ্তিস্মদাতার মৃত্যুর পর যখন রাজা হেরোদ যীশুর মহিমা ও খ্যাতির কথা শুনতে পান, তখন তিনি তাঁর ভৃত্য ও লোকদেরকে বলেন, "যোহন বাপ্তিস্মদাতা মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়েছেন যীশু; সেই কারণেই তাঁর মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে।" যোহন হেরোডকে বলেছিলেন যে তাঁর ভাই ফিলিপের স্ত্রীকে রাখা তাঁর পক্ষে বৈধ নয়। হেরোড তাই যোহনকে ধরে বেঁধে কারাগারে রেখেছিলেন কারণ তিনি তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যারা যোহনকে ভাববাদী বা অবতার বলে মনে করত তারা তাকে ভয় করতেন। কিন্তু যখন হেরোদের জন্মদিন এল, তখন হেরোদিয়ার কন্যা দলবলের সামনে নাচলেন এবং হেরোদকে খুশি করলেন, তাই তিনি শপথ করে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি (হেরোদিয়ার কন্যা) যা চাইবেন তা তিনি (হেরোড) তাকে দেবেন। তখন তার মায়ের প্ররোচনায় মেয়েটি বলল, “একটি থালায় করে যোহনের মাথাটা আমাকে এখানে এনে দাও।” যদিও রাজা অসন্তুষ্ট বোধ করেছিলেন, কিন্তু তার শপথের কারণে তিনি কারাগারে যোহনের মাথা কেটে ফেলার জন্য তার ভৃত্যদের পাঠালেন। এরপর তার মাথাটা একটি থালায় করে মেয়েটিকে দেওয়া হয়েছিল এবং সে তার মায়ের কাছে নিয়ে এসেছিল। যোহনের শিষ্যরা এসে মৃতদেহটি নিয়ে গিয়ে কবর দিল। তারা যীশুকে সেই দুঃখজনক ঘটনাটি জানাল।

তারপর যীশু যখন যোহনের মর্মান্তিক হত্যার কথা শুনলেন, তখন তিনি সেখান থেকে নৌকায় করে একা এক নির্জন স্থানে চলে গেলেন। কিন্তু জনতা এই কথা শুনে শহরগুলি থেকে পায়ে হেঁটে তাঁর পিছনে পিছনে চলল। নৌকা থেকে নেমে স্থলে পৌঁছে তিনি দেখলেন ৫০০০-এরও বেশি লোকের এক বিশাল জনতা তাঁর পিছনে পিছনে আসছে। তিনি তাদের প্রতি করুণা বোধ করলেন এবং তাদের মধ্যে অসুস্থদের সুস্থ করলেন। সেখানে সন্ধ্যা হলে, শিষ্যরা যীশুর কাছে এসে বললেন, "এটা নির্জন জায়গা, আর এখন দিন শেষ হয়ে ; সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাই জনতার লোকজন গ্রামের

মধ্যে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার কিনতে গেছে।" যীশু চেয়েছিলেন শিষ্যরা যেন জনতার প্রচুর লোককে খাওয়ান।_তারা বললো এটা অসম্ভব। কিন্তু, তাদের সাথে থাকা একটি ছেলের কাছে পাঁচটি ছোট রুটি এবং দুটি ছোট মাছ ছিল। যীশু ঐ ছেলেটির কাছ থেকে ঐ উপহারটি নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন। যীশু ৫০০০-এরও বেশি পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের বিশাল জনতাকে ঘাসের উপর বসতে নির্দেশ দিলেন। তিনি ঐ পাঁচটি রুটি এবং দুটি মাছ নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং রুটিগুলি ভেঙে ফেললেন। তারপর তিনি শিষ্যদের হাতে সেগুলি তুলে দিলেন, এবং শিষ্যরা ৫০০০-এরও বেশি লোকের বিশাল জনতাকে খেতে দিলেন এবং তারা সকলে তৃপ্তি সহকারে খেয়েছিল। সকলকে খাওয়ানোর পর, অবশিষ্ট রুটিগুলি বারোটি ঝুড়িতে ভর্তি হয়ে শিষ্যরা তুলে নিলেন। এই অলৌকিক ঘটনাটি মার্ক, লুক, ম্যাথু ও জোহানের বাইবেলে নিখুঁতভাবে বর্ণীত। **(Ref; Bible of Mark 6:30-44, Luke 9:10-17, Mathew 14:13-21 and John 6:1-15)**

*(**বি দ্র;** জন ব্যাপটিস্টকে হেরোদ অ্যান্টিপাস মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন, হেরোদ দ্য গ্রেট নন। **হেরোদ দ্য গ্রেট** ছিলেন জুডিয়ার রাজা যিনি আনুমানিক ৩৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সে কথা আগেই বলা হয়েছে। খ্রিস্টান বাইবেলে তিনি বেথলেহেমে নিরীহদের গণহত্যার জন্য পরিচিত। যাদুকরদের পরিদর্শন এবং নবজাতক "ইহুদিদের রাজা" এর অবস্থান নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তিনি বেথলেহেমে নিরীহ শিশুদের গণহত্যা ঘটিয়েছিলেন। তারপর এলেন* হেরোড অ্যান্টিপাস, *হেরোদ দ্য গ্রেটের পুত্র। হেরোদ অ্যান্টিপাস, গ্যালিল এবং পেরিয়া শাসন করেছিলেন এবং তিনিই জন ব্যাপটিস্টের মৃত্যুর আদেশ দিয়েছিলেন। তাই জন ব্যাপটিস্টকে হেরোদ অ্যান্টিপাস মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন, হেরোদ দ্য গ্রেট নন। যীশুর পরিচর্যা এবং জেরুজালেমে তাঁর যাত্রা হেরোদ দ্য গ্রেটের মৃত্যুর পরে ঘটেছিল, যে কারণে তিনি জন ব্যাপটিস্টের*

মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন না। যীশুর বিচার এবং ক্রুশবিদ্ধকরণের সময় হেরোদ অ্যান্টিপাসও উপস্থিত ছিলেন। তিনি যীশুর ভাগ্যে ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৩) যীশু জলের উপর দিয়ে হেঁটেছিলেন

একবার তাঁর প্রচার শেষ করার পর, যীশু এক বিশাল জনতাকে বিদায় দিলেন এবং তাঁর শিষ্যদের নৌকায় তুলে দিয়ে তাদেরকে তাঁর আগে হ্রদের ওপারে যেতে নির্দেশ দিলেন। যিশু শিষ্যদের গ্যালিল সাগরের (পশ্চিম দিকে) কফরনাহুম যেতে বলেছিলেন, তিনি প্রার্থনা করার জন্য একা পাহাড়ের ধারে উঠে গেলেন। সেই রাতে, তিনি একাই সেখানে ছিলেন এবং নৌকাটি ইতিমধ্যেই স্থল থেকে অনেক দূরে ছিল, প্রবল বাতাসের কারণে ঢেউয়ের কবলে পড়ল। ভোর হওয়ার ঠিক আগে যীশু হ্রদের উপর দিয়ে হেঁটে তাদের কাছে গেলেন। শিষ্যরা যখন তাঁকে হ্রদের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। "এটা ভূত, ভূত আসছে" তারা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু যীশু তৎক্ষণাৎ তাদের বললেন, "সাহস করো! আমিই তো। ভয় পেও না।" পিটার উত্তর দিলেন, "প্রভু, যদি তুমি হও, তাহলে আমাকে জলের উপর দিয়ে তোমার কাছে আসতে বলো।" তিনি বললেন, "এসো।" তারপর পিটর নৌকা থেকে নেমে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যীশুর কাছে এলেন। কিন্তু যখন সে বাতাস দেখল, তখন সে ভয় পেল এবং ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। সে চিৎকার করে বলল, "প্রভু, আমাকে বাঁচান!" যীশু তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে নিলেন। যীশু বললেন, "তুমি আমার উপর অল্প বিশ্বাস করছো; আমার কথায় কেন সন্দেহ করলে?"। তারপর তারা নৌকায় উঠল, বাতাস থেমে গেল। তখন নৌকায় যারা ছিল তারা যীশুর উপাসনা করে জোরে বলল, "সত্যিই তুমি ঈশ্বরের পুত্র।"(**Ref-** Gospel of Matthew 14:22–36, Mark 6:45–56, and John 6:16–21)

১৪) যীশুর পোশাক স্পর্শে অনেক অসুস্থ সুস্থ হয়ে যায়;

গালীল সমুদ্রের জলের উপর হাঁটার অলৌকিক কাজ করার পর, যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা গেনেসারেৎ শহরের তীরে তাদের নৌকা নোঙর করলেন। সেখানকার বাসিন্দারা যীশুকে চিনতে পেরেছিলেন এবং তাদের বিভিন্ন রোগ থেকে অলৌকিকভাবে আরোগ্য লাভের জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। যারা যীশুর পোশাক স্পর্শ করেছিলেন তারা তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। সেখানে যীশু গ্রামে, শহরে বা গ্রামে প্রবেশ করে রাস্তায় অনেক অসুস্থকে পড়ে থাকতে দেখতে পেতেন। অসুস্থরা যখনই যীশুর পোশাকের কিনারা স্পর্শ করত এবং সুস্থ হয়ে উঠত। বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে- এক দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ মহিলা যীশুর পোশাকের প্রান্ত ছুঁয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে যীশুর স্পর্শে তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন। বাইবেলে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে যেখানে অসুস্থ ব্যক্তি যীশুর পোশাকের প্রান্ত ছুঁয়ে বা তাঁর কাছে গিয়ে সুস্থ হয়েছে। এই ঘটনাগুলি যীশুর ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রমাণ করে এবং ঈশ্বরের প্রতি মানুষের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। **(Refer Gospel of Mathew 14:34-36; Mark 6:53-56)**

তাঁর পার্থিব জীবন পরিচর্যায়, এইভাবে অনেক অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্ট অসংখ্য জীবনকে আরোগ্য দান করেন এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী করে তুলেন। তিনি প্রকৃতির নিয়ম অতিক্রম করেছিলেন এবং এমনকি মৃতদেরও জীবিত করেছিলেন, প্রমাণ করেছিলেন যে জীবন ও মৃত্যুর উপর তাঁর ক্ষমতা রয়েছে। তাঁর অলৌকিক কাজগুলি পবিত্র গ্রন্থ, বাইবেল, (New Testament) এ পণ্ডিতগণ সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে আমরা বাইবেল নথিভুক্ত তাঁর কয়েকটি অলৌকিক কাজ নিয়ে আলোচনা করলাম।

যীশুর ক্রুশবিদ্ধকরণ

যীশুর ক্রুশবিদ্ধকরণ খ্রিস্টধর্মের একটি কেন্দ্রীয় ঘটনা এবং বাইবেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সম্ভবত ৩০ বা ৩৩ খ্রিস্টাব্দের

দিকে, জেরুজালেমের বাইরে গোলগোথা নামক স্থানে, রোমান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যীশুকে গ্রেপ্তার করা এবং তাঁর বিচার হয়।বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। বিচারের পর তাঁকে বহু চাবুক মারা হয় এবং ক্রুশে পেরেক দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। যীশুর ক্রুশবিদ্ধকরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুকথা বাইবেলের তথ্য অনুসারে নিচে তুলে ধরা হল;

যীশুর গ্রেপ্তার, অভিযোগ, বিচার এবং বিচারের রায়;

যীশুকে ইহুদি ধর্মীয় আদালত সানহেড্রিন গ্রেপ্তার করে বিচারের মুখোমুখি করে এবং তারপর রোমান গভর্নর পন্টিয়াস পিলাত তাকে বেত্রাঘাত ও ক্রুশবিদ্ধ করার শাস্তি দেয়। সানহেড্রিন (Sanhedrin) ইহুদিদের একটি উচ্চ বিচার পরিষদ বা আইনসভা, যা ইহুদি ধর্মীয় ও বিচারিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। এই বিচারে যিশুর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে দাবি করেছেন, যা ইহুদি নেতাদের চোখে ধর্মীয় অবমাননা। যিশুকে জেরুজালেমে গেত্শেনী নামক স্থানে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তখন তিনি সেখানে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে ছিলেন। গ্রেপ্তার করার পর যিশুকে প্রথমে ইহুদি বিচারিক সংস্থা সানহেড্রিনের (Sanhedrin) সামনে বিচারের জন্য আনা হয়। সানহেড্রিনের বিচার শেষ হওয়ার পর যিশুকে রোমান প্রদেশের গভর্নর পন্টিয়াস পিলাটের কাছে বিচারের জন্য পেশ করা হয়েছিল। পীলাত প্রথমে যীশুকে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। পীলাত জিজ্ঞাসাবাদে তখন যীশুর কোনও দোষ খুঁজে পাননি এবং তাই তিনি প্রথমে তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ইহুদি নেতারা পীলাতের উপর চাপ বৃদ্ধি করে এবং জনতা যীশুর ক্রুশবিদ্ধকরণের দাবি রাখে। অবশেষে, দাঙ্গার আশঙ্কায় পিলাত জনতার দাবির কাছে নতি স্বীকার করেন। ফলে জনতার চাপে এবং ইহুদি নেতাদের প্ররোচনায় পিলাট বাধ্য হয়ে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদন্ডের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, লূক বাইবেলের ২৩নং পদে উল্লেখ করেছেন, রোমান প্রদেশের গভর্নর পীলাত যখন জানতে পারেন

যে যীশু একজন গালীলীয় এবং তাকে গালীলের শাসক হেরোদ অ্যান্টিপাসের কাছে পাঠান। হেরোদ, যিনি যীশুর কথা শুনেছিলেন, তিনি তাঁকে একটি অলৌকিক কাজ করতে দেখাতে বলেন। কিন্তু যীশু চুপ করে রইলেন। হেরোদ তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পীলাতের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর জনতার চাপে এবং ইহুদি নেতাদের প্ররোচনায় পিলাট বাধ্য হয়ে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদন্ডের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগে, যীশুকে চাবুক মারা হয়েছিল এবং তাঁর পরিধানের জন্য তাঁকে কাঁটার মুকুট দেওয়া হয়েছিল- সেটা ছিল তাঁকে উপহাসের প্রতীকী কাজ। বিচারের রায় অনুসারে যীশুকে নিজের ক্রুশ নিজেকে মৃত্যুদণ্ডের স্থান, গোলগোথায় বহন করে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। পাশবিক বিচারের রায়। ক্রুশবিদ্ধকরণের সময় গোলগোথায়, যীশুর সমস্ত পোশাক খুলে ফেলা হল এবং ক্রুশে তাঁর কব্জি বা হাতে এবং পায়ে পেরেক দেওয়া হয়েছিল। ক্রুশবিদ্ধকরণের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ক্রুশে যীশু মারা যান। মার্কের সুসমাচার অনুসারে, দিনের তৃতীয় প্রহরে (সকাল ৯টা) যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় এবং দিনের নবম প্রহরে (প্রায় ৩:০০ টা) তিনি মারা যান। বাইবেল পড়ে জানা যায় যীশুকে দুই ডাকাতের মাঝখানে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর, যীশুকে কাছের একটি সমাধিতে সমাহিত করা হয়েছিল। বাইবেলে বলা হয় যে যীশুর ক্রুশবিদ্ধকরণ খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের একটি ভিত্তিপ্রস্তর, যা যীশুর মৃত্যুকে মানবতার পাপের জন্য বলিদান হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলনের পথ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তী আলোচনা থেকে খ্রিস্ট ধর্মের এই তত্ত্বটি পরিষ্কার হয়ে যায়।

যীশু নিজের ক্রুশ নিজেই বহন করছেন

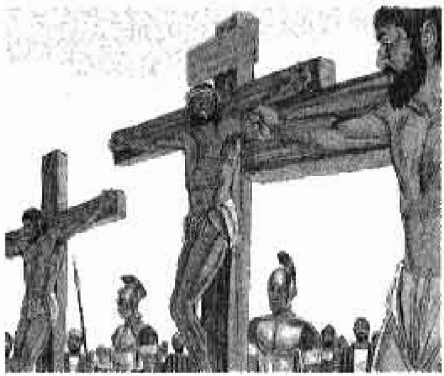

দুজনের মাঝে যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছে

ঈশ্বরের মেষশাবক

উল্লেখ্য বাইবেল সুসমাচারের শুরুতে যীশুকে স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের মেষশাবক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং এই প্রতীকবাদ পরোক্ষভাবে সুসমাচারের শেষেও পুনরুত্থিত হয়েছে, সেখানে যীশুর মৃত্যুকে বলিদান রূপে আলোচিত হয়েছে। যীশুর বলিদানকে ঈশ্বরের মেষশাবকের সাথে তুলনা করা হয়। বাইবেলে খ্রীষ্টকে পাসকাল মেষশাবক হিসেবে উল্লেখ করেছেন (১ করিন্থীয় ৫:৭); অতএব, খ্রীষ্টের প্রতি খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক। কারন তিনি তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে মানবজাতিকে পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন। যেখানে যীশু, একজন পাসকাল

মেষশাবকের মতো। বাপ্তিস্মের সময় যোহন বাপ্তাইজক যীশুকে দেখে চিৎকার করে বলেছিলেন "ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক যিনি পৃথিবীর পাপ দূর করেন। যীশুকে এইভাবে ডাকার সারমর্ম হল ঈশ্বর যীশুকে আমাদের পাপের জন্য মেষশাবকের মতো হত্যা হতে পাঠিয়েছেন যাতে আমরা চিরকাল বেঁচে থাকতে পারি।" *"Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. The essence of calling Jesus is that God sent Jesus to be killed like a lamb for our sins so we could live forever."*

Old Testament এর অনেক অনুচ্ছেদে "মেষশাবক" বলিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি জাতি হিসেবে, ইস্রায়েল প্রতিটি ঘরের দরজার চৌকাঠ এবং লিন্টেলগুলিতে মেষশাবকের রক্ত লাগিয়ে তার ইতিহাস শুরু করেছিল। বাইবেলের এই মতবাদে বলা হয়েছে যে ঐশ্বরিক যীশু ক্যালভারিতে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার জন্য দুঃখভোগ করেছিলেন, যা "ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং দাস" হিসেবে তাঁর ঐশ্বরিক পিতার ইচ্ছার প্রতি তাঁর পূর্ণ আনুগত্যের চিহ্ন রেখে গিয়েছেন যা জগতের পাপ বহন করে নিয়ে যায়। (**(John verse-1.29 & 1.36)**। মেষশাবকের রূপকটি অন্য একটি সুসমাচারের পদের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ যেখানে ঈশ্বরকে একজন রাখাল হিসেবে দেখানো হয়েছে যিনি তাঁর পাল অর্থাৎ মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। (Psalm 23) কিছু সুসমাচারে, যীশু খ্রীষ্টকে মশীহ এবং নিস্তারপর্বের মেষশাবক হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কারণ তিনি সমগ্র বিশ্বের পাপ নিজের উপর নিয়েছিলেন এবং তিনি স্বেচ্ছায় আমাদের জন্য বলিদানের মেষশাবক হয়েছিলেন। সহজ কথায় যীশুকে 'ঈশ্বরের মেষশাবক' হিসেবে চূড়ান্ত বলিদান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যিনি মানবজাতির পাপের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

পবিত্র আত্মা একটি প্রতিশ্রুতি (Promise of Holy Spirit for salvation) ;

খ্রিস্টধর্মে, পবিত্র আত্মার প্রতিশ্রুতি একটি মূল বিশ্বাস, যা বিশ্বাসীদের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং শক্তিকে নির্দেশ করে,

পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি এবং শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। যীশু তাঁর স্বর্গারোহণের পর তাঁর শিষ্যদের কাছে পবিত্র আত্মা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যেমনটি যোহন ১৪:১৬-১৭ এবং যোহন ১৫:২৬ পদে লক্ষ্য করা যায়। পবিত্র আত্মা ঈশ্বর বিশ্বাসীদেরকে সত্যের দিকে পরিচালিত করেন, তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে আনন্দদায়ক জীবনযাপন করার ক্ষমতা দেন এবং পাপকে জয় করতে সাহায্য করেন। বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে, একজন ঈশ্বর বিশ্বাসীর মধ্যে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি তাদের পরিত্রাণের নিশ্চয়তা এবং ঈশ্বরের পরিবারের অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি প্রদান করে। যোহন ১৪:১৬-১৭ শ্লোকে যীশুর এক অসাধারণ অমোঘ বানী উল্লেখ করা হয়েছে: "আর আমি পিতার কাছে প্রার্থনা করব, আর তিনি তোমাদের আর একজন সাহায্যকারী দেবেন, যিনি তোমাদের চিরকাল সঙ্গ দেবেন, তিনি সত্যের আত্মা, যাঁকে জগৎ গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখে না এবং জানে না; কিন্তু তোমরা তাঁকে জানো, কারণ তিনি তোমাদের সাথে থাকেন এবং তোমাদের অন্তরে থাকবেন।"

যীশুর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণী ও উপদেশ;

"Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind," "Love your neighbor as yourself," and "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me". (Matthew 22:37-40 ও John 14:6)

"তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ এবং তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালোবাসো," "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসো," এবং "আমিই পথ, সত্য এবং জীবন। আমার মাধ্যমে ছাড়া কেউ পিতার কাছে আসে না" ।

"Love your enemies and pray for those who persecute you." (Matthew 5:44)

"তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালোবাসো এবং যারা তোমাদের তাড়না করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো।"

"I am the vine; you are the branches. Whoever abides in me and I in him bears much fruit, for apart from me you can do nothing."(John 15:5)

আমিই দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা। যে আমার মধ্যে থাকে এবং আমি তার মধ্যে থাকি, সে প্রচুর ফল ধরে, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না।"

No one comes to the Father except through me." John 10:11: I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep." John 6:35: "I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.

আমার মাধ্যমে ছাড়া কেউ পিতার কাছে আসে না।" যোহন ১০:১১: আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক মেষদের জন্য তার জীবন উৎসর্গ করে।" যোহন ৬:৩৫: "আমিই জীবনের রুটি; যে আমার কাছে আসে সে কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, এবং যে আমার উপর বিশ্বাস করে সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না।"

“Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it.

সরু ও সংকীর্ণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর, কারণ ধ্বংসভিমুখি পথ প্রশস্ত। তার দ্বার সুপরিসর এবং সে পথের পথিকও প্রচুর। কিন্তু জীবনের অভিমুখী পথ দুর্গম, দ্বারও সংকীর্ণ; অল্প লোকই তার সন্ধান পায়।

মোশি (Moses)

আজ থেকে প্রায় ৩৫০০ বৎসর পূর্বে ঈশ্বরের বার্তা বাহক এবং ইস্রায়েলীয়দের মুক্তি দাতা মোশি বা মোজেস মিশর দেশে আবির্ভূত হয়ছিলেন। মোশি বা মুসা (Moses), ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্মে একজন গুরুত্বপূর্ণ নবী বা পয়গম্বর হিসেবে পরিচিত। হিব্রু বাইবেলে তিনি মোশি রব্বিনু নামে পরিচিত। ইহুদীয় এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। ইহুদিধর্মের মোশি ইসলাম ধর্মে হজরত মুসা আ. নামে আল্লাহর একজন বিখ্যাত নবী ও রসুল রূপে পবিত্র কোরান ধর্মগ্রন্থে সর্বাধিকবার আলোচিত হয়েছেন।

আব্রাহামিক ধর্মে, মূসা ছিলেন একজন নবী যিনি n the Exodus. ইস্রায়েলীয়দের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাকে ইহুদি ধর্ম এবং সামেরিয়ান ধর্মে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নবী হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এবং খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম, বাহাই ধর্ম এবং অন্যান্য আব্রাহামিক ধর্মে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নবীদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া তিনি বাহাই ধর্মের মত বেশ কয়েকটি অব্রাহামীয় ধর্মের একজন গুরুত্বপূর্ণ পয়গম্বর। যেসকল নবী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সৃষ্টিকর্তার সাথে যোগাযোগ বা বার্তা বিনিময় করেন তাদেরকে ইহুদিধর্ম খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বা বাহাই ধর্মে পয়গম্বর বলা হয়।) বাইবেল ও কোরানের আখ্যান অনুসারে

মুসা পয়গম্বর ছিলেন ইস্রায়েলীয়দের (ইহুদিদের) নেতা ও আইনপ্রণেতা। তাঁর উপর তোরাহ (Torah) ধর্মগ্রন্থ লেখার দায়িত্ব অর্পণ হয়েছিল। তোরাহ হল বাইবেলের প্রথম পাঁচটি বই। ইহুদীয় এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ইহুদিধর্মের মোশি এবং ইসলাম ধর্মের হজরত মুসা সম্বন্ধে লেখা আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিধি অতি সীমিত। তবুও আমি এই সকল মহাপুরুষ ও মনিষীদের সম্বন্ধে লেখার চেষ্টা বিশেষ কয়েকটি কারনে। আমরা স্বামী বিবেকানন্দ ও ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের কথায় ও বানীতে জেনেছি-পৃথিবীতে সকল ধর্মের সার এক – ঈশ্বর লাভ বা ঈশ্বর দর্শন। পথ ভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য এক। জগতের সকল জ্ঞানের সার্বভৌম ও সুদৃঢ় ভিত্তি জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের নবী ও দার্শনিকগনের ঈশ্বর অন্বেষণ ও প্রত্যক্ষানুভুতির এবং উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। মোশি পৃথিবীতে এসেছিলেন প্রায় ৩৫০০ বৎসর আগে; খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক যীশু এসেছিলেন পৃথিবীতে আজ থেকে ২০০০ বৎসর আগে। যদিও ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম একজন গুরুত্বপূর্ণ নবী বা পয়গম্বর, মোশির জন্মের ১৫০০ বৎসর পর প্রভু যীশুর আবির্ভাব হয়েছিল, তবুও পণ্ডিতগন ঈশ্বর প্রেরিত দুই মহামানবের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। মোশির অলৌকিক জীবনী নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে, পণ্ডিতগণ মোসি ও যীশুর মধ্যে সম্পর্ক ও সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন, তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

মোসি ও যীশুর মধ্যে সম্পর্ক ও সাদৃশ্য।

মোশি ছিলেন ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্মে একজন গুরুত্বপূর্ণ নবী বা পয়গম্বর। মোশি এবং ঈশ্বর পুত্র যীশু, যদিও ভিন্ন শতাব্দীর মহামানব, তবুও আব্রাহামিক ধর্মে মুক্তিদাতা, আইন প্রণেতা এবং ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁদের ভূমিকায় অনেক উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য রয়েছে; যেখানে যীশুকে প্রায়শই Old Testament এ উল্লিখিত "মোশির মতো একজন নবীর ভবিষ্যদ্বাণীগুলির পরিপূর্ণতা হিসাবে দেখা হয়। এই দুই মহামানবের মধ্যে যে সকল বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়, সেগুলি হল;

মুক্তি ও নেতৃত্ব

মোশি এবং যীশু উভয়েই ভিন্ন শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে লোকেদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে ঈশ্বরের সাথে একটি নতুন সম্পর্ক ও চুক্তিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। মোশি ইস্রায়েলীয়দেরকে মিশরের অত্যাচারী রাজার দাসত্ব থেকে বের করে এনেছিলেন, অন্যদিকে যীশু মানুষের আধ্যাত্মিক দাসত্ব থেকে মুক্তিদাতা হিসেবে পূজিত হয়েছেন। যীশু বলেছেন "সকলেই পাপ করেছে এবং তারা ঈশ্বরের মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।" অতএব, আমাদের সকলকে স্বীকার করতে হবে যে আমরা বন্দী অবস্থায় আছি। আমরা সকলেই পাপের দাস ছিলাম। তিনি আরও বলেছেন যতক্ষণ না আমরা পাপ কর্মের জন্য অনুতপ্ত হই, পাপ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বন্দী করে রাখে, ঈশ্বর আমাদের যে সম্ভাবনার জন্য সৃষ্টি করেছেন পাপ কর্ম তা অর্জন করতে বাধা দেয়। " (রোমীয় ৬:২৩)। বাইবেল স্পষ্টভাবে বলেছে যে কেবল দুটি পথ আছে: হয় পাপ এবং শয়তানের দাস হওয়া অথবা ধার্মিকতা এবং যীশু খ্রীষ্টের দাস হওয়া।(রোমীয় ৬:১৯) তিনি বলেছেন "পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, আমাদেরকে সচেতনভাবে ঈশ্বরের সেবা কর্ম বেছে নিতে হবে। ধার্মিকতার দাস হয়ে, আমরা ঈশ্বরের সেবা করার জন্য পৃথিবীতে এসেছি এবং কখনও পাপপূর্ণ আচরণের শৃঙ্খলে ফিরে না যাওয়ার জন্য নিজেদেরকে পূর্ণ হৃদয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে হবে।" বাইবেলের এইসব বাণী থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি মোশি এবং যীশু উভয়েই ভিন্ন শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে মনুষ্য জাতিকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে ঈশ্বরের সাথে একটি নতুন প্রেমের সম্পর্ক ও মুক্তির যাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তি স্থাপন;

সিনাই পর্বতে মোশি ঈশ্বরের থেকে দশটি আজ্ঞা(Ten Commandments) পেয়েছিলেন তাঁর অনুগামী ভক্তদের জন্য এবং দশটি আজ্ঞা দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মোশির চুক্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অন্যদিকে যীশুকে আইন পরিপূর্ণ এবং প্রসারিত হিসাবে দেখা হয়, তাঁর শিক্ষা এবং কর্মের মাধ্যমে একটি "নতুন চুক্তি" প্রদান করেন।

মোশি ও যীশুর জন্মের অলৌকিক কাহিনী

মোশি এবং যীশু উভয়েরই জন্মের অলৌকিক কাহিনী রয়েছে। ঈশ্বর তাঁদের দুজনকেই জন্মের সময় নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছেন, কেবলমাত্র ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য । মোশিকে একটি ঝুড়িতে লুকিয়ে নীল নদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে সেখানকার রাজা তাঁকে মারতে না পারে, অনুরূপ ভাবে আমরা জানি যীশুর পরিবার শিশু-হত্যাকারী হিংস রাজা হেরোদের কবল থেকে যীশুকে বাঁচতে মিশরে পালিয়ে গিয়েছিল। এখান থেকে বোঝা যায় মোশি এবং যীশু দুজনেই ঈশ্বরের প্রিতিনিধি যাঁরা দুজন দুই যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন অসহায় নিপীড়িত মানুষদের রক্ষা করার জন্য। দুই অবতারের মধ্য আর একটা সাদৃশ্য হল মোশি এবং যীশু উভয়েরই মিশরের সাথে সম্পর্ক রয়েছে, মোশি মিশরের রাজপরিবারে বেড়ে ওঠেছিলেন এবং হেরোদের আদেশ থেকে যীশুকে বাঁচতে তাঁর পরিবার মিশরে চলে গিয়ে ছিলেন। দু যুগের দুই অবতারের মধ্যে আরও অনেক সাদৃশ্য রয়েছে যেমন- মোশি এবং যীশু উভয়েই চল্লিশ দিন ও রাত উপবাস করেছিলেন। মোশি উপবাস করেছিলেন ঈশ্বরের কাছ থেকে Ten Commandments বা দশ আজ্ঞা পাওয়ার আগে এবং যীশু তাঁর মন্ত্রক শুরু করার আগে উপবাস করেছিলেন ।

উল্লেখ্য, মোশি চল্লিশ বছর ধরে রাখাল (shepherd) হিসেবে জীবন কাটিয়েছিলেন এবং যীশুকে উত্তম রাখাল Good shepherd বলা হয়। কিছু বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, মোশি তাঁর নিজের মতো একজন নবী" সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যিনি ঈশ্বরের লোকেদের নেতৃত্ব দেবেন। তাঁদের মতে যীশু হলেন সেই নবী যিনি পৃথিবীতে এক শতাব্দীরও বেশি পরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। বলা বাহুল্য, আমাদের ভগব্দগীতায় উল্লেখ রয়েছে, ঈশ্বর বা তাঁর অবতারগণ পৃথিবীতে বারে বারে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন আর্তদেরকে রক্ষা করার জন্য এবং অধর্মকে ধ্বংস করার জন্য। যেমন এসেছিলেন আমাদের গৌতম বুদ্ধ, আদি শঙ্কর বা শ্রী চৈতন্যমহাপ্রভু। ঠিক

পাশ্চাত্যদেশ গুলিতে এসেছিলেন মোশি এবং যীশুর মত অতিমানব দুটি ভিন্ন শতাব্দীতে। যাইহোক এই অধ্যায়ে আমরা মোশির অলৌকিক জীবন কাহিনী এবং তাঁর অমৃত বাণী নিয়ে আলোচনা করব।

ইস্রায়েলদেরকে মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য মোশির আবির্ভাব;

পণ্ডিতদের মতে খ্রিস্টপূর্ব 13 শতকে **মোশি বা মোজেসের** জন্ম হয়েছিল। অনেকের মতে তাঁর জীবনকাল ছিল 1391-1271 খ্রিস্টপূর্বাব্দ। মানুষকে মৃত্যুর পথ দেখানোর জন্য তিনি প্রায় ১২০ বৎসর বেঁচে ছিলেন। লোহিত সাগরের ওপারে মিশরের দাসত্ব অবস্থা থেকে ইস্রায়েলীয়দেরকে মুক্ত করে নিয়ে আসার জন্য তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এক কথায় ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলামের ইতিহাসে মূসা বা মোজেস বা **মোশি** হলেন অন্যতম প্রধান ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্ব এবং নবী। ইহুদি দেবতা যিহোবার প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ ভাববাদী এবং ইয়াহওয়েের লোকেদের নেতা হিসেবে ইহুদি হিব্রু বাইবেলে **মোজেসের** নাম উল্লেখ রয়েছে । (ইহুদি ধর্মগ্রন্থ এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুসারে ইয়াহওয়েহ হলেন হিব্রু ভাষায় ঈশ্বরের এক নাম। অনেক সময় "ইয়াহওয়েহ" কে "যিহোবা" নামেও উল্লেখ করা হয়। এই নাম ইহুদি ধর্মগ্রন্থ এবং খ্রিস্টান বাইবেলে ঈশ্বরের নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদিও বেশিরভাগ ইহুদি এবং খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ একই। খ্রিস্টান বাইবেলে নিউ টেস্টামেন্ট যীশু ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে বিবেচিত হয়।

উল্লেখ্য, মূসার জন্মের 1591 বছর পরে এবং তাঁর মৃত্যুর 1471 বছর পরে যিশুর জন্ম হয়েছিল দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দে। পবিত্র বাইবেল ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী ইহুদিধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বা বাহাই ধর্মের অনুগামীরা বিশ্বাস করে যে যীশু খ্রীষ্ট হলেন ভগবান এবং তিনি মানব দেহে এসেছিলেন যেমন আমাদের ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানব দেহে ধরাধামে এসেছিলেন। এবং এইভাবে তিনি সর্বদা বিদ্যমান আছেন। যীশু খ্রীষ্ট মেরির কাছে একটি শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করার অনেক আগে থেকেই তার অস্তিত্ব ছিল,

কিন্তু যতদূর তার পার্থিব জন্মের কথা বলা যায়, যীশুর পৃথিবীতে আসার আগে মূসা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কারণ ওল্ড টেস্টামেন্ট লেখা হয়েছিল নিউ টেস্টামেন্ট লেখার শত শত বছর আগে। The Book of Exodus এ 2:1-10 শ্লোক বা স্তবকে মোশি বা মুসা (আঃ) জন্মের কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। The Book of Exodus (বুক অফ এক্সোডাস) যা হল বাইবেলের দ্বিতীয় বই।এখানে এক্সোডাসের কাহিনীর বর্ণনা করা হয়েছে। এক্সোডাসের কাহিনী হল ঈশ্বর যিহোবার নির্দেশে মোশির নেতৃত্বে ইস্রায়েলীয়রা মিশরের সম্রাটের দাসত্ব ত্যাগ করে, নবী মোশির সাথে সিনাই পর্বতে যাত্রা করে, যেখানে ঈশ্বর যিহোবা 10টি আদেশ (10 commandments) দেন এবং তারা যিহোবার সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। সেই চুক্তি অনুসারে তিনি তাদেরকে বিশ্বস্ততার শর্তে তাদের একটি "পবিত্র জাতি এবং পুরোহিতদের একটি রাজ্য" করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি তাদেরকে তাম্বু নির্মাণের জন্য তাদের আইন ও নির্দেশনা দেন, যার মাধ্যমে তিনি স্বর্গ থেকে আসবেন এবং তাদের সাথে বাস করবেন এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুত দেশ ভূমি অধিকার করার জন্য একটি পবিত্র যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন, যা আগে হয়েছিল, জেনেসিসের কাহিনী অনুসারে, আব্রাহামের বংশকে *ঐ* রূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বলে সংগ্রহীত তথ্য থেকে জানা যায়।

ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে মিশরে মোশি ইস্রায়েলীয়দের মুক্তিদাতা

সেই সময়ে প্রাচীন মিশরের রাজধানী ছিল পেন্টাটিউক, নীল নদের তীরে ছিল গোশন প্রদেশ বা নগরী। এই নগরীর শেষ প্রান্তে বসবাস করত বনি ইসরাইল বংশের লোকেরা। *খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব* অনুযায়ী ইস্রায়েলীয়দের ইতিহাসে গোশন প্রদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ । ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বর 'ইয়াহওয়েহ' বা "যিহোবা" তাঁর লোকেদের সেখানে শত শত বছর ধরে বসবাস করতে দিয়েছিলেন যতক্ষণ না তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তাদের অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত। যদিও মিশরের গোশনে ইস্রায়েলীয়দের দাসত্বে বাধ্য করা হয়েছিল, তবুও ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের সাথে ছিলেন। তারা সেই দেশে ঈশ্বরের দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়ে সুরক্ষিত ছিল। যতক্ষণ তারা

প্রভুর প্রতি আস্থা রেখেছিল, ততক্ষণ তাদের কোনও ক্ষতি হয়নি বলে *খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব বলে*। মিশরে গোশেন প্রদেশে ঈশ্বর যিহোবা তাঁর প্রজা ইস্রায়েলকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মিশরের রাজা ফেরাউন চেয়েছিল যে তিনি ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে লোকেদের মুক্ত না করে ইস্রায়েলীয়দের উপর বিজয় অর্জন করবেন। তিনি আরও অনেক বছর ধরে তাদেরকে দাসত্বে রাখবেন। কিন্তু ঈশ্বরের অন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি মোশিকে উত্থাপন করে মিশরীয় শাসকের পরিকল্পনাগুলিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং ফেরাউন ধ্বংস করেছিলেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে মোশি ইস্রায়েলীয়দের মুক্তিদাতা হয়ে উঠলেন।

(**উৎস;** https://www.christianity.com/wiki/bible)

অলৌকিক জন্ম কাহিনী

হিব্রু বাইবেল অনুসারে মোশি লিবাইট নামের ইসরাইলের সন্তান হিসাবে খ্রিস্টপূর্ব 13 শতকে প্রাচীন মিশরে গোশন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিতগণ বলেন মুসার নাম কোরানে ১৩৬ বার উদ্‌ধৃত হয়েছে। মুসা আ.-এর পিতার নাম ছিল ইমরান এবং মাতা ইউকাবাদ। ইসলাম অনুসারে হজরত মুসা আ. এর জন্ম এমন এক সময়ে মিশরে হয়েছিলো যখন মিশরের সম্রাট ফেরআউন বনি ইসরাইলের সদ্যপ্রসূত বালক শিশুদেরকে হত্যা করে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছিলো। এ কারণে মুসার মা ও পরিবারের লোকেরা তাঁর জন্মের পর ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলো- কীভাবে তারা তাদের ঐ শিশুটিকে হত্যাকারীদের দৃষ্টি থেকে রক্ষা করবে। এভাবে তিন মাস পর্যন্ত তাঁকে সবার দৃষ্টি থেকে গোপনে রাখা হয়েছিল। তাঁর জন্মগ্রহণের সংবাদও কাউকে জানতে দেয়া হলো না। কিন্তু গুপ্তচরদের অনুসন্ধান এবং পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ার কারণে বেশিদিন এই ঘটনা গোপনীয় রাখার সাহস পেল না মুসার পিতা ও মাতা। তাদের উদ্বেগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলো। এই কঠিন ও অসহায় পরিস্থিতিতে অবশেষে ঈশ্বর সাহায্য করলেন। তিনি মুসার মায়ের অন্তরে অদ্‌ভুত এক কৌশল এনে দিলেন।

বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধ পড়ে আমি মুসার জীবন কাহিনীটি যা জেনেছি, তাঁর সেই বিস্ময়কর ঘটনাটি এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি। আমরা হিন্দু ধর্মে যেমন দেখেছি অবতার বা ঋষি-মনিষীদের জন্ম কাহিনী যেমন অলৌকিক ও বিস্ময়কর, তেমনি অন্যান্য ধর্মে এবং অন্যান্য দেশেও অনেক ঋষি (Saint) জন্ম গ্রহণ করেছেন, যাদের জীবন কাহিনীও সেই রূপ বিস্ময়কর। আগেই বলেছি মূসার সময়কালে মিশরের সম্রাট ছিলেন ফেরাউন রামেসিস। প্রাচীন মিশরের শাসকদেরকে বলা হত ফেরাউন বা ফারাও। ফেরাউন ছিল বনি ইসরাইল বংশের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। ফেরাউন ছিলেন একজন নিষ্ঠুর এবং নির্দয় অত্যাচারী শাসক যিনি বনী ইসরাঈলদেরকে ক্রীতদাস বা গোলাম বানিয়ে তাদের উপর উৎপীড়ন ও অত্যাচার করতেন। ঐ সময় কয়েকজন জ্যোতিষী গণনা করে ফেরাউনকে বলেছিলেন যে ইহুদি পরিবারের মধ্যে এমন এক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যে ভবিষ্যতে মিসরের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। তাই ফেরাউন আদেশ দিলেন কোনো ইহুদি পরিবারে সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই যেন তাকে হত্যা করা হয়। তাই সেই সময় ফেরাউনের গুপ্তচরেরা সন্তর্পণে ঘুরে বেড়াত। কোনো ইহুদি পরিবারে ছেলে জন্মগ্রহন করলেই ফেরাউনের লোকেরা ঐ শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করত। যেহেতু, ঐ সময় ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিল যে একজন ইস্রায়েলীয় কর্তৃক ফেরাউনের মৃত্যু ঘটবে। নিজেকে বাঁচানোর জন্য ফেরাউনের নির্দেশ ছিল যে প্রতি এক বছর অন্তর পর্যায়ক্রমে সমস্ত ইস্রায়েলীয় শিশুদেরকে হত্যা করা হবে। যে বছর মূসা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই বছর ফেরাউনের নির্দেশে সন্তানদের হত্যা করার কথা ছিল। ঠিক ঐ সময় পিতা ইমরান (বা আমরাম) আর মা ইউকাবাদ (বা জোশিবেদ) এর ঘর আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন দেবশিশু মোশি। জন্মের পরপরই তাঁর মা খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। কোলের সন্তানকে বাঁচাতে বড় অস্থির হয়ে উঠেন । তাই ধাত্রীকে কড়জোড় অনুরোধ করলেন সে যেন কাউকে তার ছেলে সন্তানের কথা কাউকে না বলে। শিশু মুসার জত্যির্ময় দেবতুল্য চেহারা দেখে ধাত্রীর অন্তর প্রবল মমতায় ভরে উঠে। সে ঐ ব্যাপারে কাউকে

কিছু বলবে না বলে মূসার মাকে নিশ্চিত করল। তাই মোশির জন্মের পর মা জোশিবেদ সকলের চোখের আড়ালে সম্পূর্ণ গোপনে শিশুসন্তানকে বড় করে তুলতে লাগল। সম্পূর্ণ গোপনে শিশু মুসাকে তিন মাস লালন-পালন করার পর শিশু সন্তানকে গোপন রাখা মায়ের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। মুসাকে হত্যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য, শিশু মুসাকে একটি ঝুড়িতে নীল নদের জলে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য মুসার মা ঈশ্বরের নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন। তাই আমরাম (পিতা) এবং মা জোশিবেদ ঈশ্বরের উপর অটল বিশ্বাস রেখে শিশু মুসাকে একটা ছোট ঝুড়িতে করে নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন। নদীর পাড় ধরে ঐ ঝুড়িটিকে দূর থেকে অনুসরণ করে মোশির জ্যেষ্ঠ্য ভগিনী মিরিয়াম এগিয়ে চললেন; এটা দেখতে যে ঝুড়িটি নদীতে ডুবে না জায়। উল্লেখ্য মিরিয়াম মোশির থেকে মাত্র সাত বছরের বড়। দেখতে দেখতে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে ঝুড়িটি গিয়ে পৌছাল এমন একটি ঘাটে যেখানে ফারাও রাজকন্যা বাত্য তার মায়ের সঙ্গে স্নান করছিলেন। রাজকন্যা ও ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া (**Asiya**) ফুটফুটে সুন্দর একটা বাচ্চাকে একটা ঝুড়ির মধ্যে নদীর উপর ভাসতে দেখলেন। ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া ও রাজকন্যা ফুটফুটে দেবশিশুর ন্যায় বাচ্চাটিকে দেখে অতিশয় মুগ্ধ হলেন। শিশুটির উপর তাদের খুব মায়া হলো। ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া ঐ শিশুটিকে নিজের মতো করে গড়ে তুলতে মনস্থ করলেন। শিশুটিকে ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া রাজপ্রাসাদে তুলে নিয়ে এলেন। সেটা দেখতে পেয়েছিলেন শিশু মুসার দিদি মিরিয়াম। ফিরাউনের স্ত্রী শিশুটিকে নিজের ছেলে হিসেবে তাঁর কাছে রাখতে চাইলেন। কিন্তু বাধ সাধলেন ফেরাউন। সম্রাট ফেরাউন শিশুটিকে হত্যা করতে চাইলেন। আসিয়া ফিরাউনকে ঐ শিশুটিকে হত্যা থেকে রেহাই দিতে এবং তাকে নিজের কাছে রাখতে ফিরাউনকে রাজি করান। তবে শিশু মুসা অন্য কোন মহিলার বুকের দুধ খেতে অস্বীকার করে। মুসার এই আচরণ তার নিজের মাকে ফিরাউনের প্রাসাদে ডাকার উপায় তৈরি করে দিয়েছিল। ঠিক ঐ সময় মুসার দিদি মিরিয়াম রাজকণ্যার কাছে গিয়ে জানতে চাইলো বাচ্চাটার লালন পালনের জন্য তার কোন

হিব্রু মহিলা প্রয়োজন হবে কিনা? রাজকন্যা বাত্য সম্মত হলে মুসার মা জোশিবেদই তখন একটি ধাত্রী নার্সের ছদ্মবেশে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। জোশিবেদকেই মুসার ধাত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হল। নিজের পরিচয় গোপন করে রাজপ্রাসাদে মুসাকে দেখাশোনা করতে থাকে জোশিবেদ। মুসা আ তাঁর মায়ের কোলেই প্রাসাদে লালিত পালিত হতে লাগলেন। ঈশ্বর তাঁর মায়ের অন্তর প্রশান্ত করে দিলেন।হিব্রু বাইবেল ও কোরান অনুসারে, বছরের পর বছর ধরে ঐ প্রাসাদেই মুসা বড় হতে লাগলেন।

ফেরাউন কন্যা ভেসে আসা শিশু মোশিকে কোলে নিচ্ছেন (S; Google)

[উল্লেখ্য বিভিন্ন লেখা থেকে পাওয়া যায় মোশির শিশুকালে তাঁর মাকে ঈশ্বর পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর শিশুকে তাঁরই কোলে ফিরিয়ে দেবেন এবং পরবর্তীকালে তার পুত্র একজন নবী ও রাসুল হবেন। পরবর্তীকালে ঠিক তাই হল মোশি কেবল নবী হলেন না; সেই সঙ্গে তিনি ঈশ্বরের সাথে বাক্যালাপকারী ঈশ্বর প্রতিনিধি হয়ে ইসরাঈলদের দাসত্বের মুক্তিদাতা হয়েছিলেন। পৃথিবীতে মোশি ঈশ্বরের সাথে যেভাবে বাক্যালাপের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন অন্য কোন নবী সে সুযোগ পাননি বলে ইহুদী ও ইসলামীদের বিশ্বাস এবং এটা তাদের ধর্ম গ্রন্থে লেখা রয়েছে।]

অলৌকিক ঘটনা; বালক মোশি ফেরাউনকে মারলেন;

আমরা জানলাম, শিশু হত্যাকারী ফেরাউনের রাজ প্রাসাদেই মোশি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিলেন। কিছুদিন যাওয়ার পর হঠাৎ এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল; এক বিরাট বিপত্তি বাঁধল। ইসরা'লিয়্যাত

আখ্যান অনুসারে একদিন বালক মোশির সঙ্গে খেলার মধ্যে সম্রাট ফেরাউন মোশিকে কোলে নিলেন। আর মূসা তখন ফেরাউনের গালে প্রচণ্ড জোরে চড় বসালেন। *(কোন কোন বর্ণনায় আছে তিনি লাঠি নিয়ে খেলছিলেন। ফেরাউন কাছে যেতেই তিনি লাঠি দিয়ে* ফেরাউনের *মাথায় আঘাত করে বসলেন।)* এই ঘটনায় ফেরাউন ভীষণ রেগে যান। তনি বালক মোশিকে তখন হত্যা করতে চাইলেন। আসিয়া তখন স্ম্রাটকে বুঝালেন,"এটা নিতান্তই তার শিশুসুলভ আচরণ। আপনি ওকে পরিক্ষা করে দেখতে পারেন। কিন্তু আমার ভালবাসার খাতিরে ঐটুকু শিশুকে হত্যা করবেন না"। যেহেতু ফেরাউন স্ত্রীকে ভীষণ ভালবাসতেন, তাই তাঁর বিশেষ অনুরোধে শিশুটিকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করার নির্দেশ না দিয়ে আসিয়ার কথামত শিশুটির সরলতার পরীক্ষার আয়োজন করতে নির্দেশ দিলেন।

শিশু বালক মোশির সরলতার পরীক্ষা

ফেরাউনের স্ত্রীর কথামত বালকটির সরলতা পরীক্ষা করার জন্য বালক মোশির সামনে দুটি পাত্র রাখা হল- একটিতে মণিমুক্তা এবং আরেকপাত্রে জ্বলন্ত কয়লা রাখা হল। বালক মোশি মণিমুক্তা ভরা পাত্রের দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু দেবদূত গ্যাব্রিয়েল তার হাত কয়লার দিকে নির্দেশ করেন। বালক মোশি মণিমুক্তার পাত্র ছেড়ে দিয়ে অন্যপাত্রের দিকে গিয়ে একটি জ্বলন্ত কয়লাকে ধরে তাঁর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়, ফলে তাঁর জিহ্বা পুড়ে যায়। সেই ঘটনার পর, মুসা বাকশক্তির জড়তা শুরু হল, কিন্তু তিনি ফেরাউনের ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত অর্থাৎ মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেলেন। এইভাবে ঈশ্বর বা আল্লাহ তাঁকে শিশুকালে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেন। এই ঘটনাটিকে পণ্ডিতগণ মুসার প্রতি ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীর পরীক্ষা হিসেবে বিবেচনা করেন। (***From Wikipedia, the free encyclopedia)***

একজন মিশরীয়কে হত্যা করার জন্য মোশির স্বদেশ ত্যাগ;

মোশি যখন শৈশব ও কৈশোর পেরিয়ে সদ্য যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন তিনি প্রায় প্রাসাদের বাইরে নগর দেখতে বের হতেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি নগরে বের হয়ে দেখলেন একজন ইস্রায়েলীয় একজন মিশরীয়ের সাথে লড়াই করছে। তরুণ মোশিকে আসতে দেখে ইসরাইলী ব্যক্তিটি মোশিকে ডাকল ফয়সালার জন্য। ইসরাইলী ব্যক্তিটির কথা শুনে মোশি মিশরীয় লোকটিকে কাছে ডাকলেন। কিন্তু সেই লোকটি ঔদ্ধত বশত মোশির কথায় কর্ণপাত করল না। তখন মোশি রেগে গিয়ে মিশরীয় লোকটির কাছে গিয়ে তাকে খুব জোরে আঘাত করলেন। দূর্ভাগ্যবশত সেই আঘাতে মিশরীয় লোকটি মারা গেল। মোশি মিশরীয় লোকটির আকষ্মিক মৃত্যুতে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন এবং বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন। প্রার্থনার মধ্যে তিনি ঈশ্বরকে খুব দুঃখের সঙ্গে বললেন যে তিনি যা করেছেন সেটা শয়তানের কাজ। তিনি রাগে পথভ্রষ্ট হয়েছেন। তাই ভীষণ অনুতপ্ত। তাঁর এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ঈশ্বর যেন তাকে ক্ষমা করেন। মিশরীয় লোকটির হত্যার ঘটনা নগরেরে লোকদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল।পরদিন মোশি অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য নগর গেলেন। দেখলেন, গতকালের সেই ইস্রায়েলীয় ব্যাক্তিটি আবার এক মিশরীয় ব্যাক্তির সাথে ঝামেলায় জড়িয়েছে। মোশি ঐ ইস্রায়েলীয় ব্যাক্তিটিকে বললেন, 'তুমি তো খুব খারাপ লোক।'ইস্রায়েলীয় ব্যাক্তিটি মোশির ঐ কথা শুনে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠে মোশিকে বলল, "তুমি কি সেই মিশরীয় ব্যাক্তির মত আমাকেও মারতে চাও? তুমি তো এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী না হয়ে সেচ্ছাচারী হয়ে যাচ্ছো?" তার ঐ কথা শুনে মিশরীয় ব্যাক্তিটি ফেরাউনের দরবারে গিয়ে গত সন্ধ্যার নগরে হত্যার পরিস্থিতি সব খুলে বলল। ফেরাউন সব শুনে ভীষণ রেগে গিয়ে মোশিকে হত্যার আদেশ জারী করে। মোশির এক হিতাকাঙ্খী ঐ খবর জানতে পেরে তাঁকে মদিয়ানা দিকে পালিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। এই বিষয়ে সতর্ক হয়ে মোশি মাদিয়ানয়ায় পালিয়ে যান। হিব্রু

বাইবেল এবং কুরআনে উল্লিখিত তথ্য অনুসারে মাদিয়ান হল পশ্চিম এশিয়ার একটি ভৌগলিক অঞ্চল। নগরীর দূর প্রান্ত হতে এক লোক দৌড়ে এসে মোশিকে বলল, "হে মোশি! সম্রাটের রিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করেছে। সুতরাং তুমি বাইরে চলে যাও । "তাই স্ম্রাটের হাতে হত্যা থেকে বাঁচতে মোশি স্বদেশ ত্যাগ করলেন। তিনি যাত্রা শুরু করলেন মাদিয়ানের উদ্দেশ্যে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মাদিয়ান ছিল লোহিত সাগরের তীরবর্তী একটি স্থান, যা বর্তমানে জর্ডান ও সৌদি আরবের সীমান্তে অবস্থিত।

মাদিয়ানের জীবন: বিবাহ ও সংসার পালন

আমরা আগেই জেনেছি, প্রানের ভয়ে **মোশি** স্বদেশ ত্যাগ করে মরুভূমির উপর দিয়ে মাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। মুরুভূমিতে যাত্রা করার সময় তিনি এক সময় একটি কুপের কাছে গেলেন সেখনে সুশীতল জল পান করার জন্য। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন, শীতল জলের আশায় বহু লোকদের ভিড় রয়েছে কুয়োর পাশে। ঐ ভিড়ের অদূরে দু'টি মেয়েকে তাদের কয়েকটি তৃষ্ণার্ত পশু সহ অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। ঐ দুটি মেয়েকে তৃষ্ণার্ত পশুগুলিকে নিয়ে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর মন দয়া ও অনুকম্পায় ভরে উঠলো কারণ, কেউ ঐ মেয়েদুটির দিকে তাকাচ্ছে না এবং তাদের দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্টের কথা কেউ ভাবছে না । মূসা যেহেতু নিজেই খুব দুঃখী ও হতাশাগ্রস্থ; তাই তিনি ঐ অসহায় মেয়েদুটির কষ্টের কথা সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন।কিছুটা ইতঃস্তত বোধ করে ঐ মেয়েদুটির দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন। তিনি তাদের সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তারা বলল, 'আমরা আমাদের পশুগুলিকে জল পান করাতে এসেছি; কিন্তু পারছি না; কারণে এখানে ভীষণ ভিড়। যতক্ষণ রাখালরা তাদের পশুগুলিকে জল খাইয়ে চলে না যায় তাদের সুযোগ হবে না তাদের পশুগুলোকে জল খায়ানো।" তারা আরও বলল "তাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ' যিনি বাড়িতে বসে তাদের জন্য দুশ্চিন্তা করছেন এবং তাদের জন্য অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে

রয়েছেন" 'মেয়ে দুটির ঐ সকল দুঃখ ও অসহায় অবস্থার কথা শুনে **মোশি** খুব কষ্ট পেলেন। অতঃপর তাদের পশুগুলি কুয়োর পাশে এনে **মোশি** তাদেরকে জল পান করালেন। তারপর মেয়ে দু'টি পশুগুলি নিয়ে তাড়াতাড়ি অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের আগে বাড়ী পৌছে গেল। নির্ধারিত সময়ের আগেই বাড়ি ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মেয়েদুটি ঘটনা খুলে বলল তাদের পিতার কাছে। তাদের পিতা সেই সাহায্যকারী ব্যক্তিকে প্রতিদান দিতে চাইলেন। তিনি তার কন্যাদ্বয়ের একজনকে পাঠালেন সেই সাহায্যকারী ব্যক্তিকে বাড়িতে ডেকে আনার জন্য। তাঁর সেই কন্যা সেখানে গেল। সেই সময় **মোশি** সেখানে কুয়োর পাশে একটি গাছের ছায়ায় বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলেন। প্রার্থনা শেষে তিনি হঠাৎ দেখলেন যে সেই দুটি মেয়েদের একটি তাঁর দিকে চঞ্চল পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে'। মেয়েটি এসে ধীর কণ্ঠে তাঁকে বলল যে "আপনি যে আমাদেরকে জল পান করিয়েছেন সেই জন্য আমাদের পিতা ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য এবং কিছু পারিশ্রমিক দেবার জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

উল্লেখ্য, সেই মেয়েদুটির বাবা ছিলেন মাদইয়ান বাসীদের জন্য প্রেরিত এক বিখ্যাত নবী, হযরত শুয়াইব। **মোশি** ইতিপূর্বে কখনো তাদের পিতার নাম শোনেননি বা তাঁকে তিনি চিনতেনও না। যাইহোক মেয়েটির কথা মত তাদের বাড়িতে গেলেন এবং সেখানে পৌঁছে **মোশি** তাদের পিতার ব্যাপারে সব কিছু জানলেন। **মোশি**ও তাঁর অতীতের ঘটনা নবীকে খুলে বলেন। শুয়াইবও মোশির দেশ ত্যাগের কাহিনী মনদিয়ে শুনলেন। ঐ সময় তাঁর কন্যাদ্বয়ও মোশির অতীতের ঘটনা শুনছিলেন। ঐ দুই কন্যার মধ্যে একজন পিতার কাছে আর্জি জানায়, "তাদের গৃহের কাজের জন্য একজন কাজের লোকের প্রয়োজন আছে। তাই আপনি যদি চান ঐ লোকটিকে কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করতে পারেন। কেননা আপনার কর্ম সহায়ক হিসাবে এই ব্যক্তি ভালই হবে। সে খুব শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত"

শুয়াইব মোশিকে বললেন 'তুমি আর ভয় করো না। তুমি ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছ।"সেই সময় তাঁর একটি কন্যা বলল, "বাবা! এঁকে বাড়ীতে কর্মচারী হিসাবে রেখে দিন। কেননা এ আপনার কাজকর্মে সহায়ক হবে। তাছাড়া ইনি অনেক শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। মেয়ের এই কথা শুনে শুয়াইব মূসাকে বললেন, "আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার বাড়ীতে কর্মচারী থাকবে। তবে যদি দশ বছর পূর্ণ করো, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চান তো তুমি আমাকে সদাচারী হিসাবে পাবে'। 'মোশি বলল, " এখন থেকে আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তিটি চূড়ান্ত হ'ল। দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একজন এই চুক্তি পূরণ করতে পারে, যদি তার আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকে। আমরা এ বিষয়ে যা বলছি বা করছি ঈশ্বর তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন।" মূলতঃ এটাই ছিল তাদের বিয়ের মোহরানা। সেযুগে এ ধরনের রেওয়াজ অনেকের মধ্যে চালু ছিল। মোহরানা মূলত একটি সম্মানি। যা বিয়ের সময় স্বামী তার স্ত্রীকে দিয়ে থাকে। এটা নারীর মূল্য হিসেবে বিবেচনা করা হত না। এটা সে যুগে কখনই মনে করা হত না যে, ঐ মোহরানা দিলে বা পরিশোধ করলেই , নারী নিজেকে স্বামীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। জানা যায়, ইতিপূর্বে নবী ইয়াকূব (আঃ) তাঁর স্ত্রীর মোহরানা বাবদ সাত বছর শ্বশুর বাড়ীতে মেষ চরিয়েছেন। যাইহোক এইভাবে অচেনা-অজানা দেশে এসে মোশির অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান কোন অসুবিধা হল না। তিনি নিরাপত্তাসহ অত্যন্ত মর্যাদাবান ও নির্ভরযোগ্য একজন অভিভাবক পেয়ে গেলেন বিদেশে। সেই সঙ্গে পেলেন একজন পতি-পরায়ণা বুদ্ধিমতী জীবন সাথী। তারপর সেখানে অতি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে মূসার দিনগুলি অতিবাহিত হতে থাকলো। এরপর একটা সময় এল যখন শর্তের মেয়াদ পূর্ণ হ'য়ে গেল। এখন যাবার পালা। উল্লেখ্য, দশ বছরে তিনি দু'টি পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং শ্বশুরের কাছ থেকে পান এক পাল দুম্বা (চর্বিযুক্ত মোটা লেজওয়ালা একরকম ভেড়া)। এছাড়া নবী শ্বশুরের কাছ থেকে অনেক আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ লাভ

করেছিলেন। তাই পুনরায় স্বদেশে ফেরার কথা ভেবে প্রথমে মুসা কিছুটা ভীত-সন্ত্রস্ত্র ও অসহায় বোধ করলেন। তবুও তাঁকে যেতে হবে। কারণ তাঁর পিতা-মাতা, ভাই-বোন সবাই রয়েছেন মিশরে। তাই ঈশ্বরের উপর ভরসা করে স্ত্রী-পুত্র সকলকে নিয়ে বের হলেন পুনরায় স্বদেশের অভিমুখে।

মোশির ঐশ্বরিক শক্তি অর্জন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে বাক্যালাভ

মিশর সীমান্তে যখন তিনি সকলকে নিয়ে পৌঁছালেন, পথিমধ্যে একটি ঘটনার মাধ্যমে মোশি অদ্‌ভুত ভাবে স্বর্গীয় জ্ঞান লাভ করেছিলেন। সেই ঘটনাটি আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

পথিমধ্যে মিশর সীমান্তে অবস্থিত সিনাই পর্বতমালার একটি পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানে সকলকে নিয়ে তিনি যখন পৌঁছালেন হঠাৎ তার স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়। তক্ষুনি তাদের আগুনের প্রয়োজন হল। কিন্তু সেখানে তিনি কোথায় পাবেন আগুন। তাই তিনি পাথরে পাথরে ঘষে আগুনের চেষ্টা করলেন কিছুক্ষণ। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা বৃথা হল কারণ প্রচন্ড শীতে ও তুষারপাতের কারণে পাথর ঘষায় কোন কাজ হ'ল না। দিশেহারা হয়ে মোশি চারিদিকে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ অনতিদূরে আগুনের হলকা (স্ফুলিং) তাঁর নজরে পড়ল। মনে প্রচণ্ড আশা নিয়ে তিনি স্ত্রী ও পুত্রকে বললেন, 'তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। আমি এক জায়গায় আগুন দেখেতে পেয়েছি। সম্ভবতঃ আমি তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা সেখানে পৌঁছে পথের সন্ধান পাব'। মোশি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার পরিচিত প্রধান সড়কে বিপদের আশঙ্কাও ছিল। তাই শ্বশুরের উপদেশ মত তিনি পরিচিত রাস্তা ছেড়ে অপরিচিত রাস্তায় চলতে গিয়ে মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে ডান দিকে যাত্রা করে তূর পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। পরে মুসার মনে হয়েছিল তার সেই পথ হারানোটা ছিল ঈশ্বরের অভিপ্রায় মাত্র। তার কারণ আমরা জানতে পারব পরবর্তী ঘটনা থেকে। মূসা গভীর আশা নিয়ে যতই সেই আগুনের শিখার নিকটবর্তী হচ্ছিলেন, আগুনের হল্কা বা শিখা ততই পিছোতে

লাগল। একটা সময় আশ্চর্যভাবে দেখলেন যে আগুন একটা সবুজ বৃক্ষের উপরে জ্বলছে অথচ গাছেটির পাতা পুড়ছে না; বরং তার উজ্জ্বলতা আরও বেড়ে যাচ্ছে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে মোশি এক দৃষ্টে আগুনটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ এক গুরুগম্ভীর আওয়াজ চার পাশ থেকে তাঁর কানে এলো । তাঁর মনে হতে লাগল পাহাড়ের সকল প্রান্ত থেকে একই সাথে সেই আওয়াজটা আসছে। মোশি তখন তূর পাহাড়ের ডান দিকে 'একটি উপত্যকায় দাঁড়িয়ে। এরপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন তাঁর কানে একটা আওয়ায এলো, হে মোশি!''আমিই সমস্ত জগতের পালনকর্তা। আমার ইচ্ছানুসারে তুমি আমার দরবারে পৌঁছে গেছো। অতএব তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল। তুমি পবিত্র উপত্যকায় এসেছ; এখানে তুবায় রয়েছ। অতঃপর ঈশ্বর বলেন, *"আমি তোমাকে নবী রূপে মনোনীত করেছি। অতএব এখন তোমাকে যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাক'। আমিই তোমার উপাস্য ঈশ্বর বলছি। আমি ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোন উপাস্য নেই। অতএব আমার প্রতি তোমার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার কর এবং আমার স্মরণে তোমার পূন্য কর্ম সম্পাদন কর'।"*

অতঃপর মোশি আরো ঈশ্বরের বানী শুনলেন, "হে মোশি! তোমার ডান হাতে ওটা কী?" মোশি বললেন, "এটা আমার লাঠি। এর উপরে আমি ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা পাড়ি এবং এটি আমার অন্যন্য কাজেও লাগে।" তার ঈশ্বর তখন বললেন, "ঐ লাঠিটাকে মাটিতে নিক্ষেপ কর।" মোশি তাই করলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিটি এক বিশাল অজগর সাপ হয়ে এদিক সেদিক ছোটাছুটি শুরু করলো। মোশি ভীষণ ভয় পেলেন। মোশি পিছন দিক দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলেন। তখন ঈশ্বর বললেন, "মোশি, সাপ্টাকে তুমি ধরো । মোশি ধরতে সাহস পেলেন না। ঈশ্বর বললেন, "তুমি ওটাকে ধর, ভয় করো না, আমি এখুনি ওকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব'।" মোশি তখন ঈশ্বরের নির্দেশ মত সেটাই করলেন। ঈশ্বর এইভাবে নবী মোশির ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রমান করে

দেখালেন। এটি ছিল মোশিকে দেওয়া ঈশ্বরের প্রথম মুজেযা অর্থাৎ ঈশ্বরের দেওয়া প্রথম ক্ষমতা।*(মোজেযা হল কেবল নবীগণের অলৌকিক লীলা বা জাদু যা নবীগণের মাধ্যমে ঈশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং যা সাধারন মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতার বাহিরে।]*

এরপর আল্লাহ বা ঈশ্বর তাঁকে দ্বিতীয় *মোজেয বা ক্ষমতা জন্য তৈরি হতে* বললেন, 'তোমার হাত বগলে রাখো। ওটা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অপর এক অলৌকিক ঘটনার নিদর্শন স্বরূপ।'ঈশ্বরের নির্দেশ মত মোশি তাঁর হাত বগলে রেখে আবার বের করলেন। দেখা গেল, তাঁর হাত প্রদীপের আলোর মত জ্বলজ্বল করছে। এই ভাবে তিনি যে ঈশ্বরের সাথে কথা বলেছেন এই বিশ্বাস তাঁর অন্তরে আরো ভালোভাবে তখন বদ্ধমূল হয়ে গেল। এই দুটি নিদর্শন দিয়ে মোশিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন ঈশ্বর প্রদত্ত তাঁর ঈশ্বরিক ক্ষমতার কথা কারণ সবাই যেন তাঁর কথার উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতার প্রতি সকলে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে।

[উল্লেখ্য *ঐ* সময় মিসর ছিল জাদুবিদ্যায় শীর্ষস্থানে অবস্থানকারী দেশ। সেখানকার শ্রেষ্ঠ জাদুকরদের হারিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই নবীদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার রীতি ছিল। সেজন্যই ঈশ্বর মোশিকে সবদিক দিয়ে প্রস্তুত করে দিচ্ছিলেন। এরফলে মোশি নিজের মধ্যে অনেকটা শক্তি ও সাহস অনুভব করতে লাগলেন।

ফেরাউনের নিকট যেতে মোশিকে ঈশ্বরের নির্দেশ

ঈশ্বর এরপর মোশিকে বললেন, "তুমি মিশরের ফেরাউনের নিকট যাও। তুমি তাকে গিয়ে ঈশ্বরের নির্দেশ *প্রচার* কর এবং *জীবনের সব কাজ-কর্মে ঈশ্বরের নির্দেশ মেনে চলতে বল। তাকে বল* ঈশ্বর ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনিই পৃথিবীর একমাত্র অধিপতি। তাকে ইসরাইলের প্রতি সদয় হতে বলো। নিশ্চয় সে অনেক যুলুম করেছে। সে ঈশ্বরকে ছেড়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে।" *জেহোয়া* এরপর মোশিকে আরও বললেন "তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনবলীসহ ফেরাউনের নিকট যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য

করো না। তোমরা তার কাছে গিয়ে নম্রভাষায় কথা বলবে। তাতে হয়ত সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে'। মোশি তখন ঈশ্বরকে বললেন, হে আমাদের পালনকর্তা, আমার আশংকা এইযে, সে আমাদের উপরে যুলুম করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে'। 'ঈশ্বর তখন বললেন, 'তোমরা ভয় করো না। আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি তোমাদের (সব কথা) শুনবো এবং সেই মত অবস্থা নেব। জিহোয়া এই ভাবে মোশির সাথে আরেকবার কথা বলেন। এবং এই ভাবে মোশিও হয়ে উঠলেন একজন বিরাট নবী বা ঈশ্বরের দূত। মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সাথে সরাসরি বাক্যালাপের পর উৎসাহিত ও পুলকিত মোশি তূর পাহাড়ের পাদদেশ এলাকায় কিছু দিন বিশ্রাম করলেন। তারপর মিশর অভিমুখে যাত্রা করলেন। সিনাই পর্বত থেকে অনতিদূরে মিসর সীমান্তে পৌঁছে গেলে যথারীতি মোশির বড় ভাই হারূণ ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এসে তাঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন।

মোশির মিশরে প্রত্যাবর্তন এবং ফেরাউনের সঙ্গে সাক্ষাৎ;

ঈশ্বরের নির্দেশমত মোশি এবং তাঁর বড় ভাই হারূণ অতি কষ্টে ফেরাউন ও তার সভাসদবর্গের নিকটে পৌঁছে গেলেন। মোশি এবং হারুন যখন ফেরাউনের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং ফেরাউনের কাছে তাঁদের নবুওয়াত বা নবীর দায়িত্বের কথা ঘোষণা করলেন, তখন ফেরাউন মোশিকে তাঁর অনুসরণকারী ঈশ্বর সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করেন। উত্তরে মোশি ফেরাউনকে বলেন, "সে (মোশি) সেই ঈশ্বরকে অনুসরণ করে যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেন এবং সকলকে সঠিক পথ দেখান।" তখন ফেরাউন তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। মুসা উত্তর দেয় যে পূর্ববর্তী প্রজন্মের জ্ঞান ঈশ্বরের কাছে রয়েছে। এরপর ফেরাউন মুসাকে প্রশ্ন করে, "বিশ্বজগতের পালনকর্তা কি?" মুসা উত্তরে বলে " ঈশ্বর হলেন আসমান, জমিন এবং তাদের মধ্যবর্তী সবকিছুর মালিক।" এই সব কথা শুনার পর ফেরাউন মুসাকে তাদের সাথে তার শৈশবের কথা এবং সে যে লোকটিকে হত্যা করেছিল সেই কথা মনে করিয়ে দেয়। মোশি স্বীকার করেন যে তিনি অজ্ঞতাবশত এই

কাজটি করেছেন, কিন্তু জোর দিয়ে বলেন যে তার ঐ অজ্ঞতাবশত কুকর্মের জন্য ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করেছেন এবং এখন তিনি ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত। এবং সে তার কাছে ঈশ্বরের নির্দেশেই এসেছেন।" মোশি বনী এইবার ফেরাউনকে বললেন, "হে ফেরাউন! আমি বিশ্বপ্রভুর পক্ষ হ'তে প্রেরিত নবী ও রাসূল'। 'আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আমি পেয়েছি, আমি সেটাই তোমাদেরকে বলতে এসেছি। তার ব্যতিক্রম আমি কিছুই বলব না। তুমি একেশ্বরবাদে (monotheism) রূপান্তরিত হও। এটাই তোমার জন্য বিশ্বজগতের পালনকর্তার নির্দেশ।" মোশি এইভাবে ফেরাউনকে বিশ্ব-পালনকারীকে স্বীকার করতে বললেন। কিন্তু ফেরাউন তাতে অস্বীকার করলেন কারণ ফেরাউন নিজেকেই সর্বদা খোদা বা পালনকর্তা বলে সবার কাছে জাহির করতেন। ফেরাউন মোশিকে নবী হিসেবে গ্রহণ না করে, মোশি যে বিশ্বপালনকারীর নির্দেশে সেখানে গিয়েছেন তার প্রমাণ চাইলেন। .শুধু তাই নয়, ফেরাউন মোশিকে পাগল বলে অভিযুক্ত করলেন এবং তাঁকে বন্দী করার হুমকি দেয়- যদি তিনি ঘোষণা করেন যে ফেরাউন সত্যি ঈশ্বর নয়। মোশি এরপর ফেরাউনকে সুস্পষ্টভাবে অবহিত করেন যে তিনি ঈশ্বরের সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তার নিকট এসেছেন।

ফেরাউন মোশির নিকট বিশ্বপালনকারীর নির্দেশের প্রমান চাইলেন;

ফেরাউন যখন মোশির কাছে ঈশ্বরের সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো দেখতে চায়, তখন বনী মোশি তাঁর লাঠিটি মেঝেতে নিক্ষেপ করেন এবং সেই লাঠিটি সঙ্গে সঙ্গে একটি সাপে পরিণত হয়ে যায়। তারপর মুসা তাঁর একটি হাত বের করেন এবং তাঁর সেই হাতটি থেকে একটি উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠে। ফেরাউনের পরামর্শদাতারা তাকে পরামর্শ দেয় যে এটি যাদুবিদ্যা, এটা কোন নবীর প্রমান নয়। তখন ফেরাউন তাদের পরামর্শে তিনি রাজ্যের সেরা যাদুকরদের ডেকে পাঠালেন। ফেরাউন এরপর মোশিকে ফেরাউনের জাদুকরদের মধ্যে যুদ্ধ বা প্রতিযোগিতার জন্য চ্যালেঞ্জ করে,

মুসাকে একটি দিন বেছে নিতে বলে। মোশি এই বিষয়ে একটি উৎসবের দিন বেছে নিলেন।

সেই নির্দিষ্ট দিনে ফেরাউন তার সেরা জাদুকরদেরকে ডাকল যাতে তার ঐ জাদুকররা মোশিকে ছলনাকারী হিসেবে প্রমান করতে পারে। নির্দিষ্ট দিনে যাদুকররা সেখানে এসে পৌঁছালে ফেরাউন তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা বিজয়ী হলে, ঐ বিশেষ সমাবেশের মধ্যে তাদেরকে সম্মানিত করবে। মিশরের উৎসবের দিনে, মোশী যাদুকরদেরকে প্রথম প্রদর্শনের সুযোগ দেন কিন্তু তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে তারা যদি তাদের কর্ম সম্পাদনে কোন কপটতা বা চালাকি করে, ঈশ্বর অবশ্যই তাদের চালাকি বা কপটতা প্রকাশ করে দেবেন। কিছু কিছু লেখা থেকে পাওয়া যায় যে যাদুকররা পর্যবেক্ষকদের চোখ জাদু করে এবং তাদের ভয় দেখায়। যাদুকরদের প্রদর্শন দেখে প্রথমে মোশি কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে উদ্বিগ্ন না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

ঐদিন জাদুকরদের সামনে মোশি তাঁর বিশেষ দণ্ডটিকে মেঝেতে আঘাত করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর সেই লাঠিটি ভয়ঙ্কর সাপে পরিণত হল। কিন্তু জাদুকররা যখন তাদের সাপ তৈরি করেতে লাগল, তখন মুসার ঐ ভয়ঙ্কর সাপটি জাদুকরদের সমস্ত সাপকে খেয়ে ফেলে, যাদুকররা তখন বুঝতে পারল যে তারা একটি অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। তখন যাদুকরেরা মোশির বার্তায় বিশ্বাস করার কথা ঘোষণা করে এবং ফেরাউনের হুমকি সত্ত্বেও তারা হাঁটু গেড়ে বসে থাকে। এতে ফেরাউন ক্ষুব্ধ হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে মোশির অধীনে কাজ করার অভিযোগ তোলে। ফেরাউনের তাদেরকে সতর্ক করেন যে, তারা যদি মোশির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আগ্রহী হয় তাহলে তিনি তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবেন এবং ফেরাউনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাদেরকে খেজুর গাছের কান্ডে ক্রুশবিদ্ধ করবেন। তবে জাদুকররা তাদের মুসার প্রতি বিশ্বাসে অবিচল থাকে এবং ফেরাউনের দ্বারা শাস্তি পায়। [***From Wikipedia, the free encyclopedia]***

এই ঘটনার ফলে ঐ উৎসবের দিনটিতে মোশির অনুগামীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ফেরাউন একেশ্বরবাদকে গ্রহণ করতে অর্থাৎ ঈশ্বরকে বিশ্বপালনকারী হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। যখন তাঁর সমস্ত চেষ্টা ও ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়, মুসা অবিশ্বাসীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। এরপর থেকে ফেরাউনের দ্বারা মোশি ক্রমাগত নির্যাতিত ও উৎপীড়িত হতে লাগলেন। অতঃপর মোশি ফেরাউনকে বললেন, "আমি তোমার নিকটে বিশ্ব পালনকর্তার বিশেষ নির্দেশ নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি সেই নির্দেশ পালন করলে না। অতএব তুমি ইস্রাঈলগণকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও। মোশি ঐরূপ দাবী করার কারণ হল যে, ঐ সময় বনু ইস্রাঈলের উপরে ফেরাউনের ও তার সম্প্রদায়ের যুলুম অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং ইস্রাঈলদের সেখানে শান্তিতে আপোষে বসবাসের কোন রাস্তা ছিল না। ফলে তিনি তাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনতে চাইলেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, মূসা তখনই বনু ইস্রাঈলকে নিয়ে বের হয়ে যেতে পারেন নি।

অসহনীয় দৈহিক বা মানসিক যন্ত্রণা পেয়ে মুসা বাধ্য হয়ে তাঁর দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন কারণ তিনি দেখলেন যে ফেরাউন কখনো মুসার বাণীতে বিশ্বাস করবে না এবং ইসরাঈলিদের উপর নির্যাতন বন্ধ করবে না। তাই, মূসা পালনকর্তার কাছে প্রার্থনা করলেন: "হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি অবশ্যই ফেরাউন ও তার নেতাদেরকে পার্থিব জীবনে জাঁকজমক ও ধন-সম্পদ দান করেছেন, হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের ঐ পার্থিব জীবনে জাঁকজমক ও ধন-সম্পদ দ্বারা তারা মানুষকে আপনার পথ থেকে বিচ্যুত করছে। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট করে দিন। তাদের জীবনকে কঠিন করে দিন; তারা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের যন্ত্রণাদায়ক জীবন ভোগ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার (ঈশ্বরের) প্রতি তাদের বিশ্বাস আসবে না।"

তাঁর এই প্রার্থনার পর তিনি ঈশ্বরকে (জিহোয়া) বলতে শুনলেন;"নিশ্চয়ই তোমাদের দোয়া কবুল হয়েছে, সুতরাং তোমরা সকলে সরল পথে চলো (অর্থাৎ সৎকাজ করতে থাকো এবং ধৈর্যের সাথে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে থাকো) এবং যারা জানে না তাদের পথ অনুসরণ করো না। অর্থাৎ যারা ঈশ্বরের একত্ববাদে বিশ্বাস করে না এবং ঈশ্বরের প্রতিদান: জান্নাত ইত্যাদিতেও বিশ্বাস করে না, তাদের পথ অনুসরণ করো না ।"

এইভাবে মুসার বিরুদ্ধে লড়াই এ হেরে যাওয়ার পর, মোশি এবং ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে ফেরাউন আরও গভীরভাবে চক্রান্ত করতে থাকে। সে তার মন্ত্রী, রাজকুমার এবং পুরোহিতদের সাথে জরুরি বৈঠকের জন্য আদেশ দেয়। বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায়, ফেরাউন তার মন্ত্রী হামানকে একটি বড় টাওয়ার তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি "মোশির ঈশ্বরকে দেখতে পারেন। এরপর ফেরাউন ধীরে ধীরে ভয় পেতে শুরু করে যে মোশি তার প্রাজাদেরকে বোঝাতে পারে যে ফেরাউন প্রকৃত ঈশ্বর নয়, এবং মোশিকে ফেরাউন হত্যা করতে চায়। এই রকম একটা ভয়ের পরিবেষে, ফেরাউনের পরিবারের একজন ব্যক্তি যিনি অনেক বছর আগে মোশিকে ফেরাউনের ব্যাপারে বিভিন্ন ভাবে সতর্ক করেছিলেন, তিনি এগিয়ে আসেন সত্যটা প্রকাশের জন্য। তিনি মানুষজনকে সতর্ক করে বলতে লাগলেন যে অপরাধীদের জন্য ঈশ্বরের শাস্তি এবং ধার্মিকদের জন্য পুরস্কার নিশ্চিত। যাইহোক নিরুপায় হয়ে মোশি তার ইস্রায়েলীয়দেরকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য ফেরাউনের কাছে আবার অনুমতি চাইলেন। তিনি ফেরাউনকে বললেন, “তুমি এখন বনু ইস্রায়েলগণকে আমার সাথে চলে যেতে দাও।” ফেরাউন ইস্রায়েলীয়দের মিশর ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকার করল।

ঈশ্বরের নির্দেশে মিশরে প্রলয় এবং ইস্রায়েলদের নিয়ে মোশির মিশর ত্যাগ;

এই বিষয়ে বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায় যে ফেরাউনের অত্যাচার ও উৎপীড়ন অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ার কারনে ঈশ্বর বাধ্য হয়ে

ফেরাউনের এবং তার লোকদের উপর শাস্তির ব্যাবস্থা করেন। ঐ শাস্তি ভয়ঙ্কর বন্যা বা প্রলয়ের আকারে নেমে আসে ফেরাউনের রাজ্যে এবং তার লোকদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করে দেয়, পঙ্গপালের ঝাঁক তাদের ফসল ধ্বংস করে দেয়, মহামারী মড়ক তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। সমস্ত পানীয় জলের বাঁক রক্তে পরিণত হয়। ফলে ফেরাউন প্রজাদের কাছে বারে বারে অপমানিত হতে থাকে। কিন্তু ফেরাউন যত অপমানিত হতে থাকে, তত তার দুর্ব্যবহার বাড়তে থাকে। এদিকে ঈশ্বর মুসাকে ইস্রায়েলীয়দের সাথে নিয়ে রাতের অন্ধকারে ভ্রমণ করে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেন এবং তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে ফেরাউনের লোকেরা তাদেরকে অনুসরণ করবে। ইস্রায়েলীয়রা রাতের অন্ধকারে চলে গেছে বুঝতে পেরে ফেরাউন সৈন্যবাহিনী নিয়ে মোশী ও তার লোকদেরকে ধাওয়া করে। [***From Wikipedia, the free encyclopedia***]

ইস্রায়েলদেরকে নিয়ে মোশির দুর্বিষহ যাত্রাপথ;

ইসলাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন বা কোরানে উল্লেখ রয়েছে যে মোশি বা মুসা যখন তার অনুসারীদের নিয়ে অন্য ভূখণ্ডে পৌঁছানোর জন্য নীল নদের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন ফেরাউন বিষয়টি জানতে পারেন এবং তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের অনুসরণ করলেন। মুসা ইসরাঈলদেরকে সঙ্গে নিয়ে মিশর থেকে পালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ফেরাউনের বাহিনী তাদের পিছু নেয়। আমরা বুঝলাম আল্লাহ মূসাকে এবং তাঁর লোকদেরকে (ইসরাঈলিদেরকে) মিশর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন, কিন্তু তাঁর লোকদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তখন নাযিল করেন অর্থাৎ ঈশ্বর সেখানে অবতীর্ণ হলেন। ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীদের ভয়ে মূসার কথায় ইসরাঈলরা মিশর ছেড়ে ছিল। মুসার সম্প্রদায়ের বংশধর ছাড়া আর কেউ মুসাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারেনি বলে অনেক লেখা থেকে পাওয়া যায়। তারা মুসার কথায় মিশর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল যাতে ফেরাউন এবং তার লোক

তাদের উপর অত্যাচার করতে না পারে। নিঃসন্দেহে ফেরাউন ছিল পৃথিবীতে একজন অহংকারী অত্যাচারী, অপরাধী, পাপী ব্যক্তি। সে সর্বপ্রকার মহাপাপ করতে অভ্যস্ত। আর মূসা বললেনঃ হে আমার প্রিয় মানুষগণ! তোমরা যদি আল্লাহরকে বিশ্বাস করে থাক, যদি তোমরা মুসলমান হয়ে থাক, তবে তাঁর উপর ভরসা রাখো। তখন তারা বলেছিল."আল্লাহর উপর আমরা ভরসা করি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে জালিমিন (মুশরিক ও অন্যায়কারী) সম্প্রদায়ের জন্য পরীক্ষায় পরিণত করবেন না (এবং আপনার রহমতে আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করুন। " কুরআন আয়াত 10:83-86

অবিচল পথ চলার পর নবী মোশি ও ইস্রায়েলীয়রা সমুদ্রের তীরে পৌঁছে সেখানে তারা থামে। ফেরাউন সৈন্যবাহিনীকে তাদেরকে অনুসরণ করতে দেখে ভয় পেয়ে ইস্রায়েলীয়রা মোশিকে চিৎকার করে বলে যে তারা ফেরাউন এবং তার সেনাবাহিনী দ্বারা ধরা পড়ে যাবে।

আগেই বলেছি, রাতের অন্ধকারে, মুসা তার লোকদের লোহিত সাগরের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সকালে তারা সমুদ্র সৈকতে পৌঁছেঁচিলেন। ততক্ষণে ফেরাউন তাদের চলে যাওয়ার কথা জানতে পেরেছিল, তাই সে তাদের ধাওয়া করার জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করেছিল। সেই দেখে অধৈর্য ইসরায়েলীগণ শীঘ্রই উত্তেজিত হয়ে ওঠল এবং বলে ওঠে: "আমাদের সামনে এই দুর্গম সমুদ্র এবং আমাদের পিছনে শত্রু; নিশ্চয় আর মৃত্যু এড়ানো যাবে না!" এইভাবে তারা মুসার উপর বিরক্ত হতে লাগল এবং বিশ্বাস হারাতে লাগল। বিপদের আশঙ্কায় ঈশ্বর তখন মোশিকে তার লাঠি দিয়ে লোহিত সাগরে আঘাত করার নির্দেশ দেন এবং তাদেরকে সমুদ্রের জলে ডুবে যাওয়ার ভয় না পেতে বলেন কারণ তিনি সর্বদা তাদের সহায় আছেন। ঈশ্বর জীহোয়ার নির্দেশমত নবী মোশি তাঁর লাঠি দিয়ে লোহিত সাগরে জলে আঘাত করলেন। সমুদ্রে আঘাত করার পর, সমুদ্র দু ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং একটি পথ তৈরি হয় তার উপর দিয়ে

ইস্রায়েলীয়দের চলে যাওয়ার জন্য। এই ঘটনাটি যেমন ওল্ড টেস্টামেন্টের এক্সোডাসে (Exodus) উল্লেখ রয়েছে; বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায় ইসলাম ধর্মের পবিত্র কোরানে (কোরআনে)ও উল্লেখ রয়েছে। কোরানে মোশিকে, মুসা নামে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঈশ্বরের নির্দেশে মোশির লাঠির আঘাতে লোহিত সাগর দুভাগ হল

কোরানে বলা হয়েছে আল্লাহ মুসা এবং তাঁর লোকদেরকে (ইসরাঈলিদেরকে) মিশর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন, কিন্তু তাঁর লোকদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করেছিল। তখন সেখানে আল্লাহর আবির্ভাব ঘটে। ইসরাঈলগণ বাধ্য হয়ে ফেরাউন ও তার সৈন্যদের ভয়ে মুসার কথায় মিশর ছেড়ে ছিল। কিন্তু মুসার সম্প্রদায়ের বংশধর ছাড়া আর কেউ মুসাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেনি। সেকথা আমরা আগেই জেনেছি।

উল্লেখ্য, সর্বশক্তিমান আল্লাহ ফেরাউনকে অনেক সুযোগ দেওয়ার পর তার অপরাধের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যেটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি কিভাবে অত্যাচারী ফেরাউন ও তার লোকেরা রেড সী তে ধ্বংস হয়েছিল এবং আল্লাহ মূসাকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুসা তখন তাদেরকে বলল যে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে আরও নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করবেন। মূসার ঐ কথাগুলো তাদেরকে কিছুটা আশায় আলো দেখালো,

কিন্তু মানুষ সবসময় ফলাফলের জন্য অধৈর্য হয়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ কিছু উপায় না দেখে তারা আবার দাসত্বের মধ্যে ফিরে যেতে চাইল। তখনই আল্লাহ মূসার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন "তোমার জাদু লাঠি দিয়ে সমুদ্রকে আঘাত কর!" আল্লাহ যা আদেশ করেছিলেন মূসা তাই করলেন। একটি প্রচণ্ড বাতাস বয়ে গেল, সূর্য উজ্জ্বলভাবে জ্বলে উঠল, এবং এক ঝলকানিতে সমুদ্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, ঢেউয়ের চূড়াগুলি চারপাশে পাহাড়ের মতো উপরে উঠতে দেখা গেল ।

প্রচন্ড ভয়ে ও আতঙ্কে তারা মূসার কাছে অনুরোধ করল সমুদ্র বন্ধ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে । যাইহোক, ঈশ্বর মূসাকে তার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে পুনরায় আঘাত না করার নির্দেশ দিলেন। মূসা ও ইসরাঈলদের ঐ সাগর পার হওয়ার পর ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীর উপর ঐ সাগর আছড়ে পড়ে, এবং তাদের ফিরে আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী ডুবে মারা যায়। ফেরাউন ও মুসার এই কাহিনীটি কিছুটা পার্থক্যের সাথে কোরান ও বাইবেলে পাওয়া যায়। "সত্যিই! আমার প্রভু আমার সাথে আছেন!" মুসার এই বিশ্বাস বা দাবিকে এই অলৌকিক ঘটনাটি প্রমাণ করেছে।

এই গল্পের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে কিভাবে একজন মানুষের অহংকার একজন ঈশ্বর বিশ্বাসী কাছে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। যেভাবে ফেরাউনের প্রবল ক্ষমতা ও অহংকার মুসার ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাসের কাছে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বরের কৃপায় ইস্রায়েলীয়রা শুকনো পথে লোহিত সাগর পার হতে পেরেছিল, যা তাদের মিশর থেকে মুক্তির প্রতীক ছিল। মিশরীয় সেনাবাহিনী যখন ইস্রায়েলীয়দের অনুসরণ করে, তখন তারা লোহিত সাগরে ডুবে মারা যায়, যা ছিল ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রমাণ। উইকিপেদিয়া তথ্য অনুসারে এই ঘটনাটি বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের এক্সোডাস (Exodus) 14 অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। লোহিত সাগর পার হওয়ার ঘটনাটি ইস্রায়েলীয়দের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা,

যা তাদের স্বাধীনতা এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করেছে।

হ্যাঁ এই অমর কাহিনী শুনে অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবে না যে মোশি বা মুসা তোমার আর আমার মত একজন মানুষ হয়ে ছিলেন। কীভাবে পুরো লোহিত সমুদ্রকে ভাগ করতে পারেন? আমাদের মনে রখতে হবে এই অসম্ভব কাজকে সম্পন্ন করার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর প্রিয় ইস্রায়েলীয়দের মুক্তির জন্য মোশির সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর বিশাল কাজে ঈশ্বর সাথ দিয়েছিলেন। তাই ঈশ্বর লোহিত সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য মোশিকে অগ্রদূত হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এর উপর আমরা কেবল মোশিকেই দেখতে পাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর, যিনি দৃশ্যমান নন, তিনিই লোহিত সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন। যদি ঈশ্বর আমার বা আপনার দ্বারা তাঁর কোন কাজ সম্পন্ন করতে চান, তাহলে আমরাও মোশির মতো বড় আশ্চর্যময় কাজ করতে পারব। ভারতের ঋষি মহাঋষি মোশির ন্যায় অনেক আশ্চর্যজনক কাজ করে ছিলেন, যা আমি আমার অনেক বইতে বর্ণনা করেছি।

ফেরাউনের মৃত্যু

ফেরাউন এবং তার সৈন্যরা এক অলৌকিক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার সম্মুখীন হল। তারা দেখল সমুদ্র অদ্ভুত ভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। তারা বিভক্ত সমুদ্রের জলের উপর দিয়ে ছুটে গেল, এবং যখন তারা মাঝপথে ছিল, তখন ঈশ্বর সমুদ্রকে তার আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আতঙ্কগ্রস্ত ফেরাউন ও তার সৈনরা বুঝতে পারল যে তাদের আর বাঁচার উপায় নেই। তখন ঐ সঙ্কট মুহূর্তে ফেরাউন ঘোষণা করলেন: "আমি বিশ্বাস করি যে আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন উপাস্য নেই যাকে ইসরায়েলের সন্তানরা বিশ্বাস করে এবং আমিও ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণকারীদের তাদের মধ্যে একজন।" কিন্তু অত্যাচারী শাসকের এই ঘোষণা ঈশ্বর স্বীকার করে তাদেরকে ক্ষমা করলেন না। তাই ফেরাউন এবং তার সৈন্যরা সকলে সমুদ্রের জলে ভেসে যায় এবং সমুদ্রে ডুবে মারা যায়।

মোশি ইস্রায়েলীয়দের সিনাই পর্বতে গমন

লোহিত সাগর পার হওয়ার পর, মুসা বা মোশি ইস্রায়েলীয়দের নিয়ে সিনাই পর্বতে যান। সিনাই পর্বতে মুসা ঈশ্বরের কাছ্ থেকে দশটি আজ্ঞা লাভ করেন, যা ইহুদি ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এরপর ইস্রায়েলীয়রা ৪০ বছর ধরে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ায় এবং মুসা ১২০ বছর বয়সে মারা যান। এইভাবে মুসা বা মোশির নেতৃত্বে ইস্রায়েলীয়রা মিশর থেকে দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে।

মোশির মাধ্যমে ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা বা আদেশ Ten Commandments;

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা বা দশটি আদেশ হলো বাইবেলের ধর্মীয় অনুশাসনের একটি তালিকা, যা ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে ইস্রায়েলীয়দের কাছে সিনাই পর্বতে প্রদান করেছিলেন। ঈশ্বরের মোশিকে দশ আজ্ঞা প্রদানের প্রেক্ষাপটটি ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যাত্রাপুস্তকের গল্পের সাথে গভীরভাবে প্রোথিত। এই দশটি আজ্ঞা হল:

১ম: "তুমি অন্য কোনো দেব-দেবীকে পূজা করবে না; শুধু আমার উপাসনা করবে"(যাত্রাপুস্তক ২০:৩)

২য়: "তুমি তোমার ঈশ্বরের নামে মিথ্যা শপথ করবে না; ঈশ্বরের নামের অপব্যবহার করবে না অথবা ঈশ্বরের নামে খারাপ কাজ করবে না।" (যাত্রাপুস্তক ২০:৪-৬ পদ)

৩য়: কোন কিছু বা কারুর মূর্তি বানাবেন না - বা কোনো মূর্তি পূজা করবে না" (যাত্রাপুস্তক ২০:৭ পদ)

৪র্থ: "শনিবারে বিশ্রাম পালন করবে" প্রতি সপ্তাহের সপ্তম দিনে স্বাভাবিক কাজ করবে না -এটি একটি বিশেষ পবিত্র দিন ('ছুটির দিন') হিসেবে বিবেচনা করবে। ঐ দিন বিশ্রাম করবে। (যাত্রাপুস্তক ২০:৮-১১)

৫ম: "তোমার পিতা ও মাতার প্রতি সম্মান করবে। প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে" তাতে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দেওয়া দেশে তোমরা অনেক দিন বেঁচে থাকবে" (যাত্রাপুস্তক ২০:১২ পদ)।

৬ষ্ঠ: "তুমি কাউকে হত্যা করবে না" যাত্রাপুস্তক ২০:১৩ পদ) । এই আজ্ঞাটি হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে অন্য কোন মানবসন্তানকে খুন করার বিরুদ্ধে একটি আদেশ।

৭ম: "তুমি ব্যভিচার করবে না" তুমি যাকে বিয়ে করেছো তার সাথে ছাড়া অন্য কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে ব্যভিচার করবে না। (যাত্রাপুস্তক ২০:১৪ পদ) । এটি স্ত্রী/স্বামী ব্যতীত অন্য কারও স্ত্রী/স্বামীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার বিরুদ্ধে প্রদত্ত আদেশ।

৮ম: "তুমি চুরি করবে না" (যাত্রাপুস্তক ২০:১৫ পদ)। যা কারো নিজের নয় তা যার তার অনুমতি ব্যতীত নেয়ার বিরুদ্ধে এই আদেশটি করা হয়েছে।

৯ম: "তুমি মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না; অন্য কারো সম্পর্কে মিথ্যা বলো না। (যাত্রাপুস্তক ২০:১৬ পদ)। এই আজ্ঞাটিতে মিথ্যাভাবে বা ছলনা করে অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছু সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

১০ম: "তোমার প্রতিবেশীর প্রতি লোভ করবে না"; কারো বাড়ি, তার সঙ্গী, অথবা তার মালিকানাধীন যেকোনো কিছুর প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন না। অন্যের ঘর-দুয়ার, স্ত্রী, দাস-দাসী, গরু, গাধা কিংবা আর কিছুর উপর লোভ কোরো না" (যাত্রাপুস্তক ২০:১৭ পদ)। এই আজ্ঞাটি হচ্ছে যা আমার নিজের নয় তার জন্য কামনা বা আকাঙ্খা করার বিরুদ্ধে একটি আদেশ।

পণ্ডিতদের মতে এই দশটি আদেশ যা Old Testament এর যাত্রাপুস্তক (এক্সোডাস /Exodus) এবং দ্বিতীয় বিবরণে (Deuteronomy) উল্লেখ রয়েছে ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। ধার্মিক জীবনযাপনের

জন্য ঈশ্বরের নির্দেশিকা 'দশ আজ্ঞা' নামে এই নির্দেশাবলী জীবনের ধর্মীয় এবং জাগতিক উভয় দিককেই অন্তর্ভুক্ত করে - কীভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করতে হয় এবং পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সমাজের বাকিদের সাথে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে হয়। এই নির্দেশিকাগুলি তিন হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে ধার্মিক জীবনযাপনের জন্য পাশ্চাত্যের দেশ গুলিতে অনুসৃত হয়ে আসছে। সংক্ষেপে পবিত্র বাইবেলে উল্লেখিত এই দশটি আজ্ঞা বা আইন ঈশ্বর জিহোবা ইস্রায়েল জাতি মিসর থেকে যাত্রা করার পর তাদের দিয়েছিলেন। পবিত্র বাইবেলের যাত্রা পুস্তক ২০:১-১৭ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৬-২১ পদের মধ্যে দশ আজ্ঞাগুলো লিপিবদ্ধ আছে। এখন বাইবেলের যাত্রা পুস্তক এবং দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তক সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাক।

Old Testament এর যাত্রাপুস্তক (এক্সোডাস /Exodus) এবং দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy) এর বিভিন্ন অনুচ্ছেদ অনুসারে, দশটি আদেশ (Ten Commandments) , ধর্মীয় অনুশাসনের তালিকা সিনাই পর্বতে মোশির কাছে ঐশ্বরিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং দুটি পাথরের ফলকে খোদাই করা হয়েছিল। আদেশগুলি যাত্রাপুস্তক 20:2-17 এবং দ্বিতীয় বিবরণ 5:6-21 পদে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

Old Testament এর প্রেক্ষাপটে, এক্সোডাস বইটিতে ইস্রায়েলিয়ালিদের মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং সিনাই পর্বতে তাদের যাত্রার বর্ণনা দেওয়া হয়, যেখানে তারা মোশির মাধ্যমে তাদের প্রতি ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞা বা আদেশ লাভ করে। অন্যদিকে ডিউটারোনমি হল প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশের আগে মোশি কর্তৃক ইস্রায়েলিয়ালিদের কাছে প্রদত্ত ব্যবস্থার পুনরায় বর্ণনা এবং সম্প্রসারণ। "এক্সোডাস" নামটি এসেছে "প্রস্থান" এর গ্রীক শব্দ থেকে, যা ইস্রায়েলিয়ালিদের মিশর থেকে প্রস্থানের প্রতিফলন করে। "এক্সোডাস" গ্রন্থটি তোরাহর দ্বিতীয় বই (হিব্রু বাইবেলের প্রথম পাঁচটি বই)। এটি ইস্রায়েলিয়ালিদের মিশরে দাসত্ব, তাদের বের করে আনার জন্য মোশির প্রতি ঈশ্বরের আহ্বান এবং

এক্সোডাসের পরবর্তী ঘটনাবলী, যার মধ্যে রয়েছে মহামারী, লোহিত সাগরের বিভাজন এবং সিনাই পর্বতে ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞা প্রদানের উপর বিশেষ বিবরন রয়েছে। বলা হয় দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy) তোরাহর পঞ্চম এবং শেষ গ্রন্থ। "দ্বিতীয় বিবরণ" বা "দ্বিতীয় আইন", যা যাত্রাপুস্তক এবং তোরাহর অন্যান্য গ্রন্থে প্রদত্ত আইনের পুনরাবৃত্তি এবং সম্প্রসারণ হিসাবে উল্লেখ করে। দ্বিতীয় বিবরণে ইস্রায়েলীয়দের উদ্দেশ্যে মোশির বিদায়ী ভাষণ রয়েছে, যেখানে প্রতিশ্রুত দেশে তাদের অনুসরণ করতে হবে এমন আইন এবং আদেশের রূপরেখা রয়েছে। এটি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং চুক্তির প্রতি আনুগত্যের গুরুত্বের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে ।

মোশির মৃত্যু

বাইবেল (Old Testament) এ Deuteronomy (দ্বিতীয় বিবরণ) এর শেষ অধ্যায়ে মোশির মৃত্যুর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। মোশির আসন্ন মৃত্যুর কথা ঈশ্বর আগেই ঘোষণা করেছিলেন যা বাইবেলের এ Deuteronomy (দ্বিতীয় বিবরণ) এর ৩৪ নং অনুচ্ছেদে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। Deuteronomy;

Then Moses climbed Mount Nebo from the plains of Moab to the top of Pisgah, across from Jericho. There the LORD showed him the whole land—from Gilead to Dan, all of Naphtali, the territory of Ephraim and Manasseh, all the land of Judah as far as the Mediterranean Sea, 3 the Negev and the whole region from the Valley of Jericho, the City of Palms, as far as Zoar. 4 Then the LORD said to him, “This is the land I promised on oath to Abraham, Isaac and Jacob when I said, ‘I will give it to your descendants.’ I have let you see it with your eyes, but you will not cross over into it.” এর অর্থ হল; মোশি মোয়াবের সমভূমি থেকে পিস্‌গা পাহাড়ের চূড়ায় নবো পাহাড়ে আরোহণ করলেন। সেখানে প্রভু মোশিকে সমস্ত দেশ

দেখালেন - গিলিয়দ থেকে দান পর্যন্ত, নপ্তালি থেকে ইফ্রয়িম ও মনঃশির সমস্ত ভূমধ্যসাগরীয়অঞ্চল, যিহূদার সমস্ত দেশ; নেগেভ এবং খেজুর গাছের শহর যিরীহোর উপত্যকা থেকে সোয়র পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল। এরপর প্রভু মোশিকে বললেন, "এই সেই দেশ যা আমি অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোবের কাছে শপথ করে বলেছিলাম। আমি এটি তোমার বংশধরদের দেব।' আমি তোমাকে তোমার চোখে দেখতে দিয়েছি, কিন্তু তুমি সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।" (যিহূদা হলেন জ্যাকব ও লেয়ার ছয় পুত্রের মধ্যে চতুর্থ এবং ইস্রায়েলীয়দের যিহূদা গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা-)

বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ-এরপর উল্লেখ রয়েছে যে ঈশ্বর যে ভাবে বললেন প্রভুর দাস মোশির সেইভাবে মোয়াবে মৃত্যু হল।, যেমনটি প্রভু বলেছিলেন। মোয়াবে তাঁকে কবর দিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ জানে না যে তাঁর কবর কোথায়। প্রাচীন মোয়াব ছিল একটি সেমিটিক রাজ্য যা মৃত সাগরের পূর্বে অবস্থিত ছিল। মোশি যখন মারা গেলেন তখন তাঁর বয়স একশো বিশ বছর হয়েছিল, তবুও তাঁর চোখ দুর্বল হয়নি বা তাঁর শক্তিও কমেনি। ইস্রায়েলীয়রা মোয়াবের সমভূমিতে ত্রিশ দিন ধরে মোশির জন্য শোক পালন করেছিল। ৩৪.৫-৮)। এরপর নানের পুত্র যিহোশূয় জ্ঞানের আত্মায় পূর্ণ হল কারণ মোশি তাঁর উপর তাঁর হাত রেখেছিলেন। তাই ইস্রায়েলীয়রা তাঁর কথা শুনল এবং ঈশ্বর মোশিকে যা আদেশ করেছিলেন মোশি তাই করলেন। (৩৪-৯) সেই সময় থেকে ইস্রায়েলে মোশির মতো আর কোন নবী আসেনি, যাকে প্রভু মুখোমুখি চিনতেন। মিশরে প্রভু যে সমস্ত চিহ্ন ও অদ্ভুত কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন, মোশী সেই সমস্ত কাজ করেছিলেন। সমস্ত ইস্রায়েলের সামনে মোশি যে মহাশক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, কেউ কখনও সেই মহৎ কাজ করতে পারেনি- একথা সুস্পষ্ট ভাবে দ্বিতীয় বিবরণ এ উল্লেখ রয়েছে। (৩৪*১০-১২) বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায় যে ঈশ্বর মোশিকে যে প্রতিশ্রুত ভূমি দেখিয়েছিলেন তার মনোরম দৃশ্য ছিল অতিপ্রাকৃত, কারণ নবো পর্বত থেকে বা কনানের কাছাকাছি অন্য কোনও স্থান থেকে ভূমির সম্পূর্ণ পরিসর দেখা অসম্ভব। দ্বিতীয় বিবরণ থেকে

জানা যায় ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন যে তাঁর ভূমির ব্যবস্থা অব্রাহামের চুক্তির দিকগুলি পূরণ করেছেন। যিহোশূয়কে মোশির উত্তরসূরী হিসেবে অভিষেক করা হয়েছিল। এটি জাতির সামনে প্রকাশ্যে ঘটেছিল এবং প্রভুর সামনে একান্তে ঘটেছিল (দ্বিতীয় বিবরণ 31:14, 23)।

Moses এই কাহিনী থেকে আমাদের শিক্ষা;

মোশির কাহিনী থেকে আমাদের শিক্ষা লাভ;

১. ঈশ্বর আমাদের কখনও ভুলে যান না। ঈশ্বর আমাদের জন্য সব কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং যথাসময়ে তিনি আমাদের পরিস্থিতির প্রতি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানান। যথা সময়ে তিনি এমন দরজা খুলে দেবেন যা আমরা কখনও কল্পনাও করিনি। তাঁর প্রতি সমর্পণ করলে তিনি আমাদেরকে চরম সংকটে শান্তি দেন এবং আমাদের অস্থির মনকে শান্ত করেন।

২. ঈশ্বর যেমন ইস্রায়েলের লোকেদের **জন্য একটি প্রতিশ্রুত ভূমি রেখেছিলেন** এবং যথাসময়ে তিনি তাঁর লোকদেরকে তাঁর প্রতিশ্রুত ভূমিতে স্থানান্তরিত করতে মোশিকে পরিচালিত করেছিলেন। ইস্রায়েলীয়দের মতো, আমাদের জন্য ঈশ্বরের দ্বারা প্রস্তুত একটি প্রতিশ্রুত ভূমি রয়েছে। আমরাও একদিন আমাদের স্বর্গীয় প্রতিশ্রুত ভূমিতে পৌঁছাব এবং প্রভুর সাথে অনন্তকাল বসবাস উপভোগ করব; যদি তাঁর প্রতি আমরা অটুট বিশ্বাস রাখি এবং সত্যের পথে চলি।

৩. কোন মতে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আশা ও বিশ্বাস হারালে চলবে না। ইস্রায়েলের লোকেরা যেমন গোশনে ফেরাউনের দাস হিসেবে কাজ করছিল এবং অনেক কষ্ট স্বীকার করে ছিল; তবুও তারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারায় নি এবং আশা হারায়নি যে একদিন তারা মুক্তি পাবে। বরং, তারা আরও ভাল ও স্বাধীন জীবনের জন্য প্রভুর কাছে প্রাথনা এবং কান্নাকাটি করেছিল; ফলে ঈশ্বরও তাদের কথা শুনেছিলেন। প্রভুর এই কথা ছিল: "আমি মিশরে আমার প্রজাদের উপর যে অত্যাচার চলছে তা অবশ্যই

দেখেছি এবং তাদের কান্না শুনেছি, কারণ আমি তাদের দুঃখ জানি" (উৎস; The Exodus). এখানে আমাদের এই শিক্ষা হল এই যে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অটুট বিশ্বাস হল সেই চালিকা শক্তি যা আমাদেরকে চরম প্রতিকূলতার সময়েও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

৪. ঈশ্বরের হাতে আমাদের ভবিষ্যৎ। গোশনে ইস্রায়েল একা ছিল না; প্রভু সর্বত্র তাদের সাথে ছিলেন। আমরা হয়তো মাঝে মাঝে ভাবতে প্রলুব্ধ হতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তবে, যাকোবের বংশধরদের মতো, ঈশ্বর আমাদের বিপদের সময়ে আমাদের সাথে থাকবেন। তিনি আমাদের ত্যাগ করবেন না। আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে তিনি সর্বদা আমাদের সাথে আছেন। তিনি আমাদের প্রতিটি প্রয়োজন পূরণ করবেন এবং আমাদের জন্য আমাদের যুদ্ধ করবেন।

৫. ঈশ্বর আমাদের উদ্ধার করবেন। কখনও কখনও, আমাদের জীবনে এমন কিছু ঘটতে পারে যা আমরা কখনই ঠিক করতে পারি না, এবং এই সময় আমাদের ঈশ্বরের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। যখন আমরা আমাদের নেতিবাচক পরিস্থিতি তাঁর কাছে সমর্পণ করি, তখন তিনি আমাদের কান্না শুনবেন এবং আমাদের পক্ষে দ্রুত কাজ করবেন। গোশন দেশের বাইবেলের গল্পগুলি আমাদের প্রতি, তাঁর লোকেদের প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার কথা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত। এটি আমাদের জানাতে সাহায্য করে যে ঈশ্বরের সর্বদা আমাদের জীবনের জন্য একটি পরিকল্পনা আছে এবং যখন সঠিক সময় আসবে, তিনি আমাদের অনুসরণ করার জন্য তাঁর নিখুঁত ইচ্ছা বাস্তবায়ন করবেন এবং প্রকাশ করবেন।

মিশরে গোশন ভূমির ছিল একটি উত্তম ও উর্বর ভূমি, ফসল ও পশুপালনের জন্য উৎকৃষ্ট। যদিও ফেরাউন মিশরে ইহুদিদের দাসত্বে আবদ্ধ করেছিল, মিশরের গোশন ছিল ইস্রায়েলীয়দের কাছে অত্যন্ত প্রিয় একটি ভূমি, যারা তাদের হৃদয়ে এই ভূমির প্রতি ভালোবাসা নিয়ে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রবেশ করেছিল।

পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ কোরানে নবী মুসার জীবন কাহিনী;

পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানে নবী মুসার জীবন কাহিনীটি একটু আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু কাহিনীটি ৩০০০- ৩৫০০ বৎসরের অতীতের, তাই সামান্য কিছু তথ্যগত পার্থক্য আসতে বাধ্য। যাইহোক, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী নবী মুসার জীবন কাহিনীর কিছুটা অংশ তুলে ধরছি, যাতে পাঠকসাধারণ নবী মুসার জীবন কাহিনী সম্পর্কে এই দুই ধর্ম গ্রন্থের বর্ণনা নিয়ে অযথা বিভ্রান্ত না হয়ে পড়েন।

আগেই বলা হয়েছে ইসলাম ধর্মে মুসা একজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নবী এবং ঈশ্বরের বার্তাবাহক। কোরানে নবী হিসেবে তাঁর জীবন কাহিনী বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসা ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নবী ও রসূলদের (ঈশ্বরের বার্তাবাহক) মধ্যে একজন। ইসলামিয় সাহিত্য ও কোরান ধর্ম গ্রন্থ অনুযায়ী, মুসা মিশরে বসবাসকারী ইস্রায়েলীয়দের একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।, ইসলামিক প্রথায় মুসার পিতার নাম ছিল 'ইমরান, যা হিব্রু বাইবেলের 'আমরাম' এর অনুরূপ। ইসলাম বলে যে মুসা যে সময়ে মিশরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন শাসক ফেরাউন নবী ইউসুফ (ইউসুফ) এর সময় ইস্রায়েলীয়দের দাস বানিয়েছিল। ইসলামী সাহিত্যে বলা হয়েছে যে মুসার জন্মের সময়, ফেরাউন একটি স্বপ্ন দেখেন যাতে তিনি জেরুজালেম শহর থেকে এক ভয়ঙ্কর আগুন আসতে দেখেন, যা ইস্রায়েলীয়দের জায়গা ছাড়া তার রাজ্যের সমস্ত কিছু পুড়িয়ে দেয় (এই বিষয়ে অন্য এক ব্যাখ্যায় বলা হয় যে ফেরাউন স্বপ্ন দেখেছিল যে ইস্রায়েলীয় একটি ছোট ছেলে ফেরাউনের মুকুটটিকে ধরে ফেলে সেটিকে ধ্বংস করে দেয়। যখন কয়েকজন জ্যোতিষী ফেরাউন সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করে যে ইস্রায়েলীয়দের পুরুষ সন্তানদের মধ্যে একজন তাকে উৎখাত করার জন্য বড় হয়ে উঠবে, তখন ভবিষ্যদ্বাণীটি যাতে না ঘটে তার জন্য ফেরাউন সমস্ত নবজাত ইস্রায়েলীয় পুরুষ শিশুদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। ফেরাউনের দরবারে অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা তাকে পরামর্শ দেন যে

ইস্রায়েলীয়দের পুরুষ শিশুকে হত্যা করলে জনশক্তির ক্ষতি হবে। অতএব, তারা পরামর্শ দেয় যে এক বছর অন্তর পুরুষ শিশুদেরকে হত্যা করা হবে। মুসার ভাই হারুন জন্মগ্রহণ করেন যে বছর শিশুদের রক্ষা করা হয়, যে বছর মুসার জন্ম হয় সে বছর পুরুষ শিশুদের হত্যা করার কথা ছিল ফেরাউনের নির্দেশ অনুযায়ী। এই পর্যন্ত মুসা বা মোশির জন্ম সম্পর্কে বাইবেলের এবং কোরানের কাহিনীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এরপর কিছু ক্ষেত্রে মুসার জীবন কাহিনী সম্পর্কে বাইবেল ও কোরানের মধ্যে তথ্যগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

ইসলামিক সাহিত্য অনুসারে, এই সময়ে মুসার মা জোচেবেদ মুসাকে গোপনে দুধ পান করাতেন। যখন তারা ধরা পড়ার বিপদে পড়ে যায়, তখন ঈশ্বর তাকে একটি বেতের ঝুড়িতে রেখে তাকে নীল নদের তীরে বসানোর জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তিনি তার মেয়েকে ঐ ঝুড়িটির গতিবিধি অনুসরণ করতে নির্দেশ দেন। যাতে ঝুড়ির মধ্যে শুয়ে থাকা মুসার কোন ক্ষতি বা বিপদ না ঘটে। জোচেবেদের নির্দেশ মত তার মেয়ে নদীর তীরে ঝুড়িটিকে অনুসরণ করতে থাকে। ঐ সময় স্নান করতে এসে মুসা ফেরাউনের স্ত্রী আশিয়া (এশিয়া) নদীর ঘাটে মুসাকে আবিষ্কার করেন। ফেরাউনের স্ত্রী আশিয়া মুসাকে দত্তক হিসেবে নেওয়ার জন্য ফেরাউনকে রাজি করান। এই জায়গায় মুসার সম্পর্কে বাইবেলের সঙ্গে কোরান সাহিত্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আমার সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী এইরূপ সামান্য কিছু তথ্যগত পার্থক্য ছাড়া মুসার জন্ম ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বাইবেল ও কোরান প্রায় একই কথা বলেছে। নবী মুসা সম্পর্কে কোরানে উল্লিখিত নূতন কিছু সংগৃহীত তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

কোরানের একটি ব্যাখ্যা (ইসরাইল হাদিস) অনুসারে, শৈশবে মুসা যখন ফেরাউনের কোলে খেলছিল, তখন সে ফেরাউনের দাড়ি ধরে তার মুখে চড় মেরেছিল। মুসার ঐ ঘটনাটি ফেরাউনকে বাধ্য করেছিল মুসাকে ইস্রায়েলীয় হিসাবে বিবেচনা করতে যে তাকে ভবিষ্যতে উৎখাত করবে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ফেরাউন

মুসাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ফেরাউনের স্ত্রী তাকে প্ররোচিত করেন যে মুসাকে যেন হত্যা না করা হয় কারণ সে একটি শিশু। পরিবর্তে, তিনি বালক মুসাকে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। ফেরাউনের আদেশে তরুণ মুসার সামনে দুটি প্লেট রাখা হয়েছিল, একটিতে রুবি স্টোন এবং অন্যটিতে জ্বলন্ত কয়লা। মুসা প্রথমে রুবির প্লেটের জন্য এগিয়ে যায়, কিন্তু দেবদূত গ্যাব্রিয়েল তার হাত কয়লার দিকে নির্দেশ করেছিলেন। মুসা একটি জ্বলন্ত কয়লা ধরে তার মুখের মধ্যে নিয়ে নেয়, তার জিহ্বা পুড়ে যায়। ঘটনার পর, মুসা বাকশক্তির সমস্যায় ভোগেন, ফেরাউনের মেয়ে মুসাকে রক্ষা করেন এবং তাকে বড় করেন। এক্ষেত্রে বাইবেলের সঙ্গে কোরআনের কোন অমিল নেই।

পবিত্র গ্রন্থ কোরানের আর একটি তথ্য অনুসারে, মুসা যখন একটি শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি একজন মিশরীয়কে একজন ইসরায়েলির সাথে যুদ্ধরত দেখতে পান। ইস্রায়েলীয় ব্যক্তিটি ছিলেন সামারিটান (একটি জাতিধর্মী গোষ্ঠী যারা প্রাচীন ইস্রায়েলীয়দের থেকে উদ্‌ভূত।) ঐ ইসরায়েলি ব্যক্তিটি মিশরীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার সাথে দুর্ব্যবহারকারী মুসাকে সাহায্যের জন্য বলে। মুসা হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেন এবং বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। মুসা তারপর ঈশ্বরের কাছে অনুতপ্ত হন এবং পরের দিন, তিনি আবার একই ইস্রায়েলীয়কে দেখতে পান যে অন্য মিশরীয়দের সাথে লড়াই করছে। ইস্রায়েলীয় আবার মুসাকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করে, এবং মুসা ইস্রায়েলের কাছে আসার সাথে সাথে সে মুসাকে তার হত্যার কথা মনে করিয়ে দেয় এবং জিজ্ঞেস করে যে মুসা মিশরীয়কে হত্যা করতে চেয়েছিল কিনা। এই খবর পেয়ে ফেরাউন মুসাকে হত্যার নির্দেশ দেয়। যাইহোক, মুসা তার শাস্তি সম্পর্কে আগেই সতর্ক হয়ে যায় এবং তার পর মরুভূমিতে পালিয়ে যায়। ইসলামিক সাহিত্য অনুসারে, মুসা মাদিয়ানে আসার পর, তিনি দুটি মহিলা রাখালকে একটি কূপ থেকে তাদের পাল ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দেখেন। মুসা তাদের কাছে যান এবং রাখাল হিসাবে তাদের কাজ করে দেন এবং কূপ থেকে

তাদের পালকে জল পান করান এবং তাদের পশ্চাদপসরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তাদের উত্তর তিনি তাদের পিতা শুয়াইবের বার্ধক্য সম্পর্কে জানতে পারেন। দুই রাখাল তাদের বাড়িতে ফিরে আসে এবং তাদের পিতাকে মুসা সম্পর্কে জানায়। এরপর তারা মুসাকে একটি ভোজে আমন্ত্রণ জানায়। সেই ভোজে, তাদের পিতা মুসাকে তার একটি মেয়ের সাথে বিয়ের বিনিময়ে আট বছর কাজ করতে বলেন। মুসা তাদের পিতার ঐ সকল শর্তে সম্মতি দেয় এবং তার জন্য দশ বছর কাজ করেছিলেন। পবিত্র গ্রন্থ কোরানের তথ্য অনুসারে, চুক্তিবদ্ধ সময়কাল শেষ করার পর মুসা তাঁর পরিবারসহ মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাদের ভ্রমণের সময়, যখন তারা একটি পাহাড়ি অঞ্চলে থামেন তখন মুসা একটি বড় আগুন দেখেন এবং তাঁর পরিবারকে তাদের জন্য আগুন নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করতে নির্দেশ দেন। মুসা যখন তুওয়া উপত্যকায় পৌঁছেন, তখন ঈশ্বর তাকে উপত্যকার ডান দিকের একটি গাছ থেকে ডাকেন, যাকে কোরানে আল-বুকাআহ আল-মুবারাকাহ ("দ্যা ব্লেসড গ্রাউন্ড") বলা হয়। সেখানে ঈশ্বরের মুসাকে তার জুতা খুলে ফেলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাকে নবী হিসাবে নির্বাচন করেন। ঈশ্বর তাঁকে তাঁর প্রার্থনা করার বাধ্যবাধকতা এবং বিচারের দিন সম্পর্কে অবহিত করান।

এরপর ঈশ্বর মুসাকে তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করার আদেশ দেন, যা একটি সাপে পরিণত হয় এবং পরে তাকে ধরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। কোরানের বর্ণনা অনুজায়ী মুসাকে তার কাপড়ের মধ্যে তার হাত ঢোকাতে আদেশ করা হল এবং যখন তিনি এটি প্রকাশ করেছিলেন, তখন এটি একটি উজ্জ্বল আলোতে পরিণত হয়। ঈশ্বর বলেছেন যে এগুলি ফেরাউনের জন্য নিদর্শনা, এবং ফেরাউনকে এক ঈশ্বরের উপাসনার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর আদেশ দেন মুসাকে। মুসা ফেরাউনের প্রতি তার ভয় প্রকাশ করে এবং ঈশ্বরকে অনুরোধ করে তার কথাবার্তার প্রতিবন্ধকতা নিরাময় করতে এবং হারুনকে একজন সাহায্যকারী হিসেবে দান করার জন্য। ইসলামিক ঐতিহ্য অনুসারে, তারা উভয়েই ফেরাউনের প্রতি

তাদের ভয়ের কথা জানায়, কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারা আশ্বস্ত হয় যে তিনি তাদের পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ইস্রায়েলীয়দের মুক্ত করার জন্য ফেরাউনকে জানানোর জন্য তাদের আদেশ দেন। অতএব, তারা ফেরাউনের কাছে প্রচার করতে রওয়ানা হয়। Ref. Moses in Islam; From Wikipedia, the free encyclopediahttps://www.allahnamesorinfo.com/2021/04/musa-nobir-jiboni-musa-nabi-history.html হযরত মূসা ও ফেরাউনের এর কাহিনী। এক্ষেত্রেও বাইবেলের সঙ্গে কোরআনের কোন অমিল নেই। কুরআন শরীফেও হযরত মুসা (আঃ) এর জীবন কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি, বনী ইসরাঈলের মুক্তি এবং তুর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথোপকথন সহ তার জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্থান পেয়েছে। উৎসাহী পাঠকগণ কুরআন শরীফে হযরত মুসা (আঃ) এর জীবন কাহিনী বিস্তারিতভাবে জেনে নিতে পারেন।

মহাজ্ঞানী সক্রেটিস

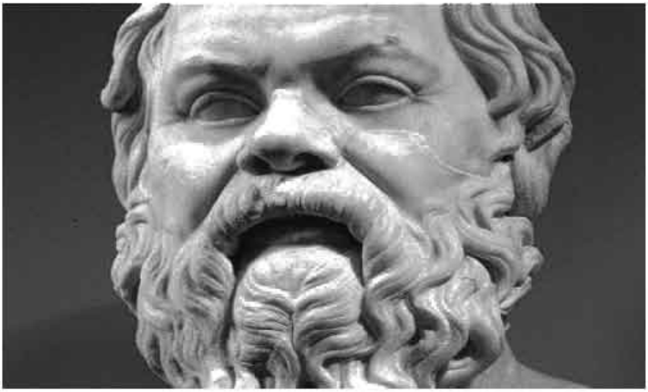

(ছবি; Britannica Encyclopedia)

সুচনা;

মহাজ্ঞানী সক্রেটিস হলেন পৃথিবীর দার্শনিকদের দার্শনিক (philosopher of philosophers)। সভ্যতার প্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ এই জ্ঞানী সন্তানের জন্যই গ্রীস সভ্যতা পৃথিবীতে বিখ্যাত। আবার অন্যায় ভাবে বিচারে সক্রেটিসকে প্রানদণ্ড দেওয়ার জন্য দুরপনেয় অপরাধে গ্রীস সভ্যতা কলঙ্কিত। গ্রীস দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান তাঁর অসামান্য চিন্তাধারা, জীবন-দর্শন ও বানী সক্রেটিসকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে বিখ্যাত করেছে। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি তাঁর দেশ এথেন্সকে যতটা প্রভাবিত করেছিলেন, তাঁর প্রাণদণ্ড তাঁর দেশ ও গ্রীক সভ্যতাকে আরো অনেক বেশি নাড়িয়ে দিয়েছিল। সরকারের প্রতিটি কাজকর্মের দার্শনিক অনুসন্ধান ও স্পষ্টবাদী সমালোচনার জন্য তিনি তৎকালীন শাসকদের কোপানলে পড়েন এবং সেই কারণে খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯সালে ৫০১ জনের জুরিবোর্ডের সামনে সক্রেটিসের বিচার হয় যারা অন্যায় ভাবে তাঁকে হেমলক বিষ পানে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পিছনে যে সকল অভিযোগগুলি বিচারে তুলে ধরা হয়েছিল সেগুলি হল: ১) তিনি এথেন্সের যুবকদের

মধ্যে ঔধত্য, দুর্নীতি ও চরিত্রহীনতা প্রবেশ করিয়েছেন।২) উপাসনার পদ্ধতির সমালোচনা করে তিনি দেশের স্বীকৃত দেবতা প্রচলিত ধর্মকে অসম্মান করেছেন। ৩) অনেক ব্যক্তিদেরকে নিয়মিত অজ্ঞ ও বোকা বলে ব্যাখ্যায়িত করে বিব্রত করতেন। ৪)তিনি শাসকগোষ্ঠীর কাজকর্মের স্পষ্ট ভাষায় সমালোচনা করতেন। যাইহোক সক্রেটিসের মৃত্যুর পর তাঁর আদর্শ ও দর্শন শুধু গ্রীস দেশে নয় সমগ্র পৃথিবীতে গ্রহণ যোগ্যতা অনেক গুণ বেড়ে যায়। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড এবং বীরের মত মৃত্যুর কাহিনী শুনলে, অতি নিষ্ঠুর লোকের চোখেও জল আসবে। তাঁর মৃত্যুর ২৫০০ বৎসর পরেও মৃত্যু দণ্ড পৃথিবীবাসীর মনে এক অমর কাহিনীরূপে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সেই অমর কাহিনী এই প্রবন্ধের প্রধান বিষয়বস্তু। এই বিষয়বস্তুতে যাওয়ার আগে, তাঁর সম্পর্কে আরও কিছুকথা আলোচনা করা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, আমরা সক্রেটিসের জীবনী সম্পর্কে জানতে পারি তাঁর অতি প্রিয় ছাত্র প্লেটোর বিভিন্ন লেখা থেকে। প্লেটো ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক। তিনি মহাজ্ঞানী ও দার্শনিক সক্রেটিসের ছাত্র ছিলেন এবং দার্শনিক এরিস্টটল হলেন প্লেটোর প্রিয় ছাত্র। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, গ্রিক দার্শনিক প্লেটো রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'রিপাবলিক" থেকে সক্রেটিস সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের মাধ্যমেই প্লেটো তাঁর গুরু সক্রেটিসের দর্শনকে তুলে ধরেছেন । প্লেটো তার এই গ্রন্থে সাম্যবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এথেন্সে সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড তাঁর ছাত্র প্লেটোর উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি তাঁর শিক্ষকের দ্বারা এতটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে তাঁর রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে তিনি দর্শনশাস্ত্রে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। তাঁর গুরু সক্রেটিসের দর্শন নিয়ে " খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০ সালের দিকে তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ্ রিপাবলিক লিখেছিলেন। “রিপাবলিক" (প্রজাতন্ত্র) হল সক্রেটিক সংলাপ গ্রন্থ। এখানে প্লেটো

সক্রেটিসের দর্শনের বিভিন্ন বিষয় যথা ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা, ন্যায়পরায়ণ নগর-রাষ্ট্র এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির শৃঙ্খলা ও চরিত্র নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। "রিপাবলিক" একটি বিশ্ব-বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ। প্রাচীন গ্রিসের সবচেয়ে প্রভাবশালী তিনজন দার্শনিকের মধ্যে প্লেটো দ্বিতীয়। প্রথম হলেন সক্রেটিস এবং তৃতীয় প্রভাবশালী দার্শনিক হলেন এরিস্টটল। এরাই পশ্চিমা দর্শনের ভিত রচনা করেছেন বলা যায়। "রিপাবলিক" এর মধ্যে পাওয়া যায় সক্রেটিসের বিশ্ব-বিখ্যাত অমৃত বানী এবং দর্শন। "রিপাবলিক" নিয়ে পরিশেষে আরো কিছু কথা বলার চেষ্টা হয়েছে।

সক্রেটিসের জন্ম, শৈশব ও কৈশোর

তাঁর শিষ্য প্লেটোর লেখা থেকে জানা যায়, গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস আনুমানিক ৪৭০/ 469খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিস দেশের এথেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সোফ্রোনিস্কাস এবং মাতা ফেনারেতে বা ফেনারেট। তিনি গ্রীস দেশের অন্যতম প্রতিপক্ষ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখ্য, গ্রীক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, একটি "প্রতিপক্ষ গোষ্ঠী" সাধারণত একটি রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীকে বোঝায় যারা সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান সরকার বা প্রভাবশালী মতাদর্শের বিরোধিতা করে; তারা মূলত মূল ক্ষমতা কাঠামোর "প্রতিপক্ষ" দল। সহজভাবে "প্রতিপক্ষ গোষ্ঠী হল বিদ্যমান সরকারের বিপ্লবী গোষ্ঠী, বা রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী প্রতিদ্বন্দ্বী দল। সক্রেটিসের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব কম ছিল। উল্লেখ্য সে যুগে এথেন্সে শুধু পুরুষদের জন্য শিক্ষার প্রচলন ছিল। ৫০০খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকেই গ্রীসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি তাঁর পিতার মতো পাথরের রাজমিস্ত্রি হিসাবে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন এবং কথাবার্তা ও সামরিক পরিষেবার মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা লাভ করেন। একজন যুবক হিসেবে সক্রেটিসের সামাজিক পদমর্যাদা প্রায় কিছুই ছিল না। এক কথায় ছোট বেলায় স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষার তাঁর সামর্থ্য ছিল না। ঐ সময় হাঠে বাজারে তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত।

শৈশবে তাঁর শিক্ষার কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা-পদ্ধতি ছিল কিনা সে বিষয়ে কোন গ্রন্থে বিশেষ কোন উল্লেখ নেই। তবে তিনি যে অলঙ্কার শাস্ত্র, কাব্য-সাহিত্য নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদের কাছে পড়াশুনা করেছিলেন-সে বিষয়ে বিভিন্ন লেখা ও বইতে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তিনি সংগীত-শিক্ষাও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উপর লেখা বিভিন্ন রচনায় এও তথ্য পাওয়া যায় যে সে যুগের বৈজ্ঞানিক অ্যানাক্সাগোরাস, ডেমোন এবং আর্কিওলাসের বিজ্ঞান চেতনা সক্রেটিসকে ভীষণ অনুপ্রাণিত করেছিল। এছাড়া বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায়, তাঁর জননী ছিলেন ধাত্রী। তিনি মাতৃদেবীর কাছেও যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করেন। বিভিন্ন লেখা থেকে আরও জানা যায় যে গণিতশাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, তর্কবিদ্যা, প্রাচীন ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব বিবিধ বিষয়ে সক্রেটিসের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল; এমন কি তাঁর শিষ্য প্লেটো এবং প্লেটোর শিষ্য, অ্যারিশ্টটল ঐ সকল বিদ্যায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। এর কারণ হল পঞ্চ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে এথেন্সে গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, তর্কবিদ্যা, প্রাচীন ইতিহাস, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে চর্চার বিশেষ প্রচার ছিল।

কৈশোর

তিনি কৈশোর থেকেই তর্কবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং পরবর্তী সময় এথেন্সে তার্কিক এবং দার্শনিক শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন। এর কারন হিসেবে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, তাঁর কৈশোর এবং যৌবনে বিভিন্ন তর্কশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আগেই বলেছি, তাঁর পিতা পেশায় ভাস্কর ছিলেন। অর্থ উপার্জনের আশায় কৈশোরে তিনি কিছুদিন পিতৃদেবের বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু এই পেশা তাঁকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারে নি। তিনি যখন আঠারো বৎসরে পা দেন, তখন তাঁর পিতৃদেব তাঁকে নাগরিক সংগঠনে যুক্ত করেন। এর ফলে তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকান্ডের যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

সক্রেটিসের কৈশোরকালে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে। পিতার মৃত্যুর কিছু পরে তাঁর মাতৃদেবী দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এরপর তাঁর মায়ের দ্বিতীয় সন্তান হয়। ঐ সময় এথেন্সে নানা ধরণের উৎসব অনুষ্ঠান

এবং প্রতিযোগিতা প্রায় লেগে থাকত। এথেন্সে প্রতি চার বৎসর অন্তর অলিম্পিক হত। ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন অঞ্চল বা রাষ্ট্র থেকে বহু মানুষ এথেন্সে পরিভ্রমণে আসত। ঐ সময় দেশ-বিদেশ থেকে আগত বহু দার্শনিকদের সমাগম হত এবং তাঁদের অনেক আলাপ-আলোচনা হত। সেই সকল আলাপ-আলোচনায় উনিশ বৎসর বয়সী সক্রেটিসের অংশগ্রহণের সুযোগ মিলত এবং সেখানে তিনি তাঁর মত বিনিময়ের সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেন। ফলে কৈশোর থেকে আস্তে আস্তে দার্শনিক শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন। জানা যায় ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে জুলাই মাসে ব্যানাতেনিয়া উৎসবে এক বৃহত্তর দার্শনিকদের সমাবেশ ঘটে। সেখানেই সক্রেটিস তাঁর দর্শনের উপর আলোচনা ও মতবিনিময়ের সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন।

বিবাহিত জীবন

সক্রেটিস মাত্র ৭০ বছর বেঁচে ছিলেন। এরমধ্যে তাঁর বিবাহিত জীবন ছিল মাত্র কুড়ি বৎসরের। ৫০ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম বিয়ে করেন। আরেকটি বিয়ে হয়েছিল এথেনীয় রাষ্ট্রনায়ক অ্যারিস্টিডেসের কন্যার সাথে। তাঁর তিনটি পুত্রসন্তান ছিল। তাঁর বিবাহিত জীবন খুব একটা সুখকর ছিল না। তৎকালীন প্রথা অনুসারে বিয়েতে তিনি প্রভূত যৌতুক গ্রহণ করেছিলেন। আগেই বলেছি অল্প কালের জন্য তিনি ভাস্কর্য শিল্পের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন এবং তারপর তিনি সর্বক্ষণ দর্শন শাস্ত্র নিয়ে আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। কিছু কিছু লেখা থেকে জানা যায়, অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি একটা তর্কবিদ্যা স্কুল চালাতেন। প্লেটোর লেখা থেকে জানা যায় তাঁর কোন স্পেশাল বৃত্তি ছিল না যেখান থেকে তিনি অর্থ উপার্জন করতেন। তাঁর কোন উপার্জন ছিল না। তিনি বিয়েতে যে যৌতুক পেয়েছিলেন, সেই অর্থ দিয়ে সংসার পরিচালনা করতেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর স্ত্রী ধাত্রীর কার্য নিয়ে সংসার বহন করতেন। সক্রেটিস দর্শনের গভীর চিন্তায় ও আলোচনায় সর্বদা মগ্ন থাকতেন। একবার তাঁর স্ত্রী সংসার সম্পর্কে কিছু সমস্যার কথা তাঁকে বলেছিলেন; কিন্তু সক্রেটিসের সেদিকে

কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁর ঐ আচরণে বিরক্ত হয়ে তাঁর স্ত্রী তাঁর মাথায় এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছিলেন। উপস্থিত বন্ধুরা ঐ দেখে ভীষণ হাসাহাসি করতে লাগলো। তখন সক্রেটিস হেসে বলে উঠলেন- "বজ্র গর্জনের পরেই বর্ষণ হয়,"। সক্রেটিসের উপর তাঁর স্ত্রীর প্রবল ক্ষোভ ছিল-তিনি সারা দেশের লোকের সঙ্গে কথা বলেন কিন্তু বাড়িতে এলেই তিনি মৌনবাবা হয়ে যেতেন। তিনি কিছুই কথা বলতেন না বাড়িতে। তাঁর স্ত্রীর কাছে এটা খুব অসহ্য লাগতো। এমন কি তার মৃত্যুর দিনে তার স্ত্রী তার সন্তানকে নিয়ে কারাগারে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি দর্শন চর্চায় এত ব্যাস্ত ছিলেন যে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে বেশি কথা বলেননি। স্ত্রীকে সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে দেন নি। তিনি সন্তানসহ স্ত্রীকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আগেই বলেছি তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছিল অ্যারিস্টিডেসের কন্যা 'মার্তো' এর সাথে। তাঁর দুই পুত্র সাফ্রোনিসকাস এবং মেনেক্সেনাস হল তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মার্তোর গর্ভজাত সন্তান। প্ল্যাটোর ছাত্র অ্যারিস্টটলের লেখা থেকে জানা যায় যে দুটি স্ত্রী একই সঙ্গে সংসারে আসীন ছিলেন এই দ্বিতীয় স্ত্রীর পরিগ্রহণের পরিবহনে কারণ হিসাবে বলা হয়েছে সেই সময় এথেন্সে অতিরিক্ত সন্তান জন্মানোর জন্য একটি অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছিল। এর কারণ ছিল অতিরিক্ত লোকবল যাতে যুদ্ধে দেশ মোকাবিলা করতে পারে। প্রথম স্ত্রী জানথিপির কাছে তিনি ছিলেন অবজ্ঞার পাত্র। জানথিপি প্রায়ই বলতেন, তার নিষ্কর্মা স্বামী পরিবারের জন্য সৌভাগ্য না-এনে দুঃখ কষ্টই এনেছেন বেশি। তবে বাইরে বাইরে যতই তিক্ততা থাকুক জানথিপির অন্তরের অন্তস্থলে স্বামীর জন্য ছিল প্রচণ্ড ভালোবাসা ওঃ আবেগ।

সক্রেটিসের অস্বাভাবিক দেহ ও আচার-আচরণ

সক্রেটিস দেখতে ভীষণ কুৎসিত ছিলেন, তাঁর নাক ছিল চ্যাপ্টা বা থ্যাবড়ানো, উপর থেকে নীচে তাঁর নাসিকা-ছিদ্র প্রসারিত, চোখদুটি স্ফীত; চওড়া মুখমণ্ডল; ঠোঁট ভীষণ মাংসল ও মোটা; বড় পেট, তাঁর চুল ছিল লম্বা ও অবিন্যস্ত; খালি পা; পোশাক অপরিচ্ছন্ন। তার বন্ধুরা তাঁর চেহারা নিয়ে মজা করত।

তাঁর কথাবার্তা ও আচার-আচরণ ছিল অতি মধুর। যে-ই তাঁর সঙ্গে কথা বলত সে-ই তার কথাবার্তা ও চরিত্রসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যেতো। অধিকাংশের বর্ণনা মতে তিনি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রদান করতেন না। রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজারই ছিল তার শিক্ষায়তন। দর্শন অনুশীলন করতে গিয়ে সংসার ও জীবিকা সম্পর্কে খুবই উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এ কারণে শেষ জীবনে তাঁর পুরো পরিবারকেই দারিদ্র্য ও অনাহারের মধ্যে জীবন যাপন করতে হয়। বেশির ভাগ সময়েই তিনি তাঁর শিষ্যদের বাড়িতে পানাহার করতেন। তাঁর বন্ধুরা তাঁর চেহারা নিয়ে মজা করতেন।সক্রেটিস তাঁর নিজের চেহারা এবং ব্যক্তিগত আরাম ও ভোগ বিলাসের আনন্দের প্রতি উদাসীন থাকতেন। তিনি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অবহেলা করতেন, খুব কমই স্নান করতেন, খালি পায়ে হাঁটতেন, এবং শুধুমাত্র একটি ন্যাকড়াযুক্ত কোটের মালিক ছিলেন। তিনি তাঁর খাওয়া-দাওয়া, মদ্যপান, এবং যৌনতা সংযত করতেন। তিনি দেশের যুবকদের প্রতি তার আবেগকে প্রতিরোধ করতে পারতেন না। এর কারণ হিসেবে প্লেটো বর্ণনা করেছেন, তিনি তাদের আত্মাকে উন্নত করতে বেশী আগ্রহী ছিলেন। সক্রেটিস তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে যৌনতা কামনা পছন্দ করতেন না – যা প্রায়শই এথেন্সের বয়স্ক এবং কম বয়সী পুরুষদের মধ্যে ছিল।

সেনাবাহিনীতে সক্রেটিস

সক্রেটিসকে দুই বছরের জন্য এথেন্সের আইন অনুসারে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। ১৮ বছর বয়সে দুই বৎসরের সামরিক শিক্ষা গ্রহণের পর যখন তিনি দেশের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বছর। তিনি দেশের জন্য তিনবার যুদ্ধে গিয়েছিলেন প্রতিবারই তিনি রণক্ষেত্রে যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি পতিদিয়া, অ্যামফিপোলিশ এবং ডেলিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি গিয়েছিলেন পদাতিক সৈন্যরূপে। পতিদিয়ার যুদ্ধে কি ভাবে তিনি অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তার বর্ণনা সুন্দরভাবে করেছিলেন ঐ যুদ্ধের সেনাপতি। ডেলিয়ামের যুদ্ধে তিনি অপরের জীবন রক্ষার জন্য

অসামান্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ডেলিয়াম যুদ্ধে তার বীরত্বের কাহিনী ওই যুদ্ধের সেনাপতি লাচে সুন্দরভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। ডেলিয়াম যুদ্ধে এথেন্স পরাজিত হলেও সক্রেটিস অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। (উৎস – 'সক্রেটিস' – বিপুল রঞ্জন সরকার) একটি সূত্রে জানা যায়- পোটিডিয়ায় পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধের সময় (৪৩২-৪২৯) সেনাবাহিনীতে তিনি আলসিবিয়াদেসের জীবন রক্ষা করেছিলেন। ডেলিয়াম (৪২৪) এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তিনি শান্ত ছিলেন যখন তার চারপাশের বেশিরভাগ মানুষ আতঙ্কিত ছিলেন।

এথেন্সের নাগরিকের ভূমিকায় সক্রেটিস

সক্রেটিসকে প্রধানত একজন দার্শনিক এবং প্লেটোর শিক্ষক হিসেবে স্মরণ করা হয়, তবে তিনি এথেন্সের নাগরিকও ছিলেন। প্রাচীন এথেন্সের নাগরিকত্ব কেবল রাষ্ট্রের প্রতি একটি আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল না, বরং জাতিগত-জাতীয়তার একটি বৈশিষ্ট ছিল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তৎকালীন গ্রীস দেশে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এথেন্স ছিল গ্রীস দেশের কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে একটি নগর রাষ্ট্র; কিন্তু চিন্তা, ভাবনা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এথেন্স ছিল একটি উন্নত রাষ্ট্র। এখানে নাগরিকগণ একটি নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হয়ে সরাসরি রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করত। তারা 'এথেনিয়ান" উপাধি লাভ করত। "এথেনিয়ান" উপাধিটি স্বাধীন বাসিন্দাদের নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে তাদেরকে শহরের অন্যান্য বাসিন্দাদের তুলনায় বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং সুরক্ষা প্রদান করা হত। এথেনিয়ানরা, যারা স্বাধীন বলে বিবেচিত হত এবং অ-নাগরিক বা অ-এথেনিয়ানরা যারা, তাদেরকে আইনত দাসত্বের শিকার হতে হত। সক্রেটিস "এথেনিয়ান" উপাধি লাভ করার ফলে, তিনি অন্যান্য এথেনিয়ান নাগরিকদের সাথে রাস্ট্রের রীতি, নীতি, ও কর্মসূচি চূড়ান্ত করতেন। এখানে লটারির মাধ্যমে, রাস্ট্র পরিচালনার কাজে অংশীদার বাছাই করা হত। যারা দরিদ্র নাগরিক হতেন, তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট ভাতা পেতেন। এথেন্সের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ছিল

গন বিতর্ক। অধিবেশনে যে কোন প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে বিতর্ক হত। তাই বলা হত এথেন্সে গণতন্ত্র ছিল ডেমসের অর্থাৎ জনগণের শাসন। সক্রেটিস নাগরিকদের ৫০০জনের প্রতিনিধি সভার সভ্য ছিলেন। সক্রেটিস যদিও "এথেনিয়ান" বা নাগরিক ছিলেন তিনি চেষ্টা করতেন নিজেকে রাজনৈতিক কাজে কম জড়াতে। তিনি বুঝেছিলেন সত্য ও ন্যায়ের যিনি পূজারী তার পক্ষে রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ খুব বিপজ্জনক। কেউ যদি অন্যায় ও অবৈধ্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত তাহলে তাকে হয়তো কোন এক অজানা অজুহাতে প্রানদণ্ডের শিকার হতে হত।

সক্রেটিসের দর্শন;

সক্রেটিস ছিলেন স্বাধীন চিন্তা ধারার মানুষ। মানুষের স্বাধীনতা হল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় দর্শন। তিনি বহুল প্রচলিত রীতিনীতি, প্রথা এবং গতানুগতিক ধর্মাচরণের পদ্ধতির অনুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমালোচনা করতেন। তাঁর সকল মতবাদের দুটি প্রধান দিক ছিল- ধারণা বা concepts এবং নৈতিকতা বা Morality. কোন একটি ধারণায় উপনীত হওয়ার আগে তিনি অবরোহণ প্রনালি (Deductive Method) or process of deduction অনুসরণ ক্রতেন। তিনি সর্বদা চেষ্টা করতেন মানুষের জীবনের বিড়ম্বনা বা Irony এবং সুপ্ত ধ্যান-ধারনাকে (maieutics) সুস্পষ্ট চেতনার স্তরে পৌঁছে দিতে। তিনি জনসভায় ভাষণের মাধ্যমে তাঁর মতবাদ প্রকাশ করতেন না। সব ধরনের মানুষের সঙ্গে খোলামেলা আলাপালোচনার এবং প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে তাঁর দর্শন বা ধারণা সহজভাবে তুলে ধরতেন। এমন কি সামান্য এক মৎস্য বিক্রেতার সঙ্গে দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। জানা গিয়েছে, তিনি সামান্য এক মাছ-বিক্রেতাকে তাঁর দর্শন বোঝানোর জন্য তিনি খুব সহজ সরল প্রশ্ন দিয়ে শুরু করে কঠিন তত্ত্বে পৌছাতেন। যেমন-

১) মাছ কি? –এই দিয়ে শুরু করতেন। জেলে যদি বলত -পা ছাড়া এক প্রাণী যা নদী বা সমুদ্রে সাঁতার দেয়

২) সক্রেটিসের দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়ত হত; সমুদ্রে তো পা বিহীন অক্টোপাস এবং তিমি ও সাঁতার দেয়; ওরাও কি মাছ? মাছ-বিক্রেতা ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত না। ফলে উত্তর জানার জন্য লোক-সমাগম ঘটত। তাঁকে সাধারণত হাটে বাজারে বেশি দেখাযেত যেখানে বেশি লোকের ভিড় হত। সেখানে তিনি প্রবীণ ও যুবকদের সঙ্গে প্রথমে সহজ সহজ প্রশ্ন দিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করতেন; পরে ধীরে ধীরে তিনি কঠিন বিষয়ে তর্কে প্রবেশ করতেন।

বিভিন্ন সুত্র থেকে জানা যায় যে ঐ ধরণের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাঁর মতবাদ প্রকাশ করার অভ্যাস তিনি অল্প-বয়স থেকেই আয়ত্ব করেছিলেন। এবং তিনি এইভাবে জনসাধারণকে প্রকৃত জ্ঞান বিতরন করতেন। তিনি সকলকে সরলভাবে সাদাসিদে প্রশ্ন করে এবং সহজ ভাবে সঠিক উত্তর প্রদান করে গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি নিজেকে কখনো মহাজ্ঞানী বলে জাহির করতেন না; বরং তিনি এমনভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে কোন ধারণা বা প্রশ্ন তুলে ধরতেন যে মনে হবে, তিনি ঐ ব্যক্তির কাছে কিছু জ্ঞান লাভ করতে চান। যেমন তাঁর সাদাসিধে কিছু প্রশ্ন হল –জ্ঞান কি? দয়া কি? সৌন্দর্য কি? কোন কাজ করা সঠিক কোন কাজ ভুল? উল্লেখ্য সক্রেটিসের দর্শনের আলোচনার পদ্ধতিকে বলা হয় "সক্রেটিক পদ্ধতি" বা "সক্রেটিক প্রশ্নোত্তর", যা মূলত একটি কথোপকথন বা আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার একটি বিশেষ পদ্ধতি। সক্রেটিক পদ্ধতির কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হলো;

- প্রশ্ন ও উত্তর
- সন্দেহ ও অজ্ঞতা স্বীকার
- আলোচনা ও বিতর্ক
- সদগুণ ও নৈতিকতা
- জ্ঞানের অনুসন্ধান
- সহজবোধ্যতা
- সৃজনশীলতা:
- সতর্কতা:

এই বৈশিষ্ট্য গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করে পাওয়া যায়-

সক্রেটিস অন্যদের কাছ্ থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য ক্রমাগত প্রশ্ন করতেন, যা তাদের নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট ভাবে সাহায্য করত। সক্রেটিস মনে করতেন যে, জ্ঞান অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ হল নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করা। সক্রেটিক পদ্ধতিতে আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে সত্যের সন্ধান করা হতো। সক্রেটিস নীতিশাস্ত্র ও সদগুণ সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্ন বিভিন্নভাবে তুলে ধরতেন এবং মানুষের জীবনযাপনের সঠিক পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন। আলোচনা ও বিতর্ক পদ্ধতিতে সক্রেটিসের লক্ষ্য ছিল মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও সত্যের প্রতি আগ্রহ তৈরি করা এবং তাদের চিন্তাভাবনাকে উন্নত করা। তিনি জটিল বিষয়গুলোকে সহজ করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতেন, যাতে সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে জীবনের সত্য ও সদগুণ কি? সক্রেটিক পদ্ধতি মানুষকে জীবন সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করতে এবং নিজেদের জ্ঞান যাচাই করতে উৎসাহিত করত। –তিনি সবসময় অন্যদের মতামতকে সম্মান করা সম্পর্কে সতর্ক থেকে তাদের ভুল ধারণাগুলি দূর করার চেষ্টা করতেন।

প্লেটোর লেখা ইউথিফ্রো সক্রেটিক সংলাপ

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, প্লেটো তাঁর একটি লেখা থেকে "ইউথিফ্রো" নামক একটি সক্রেটিক সংলাপের কথা জানা যায়, সেই সংলাপে সক্রেটিস এবং ইউথিফ্রো নামের এক ধার্মিক ব্যক্তি ধার্মিকতা বা ধর্মীয়তা কী, তা নিয়ে আলোচনা করেন। ইউথিফ্রো তার পিতার বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য সমাজে পরিচিত।

ইউথিফ্রো তার বাবাকে হত্যার জন্য বিচার করার জন্য আদালতে যাচ্ছে, এবং সক্রেটিস তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে কেন তিনি এমনটা করছেন? ইউথিফ্রো প্রথমে ধর্ম কি তা বোঝানোর জন্য সক্রেটিসের সামনে বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরেন। কিন্তু সক্রেটিস তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে ধর্ম কি তা সাধারণভাবে কিভাবে

সংজ্ঞায়িত করা যায়। ইউথিফ্রো বলেন যে দেবতাদের যা ভালো লাগে, বা দেবতাদের যা পছন্দ, তাই করা হল ধার্মিকতা। এরপর সক্রেটিসের প্রশ্ন হল; "দেবতারা কি ভালো কাজ ভালোবাসেন কারণ এটি ভালো, নাকি ভালো কাজ ভালো কারণ এটি দেবতারা ভালোবাসেন?" তারপর সক্রেটিস প্রশ্ন করেন; ইউথিফ্রো কি ধার্মিক কাজ করছেন, নাকি তিনি তার পিতার সাথে যা করছেন তা আসলে অন্যায়?

ইউথিফ্রো সক্রেটিক সংলাপ পটভূমি

সক্রেটিসে*র সাথে ইউথিফ্রোর* সংলাপটি *ব্যাসিলিয়াসের* দরবারের কাছে ঘটেছিল, যেখানে সক্রেটিস এবং ইউথিফ্রো একে অপরের মুখোমুখি হন;সম্ভাব্য বিচারের প্রাথমিক শুনানির জন্য ঐ দুই ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত হয়েছিল। ইউথিফ্রো তার নিজের বাবার বিরুদ্ধে শ্রমিক হত্যার অভিযোগ নিয়ে বিচারের জন্য আদালতে হাজির হয়েছে। তার বাবা পারিবারিক সম্পত্তির একজন দাসকে হত্যা করার জন্য তার একজন কর্মী কে গ্রেপ্তার করার পর , তাকে বেঁধে একটি খাদে ফেলে দেন যেখানে সে মারা যায়। এথেনিয়ান আইন অনুসারে শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের হত্যার মামলা দায়ের করার অনুমতি দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ইউথিফ্রোর নিজের বাবার বিরুদ্ধে নরহত্যার গুরুতর অভিযোগে মামলা করতে সক্ষম হওয়ার আত্মবিশ্বাস দেখে সক্রেটিস অবাক হন। ইউথিফ্রো সক্রেটিসের বিস্ময়কে উড়িয়ে দেন, যা ধর্মীয় ও নীতিগত বিষয়ে তার নিজের সমালোচনামূলক বিচারের উপর তার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসকে নিশ্চিত করে।

সক্রেটিস বলেছেন যে ইউথিফ্রো স্পষ্টতই ধার্মিক বা পবিত্র এবং অশুভ বা অপবিত্র সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট ধারণা রাখেন। যেহেতু তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার আনুষ্ঠানিক অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন, সক্রেটিস ইউথিফ্রোর কাছ থেকে কিছু শেখার আশা প্রকাশ করেন, বিচারে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আরও ভালভাবে, কারণ তিনি নিজেই ধর্মীয় লঙঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত।

ইউথিফ্রো বলেন যে, মেলেটাস এবং অন্যান্যদের দ্বারা সক্রেটিসের বিরুদ্ধে যে অধর্মের অভিযোগ আনা হয়েছে , তার পেছনে রয়েছে সক্রেটিসের দাবি যে তাকে একটি ঐশ্বরিক চিহ্ন দ্বারা আবদ্ধ করা হয়েছে, যা তাকে বিভিন্ন কর্মপন্থা সম্পর্কে সতর্ক করে । কিছু এথেনিয়ানদের দৃষ্টিকোণ থেকে, সক্রেটিস গ্রীক দেবতাদের সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন , যা তিনি এবং ইউথিফ্রো তাদের সংলাপের মূল যুক্তি: "ধার্মিকতার সংজ্ঞা" – আদালতে এগিয়ে যাওয়ার আগে তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করেছিলেন। অধিকন্তু, সক্রেটিস গ্রীক দেবতাদের নিষ্ঠুরতা এবং অসঙ্গত আচরণের উপর জোর দেয় এমন ঐশ্বরিক বিবরণ সম্পর্কে আরও সমালোচনামূলক আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন।

সংলাপের উপসংহারে, ইউথিফ্রো স্বীকার করতে বাধ্য হন যে "ধার্মিকতা" সম্পর্কে তার প্রতিটি সংজ্ঞা ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু, তার ত্রুটিপূর্ণ যুক্তি সংশোধন করার পরিবর্তে, তিনি বলেন যে তার চলে যাওয়ার সময় এসেছে, এবং তাদের সংলাপ থেকে নিজেকে অজুহাত দেন। সেই লক্ষ্যে, সক্রেটিস সক্রেটিক বিদ্রূপের সাথে সংলাপটি শেষ করেন: যেহেতু ইউথিফ্রো "ধার্মিকতা" সংজ্ঞায়িত করতে অক্ষম ছিলেন, তাই ইউথিফ্রো সক্রেটিসকে ধার্মিকতা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, ইউথিফ্রোর সাথে তার সংলাপ থেকে, সক্রেটিস আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মভ্রষ্টতার অভিযোগের বিরুদ্ধে তার প্রতিরক্ষার জন্য সহায়ক কিছুই পাননি । (উৎস; উইকিপিডিয়া , মুক্ত বিশ্বকোষ)

সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যুদণ্ড

সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনশ নিরানব্বই খ্রিস্ট পূর্বাব্দে এথেন্সের প্রচলিত দেবতাদের অস্বীকার করা, ধর্মদ্রোহিতা করা এবং তরুণদের মধ্যে কর্তৃত্বের প্রতি অসম্মান তৈরি করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং হেমলক বিষ পানে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। সংগৃহীত তথ্য অনুসারে তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় সত্তর। তৎকালীন গ্রীস দেশের অন্যতম রাজনীতিবিদ আনুতুস তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ

এনেছিলেন যে তিনি এথেন্সের যুবসমাজকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তিনি রাষ্ট্রস্বীকৃত দেবতাদের অস্বীকার করছেন। পাঁচশ একজন বিচারকের সামনে তাঁর বিচার হয়। সেই সময় এথেন্স রাজ্যে উকিলের ব্যবস্থা ছিল না। আসামী এবং ফরিয়াদী উভয়েই বিচারকের সামনে তাঁদের বক্তব্য পেশ করতেন। বিপুল সংখ্যক বিচারকদের মধ্যে সক্রেটিসকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় মাত্র ষাটজন বিচারকের ভোটাধিক্যে। তখনকার নিয়ম অনুসারে দণ্ডিত ব্যক্তি নিজেই কোনো লঘুদণ্ডের প্রস্তাব করতে পারতেন। বিচারকেরা ইচ্ছে করলে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারতেন। সক্রেটিসকেও সেই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি এত সামান্য জরিমানার প্রস্তাব করেন যে বিচারক মণ্ডলী তাতে অপমানিত বোধ করেন। ফলে তাঁকে বিষ পান করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগগুলো আনা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল;

১) এথেন্স রাষ্ট্রের দেবতাদেরকে তিনি যথাযথ স্বীকার না করে, অলৌকিকতাকে ব্যাখ্যা করেছেন নিজস্ব দর্শন অনুসারে। ২) শহরের তরুণ সমাজকে নিজের দর্শন দ্বারা বিপথে চালিত করেছেন। যথেষ্ট গুরুতর অভিযোগ।

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের বিরুদ্ধে এই ধরনের গুরুতর অভিযোগ এবং বিচারে তাঁর মৃত্যু দণ্ডের পিছনে এক বিশাল পটভূমি ছিল। সেই পটভূমি না জানলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের আসল কারণ বোঝা যাবে না। সেই সময়টা ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ থেকে ৩৯৯ এর মাঝামাঝি। নানাবিধ টানাপোড়েনে এথেন্স রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন টালমাটাল অবস্থায়। কিছুদিন আগেই পেলোপনেশিয়ানের যুদ্ধ এথেন্স রাস্ট্র স্পার্টার সাথে যুদ্ধে নিদারুণভাবে হেরে গিয়েছিল। ঐ ভয়াবহ বিপর্যয়ের পরে ক্ষমতাশীল দল রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা আনতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল, কিন্তু জনমত তখনকার এথেন্সের রাজনীতি তথা গণতন্ত্রের ওপর ক্রমেই আস্থা হারাচ্ছিল। সক্রেটিস নিজেও সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন। তিনি শাসকদের সমালোচনা করতে গিয়ে চিরশত্রু

স্পার্টাদেরও রাষ্ট্রনীতির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। একই সাথে তীব্র সমালোচনার মাধ্যমে তিনি এথেন্সবাসীদের দেখিয়ে দিচ্ছিলেন যে গণতন্ত্রের নামে এথেন্সের শাসকগোষ্ঠী ক্রমেই দমনমূলক হয়ে উঠেছিল এবং দেশের সমস্যা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

এই সকল কারণে স্বাভাবিকভাবেই সক্রেটিস ক্রমান্বয়ে শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়েছিলেন। তাই তাঁকে ঐ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে শুরু হলো বিচার। যথারীতি জুরিবোর্ডের সামনেও দুর্বিনীত আচরণ করলেন তিনি। সক্রেটিসের অন্যতম শিষ্য জেনোফোনের মতে, তিনি যেন ইচ্ছা করেই জুরি আর বিচারকদের ক্ষেপিয়ে তুলছিলেন, এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করছিলেন,যেন তাকে মৃত্যুদণ্ডই দেয়া হয়। হয়তো, তিনি নষ্টভ্রষ্ট সমাজের প্রতি একেবারেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে সেই শাসন ব্যবস্থাকে ক্রমাগত আঘাত করতে চাচ্ছিলেন। ক্ষমতার মোহে অন্ধ সমাজের নেতারা যখন সমাজকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে এবং যে কোন মূল্যে তারা নিজেদের দোষ ঢাকতে চায়, যখন গণতন্ত্রের নামে শাসনযন্ত্র হয়ে ওঠে পীড়নকারী এবং ধ্বংসকারী- তখন সমাজে 'জোর যার মুল্লুক তার' নিয়ম শুরু হয়। তখন একজন দার্শনিক ও শিক্ষক হতাশার কোন সীমা হারিয়ে ফেলেন। বিশেষজ্ঞদের মতে তাই হয়েছিল সক্রেটিসের ক্ষেত্রে। তাঁর চিন্তা ভাবনা তখন সংশোধনের ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিল। সমাজে আর থাকতে চান নি সক্রেটিস। দার্শনিক হিসেবে বিশাল প্রজ্ঞার অধিকারী ঐ মানুষটির কাছে নিশ্চয়ই সমাজের ধ্বংস ও অবক্ষয় অসীম বেদনার কারণ হয়ে উঠেছিল। নিজের চোখের সামনে সভ্যতার উন্নতির শিখরে থাকা একটা রাষ্ট্রকে এভাবে ধীরে ধীরে ক্ষমতার মোহে অন্ধ এথেন্সের শাসকগোষ্ঠীর হাতে ক্ষয় হতে দেখে তিনি তাদের ভয়ঙ্কর সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন। তখনকার নিয়ম অনুযায়ী খোলা মাঠে তার বিচার বসেছিলো। বিচারক ছিলেন তৎকালীন সমাজের ৫০০ জন জ্ঞানী মানুষ। এদের অনেকেই ছিলেন গ্রীসের রাজার একান্ত অনুগত। সক্রেটিসের মেধা ও

বিশেষত তরুণদের কাছে তার জনপ্রিয়তায় জ্বলন ছিলো তাদের। তাই তাঁকে বিচারে মৃত্যুদন্ডের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের মৃত্যুদন্ড ও তাঁর পতিক্রিয়া ও বানী

সক্রেটিসের মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয়েছিল এক সন্ধ্যায়। তখনকার নিয়ম অনুযায়ী পরিবারের সকলেই আর একান্ত শিষ্যরা তার চারপাশ ঘিরে আছেন, কারাগারের অন্ধকার ঘরে! প্রধান কারারক্ষী এসে শেষ বিদায় নিয়ে গেলেন. তার চোখেও অশ্রু টলমল করছে। হায় কি অদ্ভুত শাস্তি- হেমলক বিষ পানে মৃত্যু। প্রায় সকলের চোখে জল; বুকে নিদারুণ বেদনা ও হতাশা! কিন্তু হায় হায় যাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, তিনি সম্পূর্ণ ধীরস্থির, অবিচল ও শান্ত। তাঁর চোখে বিন্দুমাত্র জল নেই; মনে কোন ক্ষেদ নেই। সেই সময় মহাজ্ঞানী সক্রেটিস বলে উঠলেন "আজীবন আইন মেনেছি। মৃত্যুতে আইন ভাঙব কেন"? কারাগার প্রধান বললেন- *"এথেন্সের হে মহান সন্তান- আপনি আমায় অভিশাপ দেবেন না, আমি দায়িত্ব পালন করছি মাত্র"। এতবছর কারাগারে কাজ করতে গিয়ে আপনার মতো সাহসী, সৎ ও জ্ঞানী মানুষ আমি কখনো দেখিনি। মৃত্যুর ঠিক আগে সক্রেটিস তার পরিবারের নারী ও শিশুদের চলে যেতে বললেন। নিয়ম অনুসারে সুন্দর পোষাক পরিধান করলেন তিনি। শিষ্যরা সবাই তাঁর চারপাশে কাঁদছে কিন্তু সক্রেটিস ধীর স্থির ও অবিচল। মৃত্যুতে তার কিছুই আসে যায় না। তিনি চাইলেই মৃত্যুদন্ডটা এড়িয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি মোটেই চাইলেন না। সক্রেটিসকে খতম করার এমন সুযোগ তারা ছাড়বে কেন ক্ষমতাসীন সরকার? তবুও হয়তো প্রাণে বেঁচে যেতেন সক্রেটিস, কিন্তু কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়েও বিচারকদের নিয়ে উপহাস করতে ভুললেন না। ফলাফল হেমলক লতার বিষপানে মৃত্যু*। সক্রেটিস নিজেই তার আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন। কঠোর যুক্তি দিয়ে বিচারকদের প্রশ্নবাণে জর্জারিত করেছিলেন বিচারকেরা তার একটি প্রশ্নেরও সঠিক কোন উত্তর দিতে পারেনি। মৃত্যুর আগে একমাস কারাগারে বন্দী ছিলেন তিনি। তখন নিয়ম ছিলো এমন। এই একমাসে কারারক্ষীরাও তার জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে গেলো। তারা

তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করতে চাইলো।সক্রেটিস পালিয়ে যেতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন "আজ পালিয়ে গেলে ইতিহাস আমায় কাপুরুষ বলবে। তিনি মনে করতেন "বীরের মতো মৃত্যু অপমানের জীবনের চাইতে শ্রেষ্ঠ"।

ঐদিন সন্ধ্যায় প্রধান কারারক্ষী চলে যাওয়ার পরে জল্লাদ এলো পেয়ালা হাতে; পেয়ালা ভর্তি হেমলকের বিষ। সক্রেটিস জল্লাদকে বললেন ' কি করতে হবে আমায় বলে দাও' জল্লাদ বললো পেয়ালার পুরোটা বিষ পান করতে হবে। একফোঁটাও নষ্ট করা যাবেনা। সক্রেটিস বললেন 'তবে তাই হোক।' তিক্ত বিষের পুরো পেয়ালা তিনি জলের মতো করে পান করে ফেললেন। চারপাশে বসে থাকা শিষ্যরা চিৎকার করে কাঁদছেন, এমন মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না কেউ ! তখন জল্লাদ আরও কঠোর নির্দেশটি দিলো। বললো নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে এখন কিছুক্ষণ পায়চারী করতে হবে। যাতে বিষের প্রভাব পুরোটা শরীরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। হায় হায় করে উঠলেন সবাই।

একটু ম্লান হাসি হেসে সক্রেটিস বললেন, "আজীবন আইন মেনেছি। মৃত্যুতে আইন ভাঙবো কেন? * দূর্বল পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি কিছুক্ষণ হাঁটলেন । যতক্ষণ তার শক্তিতে কুলোয়। এরপর বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। শিষ্যদের বললেন তোমরা উচ্চস্বরে কেঁদোনা। আমায় শান্তিতে মরতে দাও।*

পাষাণ মনে জল্লাদ তখন শ্রদ্ধার ভাব আর লজ্জায় মাথা নামিয়ে নিলো। চাদর দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে নিলেন সক্রেটিস।একবার চাদরটা সরালেন। একজন শিষ্যকে ডেকে বললেন প্রতিবেশীর কাছ থেকে একটা মুরগী ধার করেছিলাম আমি। ওটা ফেরত দিয়ে দিও। বিচারের রায় অনুযায়ী মহাজ্ঞানী সক্রেটিস বিষ পান করে বীরের মত মৃত্যু বরণ করলেন। এই হল তাঁর জীবনের শেষ কথা। খানিক পরেই অনিশ্চিত যাত্রায় চলে গেলেন মহাজ্ঞানী সক্রেটিস। সংগৃহীত তথ্য ঐদিন সক্রেটিসের মৃত্যুর খবর এথেন্সে ছড়িয়ে পড়লে, সাধারণ মানুষেরা বিক্ষোভ মিছিল সহকারে এথেন্সের রাস্তায় নেমে আসে ও সক্রেটিসের বিরুদ্ধে মিথ্যা রায় দেওয়া

বিচারকদের পিটিয়ে হত্যা করে। কিছু বিচারক ও জল্লাদ অনুশোচনায় আত্মহত্যা করেছিল। তার শিষ্যদের মাঝে সেরা ছিলেন প্লেটো। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের এই ঘটনাগুলো

প্লেটো তার রচিত বিখ্যাত রিপাবলিক গ্রন্থে লিখে গুরুকে অমর করে গেছেন।

রিপাবলিক (the Republic)

"রিপাবলিক" প্লেটোর সবচেয়ে বিখ্যাত এবং বহুল পঠিত সংলাপ-গ্রন্থ। অন্যান্য বেশিরভাগ প্লেটোনিক সংলাপের মতোই এর প্রধান চরিত্র সক্রেটিস। এটি সাধারণত গৃহীত হয় যে "রিপাবলিক" প্লেটোর মধ্যযুগের সংলাপগুলির অন্তর্গত একটি বিখ্যাত সংলাপ গ্রন্থ। "রিপাবলিক"-এ আমরা সক্রেটিসকে ন্যায়বিচার এবং ইউডাইমোনিয়া (সুখ) এর সাথে এর সম্পর্ক বা অবস্থান গড়ে তুলতে দেখি। তিনি ন্যায়সঙ্গত জীবন এবং সুখী জীবনের সাথে এর প্রয়োজনীয় সংযোগের পক্ষে একটি দীর্ঘ এবং জটিল, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ যুক্তি প্রদান করে গেছেন। "রিপাবলিক' থেকে প্লেটোর কিছু কথা তুলে ধরা হল।

"The price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men."
— Plato in the Republic.

"The heaviest penalty for declining to rule is to be ruled by someone inferior to yourself."

Plato in the Republic.

"I am the wisest man alive, for I know one thing, and that is that I know nothing."—The Republic।

উপরের আলোচনা হতে আমরা জানলাম, বিচারে প্রহসনের সক্রেটিসের মৃত্যু হয়েছে ঠিকই। কিন্তু মৃত্যু তাকে মারতে পারেনি। শিষ্যদের মাঝে জ্ঞানের আলো দিয়ে বেঁচে রইবেন তিনি

অনন্তকাল।*

অ্যাপোলজি" (Apology);

প্লেটো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "অ্যাপোলজি " (Apology) –এ উল্লেখ করেছেন যে সক্রেটিস ছিলেন এমন একজন মানুষ যিনি তার সাধারন মানুষ তথা দেশবাসীর জন্য সর্বাধিক মূল্যবান হওয়ার জন্য তিনি সারা জীবন অসাধারণ পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং দুঃখ কষ্ট বরণ করেছেন। কিন্তু দেশের মানুষের জন্য তাঁর সেই অসাধারণ দুঃখ, কষ্ট, প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রম, তাঁকে মানুষের কৃতজ্ঞতা এবং সম্মান অর্জনের বিন্দুমাত্র সাহায্য করে নি। বরং তিনি যাদের সেবা বা মঙ্গলের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিবেদিত করেছিলেন, তারাই তাঁর সর্বাধিক নিন্দা করেছে এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের সম্মুখীন করেছে। সক্রেটিস তাই বেদনাদায়কভাবে জেনেছিলেন যে তিনি মানুষের কাছে একজন ঘৃণ্য ব্যক্তিত্ব হয়েছেন এবং তাই তারা তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ এনেছে। সক্রেটিস একজন দরিদ্র মানুষ ছিলেন তাঁর কাছে বিশেষ কিছু অর্থ ছিল না। রাজনৈতিক প্রভাব তাঁর ছিল না এবং তিনি তার স্ত্রী ও পরিবারের প্রতি খুব কম মনোযোগ দিয়েছেন - সবকিছুই জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত করেছেন; কিন্তু তারাই পরে নিন্দা করেছে। এটা কী তাহলে সক্রেটিসের ভুল হয়েছে? এই প্রশ্ন টাই তুলে ধরেছেন সক্রেটিসের শিস্য প্লেটো তাঁর বিখ্যাত 'Apology' গ্রন্থে।

প্লেটোর 'Apology' (ক্ষমাপ্রার্থনা) মূলত ঐতিহ্যবাহী ক্ষমাপ্রার্থনা বা অনুশোচনার প্রকাশের পরিবর্তে, এথেন্সের যুবসমাজকে অধর্ম এবং কলুষিত করার অভিযোগের বিরুদ্ধে সক্রেটিসের প্রতিরক্ষার (defense) উপর আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ এথেন্সের যুবকদের নাস্তিকতা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই বিচারে সক্রেটিসের প্রতিরক্ষার কথা এই বইটিতে প্লেটো বর্ণনা করেছেন। প্লেটো এই ক্ষমা প্রার্থনা লিখেছিলেন বিচারের অন্যায্য প্রকৃতি প্রদর্শন করার জন্য এবং প্রকাশ করার জন্য যে সক্রেটিস, সত্যের প্রতিনিধি ছিলেন যা অন্যায়কারী, বিচারহীন এবং নিন্দাকারী বিচারকরা বিচার করেন নি। বিচারে সক্রেটিসের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ

আনা হয়েছিল সেগুলি হল- ধর্মভ্রষ্টতা অর্থাৎ শহরের দেবতাদের বিশ্বাস না করা এবং নতুন দেবত্ব ধারণা প্রবর্তন করা; ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে যুবসমাজকে কলুষিত করা। "দ্য অ্যাপোলজি" সক্রেটিসের বিচারের সময় জুরির সামনে দেওয়া বক্তৃতাগুলি তুলে ধরেছে এবং সক্রেটিসের দার্শনিক সাধনা এবং জীবনধারাকে সমর্থন করেছেন প্লেটো। প্লেটোর ক্ষমা প্রার্থনার মূল বিষয়বস্তু হল যে এথেন্সে সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তা ছিল অন্যায্য এবং অসত্য এবং অন্যায়কারী বিচারকরা সক্রেটিসকে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন এবং তা কার্যকর করেছিলেন। এখানে প্লেটো আরও তুলে ধরেছেন যে বিচারে সক্রেটিস তাঁর দার্শনিক কার্যকলাপকে সমর্থন করে যুক্তি দেন যে তিনি সদ্গুণ এবং প্রজ্ঞা প্রচারের জন্য বিশিষ্ট এথেনিয়ান সহ অন্যদের জীবন নিয়ে প্রশ্ন করা এবং পরীক্ষা করার একটি ঐশ্বরিক লক্ষ্য পূরণ করেছেন। "দ্য অ্যাপোলজি" সক্রেটিসের সক্রেটিক পদ্ধতির ব্যবহার তুলে ধরে - এক ধরণের অনুসন্ধান যেখানে দ্বন্দ্ব প্রকাশ করতে এবং অনুমানকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রশ্ন করা হয়। বিচারে সক্রেটিসের যুক্তি (defense) ছিল যে তাঁর জ্ঞান নিহিত ছিল নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করার মধ্যেই, যারা মিথ্যাভাবে জ্ঞানের অধিকারী বলে নিজেদেরকে দাবি করে তাদের বিপরীতে। যদিও সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, তবুও "অ্যাপোলজি" তাঁর দার্শনিক নীতির প্রতি অটল প্রতিশ্রুতি এবং সদ্গুণের গুরুত্বের প্রতি তার বিশ্বাসকে চিত্রিত করে।

উনিশ শতকে সক্রেটিসকে ইউরোপীয় চিন্তাধারার বিবর্তনে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে অথবা খ্রিস্টের মতো উচ্চতর অস্তিত্বের দূত হিসেবে বিবেচনা করা হত। জি.ডব্লিউ.এফ. হেগেল সক্রেটিসের মধ্যে প্রাক-প্রতিফলিত নৈতিক অভ্যাস থেকে আত্ম-সচেতনতার দিকে দিশা দেখেছিলেন; কিন্তু সেই আত্ম-সচেতনতার দিশা ও মানদণ্ডের সাথে এখনও সর্বজনীন নাগরিক নিজেকে সামঞ্জস্য করতে শেখেনি। এটা খুবই দুঃখজনক। যাইহোক জানা

যায় ইংল্যান্ডে বহু চিন্তাবিদরা এখন সক্রেটিসকে একজন খ্রিস্টের মতো শহীদ হিসেবে আদর্শ মনে করেন। তাদের মতে সক্রেটিস এক আধুনিক, যুক্তিসঙ্গত, বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিল একই সাথে সক্রেটিস এবং খ্রিস্টের আইনি মৃত্যুদণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন যাতে অপ্রচলিত চিন্তাবিদদের উপর সাধারণ মতামতের দ্বারা নির্যাতন চালানোর ভয়াবহ পরিণতির দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ আকর্ষিত হয় । ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্লেটোর প্রধান অনুবাদক বেঞ্জামিন জোয়েট অক্সফোর্ডে তার ছাত্রদের বলেছিলেন, "যে দুটি জীবনী সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশি আগ্রহী তা হল খ্রিস্ট এবং সক্রেটিসের জীবনী।" এই ধরনের তুলনা বিংশ শতাব্দীতেও অব্যাহত ছিল: জার্মান অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কার্ল জ্যাসপার্স সক্রেটিসকে "প্যারাডাইমমেটিক ব্যক্তি" অর্থাৎ বুদ্ধ, কনফুসিয়াস এবং খ্রিস্টের মডেল বা আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

সক্রেটিসের কয়েকটি অমৃতবাণী

সক্রেটিসের অসংখ্য দার্শনিক উক্তি সমগ্র মানবজাতিকে শত শত বছর ধরে অনুপ্রাণিত করে আসছে। এখানে তারমধ্যে কয়েকটি উল্লিখিত হল;

1. অপরিক্ষীত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা গ্লানিকর। “The unexamined life is not worth living.”
2. পোষাক হলো বাইরের আবরণ, মানুষের আসল সৌন্দর্য হচ্ছে তার জ্ঞান।;; Dress is the outer cover, real beauty of man is his knowledge.
3. আমি জানি যে আমি কিছু জানি না। “All I know is that I do not know anything."
4. আমিই সবচেয়ে জ্ঞানী, কারণ আমি একটা জিনিস জানি, আর তা হলো আমি কিছুই জানি না। I I am the wisest man alive, for I know one thing, and that is that I know nothing.

5. পৃথিবীতে শুধুমাত্র একটি-ই ভাল আছে, জ্ঞান। আর একটি-ই খারাপ আছে, অজ্ঞতা।"There is only one good- knowledge, and one evil- ignorance."
6. বিস্ময় হল জ্ঞানের শুরু। "Wonder is the beginning of wisdom."
7. তুমি কিছুই জান না এটা জানা-ই জ্ঞানের আসল মানে। "The only true wisdom is in knowing you know nothing."
8. যাই হোক বিয়ে কর। তোমার স্ত্রী ভাল হলে তুমি হবে সুখী, আর খারাপ হলে হবে দার্শনিক। "By all means marry; if you get a good wife, you'll become happy; if you get a bad one, you'll become a philosopher."
9. আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত সাধারণের ভালর জন্য। শুধু ঈশ্বরই জানেন কিসে আমাদের ভাল Our prayers should be for the common good. Only God knows what is best for us.
10. সেই সাহসী যে পালিয়ে না গিয়ে তার দায়িত্বে থাকে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। One who does not run away but stays on one's duty and fights against the enemies is the brave.
11. মৃত্যুই হল মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় আশীর্বাদ। "Death may be the greatest of all human blessings."
12. কঠিন যুদ্ধেও সবার প্রতি দয়ালু হও। "Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle."
13. "শক্তিশালী মন ধারণা নিয়ে আলোচনা করে, গড়পড়তা মন ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে, দুর্বল মন মানুষ নিয়ে আলোচনা করে।" Strong minds discuss ideas, average minds discuss events, weak minds discuss people."
14. সম্পদের চেয়ে জ্ঞানকে প্রাধান্য দাও, কারণ একটি ক্ষণস্থায়ী, অন্যটি চিরস্থায়ী। "Prefer knowledge to wealth, for the one is transitory, the other perpetual."

15. বুদ্ধিমান লোকেরা সবকিছু এবং সবার কাছ থেকে শেখে। গড়পড়তা লোকেরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখে। বোকা লোকেরা ইতিমধ্যেই সমস্ত উত্তর পেয়ে যায়। Smart people learn from everything and everyone. Average people learn from their experiences. Stupid people already have all the answers.
16. সকল মানুষের আত্মা অমর কিন্তু সঠিক মানুষের আত্মা অমর এবং ঐশ্বরিক। "All men's souls are immortal but the souls of the right people are immortal and divine."
17. তৃপ্তি ও সন্তোষ হলো প্রকৃত সম্পদ, বিলাসিতা হলো কৃত্রিম দারিদ্র্য। "Contenment is natural wealth, luxury is artificial poverty."
18. বাঁচার জন্য খাওয়া উচিত; খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়। "Thou shouldst eat to live; not live to eat"
19. ঈর্ষা হলো আত্মার ক্ষত। "Envy is the ulcer of the soul."
20. যে পৃথিবীকে নাড়াতে চায়, সে আগে নিজেকে নাড়াক। "Let him who would move the world first move himself."
21. "আমি কাউকে কিছু শেখাতে পারি না। আমি কেবল তাদের ভাবিয়ে তুলতে পারি।" "I cannot teach anybody anything. I can only make them think."
22. "শিক্ষা হলো আগুন জ্বালানো, পাত্র ভর্তি করা নয়। "Education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel."
23. " তুমি যা চাও যদি তা না পাও, তাহলে তুমি কষ্ট পাবে, যদি তুমি যা চাও না তা পাও, তাহলে তুমি কষ্ট পাবে, এমনকি যখন তুমি ঠিক যা চাও তা পেয়েও, তুমি কষ্ট পাবে কারণ তুমি চিরকাল তা ধরে রাখতে পারবে না। তোমার মন তোমার দুর্দশা। এটি পরিবর্তনমুক্ত, যন্ত্রণামুক্ত, জীবন ও মৃত্যুর বাধ্যবাধকতামুক্ত হতে চায়। কিন্তু পরিবর্তনই নিয়ম এবং কোন ভানই সেই বাস্তবতাকে পরিবর্তন করতে পারবে না।" "If you don't get what you want, you suffer, if you get

what you don't want, you suffer, even when you get exactly what you want, you will suffer because you cannot hold on it forever. Your mind is your predicament. It wants to be free of change, free of pain, free of the obligations of life and death. But change is law and no amont of pretending will alter that reality."

24. আমি এথেনীয় বা গ্রীক নই, বরং বিশ্বের একজন নাগরিক।" "I am not an Athenian nor a Greek, but a citizen of the world."
25. তোমার ছেঁড়া কাপড়ের মধ্য দিয়ে আমি তোমার অহংকার দেখতে পাচ্ছি।" "Through your rags, I see your vanity."
26. "মৃত্যুর ব্যাপারে খুশি থাকো এবং এই সত্যটি জেনে রাখো যে, একজন ভালো মানুষের জীবনে বা মৃত্যুর পরে কোন মন্দ ঘটতে পারে না।" "Be of good cheer about death and know this of a truth, that no evil can happen to a good man, either in life or after death"
27. "হে ঈশ্বর, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা- আমি যেন ভেতরে সুন্দর হতে পারি।" "I pray thee, O God, that I may be beautiful within."
28. "বিদায়ের সময় এসে গেছে, আমরা আমাদের আলাদা পথে চলে যাব, আমি মরতে, আর তুমি বাঁচতে; এই দুজনের মধ্যে কোনটি ভালো তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।" "The hour of departure has arrived, and we go our separate ways, I to die, and you to live; Which of these two is better only God knows.
29. পুন্য সম্পদ থেকে আসে না, বরং সম্পদ এবং মানুষের কাছে থাকা অন্যান্য সকল ভালো জিনিস কেবল পুন্য বা সদগুণ থেকে আসে। "Virtue does not come from wealth, but wealth and every other good thing which men have .... Comes from virtue."

30. "যারা তোমার সমস্ত কথা এবং কাজের প্রশংসা করে, তাদের কথা ভাবো না; বরং তাদের কথা চিন্তা কর; যারা তোমার দোষ-ত্রুটিগুলোকে দয়া করে তিরস্কার করে।" "Think not of those faithful who praise all thy words and actions; but those who kindly reprove thy faults."
31. একটি শব্দ আমাদের জীবনের সমস্ত বোঝা এবং যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়। সেই শব্দ হল ভালোবাসা।" "One word frees us of all the weight and pain in life. That word is love."
32. "সবচেয়ে উষ্ণ প্রেমে সবচেয়ে ঠান্ডা পরিণতি হয়।" "The hottest love has the coldest end."

জীবন দর্শনের উপর সক্রেটিসের এই রকম শত শত উক্তি রয়েছে, যা তিনি তাঁর বিভিন্ন আলোচনা, বক্তৃতা এবং জীবন সম্পর্কে শিক্ষায় উল্লেখ করেছেন। তাঁর উক্তির মধ্যে তাঁর যে দর্শন প্রকাশ পেয়েছে তা শুধু পাশ্চাত্য দেশগুলির জন্য নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের মানুষের আত্ম-প্রতিফলন, বৌদ্ধিক নম্রতা এবং জ্ঞান ও গুণাবলীর অন্বেষণকে উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু সক্রেটিস কোন ধনী বা সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আসেননি, তিনি এক পাথর মিস্ত্রি ব্যবসা বা পেশার পরিবার থেকে এসেছিলেন, তাই তাঁর জীবন যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং সংগ্রামপূর্ণ। প্রাচীন গ্রিসের রাজনৈতিক উত্থানের সময় তাঁর জীবন, কর্ম এবং দর্শন সাংস্কৃতিক উদ্ভাবন এবং বৌদ্ধিক অনুসন্ধানের প্রভূত বিকাশ ঘটিয়েছে।

রেফেরেন্স;

১) প্লেটো রচিত বিখ্যাত 'দ্য রিপাবলিক' (The Republic)

২) প্লেটো রচিত অ্যাপোলজি" (Apology)

4. কনফুসিয়াস

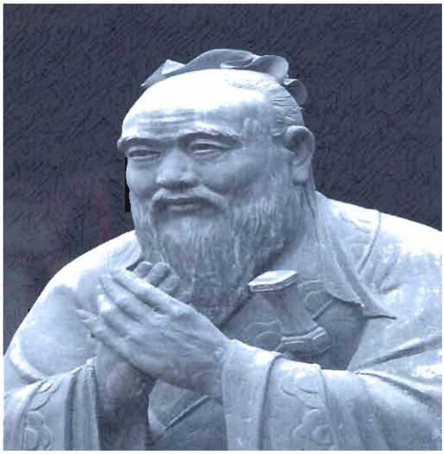

(ছবির উৎস Internet Encyclopaedia of Philosophy)

সূচনা

কনফুসিয়াস এক মহান চীনা ঋষি ও মহাপুরুষ। কনফুসিয়াস ৫৫১-৪৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দের বিশ্ব বিখ্যাত চীনা চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। বিংশ শতাব্দীর চীনা চিন্তাধারার ইতিহাসের একজন মহান বিশেষজ্ঞ ফুং ইউ-লান, চীনা ইতিহাসে কনফুসিয়াসের প্রভাবকে পশ্চিমের সক্রেটিসের প্রভাবের সাথে তুলনা করেছেন। চীনা পরম্পরাগত মতবাদ বা ঐতিহ্য অনুসারে, কনফুসিয়াস একজন চিন্তাবিদ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ এবং রু স্কুল অফ চাইনিজ অর্থাৎ কনফুসিয়ানিজম(Confucianism) চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। লুন্যু বা অ্যানালেক্টে সংরক্ষিত তাঁর শিক্ষাগুলি, আদর্শ মানুষের শিক্ষা এবং আচরণ, একজন ব্যক্তির কীভাবে তার জীবনযাপন করা উচিত এবং অন্যদের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করা উচিত, এবং কোন সমাজ ও সরকারের রূপে তার অংশগ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে পরবর্তী চীনা জল্পনা-কল্পনার ভিত্তি তৈরি করে। উল্লেখ্য কনফুসিয়াসের জীবন-চরিতের উৎসগুলি তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে সংকলিত এবং একত্রিত করা হয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব

এবং তাঁর জীবনের ঘটনাবলী তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য উৎস হতে সংকলিত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান উৎস হল: অ্যানালেক্টস যিনি কনফুসিয়াসের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর জীবন চরিতের উৎসগুলি অনুসারীদের দ্বারা সংকলিত হয়েছে বলে জানা যায়। তাঁর মৃত্যুর পরে রচিত তাঁর জীবন চরিতের আর একটি প্রধান উৎস হল জুওঝুয়ান, যা একটি আখ্যানমূলক ইতিহাস। সংক্ষেপে কনফুসিয়াসের জীবন চরিতের উৎসগুলি কনফুসিয়াসের শিষ্য এবং অনুসারীদের দ্বারা একত্রিত হয়েছে।

জন্ম

সংগৃহীত তথ্য অনুসারে কনফুসিয়াস ১৯শে জুন, ৫৫১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ২৬০০ বৎসর পূর্বে চীনের লু দেশের শাং পিং-এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রথম নাম ছিল কং, কিন্তু তাঁর শিষ্যরা তাঁকে কং-ফু-ৎসে (কং এর অর্থ গুরু বা শিক্ষক) নামে ডাকতেন, যাকে জেসুইট মিশনারিরা ল্যাটিন ভাষায় তাঁর নাম রাখে ‘কনফুসিয়াস’। উল্লেখ্য লু- প্রদেশ বর্তমানে চীনের শানডং প্রদেশে অবস্থিত। কনফুসিয়াস ছিলেন প্রাচীন চীনের প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তাবিদ। কনফুসিয়াস চীনের সবচেয়ে বিখ্যাত শিক্ষক, দার্শনিক এবং রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, যার ধারণাগুলি চীন এবং অন্যান্য পূর্ব এশীয় দেশগুলির সভ্যতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তার বাবার নাম কং হি ও মায়ের নাম ইয়ান ঝেং। কনফুসিয়াসের পিতা কং হি জুঝুয়ানের (Zuozhuan) মতে, খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬৩ -৫৫৬ সালে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। লু সেনাবাহিনীর দায়িত্বে অসাধারণ বীরত্ব, সাহস এবং শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল তাঁর পুত্রও পরবর্তী কালে তাঁর মত অসাধারণ গুণাবলির অধিকারী হয়ে ঐতিহাসিক উৎস অনুসারে পরিচিত হবেন। তার মা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা যায় নি; তবে জুঝুয়ান মতে তিনি সম্ভবত ইয়ান পরিবারের একজন কন্যা ছিলেন। কনফুসিয়াস ৫৫১ সালে লু রাজ্যের প্রাচীর ঘেরা ঝৌ শহরে

জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (জুঝুয়ান হল একটি প্রাচীন চীনা আখ্যান ইতিহাস)

অলৌকিক জন্ম কাহিনী

তাঁর বাবা কুং হো এর বয়স তখন প্রায় ৭০ বছর। তাঁর প্রথম স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন এবং তিনি নয়টি কন্যার পিতা হিসেবে রয়েছেন। একটি পুত্র সন্তানের জন্য কুং হোও এর ভীষণ আশা ছিল । তাই তিনি ইয়েনের সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রধানের কাছে গিয়ে তাদের একটি কন্যাকে বিয়ে করতে চান। ছোট মেয়ে, ইয়েন চিং-সাই, বলল যে সে এই বয়স্ক ব্যক্তিকে বিয়ে করতে রাজি। এরপর দুজনের বিয়ে হল, এবং এর কিছুদিন পরেই ইয়েন চিং-সাই নি-চিউ পর্বতে ভ্রমণ করেন, যে পর্বতগুলি সম্রাট শুন তার অভিভাবক আত্মার উপাসনার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। সেখানে তিনি প্রার্থনা করেন, আশা করেন যে তিনি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবেন। সেই রাতে, তিনি স্বপ্নে দেখেন যে একটি আত্মা তার কাছে এসে বলেছে, "তোমার একটি পুত্র হবে, যে একজন মহান ঋষি এবং নবী হবে, এবং তুমি তাকে তুঁত গাছের ফাঁকে জন্ম দেবে।" এই স্বপ্নের কিছুক্ষণ পরেই, তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েন।

যখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন, তখন তিনি স্বপ্নের রাজ্যে চলে যেতেন; সপ্নের মধ্যে একটি ছোট গরুর আকারের একটি চীনা ইউনিকর্নের মুখে সবুজ জেড দিয়ে তৈরি একটি ট্যাবলেট দেখলেন। সেই ট্যাবলেটে একটি ভবিষ্যদ্বাণী খোদাই করা ছিল: "জলের নির্যাসের পুত্র শীঘ্রই শুকিয়ে যাওয়া চৌ-এর উত্তরাধিকারী হবেন এবং সিংহাসনহীন রাজা হবেন"; যার অর্থ ছিল যে তাঁর শিশুটি বড় হয়ে জ্ঞানী এবং মূল্যবান নেতা হবেন, যদিও তিনি কখনও রাজনৈতিক ক্ষমতা ধারণ করবে না। তিনি ইউনিকর্নের শিংয়ের চারপাশে একটি রেশমের স্কার্ফ বেঁধেছিলেন, যার উপর প্রাণীটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

এরপর শীঘ্রই ইয়েন সাইয়ের সন্তান প্রসবের সময় এল। তিনি তার স্বামীকে বললেন যে তাঁকে "ফাঁকা তুঁত গাছের তলায় নিয়ে যেতে।

সেখানেই তাকে সন্তান প্রসব করতে হবে যেখানেই তুঁত গাছ থাকুক না কেন। তাঁর স্বামী বললেন যে কাছাকাছি একটি পাহাড়ে একটি শুকনো গুহা ছিল যা এই নামে পরিচিত ছিল। সন্তান প্রসবের সময় তারা "দ্য ফাঁপা তুঁত গাছ" নামে একটি শুকনো গুহায় চলে গেলেন। যে রাতে শিশুটির জন্ম হয়, সেই রাতে আকাশে দুটি ড্রাগন পাহারা দেওয়ার জন্য আবির্ভূত হয়; একটি পাহাড়ের ডানদিকে যেখানে গুহাটি ছিল, অন্যটি পাহাড়ের বাম দিকে। তারপর পাহাড়ের উপরে বাতাসে দুটি আত্মা আবির্ভূত হয়, দুটি মহিলা যারা সুগন্ধি জল ঢেলেছিল, যেন চিং-সাইকে প্রসবের সময় সুন্দর সুগন্ধে স্নান করানোর জন্য। এরপর গুহার ভেতরে, চিং-সাই একটি সঙ্গীত শুনতে পেলেন, এবং একটি কণ্ঠস্বর: "তোমার পুত্রের জন্মের সময় স্বর্গ কেঁপে উঠল, এবং সুরেলা শব্দ পাঠাল।" শুকনো গুহার ভেতর থেকে জলের একটি ঝর্ণা বেরিয়ে এল, যাতে চিং-সাই তার নবজাতককে স্নান করাতে পারেন; এবং ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চিত করে যে নবজাতকটি "জলের সত্তার পুত্র"

এরপর নবজাতক শিশুটিকে শ্রদ্ধা জানাতে দূর থেকে পাঁচজন শ্রদ্ধেয় পুরুষ এসেছিলেন। কেউ কেউ বলেছিলেন যে তাঁরা হলেন আকাশের পাঁচজন বৃদ্ধ অমর ব্যক্তি যারা কখনও মরে না, এবং তারা এই মহান শিশুর জন্ম উদযাপন করতে পাঁচটি গ্রহ থেকে নেমে এসেছিলেন। এই ছোট্ট শিশুটি বড় হয়ে একজন মহান মানুষ, একজন নবী এবং ঋষি হয়ে ওঠেন যিনি কুং-ফু-ৎজু, অর্থাৎ গুরু বা শিক্ষক কুং নামে পরিচিত ছিলেন; এবং আমাদের কাছে তিনি কনফুসিয়াস নামে পরিচিত হলেন। (Ref. The Miracle Birth of Confucius.https://www.danielharper.org/blog/)

শৈশব ও কৈশোর

বাবা, কং হি, লু প্রদেশের সরকারি কর্মচারী ছিলেন এবং স্থানীয় সামরিক গ্যারিসনের কমান্ডার ছিলেন। কনফুসিয়াসের বয়স যখন তিন বছর তখন তার বাবা কং হি মারা যান; ফলে তাঁর অসহায় ছোট্ট মা তাঁর সন্তান কনফুসিয়াসকে নিয়ে ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে যান এবং অতি কষ্টে তিনি সন্তানকে লালন-

পালন করেন। কনফুসিয়াসের শৈশব সম্পর্কে খুব একটা জানা না গেলেও বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, তাঁর শৈশবকাল কেটেছিল অপরিসীম দুঃখ, দারিদ্র্য ও দুর্দশার মধ্য দিয়ে। কনফুসিয়াসের বাবা কং হি, (শু-লিয়াং হে) একজন যোদ্ধা ছিলেন এবং লুতে জেলা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, কিন্তু কনফুসিয়াসের জন্মের সময় তিনি ইতিমধ্যেই বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী বিবাহের ফলে তার নয়টি কন্যা এবং একটি ক্লাবফুট (বিকৃত পাযুক্ত) পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল, এবং তাই কনফুসিয়াসের বাবা কং হি,বৃদ্ধ বয়সে এক দরিদ্র চাষির মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন একজন সুস্থ উত্তরাধিকারী (পুত্র সন্তান) লাভের জন্য। পরবর্তী জীবনে তিনি মাস্টার কুং নামে পরিচিত ছিলেন, যা চীনা ভাষায় কুং ফু-তজু নামে পরিচিত, যার ল্যাটিন রূপ কন-ফু-সিউস। (ওয়িকিপেডিয়া) তিনি সম্ভবত অভিজাত শ্রেণীর একটি দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন । সিমা কিয়ান এবং অন্যান্য সূত্র অনুসারে, কনফুসিয়াসকে দারিদ্র্যপীড়িত অপমানজনক যৌবন সহ্য করতে এবং যৌবনে পৌঁছানোর পর হিসাবরক্ষণ এবং পশুপালনের মতো ছোটখাটো কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। [7] সিমা কিয়ানের বিবরণে কনফুসিয়াসের জন্মের গল্পটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কীভাবে নি নামক একটি পবিত্র পাহাড়ে (কিউ) ঈশ্বরের কাছে তার বাবা-মায়ের অসাধারন প্রার্থনার প্রভাবে কনফুসিয়াসের জন্ম হয়। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় কং (যার অর্থ হল প্রার্থনা কবুল হলে আক্ষরিক অর্থে কৃতজ্ঞতা স্বীকার), সামাজিক নাম তার জন্মের অলৌকিক পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করেন ঐতিহাসিকগণ। (Note, Sima Qian was a Chinese historian during the early Han dynasty. He is considered the first great Chinese historian)

তিনি নিজের ভরণপোষণের জন্য সামান্য একটা চাকরি করতে শুরু করেন। ২০ বছর বয়সে বিয়ে করেন কিগুয়ান নামের এক মেয়েকে। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই জন্ম নেয় তাদের প্রথম সন্তান

কঙ লি। জিয়াও। কনফুসিয়াসের বাবা কং হি তিন বছর বয়সে মারা যান এবং দারিদ্র্যের মধ্যে তাকে তার মা ইয়ান ঝেংজাই লালন-পালন করেন। তার মা অল্প বয়সে মারা যান। কনফুসিয়াসের শৈশব সম্পর্কে আমরা খুব বেশি কিছু বলতে পারি না, সিমা কিয়ান বলেন যে, "[কিছু অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ হ্যাজিওগ্রাফারদের মতে, পাঁচ বছরের শিশু হিসেবে, কনফুসিয়াস অভ্যাসগতভাবে আচার-অনুষ্ঠানের পাত্র সাজিয়ে এবং অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করে আনন্দ লাভ করতেন। বিশেষ করে এইভাবে দার্শনিকের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগের কথা Sima Qian এর বর্ণনায় উঠে এসেছে বলে অনেক লেখায় পাওয়া যায়। আগেই বলেছি Sima Qian হলেন চীন দেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক।

কনফুসিয়াসের শারীরিক গঠন

AI Search থেকে জানা যায় কনফুসিয়াসের কোনও সমসাময়িক সঠিক প্রতিকৃতি বর্তমানে পাওয়া সম্ভব নয়, প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে তাকে ব্যতিক্রমীভাবে লম্বা ব্যক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীন চীনের গ্রন্থগুলিতে তাঁকে প্রায় সাত ফুট লম্বা এক দাড়িওয়ালা মানুষ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং লোকেরা তাকে "লম্বা মানুষ" বলে ডাকত। তিনি ভীষণ শক্তিশালী মানুষ ছিলেন। **AI Search** থেকে পাওয়া যায় কনফুসিয়াস "এত শক্তিশালী ছিলেন যে তিনি একটি শহরের গেটের খিলান ধরে রাখতে পারতেন" যাইহোক, পরবর্তী সময় চীনের শিল্পকলা, সাহিত্য ও সামাজিক আলোচনায় তাঁকে এক আদর্শ দার্শনিক ও শিক্ষক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

কনফুসিয়াসের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী;

আগেই বলেছি কনফুসিয়াস হলেন এক মহান চীনা ঋষি যিনি ৫৫১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লু দেশের শাং পিং-এ জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তাঁর প্রকৃত ও প্রথম নাম ছিল কং, কিন্তু তাঁর শিষ্যরা তাঁকে কং-ফু-ৎসে (কং এর অর্থ গুরু বা শিক্ষক) নামে ডাকতেন। জেসুইট মিশনারিরা তাঁর নাম ল্যাটিন ভাষায় 'কনফুসিয়াস' এ রূপান্তরিত করেছিলেন। এবার বলি জেসুইট মিশনারি কি? [জেসুইট মিশনারি

বলতে বুঝায় সোসাইটি অফ জেসাসের সদস্য, যা লয়োলার সেন্ট ইগনাশিয়াস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি রোমান ক্যাথলিক ধর্মীয় ব্যবস্থা,। এটা তাদের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শিক্ষামূলক, সেবামূলক, দান এবং দাতব্য কাজ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার জন্য সারা বিশ্বে দুই শতাব্দী ধরে বিশেষভাবে পরিচিত । জেসুইটরা "সকল কিছুর মধ্যেই ঈশ্বরকে খুঁজে বের করার" প্রতিশ্রুতির জন্য পরিচিত, জেসুইট মিশনারিরা খ্রিস্টধর্ম প্রচার এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। যেমন ভারতে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার সোসাইটি অফ জেসাসের একজন সহ-প্রতিষ্ঠাতা, যিনি ভারত এবং দূর প্রাচ্যে তার মিশনারি কাজের জন্য পরিচিত। ইউরোপে ক্যাথলিক পুনরুত্থানের সময়কালে, কাউন্টার-রিফর্মেশনে জেসুইটরা গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় ছিল এবং পরবর্তীতে গির্জার আধুনিকীকরণে ভূমিকা পালন করেছিল।চীনে জেসুইট মিশন: জেসুইটরা চীনে পশ্চিমা বিজ্ঞান এবং গণিতের পরিচয় করিয়ে দেয় এবং কেউ কেউ এমনকি চীনা সম্রাটদের বিশ্বস্ত উপদেষ্টাও হয়ে ওঠে।] কনফুসিয়াস ঝৌ রাজবংশের বসন্ত ও শরৎকালের শেষের দিকে বাস করতেন। ঝৌ রাজবংশের মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও পতনের সময়। বসন্ত ও শরৎকালকে পূর্ব ঝৌ যুগের প্রথম অংশ হিসেবেও পরিচিত। চীনের ইতিহাসের এই সময়কাল, যা প্রায় ৭৭০-৪৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ঝৌ রাজবংশের কর্তৃত্বের পতন এবং শক্তিশালী আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলির উত্থানের দ্বারা চিহ্নিত ছিল। এই সময়কালে সামন্ত প্রভুরা ক্ষমতার জন্য লড়াই করতেন, যখন সম্রাটের নিজস্ব কর্তৃত্ব হ্রাস পাচ্ছিল। সেই সময়কালে সম্রাটের ভূমিকা মূলত ধর্মীয় ছিল এবং একে পুরোহিত হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে, আঞ্চলিক নেতারা পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা অর্জন করতেন, অর্থাৎ, তারা সম্রাটের আত্মীয় ছিলেন। কিন্তু সম্রাটকে সমর্থন করার এবং রাষ্ট্র সংরক্ষণের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার পরিবর্তে, তারা বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি মূলত উদাসীন ছিলেন এবং তাদের নিজস্ব বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিতেন।

কনফুসিয়াসের শিক্ষা-দর্শন

কনফুসিয়াস নিজে কীভাবে শিক্ষিত হয়েছিলেন তা ঐতিহাসিক গণ সুস্পষ্টভাবে লিখে যান নি। তবে কিছু কিছু লেখা এবং AI Search থেকে পাওয়া যায় তাওবাদী গুরু লাও ড্যানের কাছে আচার-অনুষ্ঠান, চ্যাং হংয়ের কাছে সঙ্গীত এবং সঙ্গীত-গুরু জিয়াংয়ের কাছে সুর-বাদ্য শিখেছিলেন তিনি। ধারণা করা হয় যে, মধ্যবয়সে কনফুসিয়াস তাঁর চারপাশে একদল শিষ্য জড়ো করেছিলেন যাদের তিনি শিক্ষা দিতেন এবং লু- প্রদেশে রাজনৈতিক বিষয়ে নিজেকে গভীরভাবে নিবেদিত করেছিলেন। সিমা কিয়ানের ঐতিহাসিক তথ্য এবং অন্যান্য সূত্র দাবি করেছে যে কনফুসিয়াসের শিষ্যের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এদের মধ্যে বাহাত্তোরটি সর্বোচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন ছিল। যারা তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখে গেছেন বলে জানা যায়। (Ref. Sima Qian history during the early Han dynasty)

কনফুসিয়াসের শিক্ষা এবং জ্ঞানের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল। ক্রমাগত আত্ম-উন্নতির জন্য শিক্ষা, এবং জ্ঞানের সাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। জ্ঞানকে ব্যক্তিগত বিকাশ এবং সমাজের উন্নতির হাতিয়ার হিসেবে মূল্য দিতেন তিনি। তাই ছোটবেলায় প্রচন্ড দারিদ্রতার মধ্যেও তিনি পড়াশুনা চালিয়ে গেছেন। কোন দুঃখ, দারিদ্র, কষ্ট বা অভাব শেখার প্রতি তার ভালোবাসা এবং ভালো কিছু জানার প্রতি আকাঙ্ক্ষা থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি। সারা জীবন তিনি জ্ঞানার্জনের প্রতি অসাধারণ ভালবাসা প্রদর্শন করেছেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন যে ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। তিনি ব্যক্তির জ্ঞান এবং কর্মের উপর ক্রমাগত চিন্তা করতে উৎসাহিত করতেন, আত্ম-সংস্কার এবং দানশীলতা, ধার্মিকতা এবং প্রজ্ঞার মতো গুণাবলীর বিকাশের জন্য প্রচেষ্টা করেছিলেন। তিনি আরো বলতেন, শিক্ষা ও জ্ঞান শাসকের দক্ষতা ও শাসন করার ক্ষমতা অনেক বাড়াতে পারে । তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা এবং আত্ম-প্রতিফলনের মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানের বিকাশ করতে পারে এবং সঠিক বিচার করতে পারে। কনফুসিয়াসের ঐতিহ্যবাহী চীনা

সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি তাঁর সময়ের ধ্রুপদী (ক্লাসিক)গ্রন্থগুলিকে মূল্যবান বলে বিবেচনা করতেন। তিনি তাঁর শিক্ষা ও শিক্ষা দানের ভিত্তি হিসেবে ঐ গ্রন্থগুলি ব্যবহার করতেন এবং তাঁর ছাত্রদের সেগুলি অধ্যয়ন করতে উৎসাহিত করতেন। কনফুসিয়াস বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষায় নৈতিকতা বা নীতি থাকে যা মানুষের শিক্ষা লাভ করা উচিত। তিনি না বুঝে মুখস্থ করার বিরুদ্ধে সতর্ক করতেন। তিনি বলতেন তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা জ্ঞান বা শিক্ষা লাভ করতে পারি: প্রথম; প্রতিফলন; দ্বিতীয়; অনুকরণ এবং তৃতীয়; অভিজ্ঞতা। "By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; Second, by imitation, which is easiest; and third by experience, which is the bitterest." শিক্ষা সম্পর্কে কনফুসিয়াসের বিখ্যাত উক্তিটি হল; "যে শেখে কিন্তু চিন্তা করে না সে হারিয়ে যায়; যে চিন্তা করে কিন্তু শেখে না সে মহা বিপদে পড়ে।" "যে বিনয় ছাড়া কথা বলে তার কথা সুন্দর করে তোলা কঠিন হবে।" "জীবন সত্যিই সহজ, কিন্তু আমরা এটিকে জটিল করে তোলার উপর জোর দিই।"

কনফুসিয়াসের বিবাহ

কনফুসিয়াস ১৯ বছর বয়সে লেডি কিগুয়ানকে বিয়ে করেন। কনফুসিয়াস এমন এক সময়ে বাস করতেন যেখানে বিবাহকে সামাজিক কাঠামোর একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হত। বংশধারা অব্যাহত রাখা এবং পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বিবাহের উপর জোর দেওয়া হত। তাদের তিনটি সন্তান ছিল: একটি ছেলে, কং লি, এবং দুটি মেয়ে, যাদের মধ্যে একজন শৈশবে মারা যান এবং অন্যজনের নাম কং। কনফুসীয় দর্শন ও চিন্তাধারায়, বিবাহ কেবলমাত্র দম্পতির সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নয়, বরং পরিবারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং সামগ্রিক সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়ও ছিল। ফলে কিগুয়ানের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিবাহের কয়েক বছর পরেই দম্পতির মধ্যে আদর্শগত অনেক মতবিরোধ দেখা দেয়;

ফল সরূপ বিয়ের কয়েক বছর পরেই তাদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।

কনফুসিয়াসের বিবাহবিচ্ছেদ

কনফুসিয়াসের বিবাহবিচ্ছেদের কারণগুলি সুনির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও, ঐতিহাসিক বিবরণগুলি বেশ কয়েকটি সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে দম্পতির মধ্যে আদর্শগত মতবিরোধ বা অসন্তোষের কারণে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছিল, আবার কেউ কেউ কনফুসিয়াসের রাজনৈতিক ও দার্শনিক কাজের জন্য তাঁকে ব্যাপক ভ্রমণ করতে হত; যেটা তাঁর স্ত্রী মেনে নিতে পারেন নি। ঐতিহ্যবাহী চীনা দৃষ্টিভঙ্গি, পারিবারিক স্থিতিশীলতা এবং সম্প্রীতির উপর জোর দেয়; কিন্তু স্ত্রীর অসন্তোষের কারণে কনফুসিয়াসের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। কনফুসিয়াসের বৈবাহিক বিচ্ছেদের সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ঐক্যমত্য নেই। কিছু ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, কনফুসিয়াসের বিবাহের সমাপ্তি ঘটে সামঞ্জস্যের অভাবের কারণে। সম্ভবত তার নিজস্ব পরিশীলিত রুচি এবং বৌদ্ধিক সাধনার কারণে। কিছু পণ্ডিত মনে করেন যে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ দ্বারা তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুকে বোঝান হয়েছে।

কনফুসিয়াসের সঙ্গীতানুরাগ

কনফুসিয়াস ভীষণ সঙ্গীত প্রেমিক ছিলেন। তিনি সঙ্গীত কলার সাথে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি সঙ্গীতকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সম্প্রীতি সম্প্রসারণের একটি মৌলিক দিক হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সঙ্গীত নৈতিক চরিত্র গড়ে তুলতে পারে এবং একটি সুশাসিত সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারে। তিনি শিক্ষায় সঙ্গীতের গুরুত্বের উপর জোর দিতেন। এটিকে আত্ম-সংস্কৃতি এবং সামাজিক সংহতির একটি হাতিয়ার হিসেবে দেখতেন। কৈশোরে প্রচন্ড অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি অতি প্রাচীন কবিতা গ্রন্থের কবিতা থেকে গান রচনা করতেন এবং এক প্রবীণ অন্ধ গায়কের কাছে গান শিখতেন। পরে

ভীষণ ভাল গান গাইতেন। কনফুসিয়াসের সঙ্গীত দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হওয়াএবং "শাও"-এর প্রাচীন সঙ্গীতের প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশের বিবরণ AI search থেকে পাওয়া যায়। কনফুসিয়াস বিশ্বাস করতেন যে সঙ্গীত একজন ব্যক্তির চরিত্র গঠন করতে এবং সদ্গুণ উন্নীত করতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। তিনি সকলের জন্য গান শেখার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন গান মানুষের মনকে উদ্দীপিত করতে পারে এবং সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলার অনুভূতি গড়ে তুলতে পারে। কনফুসিয়াস আরও বিশ্বাস করতেন সঙ্গীত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং সম্প্রদায়ের অনুভূতি প্রচার ও প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। তাঁর মতে সঙ্গীত ইতিবাচক আবেগকে অনুপ্রাণিত করে এবং মানুষের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার গুণ বৃদ্ধি করতে পারে। এ বিষয়ে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশাত্মকবোধক গানের ভূমিকার কথা মনে করতে পারি। তাই আচার-অনুষ্ঠানে কনফুসিয়াস সঙ্গীতের ব্যবহারকেও ভীষণভাবে উৎসাহিত করতেন। সঙ্গীতকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখেছিলেন তিনি। কনফুসিয়াস সঙ্গীতকে কখনো বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে দেখেননি বরং একটি প্রভাব শালী শক্তি হিসেবে দেখেছিলেন। তিনি বলতেন সঙ্গীত ব্যক্তি, সমাজ, এমনকি শাসনব্যবস্থার কাঠামোকেও প্রভাবিত করতে পারে। কনফুসিয়াস যে সঙ্গীতটি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন তা ছিল শাও নামে পরিচিত প্রাচীন সঙ্গীত। যখন তিনি প্রথম এটি শুনেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "আমি কখনও কল্পনাও করিনি যে সঙ্গীত এত সুন্দর হতে পারে," এবং "পরবর্তী তিন মাস তিনি মাংসের স্বাদ অনুভব করেননি" (অ্যানালেক্টস, ৭:১৪)।

“Confucius writes that “music is the harmonization of heaven and earth; the rites order heaven and earth.”3 The only way for society to prosper is to be in tune with the universal standard indicated through music. “The rites are not simply

a matter of decorum...They are the institutions, orders, and norms that developed from primitive magical ritual and that unite the universe (heaven) with society (people)." Confucius says, "Music is that which moves man from the internal; rites are that which affects man on the external. Music brings about harmony. Rites ensure obedience."1 Music properly orders the internal state of a person, while ritual provides a tangible manifestation of this internal ordering. (Ref. Confucius on Harmony, Music, and Ritual; By Jensen Armstrong Kirkendall, Azusa Pacific University,) - এআই অনুসন্ধান

কর্ম জীবন

কৈশোর পেরোতে-না-পেরোতেই জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয় কনফুসিয়াসকে। কখনো পশু খামারে মেষপালক হিসেবে কাজ করেছেন, কখনো কেরানিগিরি বা লাইব্রেরির চাকরি, আবার কখনো শহরের উদ্যানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনার কাজ করেছেন। তিনি সব সময় নিষ্ঠাভরে ও দায়িত্বসহকারে সব কাজ করেছেন। কিন্তু হাজার কাজ এবং দুঃখ দারিদ্রের মধ্যে ও পড়াশোনার চালিয়ে গেছেন কনফুসিয়াস। অল্প বয়স থেকেই ছাত্রদের পড়াতে শুরু করেন তিনি। এর মধ্যেই কনফুসিয়াসের বিবাহ হয়েছিল। মাত্র ২৩বছর বয়সে কনফুসিয়াস মাতৃহারা হন। প্রসঙ্গত, কনফুসিয়াস তার পারিবারিক পটভূমি সম্পর্কে অকপট ও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন যে, "দরিদ্র এবং নিম্ন স্তরের" হওয়ায়, তিনি বিশিষ্ট পরিবারের যুবকদের মতো সহজে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করতে পারতেন না এবং তাই তাকে "অনেক নীচু বিষয়ে দক্ষ" হতে হয়েছিল। তিনি প্রথমে জিসুন বংশের সাথে চাকরি খুঁজে পান, জিসুনদের সাথে একের পর এক সাধারণ পদ - শস্যভাণ্ডার ও পশুপালনের রক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন এবং পরবর্তী সময় তাঁর জ্ঞান ও পান্ডিত্য, সততা,

নিষ্ঠা, ক্ষমতা বলে রাজদরবারে উচ্চ পদে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল।

রাজদরবারে কনফুশিয়াস

সেই সময় চীনের সমাজ ব্যবস্থায় জনগণের অবস্থান অনুযায়ী তাদের কাজ বা পেশার শ্রেণিবিন্যাস করা হতো। আগেই বলেছি কনফুসিয়াসের জ্ঞান পান্ডিত্য, সততা, নিষ্ঠার কারণে যারা ভদ্র-মধ্যবিত্ত-বিদ্বান হিসেবে পরিচিত এবং সমাজের সম্ভ্রান্ত ও শাসক শ্রেণীর সাথে তিনি মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সময় লু প্রদেশের শাসক ছিলেন চি চি। কসফুশিয়াসের জ্ঞান ও পান্ডিত্যের কথা জানতে পেরে রাজা কনফুসিয়াসকে তার সভায় আমন্ত্রণ জানান। প্রথম পরিচয়েই কনফুসিয়াসের পান্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে যান রাজা। তাঁর জ্ঞান ও পান্ডিত্য, সততা, নিষ্ঠা ও দারিদ্রের কথা শুনে তিনি কনফুসিয়াসকে তাঁর রাজদরবারে হিসাবরক্ষকের কাজে নিযুক্ত করলেন। কনফুসিয়াসের কর্মদক্ষতায় খুশি হয়ে রাজা তাকে আরো উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত করেন। যেমন জেলা কর্মকর্তা হিসেবে তিনি বেশ কিছুদিন দক্ষতার সাথে কাজ করেন; পরে তাঁর কর্ম-দক্ষতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি লু সরকারে আরও গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন- যেমন, কর্মমন্ত্রী (minister of works) এবং পরে অপরাধমন্ত্রী (minister of crime) হিসেবে বিশেষ দক্ষতার সাথে বহু দিন কাজ করেছিলেন।

রাজ্যের উচ্চতর পদে কনফুশিয়াস

Encyclopædia Britannica দেওয়া তথ্য অনুসারে অপরাধ মন্ত্রী এবং কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনে কনফুসিয়াস যথেষ্ট পারদর্শীকতা দেখিয়েছিলেন। সেখানে আরও বলা হয়েছে, অপরাধ মন্ত্রী হিসেবে কনফুসিয়াস আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা মোকাবেলায় যতখানি দক্ষতা দেখিয়ে ছিলেন, কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনে তিনি আরও বেশি প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি সর্বদা নিশ্চিত করতেন যে শাসক এবং তার শাসন পদ্ধতি যেন সর্বদা অপ্রত্যাশিত ক্ষতিকর পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকে ; তিনি জানতেন কিভাবে একটি কঠিন বিষয়ের

উপর আলোচনাকে সফলভাবে শেষ করার জন্য শাসককে পরামর্শ দিতে হয়। ফলে প্রায় ৫২ বছর বয়সে লু প্রদেশের প্রধান আইনরক্ষকের দায়িত্ব পান কনফুসিয়াস। কনফুসিয়াস বিশ্বাস করতেন, "মানুষের মাঝে যদি নৈতিক চরিত্রের উন্নতি না ঘটে, শুধুমাত্র আইন দিয়ে মানুষকে সংযত রাখা সম্ভব নয়।" তাছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাও সম্ভব নয়। তাই কনফুসিয়াস নিজেই আইন প্রণয়ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে নীতিবোধ জাগাতে নানা উপদেশ দিতেন। অল্প কিছুদিনেই এর সুফল দেখা দিল লু প্রদেশে। সমগ্র চীন দেশের মধ্যে লু রাজ্য ছিল একমাত্র রাজ্য যেখানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন হতো না। সকলেই নির্ভয়ে, নিরাপদে নিজের দ্রব্য রাখতে পারতো। গভীর রাতেও পর্যটকরা নিরাপদে চলতে পারতো। আইনরক্ষকের দায়িত্ব এত ভালভাবে সম্পাদন করার পুরস্কার হিসেবে কয়েক বছরের মধ্যেই তাকে দেওয়া হয় লু প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার। কিন্তু তবুও এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে ঐ পদ থেকে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। সেই সময় চীন দেশ বিভাজন হতে হতে পাঁচ হাজারেরও বেশি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। সেই হাজার হাজার ছোট ছোট রাষ্ট্র গুলি বংশগত পরিবার তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অধীনে চলে আসে। ফলে শাসক পরিবারগুলির মধ্যে বিবাদ ও সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকে। ফলসরূপ, যারা বংশ পরম্পরায় লু-এর বৈধ শাসকদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে আসছিল, তাদের আক্রমণ আরোও প্রবল হল। কনফুসিয়াস ঐ শাসক পরিবারগুলির কর্মকাণ্ড এবং তাদের ধর্মীয় আচারবিচারকে আপত্তিকর বলে মনে করেছিলেন এবং শাসকের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি ন্যায্য উপায়ে লড়াই করে আসছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ৪৯৮ সালে একটি বড় সংঘর্ষ ঘটে যার ফলে ঐ শাসক পরিবারগুলি আত্ম-ধ্বংসের দিকে পরিচালিত হয়। তাদের পরিকল্পনা উল্টে যায়। লু-শাসক পরিবারের প্রধানরা কনফুসিয়াসকে সন্দেহ করলেন। তাই তিনি পদ থেকে বিচ্যুত হন। তখন তার বাড়ি ছেড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

(https://www.britannica.com/biography/Confucius)

লু-প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী কনফুসিয়াস

৫২ বছর বয়সে কনফুসিয়াস লু প্রদেশের প্রধান আইনরক্ষকের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র চীন দেশের প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি রাজ্যগুলির মধ্যে লু রাজ্য ছিল একমাত্র রাজ্য যেখানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন হতো না তাঁর সময়ে। এটা সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র তাঁর আইন প্রশাসনের অসাধারণ পারদর্শীতার কারণে। আইনরক্ষকের দায়িত্ব ভীষণ ভালভাবে সম্পাদন করার পুরস্কার হিসেবে তাঁকে কয়েক বছরের মধ্যেই লু প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল।

কনফুসিয়াসের স্ব-নির্বাসন

এরপর কনফুসিয়াস দীর্ঘ সময় স্ব-নির্বাসনে চলে যান। প্রথমে লু-এর ঠিক পশ্চিমে অবস্থিত ওয়েই রাজ্যে,তারপর দক্ষিণে সং রাজ্যে এবং অবশেষে চেন এবং কাই রাজ্যে। তাঁর এই স্ব-নির্বাসন যাত্রা প্রায় ১৪ বছর স্থায়ী হয়েছিল এবং কনফুসিয়াস সেই সময়ের বেশিরভাগ সময় এমন শাসকদের খুঁজে কাটিয়েছিলেন যারা তাঁর দর্শন ও পরামর্শ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এবং তার সৎ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হতে আগ্রহী হতে পারে। যদিও তার সেই খোঁজ বা অনুসন্ধান শেষ পর্যন্ত প্রায় বৃথা গিয়েছিল। তবুও তিনি কখনও হাল ছাড়েননি, কারণ তিনি এমন কাউকে পেতে আগ্রহী ছিলেন যিনি তাঁকে ঠিকভাবে রাজকার্যে বা প্রশাসনে কাজে লাগাতে পারে" (অ্যানালেকস, ১৭:৫)। যারা তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন তাদেরকে তিনি বলেছিলেন, "আমি এমন করলা গাছের মতো হতে পারি যা দড়ির প্রান্তে ঝুলে থাকে কিন্তু খাওয়া যায় না?" (অ্যানালেকস, ১৭:৭)।

মহান শিক্ষক কনফুসিয়াস

কনফুসিয়াস একজন বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন। চীন দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী শিক্ষকদের মধ্যে একজন হিসেবে

তাঁকে বিবেচনা করা হয়, যিনি নীতিশাস্ত্র সামাজিক শৃঙ্খলা এবং শিক্ষার গুরুত্বের দর্শনের জন্য সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। তিনি চীনের প্রথম বেসরকারি শিক্ষক হিসেবেও পরিচিত, যিনি শিখতে আগ্রহী যে কাউকেই শিক্ষা দিতেন। কনফুসিয়াসের শিক্ষা, বিশেষ করে অ্যানালেক্টস-এ সংকলিত শিক্ষা, এখনও অধ্যয়ন করা হচ্ছে এবং চীনা সংস্কৃতি এবং পূর্ব এশীয় সমাজকে গভীরভাবে গঠন করেছে। "অ্যানালেক্টস" বা "লুন-ইউ" হলো কনফুসিয়াসের শিক্ষা ও দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ (collection), যা মূলত কনফুসিয়াস এবং তার শিষ্যদের কথোপকথন ও কাজের একটি রেকর্ড (document). অ্যানালেক্টস" কে কনফুসিয়ান দর্শনের একটি স্তম্ভ বলে মনে করা হয়। চীনা সংস্কৃতি ও সমাজে এর গভীর প্রভাব রয়েছে। অ্যানালেক্টস এর বিষয়বস্তু হল কনফুসিয়াসের শিক্ষা, নীতি, এবং দর্শন। কনফুসিয়াসের শিষ্যরা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিক্ষা ও কাজের উপর ভিত্তি করে এই সংগ্রহটি তৈরি করে ছিলেন। চীনা সংস্কৃতিতে প্রভাব: অ্যানালেক্টসকে চীনা জাতির আত্মা এবং প্রজ্ঞার প্রধান উৎস বলে গণ্য করা হয়। শিক্ষাদানের উৎপত্তি সম্পর্কে চিন্তা করে, কনফুসিয়াসকে বিশ্বের প্রথম শিক্ষক হিসেবে ইতিহাসবিদরা মনে করেন। ৫৫১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণকারী কনফুসিয়াস নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা এবং শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল এবং তাঁর সেই গভীর অন্তর্দৃষ্টি পূর্ব এশীয় দেশগুলির চিন্তাভাবনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। (TOI- তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪) তিনি মানুষকে শেখাতে ভীষণ পছন্দ করতেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্ব-শিক্ষায় নিযুক্ত থাকতেন। সরকার পরিচালনায় সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার পর, তিনি শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন যে কনফুসিয়াস ছিলেন চীনের প্রথম পেশাদার শিক্ষক কারণ তিনি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি নিতেন। কনফুসিয়াস তার ছাত্রদেরকে সরকারের শাসন ব্যবস্থা এবং জীবনযাত্রার মাণ উন্নতি সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। "ঐতিহাসিকদের মতে কনফুসিয়াসের তিন হাজারের বেশি ছাত্র ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ৭২ জন ছাত্র তাঁর শিক্ষায় প্রকৃত দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর ঐ ৭২ জন

ছাত্র সকলেই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী পণ্ডিত ছিলেন। (উইকিপিডিয়া) সংগৃহীত তথ্য অনুসারে কনফুসিয়াস চীনের প্রথম এবং সফল শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হন। তিনি শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে সকলের সহজলভ্য করতে চেয়েছিলেন এবং শিক্ষকতাকে একটি পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি যে নীতিগত, নৈতিক এবং সামাজিক মান উন্নয়ন ও দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা কনফুসিয়ানিজম নামে পরিচিত। কনফুসিয়ানিজম কেবল মাত্র চীন নয়, পৃথিবীর বহু দেশের মানুষের জীবনযাত্রা মানের উন্নয়নের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কনফুসিয়ানিজমের মূল ধারণা হল ব্যক্তির একটি ভালো নৈতিক চরিত্র গঠন, এবং মহাজাগতিক সম্প্রীতির উন্নয়ন যার মাধ্যমে সারা বিশ্ব প্রভাবিত হতে পারে। এই নৈতিক চরিত্রটি "মানবতার"মাধ্যমে অর্জন করা হয়, যার ফলে মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, নম্রতার এবং পরোপকারের মতো আরও অনেক সৎ আচরণ সৃষ্টি হতে পারে।

কনফুসিয়াসের দর্শন

আগেই বলেছি কনফুসিয়াস ছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত চীনা পণ্ডিত ও দার্শনিক। কনফুসিয়াসের **দর্শন** কনফুসিয়ানিজম নামে সারা বিশ্বে সমাদৃত। প্রাচীন চীনে উদ্ভূত একটি প্রধান চিন্তাধারা, কনফুসিয়ানিজম নীতিশাস্ত্র, সামাজিক সম্প্রীতি এবং সম্পর্কের গুরুত্বের উপর জোর দেয়, যার মূল ধারণাগুলি হল রেন (উদারতা), লি (আচার-অনুষ্ঠানগত শালীনতা), এবং পুত্র-ধর্ম্মভীতি (বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা)। অর্থাৎ কনফুসিয়ানিজম দার্শনিক চিন্তা-পদ্ধতি নৈতিকতা, সামাজিক সম্পর্ক, এবং সরকারের সঠিক পরিচালনা নিয়ে আলোচনা করেছে। কনফুসিয়ানিজম একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ মতবাদ এবং জীবন দর্শন যা কনফুসিয়াস খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচার করেছিলেন এবং দুই সহস্রাব্দেরও বেশি সময় ধরে চীন দেশের নাগরিক অনুসরণ করে আসছে। কনফুসিয়ানিজম কোন ধর্ম হিসেবে সংগঠিত বা বিবেচিত না হলেও, এই জীবন দর্শন বা মতবাদ পূর্ব এশীয় আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক জীবনকে

তুলনামূলকভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। কনফুসিয়ানিজমের মূল বৈশিষ্টগুলির মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত গুণাবলীর চর্চা, পরিবার ও সম্প্রদায়ের গুরুত্ব এবং ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে শিক্ষা ও আচার-অনুষ্ঠানের ভূমিকা ।এই দর্শনের মূল ধারণাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল;

1. ***Ren*** 'রেন' (***ren-*** **humaneness," "benevolence_**) যার অর্থ হল "মানবতা, ও "উদারতা"। এই দর্শনে রেন- প্রায়শই "মানবতা," "উদারতা," বা "ভালোবাসা" হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে। কনফুসিয়াস এর দ্বারা নীতিশাস্ত্র, সহানুভূতি, করুণা এবং অন্যদের প্রতি দায়িত্ববোধের উপর জোর দিয়েছেন।
2. ***Li*** **লি** (***li*** **- ritual norms)** যার অর্থ হল আচার-অনুষ্ঠানের নিয়মানুবর্তিতা). অর্থাৎ লি বলতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সঠিক আচরণ এবং সামাজিক শিষ্টাচারকে বোঝান হয়। এটি আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে দৈনন্দিন মিথস্ক্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অনুশীলনকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কনফুসিয়ানিজমের বৈশিষ্ট।
3. **Yi আই** এর অর্থ হল; ধার্মিকতা বা ন্যায়বিচার; অর্থাৎ নৈতিকভাবে নিজের কর্তব্য পালন।
4. ***zhong*** **ঝং** (***zhong*** - loyalty to one's true nature নিজের প্রকৃত প্রকৃতির প্রতি আনুগত্য),
5. **Xiao জিয়াও (filial piety**)- এর অর্থ হল পিতৃতুল্য ধার্মিকতা। অর্থাৎ পিতামাতা এবং প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য, যা কনফুসিয়ানিজমে একটি মৌলিক গুণ হিসাবে বিবেচিত হয়।
6. **Zhi** ঝি; কনফুসিয়ানিজমে, ঝি এর অর্থ জ্ঞান বা ব্যবহারিক জ্ঞান। এটি এমন একটি গুণ যা মানুষকে সঠিক ও ভুলের পার্থক্য করার এবং সঠিক বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করে এবং সামাজিক সম্প্রীতির দিকে পরিচালিত করে। ঝি-র

মধ্যে বিশ্বকে শেখার এবং বোঝার ক্ষমতা এবং ব্যবহারিক পরিস্থিতিতে সেই জ্ঞানকে বিজ্ঞতার সাথে প্রয়োগ করার ক্ষমতা উভয়ই জড়িত

7. **Xin (জিন);** কনফুসিয়ানিজমে, জিন এর অর্থ বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা। এটি রেন (উদারতা), ই (ধার্মিকতা), লি (স্বত্বা) এবং ঝি (প্রজ্ঞা) সহ পাঁচটি ধ্রুবক (ক্লাসিক) গুণের মধ্যে একটি। জিন এর তাৎপর্য হল নিজের কথার প্রতি সত্য থাকা এবং কর্ম এবং চরিত্র উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বাসের যোগ্য হওয়া। এটি সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ অর্জনের জন্য একটি মৌলিক গুণ হিসাবে বিবেচিত হয়।

8. **Tian (তিয়ান);** কনফুসিয়ানিজমে, "তিয়ান" সাধারণত "স্বর্গ" ("Heaven") হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি একটি শক্তিশালী, অথচ নৈর্ব্যক্তিক বা নিরপেক্ষ শক্তিকে বোঝানো হয়েছে; যা মহাবিশ্ব এবং নৈতিক শৃঙ্খলা পরিচালনা করে। এটি কোনও ব্যক্তিগতকৃত দেবতা নয় বরং প্রাকৃতিক জগৎ, নিয়তি এবং সঠিক ও ভুলের নীতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন একটি ধারণা। কনফুসীয়রা বিশ্বাস করেন যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নীতিবান জীবন লাভের জন্য তিয়ানকে বোঝা এবং তার সাথে নিজেকে সংযুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

9. ***Shu*** **(শু)** কনফুসিয়ানিজমে, শু এর অর্থ " যথাযথ বিবেচনা" বা "পারস্পরিকতা"। এটির তাৎপর্য হল "নিজের জন্য যা চাও না তা অন্যদের সাথে করো না"। এই নীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে এখানে। মূলত অন্যদের অনুভূতি এবং চাহিদার প্রতি সহানুভূতি এবং বোঝাপড়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কনফুসীয় নীতিশাস্ত্রে শু হল একটি মূল নীতি, রেন (দয়া) এবং লি (আচার-অনুষ্ঠানের নিয়ম) এর মতো ধারণাগুলির পাশাপাশি বিদ্যমান। ।

10. ***de*** **দে (পুণ্য virtue)** এগুলি একসাথে পুন্য গঠন করে বলে কনফুসিয়ানিজমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কনফুসিয়ানিজমে,

দে প্রায়শই "পুণ্য" বা "নৈতিক শক্তি" হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়, এটি একটি কেন্দ্রীয় ধারণা যা অন্তর্নিহিত চরিত্র, নৈতিক উৎকর্ষতা এবং নৈতিক কর্তৃত্বের মাধ্যমে অন্যদের প্রভাবিত করার ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। এটি কনফুসীয় নীতিশাস্ত্র এবং নেতৃত্বের একটি মূল উপাদান। এটা বলা হয় যে নেতৃত্ব শক্তি বা বলপ্রয়োগের পরিবর্তে নিজের গুণাবলীর বিকাশের মাধ্যমে উদ্‌ভূত শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে হয়। উপরের আলোচনা হতে বোঝা যায়, কনফুসিয়ানিজম সমাজে মানুষদের মধ্যে সঠিক সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে; যার মধ্যে রয়েছে শাসক ও প্রজা, পিতামাতা ও সন্তান, সমাজ ও মানুষ, স্বামী ও স্ত্রী, সমাজে বড় ও ছোট, এবং বন্ধু বান্ধব।

কনফুসিয়ানিজম, তাওবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম;

কনফুসিয়ানিজম, তাওবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম চীন দেশের তিনটি প্রধান দার্শনিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য, যা প্রায়শই "তিনটি শিক্ষা" নামে পরিচিত । কনফুসিয়ানিজম সামাজিক শৃঙ্খলা এবং নীতিশাস্ত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, সঠিক সম্পর্ক এবং নৈতিক আচরণের উপর জোর দেয়। অন্যদিকে, তাওবাদ প্রকৃতি এবং তাও (পথ) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের উপর জোর দেয়। ভারতে উৎপত্তিপ্রাপ্ত বৌদ্ধধর্ম, দুঃখকষ্ট এবং অস্তিত্বের প্রকৃতির মতো অস্তিত্বগত উদ্বেগগুলিকে সম্বোধন করে, জ্ঞানার্জন এবং মুক্তির লক্ষ্যে। চীনের ইতিহাসে কনফুসিয়ানিজম, তাওবাদ এবং বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন ও প্রাধান্য লাভের বিশেষ সময়কাল ছিল, প্রায়শই একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া (interacting) এবং প্রভাব বিস্তারকারী (influencing each other) হয়েছিল, কিন্তু এই তিনটি দর্শন বা মতবাদ সমানভাবে সহাবস্থান করেনি বলে চীনা প্রাচীন ইতিহাস বলে। আমরা উপরের বিস্তৃত আলোচনা থেকে বুঝেছি সামাজিক শৃঙ্খলা এবং নীতিশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত কনফুসিয়ানিজম, নির্দিষ্ট রাজবংশের সময়, বিশেষ করে সং রাজবংশের সময় বিশেষ প্রভাবশালী দর্শন ছিল। প্রকৃতির সাথে

সামঞ্জস্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া তাওবাদ দর্শন বিশেষ করে তাং রাজবংশের সময়কালে বিস্তার ও প্রাধান্য লাভ করে। ভারতে প্রথম প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম চীনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষ করে হান এবং তাং রাজবংশের সময়, এবং এর প্রভাব শিল্প, স্থাপত্য এবং নতুন বিদ্যালয়-শিক্ষার বিকাশ ঘটে। (Ref. AI Search Lab, Google)। পণ্ডিতদের বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায়, কনফুসিয়াসের শিক্ষা ও দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কনফুসিয়ানিজম বহু শতাব্দী ধরে চীনা সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার বা ঐতিহ্যের মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি সম্পর্ক, শ্রেণিবিন্যাস এবং নৈতিক আচরণের উপর জোর দেয়। হান রাজবংশের সময়, কনফুসিয়ানিজম সরকারি রাষ্ট্রীয় আদর্শে পরিণত হয়, যা শিক্ষা, শাসনব্যবস্থা এবং সামাজিক রীতিনীতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। যদিও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কনফুসিয়ানিজম প্রভাবশালী ছিল, কিন্তু এর গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে, বিশেষ করে যখন বৌদ্ধধর্ম এবং তাওবাদের মতো বলিষ্ঠ দর্শন চীন দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। যদিও কনফুসিয়ানিজম, তাওবাদ এবং বৌদ্ধধর্মকে প্রায়শই চীনা সমাজের "তিনটি স্তম্ভ" হিসেবে দেখা হয়েছে, সময়ের সাথে সাথে তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ওঠানামা করেছে, এক দর্শনের সময়কাল প্রাধান্য পেয়েছে যখন অন্যগুলি প্রান্তিক বা সহ্য করা হয়েছে। প্রত্যেকেই চীনা সংস্কৃতির সমৃদ্ধি এবং জটিলতায় অবদান রেখেছেন এবং আধুনিক চীনা সমাজে তাদের অব্যাহত প্রভাব অনুভূত হয়। কনফুসিয়ানিজম সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। এখন তাওবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কিছু কথা বলব; না হলে আমরা কনফুসিয়ানিজম আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে না।

তাওবাদ:

তাওবাদ, বা দাওবাদ, একটি চীনা দর্শন যা মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করে, যা তাও নামে পরিচিত। এটি সরলতা, প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহজ সরল জীবনযাপন দ্বারা দীর্ঘ জীবন ও অমরত্ব অর্জনের পথ

নির্দেশ করে। চীনের হান এবং তাং রাজবংশের সময় তাওবাদ বিশেষভাবে প্রভাবশালী হয়েছিল এবং শিল্প, চিকিৎসা এবং মার্শাল আর্ট সহ চীনা সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে এর প্রভাব দেখা যায়। "Taoism is a Chinese philosophy and religion emphasizing living in harmony with the Tao, often translated as "the way" or "the path". It stresses simplicity, naturalness, and the balance of opposing forces (yin and yang). While not a strict religion in the traditional sense, Taoism incorporates elements of folk religion and spirituality, including reverence for deities and spirits." (Ref. AI Search)। তাও হলো মুখ্য কেন্দ্রীয় ধারণা, যা মহাবিশ্বের মৌলিক নীতি বা শৃঙ্খলার পরিচয় দেয়। এটি প্রায়শই সমস্ত বস্তুর স্বাভাবিক অস্তিত্বের স্বাভাবিক প্রবাহ হিসাবে বর্ণনা করে। অভ্যন্তরীণ শান্তি গড়ে তোলা এবং তাও-এর সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে অনুশীলন হল তাওবাদের অন্যতম পথ বা উপায়। তাওবাদের মধ্যে পূর্বপুরুষদের পূজা, আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং দেবতাদের পূজার মতো অভ্যাস বা অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত। কনফুসিয়ানিজমের পর চীনা চিন্তাধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল তাওবাদ যা যুগ যুগ ধরে চীনের জনজীবনকে পরিচালিত করছে। তাওইজম বা তাওবাদ যদিও কনফুসিয়ানিজম থেকে অনেকটা আলাদা, তবে এই দুটি দর্শন বা মতবাদ পরস্পরবিরোধী নয়। তাও রাষ্ট্রীয় বিষয়, শাসনতন্ত্র, প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে কোন আলকপাত করেনি অথবা আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেয়নি। তাওবাদ বরং এটি জনসাধারণের কর্তব্য এড়িয়ে আত্মার অতীন্দ্রিয় জগতের একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান করতে উৎসাহিত করে।

বৌদ্ধধর্ম:

এবার আসি চীন দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও বিস্তার। চীনে বৌদ্ধধর্ম তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্ব বহন করে, যা এর সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য এবং দার্শনিক দিকগুলিকে বিশেষভাবে হাজার হাজার বৎসর ধরে পরিচালিত করে আসছে। এটি হান রাজবংশের সময় চালু হয়েছিল

এবং এবং ধীরে ধীরে তাং রাজবংশের সময় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।এটি চীনা সমাজের সকল স্তরকে প্রভাবিত করেছিল। তিব্বতের মতো অঞ্চলে সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং অস্থিরতা দূর করতে বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা ছিল অসামান্য। এটি মননশীলতা, ধ্যান এবং নীতিগত আচরণের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানার্জন এবং দুঃখকষ্টের অবসানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বৌদ্ধধর্ম চীনা সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল, শিল্প, স্থাপত্য এবং নতুন চিন্তাধারার বিকাশকে প্রভাবিত করেছিল। AI search থেকে জানা যায় বৌদ্ধধর্ম সম্রাট সহ সকল সামাজিক শ্রেণীর মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এমনকি রাজনৈতিক দৃশ্যপটকেও প্রভাবিত করে। তাং রাজবংশের সময়, বৌদ্ধ বিহারগুলি ধনী এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে, যা এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব প্রদর্শন করে। শত শত বছর ধরে বৌদ্ধধর্ম, কনফুসিয়ানিজম এবং তাওবাদ চীনা সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যা প্রায়শই "তিনটি শিক্ষা বা দর্শন হিসাবে জনপ্রিয় । তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সহাবস্থান করেছে এবং একে অপরকে প্রভাবিত করেছে, সামাজিক কাঠামো, আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকে রূপ দিয়েছে। যদিও প্রত্যেকের নিজস্ব স্বতন্ত্র লক্ষ্য রয়েছে, তবুও এই তিনটি দর্শন চীন সাম্রাজ্যে স্ব-অনুশীলন এবং সম্প্রীতির উপর সমান ভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। কনফুসিয়ানিজমের ফোকাস হল সামাজিক শৃঙ্খলা, নীতিশাস্ত্র এবং সঠিক সম্পর্ক; বৌদ্ধধর্মের ফোকাস হল দুঃখকষ্ট, অস্থিরতা এবং অস্তিত্বের প্রকৃতির মতো অস্তিত্বগত উদ্বেগের সমাধান করা এবং তাওবাদের ফোকাস হল তাও (পথ), প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন। সংক্ষেপে: যদিও তাদের প্রাথমিক লক্ষ্যের দিক থেকে স্বতন্ত্র, এই তিনটি ঐতিহ্য চীনা সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, প্রায়শই একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া এবং পরিপূরক। কনফুসিয়ানিজম সামাজিক শৃঙ্খলার উপর জোর দেয়, তাওবাদ প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যের উপর জোর দেয় এবং বৌদ্ধধর্ম অস্তিত্বগত উদ্বেগগুলিকে সম্বোধন

করে. বৌদ্ধধর্ম, তাওবাদ এবং কনফুসিয়ানিজম স্বতন্ত্র কিন্তু আন্তঃসম্পর্কিত চিন্তাভাবনা এবং অনুশীলনের ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে যা চীনা সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিকতাকে গভীরভাবে গঠন করেছে। এগুলো সবই একটি অর্থপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, তা সে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে হোক, প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান হোক বা একটি সুরেলা সমাজ গঠনে অবদান রাখার মাধ্যমে হোক। তবে কনফুসিয়াসের শিক্ষা মূলত নৈতিক এবং সামাজিক। তাঁর দর্শন সামাজিক সম্প্রীতি প্রচারের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে, যেমন প্রায়শই ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ধার্মিকতা, মানবতা, উন্নত সামাজিক দৃষ্টি এবং সৎ চরিত্র গঠন। এই প্রসঙ্গে তাঁর দর্শন সম্পর্কে Britannica Encyclopaedia থেকে সংগৃহীত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরছি।

কনফুসিয়াস তাঁর বিভিন্ন গঠনমূলক কাজ ও দর্শনের জন্য যে ব্যক্তির প্রতি তিনি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা এবং নির্দেশনার জন্য ফিরে তাকাতেন তিনি হলেন ঝোগং (ঝো-এর ডিউক) - ঝো রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার ভাই এবং রাজার ছোট ছেলে চেংওয়াং-এর শাসক। কনফুসিয়াস বিশ্বাস করতেন যে তিনি এবং ঝো-এর ডিউক তাঁদের দুজনেরই রাজবংশের জন্য একই লক্ষ্য ছিল এবং সেটা হল সামাজিক সম্প্রীতি এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যা বিশ্বাস এবং পারস্পরিক নৈতিক বাধ্যবাধকতার উপর ভিত্তি করে, যেখানে আইনী নিয়মের প্রয়োগ ন্যূনতম। আমাদের মনে রাখতে হবে ঝো-এর ডিউক ছিলেন ঝো-রাজপরিবারের সদস্য এবং কনফুসিয়াস ছিলেন একজন পেশাদার আমলা, যার অর্থ হল প্রশাসনে তাঁর সীমিত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব; এমনকি তাঁর অধিকারী কর্তৃত্বও ক্ষণস্থায়ী ছিল। কিন্তু লক্ষ্য দুজনের এক ছিল। কনফুসিয়াস সব সময় সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্টগুলি হল, নৈতিকতা, সততা ও সহযোগিতা। কনফুসিয়াস যখন বেকার ছিলেন তখন তিনি ভীষণ দুঃখ পেতেন এই ভেবে যে বিশ্বের কোন কাজে লাগতে পারছেন না এবং

সমাজের কাজে সুজোগ ও সহায়তা না পাওয়ার জন্য তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন। (উৎস; https://www.britannica.com/)

কনফুসিয়ানিজম ব্যক্তিদের মধ্যে সঠিক সম্পর্কের গুরুত্বের উপর সব চেয়ে বেশি জোর দেয়; যার মধ্যে রয়েছে শাসক ও প্রজা, পিতামাতা ও সন্তান, স্বামী ও স্ত্রী, প্রবীণ ও ছোট, এবং বন্ধু। কনফুসিয়ানিজম সব সময় সদ্গুণ, সঠিক সম্পর্ক এবং সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলার মাধ্যমে একটি সুরেলা সমাজ তৈরি করতে চায়। মৃত্যুর সময় তাঁর শিক্ষার ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে তাঁর নিজের সন্দেহ ছিল; পরবর্তীকালে তাঁর অনুসারীরা তাঁর জ্ঞান সংরক্ষণ এবং তাঁর দর্শন প্রচার করেছিলেন, যা কনফুসিয়ানিজম নামে চীনা দর্শন ও সংস্কৃতির ভিত্তি হয়ে ওঠে।

শেষ জীবন ও মৃত্যু

নানা কারণে নিজের দেশ লু-রাজ্য ছেড়ে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে নিয়ে বহু রাজ্যে তাঁর নীতি ও সততার শিক্ষা ও বাস্তব জীবন দর্শন প্রচার করেন এবং বহু রাজ্যের রাজাদের সহজ সরল প্রজাহিতকর রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ দর্শন সম্পর্কে সু-পরামর্শ দিয়ে বেড়ান। বহু রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর অভুতপূর্ব শিক্ষা, দীক্ষা ও সহজ-সরল বাস্তব জীবন-দর্শনে বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছিল। তাঁর অসাধারণ রাষ্ট্র নীতি এবং সমাজ জীবনের শিক্ষা ও দর্শনের ঐ অঞ্চলের বহু রাজার পথ-প্রদর্শক ছিলেন। যাইহোক শেষজীবনে লু রাজ্যের রাজার বিশেষ আমন্ত্রণে মহাপুরুষ কনফুসিয়াস তাঁর জন্মস্থান লু রাজ্যে ফিরে আসেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ বৎসর। যদিও তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁর শিক্ষা তাঁর জীবদ্দশায় সমাজে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলেনি, কনফুসিয়ানিজম পরবর্তীতে চীনে একটি প্রভাবশালী দার্শনিক এবং নীতিশাস্ত্র ব্যবস্থায় পরিণত হয়। কনফুসিয়াসের শেষ জীবনে নিজের দেশে ফিরে এসেছিলেন বহু বছর ধরে স্ব-আরোপিত নির্বাসন এবং অন্যান্য বহু রাজ্য ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতা লাভের পর। ফিরে আসার পর, তিনি অতীতের জ্ঞান শিক্ষা এবং প্রেরণে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, পাঁচটি ধ্রুপদী ধর্মের উপর

মনোনিবেশ করেছিলেন। ঐ রাজ্যের রাজার ব্যবস্থাপনা ও সহায়তায় তিনি তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলি ক্লাসিক সাহিত্য শিক্ষা এবং সম্পাদনা করে কাটিয়েছিলেন। তিনি লুতে সরকারি কর্মকর্তাদের উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করেছিলেন, শাসন ও অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেছিলেন। ঐ সময় কনফুসিয়াস অনেক ব্যক্তিগত ক্ষতির সম্মুখীন হন, যার মধ্যে ছিল তার পুত্র এবং একজন প্রিয় শিষ্যের মৃত্যু। এই ঘটনাগুলি, তার সময়ের শাসকদের প্রতি তার হতাশার সাথে মিলিত হয়ে, তাকে বিশ্বাস করতে পরিচালিত করে যে তার শিক্ষাগুলি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেনি। তিনি কুফুতে মারা যান, তার শেষ কথাগুলি শাসকরা তার দর্শন পুরোপুরি উপলব্ধি করতে না পারার জন্য তার অনুশোচনাকে প্রতিফলিত করে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, কনফুসিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর শিক্ষা, দর্শনের গুরুত্ব ও মাহাত্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তাঁর শিষ্যরা বিশেষ করে মেনসিয়াস এবং জুনজি, তার শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে থাকে এবং কনফুসিয়ানিজম চীনা চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতিতে একটি প্রভাবশালী শক্তি হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে হান রাজবংশের সময় এটি সরকারী সাম্রাজ্যবাদী আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয় এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চীনা সমাজ ও চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে আসছে। AI Search থেকে জানা যায়, প্রখ্যাত চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৯ সালের ২১ নভেম্বর চীনের কুফুতে ৭২বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি শানডং প্রদেশের কুফুতে মারা যান। তিনি স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণেই মারা যান। উল্লেখ্য তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে, তাঁর ছেলে, জু-লু, যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, যা তার ভীষণ দুঃখের কারণ বলে মনে করা হয়। সেই দুঃখ কনফুসিয়াসের মৃত্যুর কিছুটা কারণ বলে অনেকে মনে করতেন।

কনফুসিয়াসের কালজয়ী অমৃত বাণী;

কনফুসিয়াসের (Confucius) বাণী, যা মূলত শিক্ষা, নৈতিকতা, এবং সমাজের উপর জোর দেয়, তাঁর বিখ্যাত শিক্ষা ও দর্শনমূলক বাণীগুলির মধ্যে ২০টি উল্লেখযোগ্য বাণী এখানে তুলে ধরা হলো।

পৃথিবীর বহু দেশ কনফুসিয়াসের দর্শন ও বানী দুই শতাব্দী ধরে অনুসরণ করে আসছে।

1. **"Do not do to others what you do not want done to you"** This is one of Confucius' most famous sayings, known as the Golden Rule. **"যা তুমি নিজের জন্য চাও না, তা অন্যকে করো না"**:এটি কনফুসিয়াসের সবচেয়ে বিখ্যাত বাণীগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা সুবর্ণ নিয়ম নামে পরিচিত।
2. **"To be aware of one's own ignorance is true knowledge"**: This saying emphasizes the acquisition of knowledge and highlights the importance of self-observation. **নিজের অজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া হলো প্রকৃত জ্ঞান"**: এই বাণীটি জ্ঞান অর্জনের ওপর জোর দেয় এবং আত্ম-পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে.
3. **"Study without reflection is a waste of time"**: This saying emphasizes the importance of education as well as self-discovery. **"প্রতিফলন ছাড়া অধ্যয়ন সময়ের অপচয়"**:এই বাণীটি শিক্ষার গুরুত্বের সাথে সাথে আত্ম-অনুসন্ধানের ওপর জোর দেয়.
4. **"If moral character does not improve among people, it is not possible to restrain people through law alone"** :It emphasizes morality and gives more importance to morality than to the law. **"মানুষের মাঝে যদি নৈতিক চরিত্রের উন্নতি না ঘটে, শুধুমাত্র আইন দিয়ে মানুষকে সংযত রাখা সম্ভব নয়"**: এটি নৈতিকতার উপর জোর দেয় এবং আইনের চেয়ে নৈতিকতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়.
5. **"Everything has beauty but not everyone sees it"**: This saying emphasizes a positive outlook on life and an appreciation of beauty. **"সবকিছুরই সৌন্দর্য আছে**

কিন্তু সবাই তা দেখতে পায় না": বাণীটি জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সৌন্দর্য উপলব্ধির উপর জোর দেয়.

6. **"Do not befriend anyone who is not your equal"** :It emphasizes quality in friendship and establishing equal relationships. **"নিজের সমকক্ষ নয় এমন কাউকে বন্ধু কোরো না"**:এটি বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে গুণগত মান এবং সম-মানসম্পন্ন সম্পর্ক স্থাপন করার ওপর জোর দেয়.
7. **"Silence is a true friend that never betrays"**: This saying emphasizes silence and truth. **"নীরবতা সত্যিকারের বন্ধু যা কখনই বিশ্বাসঘাতকতা করে না"**: এই বাণীটি নীরবতা এবং সত্যের প্রতি গুরুত্ব দেয়.
8. **"An oppressive government is more dangerous than a tiger"**: This saying conveys a powerful message, which speaks of resistance against oppressive rule. **"নিপীড়ক সরকার বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর"**: এই বাণীটি একটি শক্তিশালী বার্তা দেয়, যা নিপীড়ক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কথা বলে.
9. **"Food can never be too clean, and meat can never be too lean"** :This saying emphasizes moderation and moderation in food. **খাবার কখনই খুব পরিষ্কার হতে পারে না, এবং মাংস কখনই খুব পাতলা হতে পারে না"**:এই বাণীটি খাদ্য বিষয়ক সংযম ও পরিমিতির উপর জোর দেয়.
10. **"Meat should be eaten in moderation"** This saying emphasizes moderation and a life of moderation. মাংস পরিমিতভাবে খাওয়া উচিত" বাণীটি সংযম ও পরিমিত জীবনের উপর জোর দেয়.
11. Life is basically simple, but we complicate ourselves by overthinking, expecting, and creating unnecessary

complications.; প্রকৃত অর্থে জীবন সরল, কিন্তু আমরা একে জটিল করি।

12. **The wisest and the most foolish people never change.**" সবচেয়ে জ্ঞানী এবং সবচেয়ে নির্বোধ লোকেরা কখনো বদলায় না।
13. **A good person acts before he speaks, and speaks after acting according to his actions.** উৎকৃষ্ট লোক বলার পূর্বে করে থাকে, এবং পরবর্তী সময়ে তার কর্ম অনুযায়ী বলে থাকে।
14. When anger arises, think about the consequences; যখন রাগ ওঠে, তখন পরিণতি নিয়ে ভাবুন।
15. "**Time flows like a river**."সময় নদীর জলের মতো বয়ে যায়।"
16. "**Where there is work, there is joy**.""যেখানে কাজ আছে, সেখানেই আনন্দ।"
17. **"Learning is only useful if we connect the learning in our own minds, to what we already know and what is useful to us". "শিক্ষা তখনই উপযোগী হয় যদি আমরা আমাদের নিজেদের মনের মধ্যে শিক্ষাকে সংযুক্ত করি, যা আমরা ইতিমধ্যে জানি এবং যা আমাদের জন্য উপযোগী।"**
18. "**Do your job well." "Keep your promise**."আপনার কাজটি ভালোভাবে করুন।" "আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।"
19. "**Be good to your neighbors**.""আপনার প্রতিবেশীদের প্রতি ভালো ব্যবহার করুন।"
20. **"Life is a journey." "Love life**.""জীবন হল একটি যাত্রা।" "জীবনকে ভালোবাসুন।"

শুধুমাত্র চীন নয় সারা পৃথিবীতে কনফুসিয়াস তাঁর প্রজ্ঞা এবং তাঁর দর্শন কনফুসিয়ানিজম প্রতিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত। শিক্ষা ও দর্শন

বিষয়ে কনফুসিয়াসের মরণোত্তর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব কোনও অতিপ্রাকৃত কীর্তি নয়, বরং চীনা চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতির উপর তার গভীর প্রভাব অতি স্বাভাবিক। কারণ কনফুসিয়ানিজমের লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিদের নৈতিক উৎকর্ষতা ও সামাজিক পরিপূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করা; যা স্ব-শিক্ষা, শিক্ষাদান এবং নৈতিক দায়িত্ব মেনে চলার মাধ্যমে অর্জিত হয়। সেই জন্যই কনফুসিয়াসের শিক্ষা ও দর্শন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চীনা সংস্কৃতি, নীতিশাস্ত্র এবং শাসনব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ব্রিটানিকা এনসাইক্লোপেডিয়া তথ্য অনুসারে কনফুসিয়াস শুধুমাত্র একজন দার্শনিক বা শিক্ষক নয়; সেই সঙ্গে একজন ঋষি হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন।

৫- সেন্ট পল দ্য অ্যাপোস্টেল

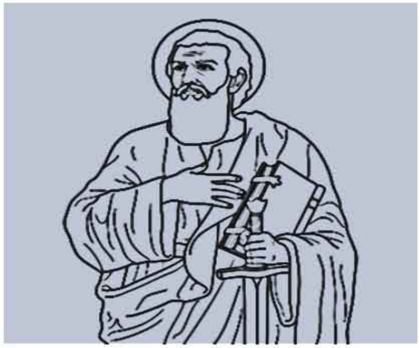

ভারতে সেন্ট পলের প্রতি নিবেদিত অসংখ্য গির্জার সংখ্যা বলা কঠিন হলেও, সেন্ট পলের মিশন অফ ইন্ডিয়া নামে আমাদের দেশে অসংখ্য গির্জা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কলকাতার সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কলকাতা শহরে সেন্ট পল এর নামে একাধিক স্কুল রয়েছে। ভারত বর্ষে দশটির বেশি এই নামে বিদ্যালয় রয়েছে। সারা বিশ্বে এই নামে অসংখ্য গির্জা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাহলে আমাদের সবার জানা দরকার এই সেন্ট পল কে? কেন তিনি সারা বিশ্বে এত বিখ্যাত। খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে, সেন্ট পলকে প্রায়শই বিশ্বের বৃহত্তম ধর্ম খ্রিস্টধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাঁর প্রথম নাম হল পল ফ্রান্সিস ড্যানেই (Paul Francis Danei) তাঁর আর একটি নাম হল শৌল (টারসাসের শৌল) তিনি পরবর্তী কালে পল দ্য অ্যাপোস্টেল এবং সেন্ট পল নামে পরিচিত হয়েছিলেন। টারসাসের শৌল সেন্ট পলে রূপান্তরিত হয়েছিলেন । এর কারণ হল তার বাবা-মা তাকে যে হিব্রু নাম দিয়েছিলেন তা ছিল শৌল, কিন্তু যেহেতু তার বাবা একজন রোমান .নাগরিক ছিলেন এবং তাই শৌল উত্তরাধিকারসূত্রে রোমান নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন. শৌলের ল্যাটিন নাম হল পল। ধর্মান্তরিত হওয়ারপর শৌল নামটি পলে রূপান্তরিত হয়।

সাধু পৌল প্রথম জীবনে ছিলেন খ্রিষ্টধর্মবিদ্বেষী ও খ্রিস্টানদের প্রতি অত্যাচারী একজন ইহুদি । কিলিকিয়ার তার্য শহরে তার জন্ম, এই শহরেই তিনি বড় হন। শিক্ষক গমলিয়েলের কাছে তিনি ইহুদিধর্ম

সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কঠোরভাবে ইহুদি নিয়ম-কানুন পালন করতেন। যীশুর পথে যারা চলতেন তিনি তাদের অত্যাচার করে হত্যা করতেন। ইহুদি মহাপুরোহিত ও ধর্ম নেতাদের আদেশে খ্রিস্টানদের বন্দী করতেন। শৌলের পলে ধর্মান্তরিত হওয়ার একটি কাহিনী বাইবেলে বর্ণিত রয়েছে। সেই বিবরণে দামেস্কের পথে যীশুর সাথে শৌলের নাটকীয় সাক্ষাতের কথা লেখা হয়েছে, যার ফলে ধর্মান্তরিত হয়ে তিনি পলে রূপান্তরিত হন। খ্রিস্টধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাধুদের একজন হিসেবে সেন্ট পলকে বিবেচনা করা হয়।

যদিও সেন্ট পল যীশু খ্রিস্টের আদি বারোজন প্রচারক বা Apostles এর মধ্যে একজন ছিলেন না, তবুও তিনি নিউ টেস্টামেন্টের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানকারীদের একজন ছিলেন। নিউ টেস্টামেন্টের সাতাশটি বইয়ের মধ্যে, তেরো বা চৌদ্দটি বই প্রচলিতভাবে সেন্ট পলের লেখা। অনেক পণ্ডিতের বিশ্লেষণ অনুসারে, তেরো বা চৌদ্দটি পৌলের পুস্তক বা পত্রের মধ্যে মাত্র সাতটি বই সম্পূর্ণরূপে প্রামাণিক এবং সেন্ট পল দ্বারা নির্দেশিত বলে গৃহীত হয়েছে। তার পত্র এবং বইগুলি খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের উপর, বিশেষ করে ঈশ্বর পিতা এবং ঈশ্বরের পুত্র যীশুর মধ্যে সম্পর্ক এবং ঈশ্বরের সাথে আধ্যাত্মিক মানব সম্পর্কের উপর বিশাল প্রভাব ফেলেছে। সেন্ট পল খ্রিস্টধর্মের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যদিও তিনি মনে করতেন যে ইহুদি এবং অইহুদী উভয়কেই খ্রিস্ট ধর্মে এক নতুন মানবতার আদর্শে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল, তার মিশন বা উদ্দেশ্যগুলি ছিল মূলত অইহুদীদের ধর্মান্তরিত করা এবং খ্রিস্টধর্মের বিকাশ করা। তিনি ক্রুশের সেন্ট পল (St Paul of the Cross) নামেও পরিচিত ছিলেন।

প্রাথমিক জীবন (Early Life)

সেন্ট পল অফ দ্য ক্রস, বা পল ফ্রান্সিস ড্যানেই, ১৬৯৪ সালে ইতালির জেনোয়ার কাছে এক বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সংগৃহীত তথ্য অনুসারে যীশুর জন্মের প্রায় একই সময়ে

(আনুমানিক ৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) অথবা তার কিছু পরে সেন্ট পল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রায় ৩৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্ট বিশ্বাসে ধর্মান্তরিত হন। তিনি একজন রোমান নাগরিক ছিলেন। তিনি টারসাস শহরের এক ধর্মপ্রাণ ইহুদি পরিবারের সন্তান ছিলেন। টারসাস হল তুরস্কের একটি শহর, যা দক্ষিণ-পশ্চিম তুরস্কের মের্সিন প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত। এটি টারসাস নদীর তীরে অবস্থিত। গত দুই শতক এটি সেন্ট পলের জন্মস্থান হিসেবে বেশি পরিচিত। আগেই বলেছি সেন্ট পলের ইহুদি নাম ছিল "শৌল"। সম্ভবত বাইবেলের রাজা শৌলের নামানুসারে তাঁর পরিবারের নাম ছিল শৌল। বাইবেলের রাজা শৌল ইস্রায়েলের প্রথম রাজা ছিলেন। গ্রেট আলেকজান্ডারের সময় থেকে টারসাস এশিয়া মাইনরের সবচেয়ে প্রভাবশালী শহরগুলির মধ্যে একটি ছিল। টারসাস ছিল রোমান প্রদেশ সিলিসিয়ার রাজধানী শহর এবং বর্তমানে তুরস্কের মেরসিন শহর নামে পরিচিত। শৌলের জন্ম ১৬৯৪ সালের ৩রা জানুয়ারী উত্তর ইতালির ওভাদা শহরে। মার্ক এবং আনা মারিয়া মাসারি ছিলেন তাঁর পিতা-মাতা। পিতা একটি প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য ছিলেন। তবুও পরবর্তী সময় তাঁর পরিবারটি ধীরে ধীরে দারিদ্র্যের মধ্যে চলে যায়। শৌল (পল) ছিলেন তাঁর পিতা মাতার ষোল সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান। ষোল সন্তানের মধ্যে এগারো জন শৈশবেই মারা যান। তাই শৌল (পল) তাঁর নিজের পরিবারে তাঁর ছোটবেলায় দারিদ্র্যের জীবন ও পরিবারে অনেক মৃত্যুর বাস্তবতা এবং জীবনের অনিশ্চয়তা সহজেই উপলব্ধি করতে শিখেছিলেন।

শিক্ষা ও কর্ম জীবন

পল প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন একজন পুরোহিতের কাছে। ঐ পুরোহিত লম্বার্ডির ক্রেমোলিনোতে ছেলেদের একটি স্কুল পরিচালনা করতেন। ঐ পুরোহিতের কাছে পড়াশুনা করে পল যথেষ্ট উন্নতি করেন এবং পনেরো বছর বয়সে তিনি স্কুল ছেড়ে নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন। তার প্রাথমিক বছরগুলিতে তিনি তার বাড়ির কাছের গির্জাগুলিতে জিজ্ঞাসাবাদ এবং প্রশ্নোত্তরের

মাধ্যমে ধর্মীয় বিষয়গুলির সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। তার শৈশব এবং যৌবন কেটেছে অত্যন্ত ত্রুটিহীনতা , অপরাধহীনতা এবং ধার্মিকতার মধ্যে। তিনি ঐ সময় একটি সঙ্ঘ বা গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পৌল যখন ছোট ছিলেন, তখনই তাঁকে বিখ্যাত ইহুদি শিক্ষক গামলীয়েলের স্কুল থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য জেরুজালেমে পাঠানো হয়েছিল। জেরুজালেমে ইহুদি শিক্ষা লাভ করেছিলেন, বিখ্যাত রাব্বি গামালিয়েলের অধীনে পড়াশোনা করেছিলেন। গমলীয়েল ছিলেন একজন বিখ্যাত ইহুদি শিক্ষক। খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যে, গমলীয়েলকে একজন ফরীশী ডাক্তার এবং ইতিহাসে ইহুদি আইনের শিক্ষক হিসেবে পরিচিত ছিলেন । জেরুজালেমে গামালিয়েলের অধীনে তাঁর শিক্ষা পলকে ইহুদি আইন ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও ধারণা প্রদান করে।

পল তারসাসে তাঁবু তৈরির (চামড়ার কাজ) ব্যবসা শিখেছিলেন, যা তিনি তার সারা জীবন ধরে অনুশীলন করেছিলেন, এমনকি তার মিশনারি যাত্রার বা ভ্রমণের সময় ব্যবহার করতেন। পল গমলীয়েলের কাছ থেকে অনেক ধর্ম শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর বাবা তামাক ও শুকনো জিনিসপত্রের একটি ছোট দোকান চালাতেন এবং তাঁর ব্যবসায়িক ব্যাপারে খারাপ অবস্থার কারণে এবং পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য পরিবারকে ঘন ঘন এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত হতে হত। ফলস্বরূপ, পলের খুব স্কুলে পড়াশুনা অনিয়মিত ছিল। খুব কম বয়স থেকেই পারিবারিক ব্যবসায় তিনি তাঁর বাবাকে সাহায্য করতেন। তিনি সর্বদা একজন ধার্মিক এবং কঠোর ক্যাথলিক জীবনযাপন করতেন। ১৯ বছর বয়সে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু পরের বছরই সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে যান। সংগৃহীত তথ্য অনুসারে তাঁকে একজন দক্ষ কারিগর এবং ইহুদি ধর্ম ও আইনের একজন জ্ঞানী পণ্ডিত হিসেবে বিবেচনা করা হত।

ফরীশীদের উৎসাহ

ধর্মান্তরের পূর্বে পল ছিলেন একজন ফরীশী। তাঁর সময়ে ফরীশী ছিল সবচেয়ে ধর্মীয়ভাবে রক্ষণশীল ইহুদি গোষ্ঠী। ফরীশীরা ইহুদি

আইন ও রীতিনীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য পরিচিত ছিল। বা আইনের ঐতিহ্যের প্রতি ফরীশীর নিষ্ঠার জন্য সুসমাচারে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যীশুর দিনের ফরীশীদের বিশেষ গুনগত বিশিষ্টতা ছিল। যেমন আইনবাদী, আত্ম-ধার্মিক, এবং আত্ম-মর্যাদা সম্পন্ন ছিল । তারা সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মানুষ ছিল এবং তারা যাকে "সঠিক পথ" বলে মনে করত তাকে সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করত। তারা মনে করত যে এই সকলগুলি তাদেরকে প্রভুর সামনে পবিত্র রাখে। যদিও যীশুর প্রতি "ফরীশীদের" অবস্থান ছিল বিরোধী, তবুও তাদের মধ্যে অনেকে যীশুর গুণাবলীতেই বিশ্বাস করেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছে নিকোডেমাস (যিনি বলেছিলেন যে যীশু ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত একজন শিক্ষক)। পল সেটাই পরে বিশ্বাস করেছিলেন। তাই তিনি ধর্মান্তর করেছিলেন। একজন ফরীশী হিসেবে তাঁর প্রাথমিক জীবন তাঁর ধর্ম বিশ্বাসকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল, যার ফলে তিনি ধর্মান্তরের আগে খ্রিস্টানদের উপর নির্যাতন চালাতে শুরু করেছিলেন। His early life as a Pharisee influenced his beliefs and faith, causing him to persecute early Christians before conversion. (Source AI Report)

সেন্ট পলের জীবনে অলৌকিক ঘটনা

সেন্ট পল ঈশ্বরের প্রতিনিধি;

সেন্ট পলকে "ঈশ্বরের মানুষ" বলা হয়। খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে যীশুর পরে সেন্ট পলকে প্রায়শই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। সেন্ট পলকে "ঈশ্বরের মানুষ" বলা হয় কারণ ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস, সুসমাচার প্রচারের প্রতি নিষ্ঠা এবং খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের উপর তাঁর লেখার গভীর প্রভাব। খ্রিস্টানদের উপর নির্যাতন থেকে একজন বিশিষ্ট প্রেরিত হয়ে ওঠার জন্যও তাঁকে স্মরণ করা হয়, যা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর এক অসাধারণ পরিবর্তন এবং অঙ্গীকার প্রদর্শন করে। তাঁর গভীর রূপান্তর, উদ্যোগী মিশনারি কাজ এবং তার লেখার মাধ্যমে তিনি যে গভীর ধর্মতাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেছিলেন তা

সত্যিই বিস্ময়কর ঘটনা। দামেস্কের পথে তাঁর ধর্মান্তর নাটকীয়ভাবে খ্রিস্টানদের উপর নির্যাতনকারী থেকে বাইবেল তথা খ্রিষ্টের একজন উৎসাহী সমর্থকে পরিণত করেছিল। তাঁর এই রূপান্তর ঘটেছিল, তার অক্লান্ত প্রচেষ্টার সাথে রোমান সাম্রাজ্য জুড়ে খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। ঈশ্বর এবং তাঁর লক্ষ্যের প্রতি গভীরভাবে নিবেদিতপ্রান হিসেবে নিজেকে সুদৃঢ় করেছিলেন। বাইবেল থেকে জানা যায় যে ঈশ্বর পলকে দামেস্কের পথে ডেকেছিলেন এবং তাঁকে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করার জন্য আদেশ ও নিযুক্ত করেছিলেন। পল বলেছিলেন যে, যখন খ্রীষ্ট তাকে ডেকেছিলেন, তখন তিনি প্রেরিতদের (the apostles) কাছ থেকে নির্দেশনা গ্রহণের জন্য জেরুজালেমে যাননি। বরং, তিনি কিছু সময়ের জন্য আরবে অবসর গ্রহণ করেছিলেন এবং তিন বছর পরে তিনি জেরুজালেমে ঈশ্বরের ডাকে গিয়েছিলেন।

যদিও The New Testament এ apostle Paul এর জীবনের অনেক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে; তবুও এটি তাঁর আরব ভ্রমণ সম্পর্কে খুব কম বিশদ বিবরণ প্রদান করে। গালাতীয়দের (Galatians) কাছে লেখা তার চিঠিতে, সেন্ট পল তার খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। পল আরবে তাঁর সময়কালের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন।বাইবেলে সেন্ট পলের নিম্নবর্ণিত উক্তি উল্লেখ রয়েছে;

"When God, who had set me apart before I was born and called me through his grace, was pleased to reveal his Son to me, so that I might proclaim him among the Gentiles, I did not confer with any human being, nor did I go up to Jerusalem to those who were already apostles before me, but I went away at once into Arabia, and afterwards I returned to Damascus. (Galatians 1:15–17, NRSV)." এর বাঙলা অনুবাদ হল;

সেন্ট পল লিখেছেন "ঈশ্বর, যিনি আমার জন্মের আগে আমাকে আলাদা করেছিলেন এবং পরে অনুগ্রহ করে তিনি ডাকলেন, তিনি তাঁর পুত্রকে আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন, যাতে আমি অইহুদীদের মধ্যে তাঁর বিষয়ে প্রচার করতে পারি / তখন আমি

কোন মানুষের সাথে পরামর্শ করিনি, এবং আমার আগে যারা প্রেরিত বা প্রচারক (*apostles)* ছিলেন, জেরুজালেমে তাঁদের কাছেও যাইনি, বরং আমি তৎক্ষণাৎ আরব দেশে চলে গিয়েছিলাম, এবং পরে দামেস্কে ফিরে এসেছিলাম।"

এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন-"প্রসঙ্গত, যখন আমরা প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পড়ি, তখন আমরা ভাবতে পারি যে পল ধর্মান্তরের পর সরাসরি পরিচর্যায় অর্থাৎ ধর্মপ্রচারে যোগ দিয়েছিলেন।" কিন্তু গালাতীয়দের বই অনুসারে, ধর্মান্তরের পর কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে সেন্ট পলের নিজস্ব ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য অনুসারে। গালাতীয়দের নতুন নিয়মের নবম বইতে, সেন্ট পল উল্লেখ করেছেন যে তিনি পুনরুত্থিত যীশুর দর্শন পেয়েছিলেন, যিনি তাকে অ-ইহুদীদের কাছে প্রেরিত (Apostle) হওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। গালাতীয়দের এই চিঠিটি হল গালাতিয়ার বেশ কয়েকটি প্রাথমিক খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের কাছে প্রচারক সেন্ট পলের লেখা একটি চিঠি। বাইবেলে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে সেন্ট পল তার মিশনারি যাত্রার সময় গালাতিয়ার শহরগুলিতে ব্যক্তিগতভাবে সময় কাটিয়েছিলেন।

(বি। দ্র; গালাতীয়দের (**Galatian)** বইটি বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের একটি অংশ, যা মূলত পৌলের লেখা এবং গালাতিয়া অঞ্চলের খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি, যেখানে পৌল বিশ্বাসীদের শিক্ষা দেন যে ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ হয়, কাজের মাধ্যমে নয়, এবং তারা ঈশ্বরের বহু-জাতিগত পরিবারের অংশ।)

বিভিন্ন লেখা পড়ে জানা যায় সেন্ট পলকে ঈশ্বরের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করার আরও একটি কারণ রয়েছে পণ্ডিতদের মতে । খ্রিস্টান অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে সেন্ট পলের পত্র বা চিঠিগুলি খ্রিস্টীয় ধর্ম এবং দর্শনের উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছে, বিশেষ করে ঈশ্বর পিতা এবং যীশুর মধ্যে সম্পর্ক। প্রভু যীশুর সাথে আধ্যাত্মিক

মানবিক সম্পর্কের বিষয়টি এখানে বিশেষ ভাবে স্থান পেয়েছে। বাইবেল এবং পণ্ডিতদের বিশ্লেষণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, সেন্ট পল এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি ঈশ্বরকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তিনি মনে প্রানে চাইতেন অন্যরা খ্রিস্টের সম্পূর্ণতা (completeness of Christ) সম্পর্কে জানুক। বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায় সেন্ট পল প্রথম খ্রিস্টীয় প্রজন্মের সবচেয়ে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। এর অন্যতম কারণ হল তাঁর লেখা পত্র। তাঁর লেখা পত্রগুলি আমাদের জন্য যীশু খ্রিস্ট সম্পর্কে তথ্যের এক অসাধারণ উৎস। সেন্ট পলের চিঠিগুলি খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের একটি ভিত্তি, যা ঈশ্বর পিতা এবং যীশুর মধ্যে সম্পর্ক এবং ঐশ্বরিকের সাথে রহস্যময় মানব সম্পর্কের মতো বিষয়গুলি অন্বেষণ করেছে

যীশুর সাথে সরাসরি অথবা বাক্যের মাধ্যমে পলের তিন বছর অধ্যয়ন;

পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে পৌল ধর্মান্তরের পরপরই কমপক্ষে তিন বছর আরবে (দামেস্ক এবং আশেপাশের মরুভূমি অঞ্চলে) ছিলেন। খ্রিস্টধর্মের অনেক বইতে বলা হয়েছে যে সেন্ট পল বলেছিলেন যে যখন খ্রিস্ট তাঁকে ডেকেছিলেন, তখন তিনি প্রেরিতদের (apostles,) কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য জেরুজালেমে যাননি। বরং, তিনি তিন বছরের জন্য আরবে ছিলেন এবং পরে তিনি জেরুজালেমে চলে যান। তিন বছর পরে জেরুজালেমে পৌঁছানোর পর তিনি প্রেরিত পিতরের সাথে দেখা করেছিলেন এবং সেখানে তিনি যে একমাত্র নেতার সাথে দেখা করেছিলেন তিনি ছিলেন জেরুজালেম গির্জার সভাপতিত্বকারী প্রাচীন যাকোব। প্রায়শই মন্তব্য করা হয়েছে যে পৌল স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছিলেন যে তিনি সরাসরি বা বাক্য অধ্যয়নের মাধ্যমে তিন বছর যীশুর দ্বারা শিক্ষা পেয়েছিলেন (১:১২)। সুতরাং, অন্যান্য প্রেরিতদের মতো, পৌল জেরুজালেমে তার পরিচর্যা শুরু করার আগে তিন বছর খ্রীষ্টের সাথে অধ্যয়ন করেছিলেন (Acts 1:21)।

[......he spent three years being taught by Jesus Himself (1:12), either directly or through the study of the Word. Thus, like

the other apostles, Paul studied with Christ for three years before beginning his ministry at Jerusalem (Acts 1:21).]

সহজ কথায় বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে যে পল যীশুর সাথে সরাসরি অথবা বাক্যের মাধ্যমে তিন বছর অধ্যয়ন করেছিলেন, ঠিক যেমন অন্যান্য প্রেরিতরা (apostles)তাদের পরিচর্যা শুরু করার আগে খ্রীষ্টের সাথে অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রেরিত ১:২১ পদের উল্লেখ দ্বারা এটি সমর্থিত, যেখানে যীশুর স্বর্গারোহণের পরের সময়কাল বর্ণনা করা হয়েছে যখন প্রেরিতরা পবিত্র আত্মার প্রতিশ্রুতির জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।

দামেস্কের পথে পলের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তর;

দামেস্কের পথে পৌলের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা বেশিরভাগ মানুষের কাছে একটি অলৌকিক ঘটনা। প্রেরিতদের কার্যবিবরণী বইয়ের লেখক লুক , যিনি পৌলের মিশনারি যাত্রায় তার সাথে ভ্রমণ করেছিলেন, তিনি লিখেছেন যে তিনি পৌলকে চিনতেন এবং এমনকি তাঁর অনেক যাত্রায় তার সাথে ছিলেন। প্রেরিতদের কার্যবিবরণী বইতে বলা হয়েছে যে পৌল যীশুর অনুসারীদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ নিয়ে জেরুজালেম থেকে সিরিয়ার দামেস্কে যাচ্ছিলেন, যাতে যীশুর অনুসারীদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং তাদের সম্ভাব্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য তাদের জেরুজালেমে বন্দী করে আনা যায়। যীশুর অনুসারীদের উপর অত্যাচারের কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। পল যখন একটি অন্ধ করে দেওয়া আলো দেখতে পান এবং একটি ঐশ্বরিক কণ্ঠস্বরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করেন তখন তাঁর যীশুর অনুসারীদের খুঁজে বের করার যাত্রাটি বন্ধ হয়। এই প্রসঙ্গে প্রেরিতদের কার্য-বিবরণী থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক বর্ণনা উদ্ধৃত করা হল;

"পৌল যখন তার যাত্রাপথে দামেস্কের কাছাকাছি যাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ আকাশ থেকে এক আলো তাঁর চারপাশে জ্বলে উঠল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন,

"শৌল, শৌল, তুমি কেন আমাকে তাড়না করছ?" শৌল তখন জিজ্ঞাসা করলেন। "প্রভু, তুমি কে?" তিনি উত্তর দিলেন।"আমি যীশু, যাকে তুমি তাড়না করছ,"

শৌলের সাথে ভ্রমণকারী লোকেরা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; তারা শব্দ শুনতে পেল কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। পৌল মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু চোখ খুললে তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। তাই তাঁরা তাকে দামেস্কে নিয়ে গেল। তিন দিন ধরে পল সেখানে অন্ধ ছিলেন এবং তিনি ঐ তিন দিন সেখানে কিছুই খাননি বা পান করেননি।"—প্রেরিত ৯:৩-৯।

এরপর দামেস্কে যীশুর এক শিষ্য অননিয় প্রভুর একটি দর্শন পেলেন যেখানে প্রভু তাকে শৌলের সাথে দেখা করতে নির্দেশ দেন এবং তাঁকে পোলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে বলা হয়েছিল।

পোলের দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধার এবং বাপ্তিস্ম:

অননিয় শৌলের উপর হাত রাখলেন, আর তার চোখ থেকে আঁশ (scales) পড়ে গেল, শৌল আবার দেখতে পেলেন। এই বিষয়ে প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ রয়েছে যে, দামেস্কের অননিয়, যিনি সিরিয়া থেকে দামেস্কে যীশুর শিষ্য ছিলেন, তিনি ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ পেলেন যে তাঁকে যিহূদার বাড়িতে শৌলের সাথে দেখা করতে হবে এবং সেখানে শৌলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনাতে শৌলের উপর হাত রাখতে হবে। প্রভুর আদেশ মত অননিয় শৌলের বাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করে শৌলের উপর হাত রেখে বললেন, "ভাই শৌল, প্রভু—যীশু, যিনি তোমার এখানে আসার পথে তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন—তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন যাতে তুমি আবার দেখতে পাও এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও।" তৎক্ষণাৎ, শৌলের চোখ থেকে আঁশের মতো কিছু পড়ে গেল এবং তিনি আবার দেখতে পেলেন। তিনি উঠে বাপ্তিস্ম নিলেন এবং কিছু খাবার খেয়ে শক্তি ফিরে পেলেন (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ৯:১৩-১৯)।

শৌল বাপ্তিস্ম নেওয়ার পর যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে প্রচার করতে শুরু করলেন। এইভাবে পলের ধর্মান্তরের ফলে তার জীবন

ও পরিচর্যায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন আসে, খ্রিস্টানদের উপর নির্যাতন চালানো থেকে তিনি ইহুদি ও অইহুদি উভয় জনগোষ্ঠীর কাছে সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্রে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। শৌল খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর 'পল' নামটি গ্রহণ করেন। এরপর পলের জনপ্রিয়তা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল, যা মূলত তার সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় মিশনারি কাজের কারণে হয়েছিল।

[উল্লেখ্য, বাইবেলের প্রেক্ষাপটে, "প্রেরিত" (Acts) শব্দটি সাধারণত প্রেরিতদের কার্যবিবরণী বইকে বোঝায়, যা প্রাথমিক গির্জার ঐতিহাসিক বিবরণ এবং যীশুর স্বর্গারোহণের পর খ্রিস্টধর্মের বিস্তারের বর্ণনা দেয় (the Book of Acts, a historical account of the early church and the spread of Christianity after Jesus' ascension) । এটির লেখক লুকের দুই খণ্ডের রচনার দ্বিতীয় অংশ, যা লুকের সুসমাচারের (Gospel of Luke) পরে রচিত। এই বইটিতে যীশুর পুনরুত্থান এবং স্বর্গারোহণের পরবর্তী ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, বিশেষ করে পিটার এবং পল সহ প্রেরিতদের নেতৃত্বে খ্রিস্টীয় ধর্ম আন্দোলনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।]

ইউরোপীয় ইতিহাসে সেন্ট পলের বিশাল খ্যাতি

ইউরোপীয় ইতিহাসে সেন্ট পলের খ্যাতি মুলত খ্রিস্টধর্ম প্রচারে, বিশেষ করে অইহুদীদের কাছে, এবং নতুন নিয়মে (New Testament) বিশেষ করে তার চিঠিগুলিতে খ্রিস্টধর্ম বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য। যীশুর পরে তাঁকে খ্রিস্টীয় ধর্মের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি খ্রিস্টধর্ম সম্প্রসারণে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। খ্রিস্টধর্ম সম্প্রসারণের জন্য তিনি এশিয়া মাইনর এবং ইউরোপের অঞ্চলগুলিসহ সমগ্র রোমান সাম্রাজ্য জুড়ে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন, গির্জা এবং সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর চিঠিপত্র গুলি খ্রিস্টীয় চিন্তাভাবনার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে, বিশেষ করে পিতা ঈশ্বর এবং ঈশ্বরপুত্র, যীশুর মধ্যে সম্পর্ক এবং ঐশ্বরিকতার সাথে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ে। ইহুদি আইন মেনে চলার পরিবর্তে ঈশ্বরপুত্র যীশুর প্রতি

বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের ধারণা গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

অইহুদীদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে দেওয়ার উপর মনোনিবেশ করে, খ্রিস্টধর্মকে সত্যিকার অর্থে একটি সর্বজনীন ধর্মে পরিণত করতে সেন্ট পলের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য যার ফলে খ্রিস্টধর্ম কেবল ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই সম্প্রসারণ ইউরোপ এবং তার বাইরেও খ্রিস্টধর্মের বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটা সকলেই স্বীকার করেন যে তাঁর শিক্ষা এবং খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণ ইউরোপের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলোকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। ইহুদি আইন মেনে চলার পরিবর্তে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের ধারণা গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সেন্ট পলের সম্মানে লন্ডনে সেন্ট পল দ্য অ্যাপোস্টেলের ক্যাথেড্রাল চার্চ

সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল আনুষ্ঠানিকভাবে সেন্ট পল দ্য এপোস্টলের ক্যাথিড্রাল চার্চ, লন্ডন নামে বিখ্যাত। এটি ইংল্যান্ডের একটি অ্যাংলিকান ক্যাথেড্রাল এপিস্কোপালের দর্শন হিসেবে কাজ করে। ক্যাথেড্রালটি চার্চ অফ ইংল্যান্ড লন্ডনের ডায়োসিসের মাদার চার্চ হিসাবেও পরিচিত। এটি লন্ডন শহরের সর্বোচ্চ স্থানে লুডগেট হিলে অবস্থিত। এই স্থানে একসময় ডায়ানার একটি রোমান মন্দির ছিল, কিন্তু রাজা প্রথম এথেলবার্টের শাসনাকালে ৬০৪ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট পলের নামে সেখানে প্রথম খ্রিষ্টীয় ক্যাথিড্রাল উৎসর্গ করা হয়েছিল এটি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য বিশিষ্টভাবে স্থান পেয়েছে। এটি লন্ডন শহরের সর্বোচ্চ স্থানে লুডগেট পাহাড়ে অবস্থিত পল দ্য অ্যাপোস্টলের সম্মানে এর উৎসর্গ 604 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই স্থানের মূল গির্জার সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। (উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ)

সেন্ট পল দ্য অ্যাপোস্টেলের ক্যাথেড্রাল চার্চ (গুগুল ছবি)

সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল একটি ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ । এটি লন্ডনের অ্যাংলিকান বিশপের আসন এবং লন্ডনের ডায়োসিসের মাতৃ গির্জা হিসেবে কাজ করে, যেখানে প্রধান ধর্মীয় সেবা এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ধর্মীয় তাৎপর্যের বাইরেও, এটি একটি জাতীয় সম্পদ, লন্ডনের স্থিতিস্থাপকতার প্রতীক এবং একটি জনপ্রিয় পর্যটন আকর্ষণ। বলা হয়, সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল হল লন্ডনের অ্যাংলিকান ক্যাথেড্রাল এবং লন্ডনের বিশপের আসন। এটি নিয়মিত খ্রিস্টানদের জন্য প্রার্থনা ও উপাসনার আয়োজন করে থাকে। এই ক্যাথেড্রালটি রাজকীয় বিবাহ, রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং উদযাপন সহ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের এবং গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য মূলত ব্যবহৃত হয়। সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত আইকনিক গম্বুজ এবং স্থাপত্য জাঁকজমকের জন্য সারা বিশ্বে বহুল প্রশংসিত।

কলকাতায় সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রাল

আমাদের কলকাতা শহরেও সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রাল রয়েছে। এই গির্জাটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৮৩৯ সালে এবং নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় ১৮৪৭। কথিত আছে, এটি কলকাতার বৃহত্তম ক্যাথিড্রাল এবং এশিয়ার প্রথম এপিস্কোপ্যাল চার্চ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রগুলিতে যে সকল ক্যাথিড্রাল গঠিত হয়, কলকাতার সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রাল সেগুলির মধ্যে প্রথম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে

কলকাতায় ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে কলকাতার ক্যাথিড্রাল রোডে এই গির্জার অট্টালিকাটি গড়ে তোলা হয়। এখান থেকে বোঝা যায়, সেন্ট পল সারা বিশ্বে এতটাই বিখ্যাত ছিলেন, সারা পৃথিবীতে তাঁর নামে গির্জা তৈরি হয়েছে।

সেন্ট পলের রহস্যময় তৃতীয় স্বর্গের অভিজ্ঞতা:

২ করিন্থীয় ১২:১-১০ পদে, পৌল তার "তৃতীয় স্বর্গে তুলে নেওয়া"র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। In 2 Corinthians 12:1-10, Paul narrates his experience of being "caught up to the third heaven." সেন্ট পলের লেখা থেকে মনে হয়, যে তিনি এমন একটি দর্শন বা প্রকাশের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন যাকে কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ তাঁর স্বর্গ বা "তৃতীয় স্বর্গ" ভ্রমণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। আবার অনেক পণ্ডিত ব্যাখ্যা করেন যে তিনি স্পষ্টভাবে বলেননি যে তিনি আক্ষরিক অর্থে স্বর্গ দেখেছিলেন । ২ করিন্থীয় ১২:২-৪ পদে, পৌল বর্ণনা করেছেন যে তাকে "তৃতীয় স্বর্গে" "ছিনিয়ে নেওয়া" হয়েছিল যেখানে তিনি "অকথ্য কথা" শুনেছিলেন যা তিনি উচ্চারণ করতে পারেননি। কিছু পণ্ডিত এটিকে স্বর্গে শারীরিক আরোহণের পরিবর্তে একটি আধ্যাত্মিক বা উদ্ঘাটনমূলক অভিজ্ঞতা হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। সহজ কথায় কেউ কেউ এই অংশটিকে আক্ষরিক অর্থে স্বর্গে আরোহণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, আবার অনেকে এটিকে আধ্যাত্মিক বা উদ্ঘাটনমূলক অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখেন।

সেন্ট পলের জেরুজালেমে শেষ সফরে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড:

তৃতীয় মিশনারি যাত্রার সময় সেন্ট পলের জেরুজালেমে সফর ছিল তাঁর শেষ সফর যা তাঁর গ্রেপ্তার এবং কারাদণ্ডের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল । তাঁর সম্ভাব্য বিপদের অনেক সতর্কীকরণ থাকা সত্ত্বেও, পৌল জেরুজালেমে চলে যান, যেখানে তিনি এক ক্ষুব্ধ জনতার মুখোমুখি হন এবং তখন রোমান কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেপ্তার করে। এরপর তাকে রোমে বন্দী হিসেবে পাঠানোর আগে তাঁকে দু

বছর সিজারিয়ায় কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। সেটা কিভাবে ঘটে ছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল;

প্রাচীন গ্রিক শহর এফেসাসে (Ephesus) তিন বছর থাকার পর, পৌল তাঁর সঙ্গী ও শিষ্যদের সাথে জেরুজালেমে যাত্রা করেন, যা ছিল তাঁর তৃতীয় মিশনারি যাত্রা। পথে, খ্রিস্টানরা তাকে জেরুজালেমে তাঁর জন্য অপেক্ষা করা বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিল, যার মধ্যে আগাবাসের একটি ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল যে পৌলকে জেরুজালেমে ইহুদিরা আবদ্ধ করবে। কিন্তু সেই সতর্কবাণী সত্ত্বেও, পৌল পবিত্র আত্মার নির্দেশে বাধ্য হয়ে জেরুজালেমে যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন।

এই বিষয়ে প্রেরিতদের কার্য বিবরণে বর্ণনা করা হয়েছে যে কীভাবে পৌলকে যাকোব এবং প্রাচীনরা সতর্ক করেছিলেন যে তিনি আইন-বিরুদ্ধ বলে খ্যাতি অর্জন করছেন, এই বলে যে, "তাদের আপনার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে আপনি অইহুদিদের মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত ইহুদিদের মোশিকে ত্যাগ করতে শেখান, এবং তাদের সন্তানদের খৎ ক্ষতি না করতে বা রীতিনীতি পালন করতে নিষেধ করেন।" [179] পৌল একটি শুদ্ধিকরণের আচার গ্রহণ করেছিলেন যাতে "সকলেই জানতে পারে যে তাঁর বিরুদ্ধে তাদের যা বলা হয়েছে তাতে কিছুই নেই, বরং তিনি নিজেই আইন পালন করেন এবং রক্ষা করেন।"

যাইহোক ৫৭ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমে পৌঁছানোর পর, পৌলের সাথে এক ক্ষুব্ধ জনতার দেখা হয় যারা যীশু সম্পর্কে তাঁর শিক্ষার বিরোধিতা করে।

উত্তেজিত জনতা তাকে ধরে টেনে মন্দির থেকে বের করে দেয়। যখন সেনাপতি এই হট্টগোলের কথা শুনতে পান, তখন সেই সেনাপতি এবং কয়েকজন সৈন্য ছুটে যান। রোমান সৈন্যরা হস্তক্ষেপ করে, এবং তার পরিচয় এবং হট্টগোলের কারণ নির্ধারণ করতে না পেরে, তারা পল কে শিকল দিয়ে আটকে রাখেন। পৌলকে গ্রেপ্তার করে। যখন তিনি জনতার সাথে কথা বলতে

অনুরোধ করেন। রোমানরা তাঁকে অনুমতি দেয় এবং তখন তিনি তাঁর বক্তব্য রাখেন। কিছুক্ষণ পর, জনতা সাড়া দেয়। "এ পর্যন্ত তারা তাঁর কথা শুনার পর উগ্র জনতা চিৎকার করে বলে, 'এই লোকটিকে পৃথিবী থেকে দূর কর! কারণ লোকটিকে বেঁচে থাকার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। সেনাপতি পৌলকে ব্যারাকে নিয়ে আসার এবং বেত্রাঘাতের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ করার নির্দেশ দেন। পৌল তার রোমান নাগরিকত্ব দাবি করেছিলেন, যা তাকে চাবুক মারা থেকে রক্ষা করে। ট্রাইব্যুনাল ক্রুদ্ধ জেরুজালেমের লোকেরা পৌলের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ এনেছে তা জানতে চেয়েছিলেন, পরের দিন তিনি তাকে মুক্তি দেন এবং প্রধান পুরোহিতদের এবং সমগ্র পরিষদকে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দেন। পৌল পরিষদের সামনে বক্তব্য রাখেন এবং ফরীশী এবং সদ্দূকীদের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়।

সেন্ট পলের মৃত্যু;

এ আই প্রদত্ত তথ্য অনুসারে সেন্ট পলের মৃত্যু রোমে সম্ভবত ৬২ থেকে ৬৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল। তিনি ৬১ খ্রিস্টাব্দের দিকে বিচারের জন্য রোমে এসেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যু সম্ভবত ৬৪ খ্রিস্টাব্দে রোমের মহাঅগ্নিকাণ্ডের পর নিরো কর্তৃক নির্দেশিত খ্রিস্টানদের মৃত্যুদণ্ডের সাথে যুক্ত বলে অনেক যায়গায় উল্লেখ রয়েছে। উইকিপেডিয়া তথ্য অনুসারে সেন্ট পলকে অবশেষে ৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে রোমে আনা হিয়েছিল যেখানে তিনি আরও দুই বছর গৃহবন্দী ছিলেন। প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর শেষ বিবরণতে বলা হয়েছে যে বিচারের অপেক্ষায় থাকাকালীন সেন্ট পল তাঁর ভাড়া বাড়িতে থেকে দু বছর রোমে যীশুর বাণী প্রচার করেছিলেন। একই তথ্য অনুসারে সেন্ট পলের মৃত্যু ৬৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রোমের মহা অগ্নিকাণ্ডের পরে ঘটেছিল বলে মনে করা হয়।

করিন্থের গির্জার কাছে লেখা চিঠিতে, রোমের বিশপ পোপ ক্লিমেন্ট প্রথম সেন্ট পলের শহীদত্ব (শহীদ হওয়া) সম্পর্কে লিখেছেন, যে

পূর্ব ও পশ্চিমে প্রচার করার পর এবং পশ্চিমের শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর পর, সেন্ট পল প্রিফেক্টদের অধীনে শহীদ হয়েছিলেন (ক্যাথলিক সংস্কৃতি অনুসারে)। ক্লিমেন্ট পলের মৃত্যুকে ধৈর্যশীল সহনশীলতার উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখাতে খ্রিস্টের শিক্ষার প্রতি সেন্ট পলের অগাধ বিশ্বাস এবং সেই কারনে ভয়ঙ্কর কষ্টের কথা তুলে ধরেছেন। ক্লিমেন্ট পূর্ব ও পশ্চিম উভয় স্থানে সেন্ট পলের যীশুর বাণী প্রচারের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের উপরেও পোপ ক্লিমেন্ট বিশেষ জোর দিয়েছেন। পোপ ক্লিমেন্ট প্রথম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে পল প্রিফেক্টদের অধীনে শহীদত্ব বরণ করেছিলেন। পোপ ক্লিমেন্ট পলের ঐ অমানুষিক কষ্টকে ধৈর্যশীল সহনশীলতার এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এবং তাঁর শরীরে যীশুর চিহ্ন বহন করার ইচ্ছার উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। (উৎস; উইকিপেডিয়া)

৬ আব্রাহাম লিংকন

আমাদের মধ্যে খুব কম লোক আছে যারা গণতন্ত্রের বিখ্যাত সংজ্ঞা জানে না। আমাদের মধ্যে যারা জেনেছে বা শুনেছে- 'Democracy is "government of the people, by the people, for the people" অর্থাৎ গণতন্ত্রের হল "জনগণের, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য সরকার" তারা সকলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকনকে কমবেশি জানে। আব্রাহাম লিংকনই সারা বিশ্বের জন্য দিয়ে গেছেন গণতন্ত্রের এই বিখ্যাত সংজ্ঞা "**জনগণের, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য সরকার**"। এটাই হল গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার ভিত্তিপ্রস্তর। এই বাক্যাংশটি গণতন্ত্রের মূল নীতিগুলিকে সংক্ষেপে নির্ধারণ করে, জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব এবং নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষাকারী সরকারের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে। গণতন্ত্রের উপর অনেক সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা রয়েছে, কিন্তু অতি সহজ, সরল এবং স্বল্প বাক্যে গণতন্ত্র সম্পর্কে এর থেকে ভাল সংজ্ঞা বোধ হয় রাষ্ট্র বিজ্ঞানে নেই। তাই জখনই গণতন্ত্রের কথা বা প্রশ্ন উঠে, তখনই গণতন্ত্রের এই সংজ্ঞার কথা মনে পড়ে এবং সেই সঙ্গে মনে পড়ে যায় এর রূপকার আব্রাহাম লিংকনকের কথা এবং তাঁর অনুপ্রেরণামূলক অসাধারণ জীবনের কথা। এখানে তাঁর অসাধারণ জীবনের কিছু কথা উৎসাহী পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন হলেন একজন বিশ্ব বিখ্যাত মার্কিন রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। দেশেরসাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সঙ্কটে তিনি আমেরিকাকে সফল ও সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আব্রাহাম লিংকন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে এক ধ্বংসাত্মক সংঘাতের মধ্য দিয়ে জাতিকে পরিচালিত করে দেশের ইউনিয়ন রক্ষা করেছিলেন। সেই সঙ্গে দেশে বহু শতাব্দীর দাসপ্রথা বিলোপ করে তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের দাসত্বমুক্তি ঘোষণাপত্র জারি করেছিলেন,যার ফলে লক্ষ লক্ষ নিরীহ অসহায় নির্যাতিত মানুষ অ্যামেরিকায় দাসত্বমুক্তি লাভ করেছিল। তাঁর বক্তৃতা, বিশেষ করে গেটিসবার্গের ভাষণ, শক্তিশালী এবং স্পষ্টভাষী বার্তার জন্যও তিনি সারা বিশ্বের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

প্রথমিক জীবন

আব্রাহাম লিংকনের প্রাথমিক জীবন অতি দারিদ্র্য ও ভীষণ কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। ১৮০৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য কেনটাকির একটি গ্রামে কাঠের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি সীমান্তে বেড়ে ওঠেন। তাঁর বাবা-মা, থমাস এবং ন্যান্সি হ্যাঙ্কস লিংকন অতি দরিদ্র কৃষক পরিবারের ছিলেন। তাঁর এক ভাই এবং এক বোন ছিল; ছোট ভাই শৈশবেই মারা যায়। পরিবারে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের জন্য লিঙ্কনের প্রাথমিক জীবন ক্ষেত- খামারে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে কাটত। তিনি সীমিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র নয় বৎসর, তাঁর মা রোগভোগে মারা যান। ছোটবেলায় তাঁর মায়ের আকস্মিক মৃত্যু তাঁর শৈশব জীবনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। এরপর তাঁর পরিবার কেনটাকি থেকে ইন্ডিয়ানাতে চলে যায়। লিংকন সীমান্তে বেড়ে ওঠেন তিনি। প্রাথমিক জীবনে তিনি প্রচণ্ড কষ্ট পান এবং নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। শৈশবে তাঁর শিক্ষা বেশী দূর এগোতে পারে নি। এ আই তথ্য অনুসারে লিংকন মাত্র এক বছর স্কুলে পড়েছিলেন; যদিও পড়াশুনার প্রতি তাঁর

প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। তিনি তিনি বই ধার করে বাড়িতে নিজেই পড়তে এবং লিখতে শিখেছিলেন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব সত্ত্বেও, লিঙ্কনের বড় হওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প, শক্তিশালী কর্মনীতি এবং শেখার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি ঐ সময় বিভিন্ন চাকরি বা কাজ করতেন, যার মধ্যে ছিল ফ্ল্যাটবোট নেভিগেটর, সার্ভেয়ার এবং স্টোরকিপার ইত্যাদি। কঠিন দারিদ্র তাঁর মনোবলকে দুর্বল করতে পারে নি।

উচ্চতর শিক্ষালাভ

প্রচণ্ড দারিদ্র্য এবং সীমিত স্কুলশিক্ষা লাভ সত্ত্বেও, আব্রাহাম লিংকন মূলত স্ব-শিক্ষা এবং পড়ার প্রতি গভীর ভালোবাসার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছিলেন। তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকাল ছিল খুবই সামান্য মোট ১২ মাসেরও কম সময়। তবে, তার সৎ মা তাঁকে বহু ধরনের বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করতে উৎসাহিত করতেন এবং তিনি মূলত বই এবং জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেকে উচ্চ শিক্ষিত করেছিলেন। যেহেতু তিনি ছোট বেলায় একজন আগ্রহী পাঠক ছিলেন এবং তাঁর সৎ মা তাঁকে বইয়ের প্রতি ভালোবাসায় উৎসাহিত করেছিলেন, তিনি স্ব-শিক্ষা মাধ্যমে নিজেকে উচ্চ শিক্ষিত করেছিলেন। লিংকন অবসর সময় আইন উপর অধ্যয়ন করতেন এবং আইনের রীতি নীতির উপর তিনি একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। যদিও আব্রাহাম লিংকন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঐতিহ্যবাহী আইন ডিগ্রি অর্জন করেন নি, তিনি স্ব-অধ্যয়নের মাধ্যমে এবং মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইলিনয় বারে ভর্তি হয়ে তিনি একজন বিখ্যাত আইনজীবী হয়েছিলেন। তিনি ১৮৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইলিনয় বারে ভর্তি হন এবং তারপর জন টি. স্টুয়ার্টের অধীনে আইন অনুশীলন করেন। কিন্তু আইন অনুশীলনের পূর্বে এই বিষয়ে তাঁকে কিছু পরীক্ষা দিতে হয়। সংগ্রহীত তথ্য অনুসারে তিনি সাঙ্গামন কাউন্টি আদালতে (Sangamon County Court) একজন ভালো ও নৈতিক চরিত্রের মানুষ হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। তিনি অনুশীলনকারী আইনজীবীদের

একটি প্যানেল দ্বারা পরিচালিত মৌখিক পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করার পর, লিঙ্কন ইলিনয়ে আইন অনুশীলনের অনুমতি পেয়েছিলেন।

আমেরিকায় দাসপ্রথা বিলুপ্তিকরনে আব্রাহাম লিংকনের ভুমিকা;

প্রথমে আমাদের জানা দরকার দাসপ্রথা কি? পৃথিবীতে দাসপ্রথার ইতিহাস কি? আমেরিকার দাসপ্রথার ইতিহাস ও ধরণ। তারপর জানব আব্রাহাম লিংকন কিভাবে আমেরিকায় দাসপ্রথা বিলুপ্তি করেছিলেন।

দাসপ্রথা কি এবং এর ইতিহাস

অনেকেরই জানা আছে দাসত্ব হলো জোরপূর্বক সীমাহীন শ্রম এবং সীমিত স্বাধীনতার প্রথা। এটি এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে এক শ্রেণীর মানুষ যারা দাস-মালিক নামে পরিচিত। আইনের সাহায্যে তারা অন্য শ্রেণীর মানুষদের (দাসদের) সীমাহীন কাজ করতে বাধ্য করত এবং তাদের স্বাধীনতা সীমিত করতে পারত। ইতিহাস পড়ে জানা যায়, কোন অপরাধ করার জন্য বা ঋণ পরিশোধের অক্ষমতার জন্য শাস্তি হিসেবে দাসত্ব প্রথা ঐরূপ শাসনব্যবস্থায় শত শত বৎসর ধরে বিদ্যমান ছিল। দাসপ্রথার সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। আব্রাহাম লিংকন আমেরিকায় দাসপ্রথা বিলুপ্তি করে লক্ষ লক্ষ অসহায় নিপীড়িত মানুষকে দাসপ্রথার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। দাসপ্রথা, এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে দাস-ব্যক্তিদের, মালিক শ্রেণির মানুষের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং দাসদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। আমেরিকায় এবং বহু পাশ্চাত্য দাসপ্রথার হাজার হাজার বছরের জটিল ইতিহাস রয়েছে। এটি বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং মহাদেশে বহু পদ্ধতিতে প্রচলিত যেমন- ঋণ-দাসত্ব, অপরাধের শাস্তির দাসত্ব, যুদ্ধবন্দী দাসত্ব এবং দাসদের গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানের দাসত্ব। প্রাচীন সভ্যতায় এই ভয়ঙ্কর দাসপ্রথার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশর, চীন, মেসোপটেমিয়া, গ্রীস, রোম এবং

পারস্যের মত দেশের সভ্যতায় দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। ইতিহাস বলে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে নবোপলীয় বিপ্লবের (Neolithic Revolution) সময় কৃষির আবিষ্কার দাসপ্রথার উত্থানকে সহজতর করেছিল কারণ অর্থনৈতিক উদ্‌বৃত্ত এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি করেছিল। অনেকের জানা, নবোপলীয় বিপ্লব বা নবপ্রস্তরযুগীয় বিপ্লব, যা প্রথম কৃষি বিপ্লব নামেও পরিচিত, মানব ইতিহাসের শিকারী-সংগ্রাহকদের যাযাবর জীবনধারা থেকে একটি স্থায়ী, কৃষিকাজে জীবনযাত্রায় রূপান্তরিত করে ঐ বিপ্লবের মাধ্যমে। প্রায় ১০,০০০ বছর আগে এই সময়কালে কৃষিকাজ, পশুপালন এবং স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। তখন থেকেই মানব সভ্যতায় দাসপ্রথার প্রচলন শুরু হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ ও বিবরণ থেকে জানা যায় যে প্রাচীন মিশর এবং অন্যান্য সংস্কৃতিতে ৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দাসপ্রথা বিদ্যমান ছিল। (উৎস এ আই তথ্য) দাসপ্রথার আর একটি ভয়ঙ্কর ধরণ হল আটলান্টিক দাস বাণিজ্য। ইতিহাস বলে- সুইজারল্যান্ডের জুরিখ শহরটি ১৮ শতকে দাসপ্রথা এবং দাস ব্যবসা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং হাজার হাজার আফ্রিকানকে নির্বাসনে ভূমিকা পালন করেছিল। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদদের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, শহরটি তুলা শিল্পের মাধ্যমে দাসপ্রথার সাথে যুক্ত ছিল।

ট্রান্সআটলান্টিক দাস ব্যবসার

এ আই প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী পঞ্চদশ শতাব্দীতে, ইউরোপীয়রা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর বাণিজ্য শুরু হয়েছিল যা অবশেষে ট্রান্সআটলান্টিক দাস ব্যবসার দিকে পরিচালিত হয়। এই দাস ব্যবসায় লক্ষ লক্ষ আফ্রিকানকে জোরপূর্বক আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, মূলত ক্যারিবিয়ান, ল্যাটিন আমেরিকা এবং দক্ষিণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃক্ষরোপণ ও চাষবাসের কাজ করার জন্য। এই দাস ব্যবসা আফ্রিকার উপর এক বিধ্বংসী প্রভাব পড়েছিল; সেখানে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল এবং সেখানকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ভীষণভাবে বাধাপ্রাপ্ত

হয়েছিল। ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ দাসত্ব বিলোপ আইনের মাধ্যমে বিশ্বের অনেক অংশে ধীরে ধীরে দাসত্ব বিলুপ্ত হয়েছিল, যার ফলে সেই সময় ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ৮০০,০০০ এরও বেশি দাসত্বপ্রাপ্ত আফ্রিকানকে মুক্তি দেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম রাষ্ট্রপতি আবরাহাম লিঙ্কনের অদম্য প্রয়াসে ১৮৬৩ সালে থেকে আমেরিকায় দাসপ্রথা লোপ পায়। এখন যদিও বেশিরভাগ দেশে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ, তবুও আধুনিক দাসপ্রথা, যেমন মানব পাচার এবং জোরপূর্বক শ্রম, এখনও বিদ্যমান। আধুনিক দাসত্ব প্রথায় ভারতও অন্যতম বৃহত্তম অবদানকারী দেশ। এখানে বিভিন্ন ভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ জোরপূর্বক শ্রম প্রদান, মানব পাচার, শিশু ও মহিলা পাচার এবং অন্যান্য ধরণের শোষণের শিকার হয়।

ইতিহাস পড়ে জানা যায় ১৮শ এবং ১৯শ শতাব্দীতে জুরিখ শহরের তুলা শিল্প এবং বাণিজ্য প্রকৃতপক্ষে ট্রান্সআটলান্টিক দাস ব্যবসার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। জুরিখ শহরটি আর্থিকভাবে এই বাণিজ্যের সাথে জড়িত ছিল, দাস-ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলিকে সমর্থন করত। আফ্রিকার দাসত্বপ্রাপ্তদের বিনিময়ে উতপাদিত টেক্সটাইল পণ্য সরবরাহ আফ্রিকার দাস-ব্যবসায়ি এবং জুরিখ শহরের টেক্সটাইল শিল্প উভয়য়েই উপকৃত হত। অর্থাৎ আফ্রিকার দাসত্বপ্রাপ্তরা পণ্য হিসাবে ব্যবসা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। এটাও জানা যায় জুরিখ-ভিত্তিক বেশ কয়েকটি টেক্সটাইল কারখানা এমন পণ্য উৎপাদন করত যা আফ্রিকায় নিয়মিতভাবে দাসদের সাথে বিনিময় করা হত। ঐকোম্পানিগুলির পছন্দের তুলা সরবরাহকারীরা অটোমান সাম্রাজ্য থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যেত, যারা ফসল কাটার জন্য দাস শ্রম ব্যবহার করত বলে কুখ্যাত ছিল। ঐতিহাসিকদের গবেষণায় দেখা গেছে, জুরিখ শহরটি পূর্ববর্তী শতাব্দীতে দাস ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়ে অর্থ উপার্জন করত। শহর কর্তৃপক্ষ একটি ব্রিটিশ দাস ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেছিল, অন্যদিকে শিল্পপতি ও বস্ত্র শিল্প আফ্রিকানদের দাস ব্যবসা থেকে ভীষণ উপকৃত হত। এই হল দাসপ্রথার ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি।

(Source; https://www.swissinfo.ch/eng/business/zurich-s-historical-ties-to-slave-trade)

দাসত্বের গুগুল ছবি (দাসত্ব বন্দীদের দাসত্বের চিহ্ন সহ আফ্রিকা থেকে প্রায়শই এই ভাবে জোয়ালে বেঁধে উপকূলে নিয়ে যাওয়া হত ইউরোপীয়দের কাছে বিক্রি করার জন্য। এখানে শিকলে-বাঁধা এক সারি ক্রীতদাসদের_ছবি: প্রাচীন আফ্রিকান প্রবাসীদের মধ্যে আফ্রিকান দাস ব্যবসা এবং দাস জীবনের সংগৃহীত একটি দৃশ্য) (সূত্র গুগল উইকিপেডিয়া অনুসন্ধান এবং এ আই অনুসন্ধান) - (http://slaveryimages.org/s/slaveryimages/)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথার রীতি-প্রকিতি;

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূলত আফ্রিকান এবং আফ্রিকান আমেরিকানদের দাসত্ব করার আইনি প্রতিষ্ঠার পর আমেরিকান দাসত্ব মূলত ১৭৭৬ সাল থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এই ব্যবস্থায় উপরি উল্লিখিত কারণে একজন ব্যক্তির মালিকানা অন্যজনের কাছে চলে আসত, যার ফলে দাসত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাদের স্বাধীনতা এবং মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। যদিও উপনিবেশ জুড়ে দাসপ্রথা বিদ্যমান ছিল, এটি বিশেষ করে দক্ষিণ রাজ্যগুলিতে প্রচলিত ছিল যেখানে অর্থনীতি কৃষিকাজের জন্য, বিশেষ করে তুলা উৎপাদনের জন্য দাস শ্রমের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল।

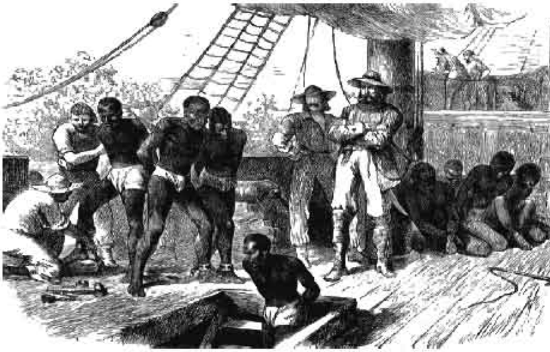

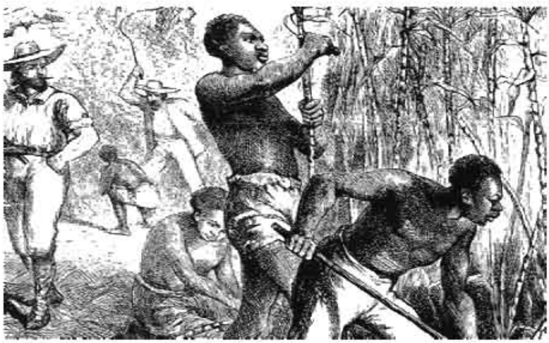

সহজ কথায় জুরিখের টেক্সটাইল কারখানাগুলি এমন পণ্য উৎপাদন করত যা দাসত্বপ্রাপ্ত আফ্রিকানদের জন্য বিক্রি করা হত, যা দাস ব্যবসাকে আরও জোরদার করত। জুরিখ সহ সারা সুইজারল্যান্ড ত্রিভুজাকার বাণিজ্য করত, যেখানে ইউরোপ থেকে উৎপাদিত পণ্য (বস্ত্র সহ) আফ্রিকার দাসত্বপ্রাপ্তদের সাথে বিনিময় করা হত, যাদেরকে পরে আমেরিকায় পরিবহন করা হত। ত্রিভুজাকার বাণিজ্যের একটি প্রধান পণ্য, তুলা আমেরিকায় দাসত্বপ্রাপ্ত শ্রম দ্বারা উৎপাদিত হত এবং তারপর প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদনের জন্য ইউরোপে পরিবহন করা হত। ফলে ইউরোপে ন্যায় অ্যামেরিকাও দাস ব্যবসায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভীষণ ভাবে জড়িত ছিল। আমেরিকান দাসত্ব এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তি (দাস) অন্যজনের (দাসধারকের /slaveholder)মালিকানাধীন থাকত। দাসত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সেখানে

ব্যক্তি হিসেবে নয়, বরং সম্পত্তি এবং পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হত এবং তাদেরকে মালিকদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকতে হত। আমেরিকান উপনিবেশগুলিতে (American colonies) আফ্রিকানদের দাসত্ব শুরু হয় ১৭ শতকের গোড়ার দিকে। উইকিপেডিয়া থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুসারে ১৬১৯ সালে ভার্জিনিয়া ভয়ঙ্কর ভাবে দাসত্ব প্রথা কার্যকরী ছিল। দাসত্বপ্রাপ্ত আফ্রিকানদের ব্যসসার মাধ্যমে উভয় পক্ষের ব্যবসাদারদের প্রভুত উন্নতি হত। এই ধরনের ব্যবসার নাম ছিল ট্রান্সআটলান্টিক দাস ব্যবসা। যেখানে আফ্রিকানদের জোরপূর্বক আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হত। অ্যামেরিকায় দাসত্ব প্রথার বৃদ্ধিতে ট্রান্সআটলান্টিক দাস ব্যবসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দাসপ্রথা আমেরিকার দাসত্বগ্রস্ত মানুষের জীবনে এক বিধ্বংসী প্রভাব ফেলেছিল এবং আমেরিকার এক ভয়ঙ্কর ইতিহাস তৈরি করেছিল। এটি একটি গভীর বর্ণবাদী সামাজিক কাঠামো (racist social structure) বিকাশের দিকে পরিচালিত করেছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণগত সম্পর্কের উপর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পুরুষানুক্রমে পাওয়া একটি ভয়ঙ্কর স্থায়ী সত্তা বা পদ্ধতি হয়েছিল। আমেরিকায় ৪০০ বছরের দাসত্ব প্রথার ইতিহাসে রয়েছে। আমেরিকায় মানব সম্পত্তির দাসত্বের আইনি প্রতিষ্ঠিত ছিল, যার মধ্যে মূলত আফ্রিকান এবং আফ্রিকান আমেরিকানদের দাসত্ব প্রথা ভয়ঙ্কর ভাবে প্রচলিত ছিল।

আমেরিকায় দাসপ্রথা বিলুপ্তিকরন

এই ভয়ঙ্কর দাসপ্রথার অবসান এনেছিলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন। তাঁর নেতৃত্বে দাসপ্রথাকে কেন্দ্র করে সেখানে এক ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-১৮৬৫) সংঘটিত হয় এবং ১৮৬৩ সালে তাঁর দেওয়া মুক্তির ঘোষণাপত্র কনফেডারেট রাজ্যগুলিতে দাসদের মুক্ত ঘোষণা করে। এটা কার্যকরী করতে তিনি ১৮৬৫ সালে সংবিধানের ১৩তম সংশোধনী অনুমোদন করেন, যার ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়। (Source; Wikipedia) আমেরিকায় দাসপ্রথা বিলুপ্তিতে আব্রাহাম

লিংকনের বিশেষ ভূমিকা ছিল মূলত গৃহযুদ্ধের সময় তিনি যখন রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশ শাসন করেছিলেন। তিনি ঐ সময় মুক্তির ঘোষণাপত্র জারি করেন, যা কনফেডারেট রাজ্যের দাসকরা মানুষদের মুক্ত ঘোষণা করে। তিনি ত্রয়োদশ সংশোধনীর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যার ফলে ঐ সময় গৃহ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আনুষ্ঠানিকভাবে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়। ১৮৬২ সালে জারি করা ঘোষণাপত্রে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে কনফেডারেট রাজ্যগুলির দাসদের ১৮৬৩ সালের ১ জানুয়ারী মুক্তি দিয়ে দেবে। ঐ ঘোষণাপত্র দাসত্ব বিলুপ্তি করণের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল এবং তখন থেকে গৃহ যুদ্ধের গতিপথ পরিবর্তন করে, যুদ্ধের প্রচেষ্টায় দাসত্বের বিষয়টি যুক্ত করেছিলেন তিনি। এই বিষয়ে তিনি ত্রয়োদশ সংশোধনীটি পাস করানোর ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যা আনুষ্ঠানিকভাবে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথার বিলুপ্ত করেছিল। ত্রয়োদশ সংশোধনীটি ছিল দাসপ্রথার একটি আইনি এবং দাসপ্রথার স্থায়ী অবসানের, লক্ষ্য তিনি তার রাষ্ট্রপতিত্ব গ্রহণের আগে থেকেই তিনি অনুসরণ করে আসছিলেন। এই ক্ষেত্রে সংবিধানের ১৩তম সংশোধনীটি পাস করানোর ক্ষেত্রে আব্রাহাম লিঙ্কন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যা আনুষ্ঠানিকভাবে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা বিলুপ্তিকরণের প্রধান হাতিয়ার হয়েছিল, কারণ এটি ছিল দাসপ্রথার একটি আইনি এবং সংশোধন আনল দাসপ্রথার স্থায়ী অবসান। এই বিষয়ে তাঁর কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনায় সুস্পষ্ট হয় যে দাসপ্রথার বিলুপ্তিকরণ বিষয়ে লিংকনের প্রাথমিক অবস্থান যথেষ্ট সতর্কমূলক ছিল, তবে সময়ের সাথে সাথে তার অবস্থান বিকশিত হয়, যুদ্ধের অগ্রগতি এবং মুক্তির জন্য ক্রমবর্ধমান জনসাধারণের দাবির দ্বারা তিনি গৃহযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তন করেন। তিনি শেষ পর্যন্ত দাস-প্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের মুক্তিকে একটি যুদ্ধ ব্যবস্থা এবং একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধের মধ্যে আব্রাহাম লিংকনের নেতৃত্ব প্রদান

গৃহযুদ্ধের সময় আব্রাহাম লিংকনের নেতৃত্ব ছিল বহুমুখী ও অসাধারণ যেখানে তাঁর অপ্রতিম কৌশলগত পরিকল্পনা, ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে জাতিকে একত্রিত রেখে ইউনিয়ন সংরক্ষণ করার তাঁরঅতুলন ক্ষমতা এবং সর্বশেষে সহস্র কালেরদাসপ্রথা বিলুপ্ত করার প্রতি তাঁর অদম্য প্রয়াস ও অটল প্রতিশ্রুতি ছিল। তিনি এহেন বহুমুখী বিরাট সংকটের মধ্য দিয়ে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন; এবং সেই সঙ্গে সামরিক নেতৃত্বের দাবির সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের জটিলতার ভারসাম্য বজায় রেখেছিলেন। তথ্য অনুসারে কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে, আবরাহাম লিঙ্কন তিনি আইনত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে, সামরিক কৌশল এবং কৌশলগুলি নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করেছিলেন, যার মধ্যে জেনারেলদের নির্বাচন এবং প্রতিস্থাপন অন্তর্ভুক্ত ছিল। গৃহ যুদ্ধের সময়, তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর জন্য দক্ষ জেনারেল খুঁজে পেতে অনেক সংগ্রাম করেছিলেন বলে জানা যায়। কৌশলগত পরিকল্পনা, অস্ত্র পরীক্ষা এবং অফিসারদের পদোন্নতি ও পদোন্নতির মাধ্যমে তিনি অধ্যবসায়ের সাথে তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেছিলে। লিঙ্কনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল কনফেডারেসিকে পরাজিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করা। তিনি সৈন্য তলব করেন, দক্ষিণ বন্দরগুলিতে নৌ অবরোধ বাস্তবায়ন করেন এবং কৌশলগত পরিকল্পনা এবং সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই প্রসঙ্গে American Civil War (12 April 1861 – 9 April 1865) এবং সেখানে কি ভাবে আব্রাহাম তার ভুমিকা পালনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন সে সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

আমেরিকার ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধের আমেরিকার

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ - জর্জ ওয়াশিংটনের জন্মদিন - ভোরবেলায় নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন ইন্ডিপেন্ডেন্স হলে পৌঁছান। তাঁর উদ্বোধনী যাত্রায় দশ দিন ধরে দেশজুড়ে ভ্রমণ

করার পর তিনি ওয়াশিংটন, ডিসিতে পৌঁছেছিলেন। এখন, জাতির জন্মস্থানে দাঁড়িয়ে, লিংকন জাতিকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন যে দেশে রক্তপাত এড়ানো সম্ভব। ১৮৬৩ সালে জারি করা লিঙ্কনের মুক্তির ঘোষণাপত্র যুদ্ধকে দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রূপান্তরিত করেন এবং যুদ্ধে নৈতিক ও আদর্শগত মাত্রা উন্নত করেন। তাঁর ঐ পদক্ষেপ ইউরোপীয় শক্তিগুলিকেও ভীষণভাবে প্রভাবিত করে যাতে তারা কনফেডারেসিকে সমর্থন না করে। উল্লেখ্য, আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময়, দক্ষিণ দিকের রাজ্যগুলো "কনফেডারেট স্টেটস অফ আমেরিকা" নামে একটি কনফেডারেসি গঠন করে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিয়ন থেকে আলাদা হওয়ার চেষ্টা করেছিল।

এরপর ১৮৬৫ সালের ৪ মার্চ তাঁর দ্বিতীয় উদ্বোধনী ভাষণে, পুনর্নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন একটি ভাঙা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। চার বছরের নৃশংস গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি সামনে আসার সাথে সাথে, উভয় পক্ষের অনেক মানুষ তাদের সহ-আমেরিকানদের প্রতি ক্রোধ এবং হতাশা অনুভব করেছিলে। লিংকন বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে নিরাময়ের প্রক্রিয়া শুরু করার চেষ্টা করলেন। দোষ চাপানোর পরিবর্তে, অথবা আসন্ন উত্তর বিজয়ের পবিত্রতায় আনন্দ করার পরিবর্তে, লিংকন উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় দেশের নাগরিকদের কাছে সমঝোতার কথা বললেন। চার বছর ধরে ভয়াবহ জাতীয় সংকটের পর, লিংকন তাঁর দ্বিতীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মৃদু অথচ স্পষ্টভাবে দাসত্বকে যুদ্ধের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন "উভয়ই একই বাইবেল পড়েন এবং একই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন এবং একে অপরের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করেন- যা ঠিক নয়" লিংকনের মতে অ্যামেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণ ছিল দাসত্বপথা। যেহেতু লিংকন একজন দক্ষ রাজনৈতিক নেতা এবং সুবক্তা ছিলেন, যিনি জাতিকে অনুপ্রাণিত করতে এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থনে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গেটিসবার্গের ভাষণের মতো ঐ সময় তাঁর অন্যান্য বক্তৃতাগুলি যুদ্ধের নৈতিক উদ্দেশ্য এবং

সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের প্রতি জাতির অঙ্গীকারকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। প্রসঙ্গত আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় ১৮৬৩ সালের ১৯ নভেম্বর পেনসালভেনিয়ার গেটিসবার্গে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন একটি বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন। ঐ ভাষণে সমগ্র জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে বলেছিলেন,;

"চারশো সাত বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা এই মহাদেশে একটি নতুন জাতি জন্ম দিয়েছিলেন, যা স্বাধীনতায় ধারনায় তৈরি হয়েছিল এবং এই প্রস্তাবের প্রতি উৎসর্গীকৃত ছিল যে সমস্ত মানুষ সমানভাবে সৃষ্টি। ..." তিনি ঐ ভাষণে আরো বলেন; "এখন আমরা একটি মহান গৃহযুদ্ধে লিপ্ত, যা পরীক্ষা করছে যে সেই জাতি, অথবা এত কল্পনা করা এবং এত নিবেদিতপ্রাণ কোন জাতি, দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে কিনা। আমরা সেই যুদ্ধের এক মহান যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখি হয়েছি। আমরা সেই ক্ষেত্রটির একটি অংশ তাদের জন্য চূড়ান্ত বিশ্রামস্থল হিসেবে উৎসর্গ করতে এসেছি যারা এখানে তাদের জীবন দিয়েছেন যাতে সেই জাতি বেঁচে থাকতে পারে। এটা সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত এবং যথাযথ যে আমাদের এটি করা উচিত।"

"কিন্তু বৃহত্তর অর্থে আমরা এই ভূমি উৎসর্গ করতে পারি না, আমরা পবিত্র করতে পারি না, আমরা পবিত্র করতে পারি না। এখানে সংগ্রাম করা জীবিত এবং মৃত সাহসী পুরুষরা এটিকে পবিত্র করেছেন, আমাদের দুর্বল শক্তির চেয়ে অনেক বেশি যোগ বা হ্রাস করার। আমরা এখানে যা বলি তা পৃথিবী খুব কমই লক্ষ্য করবে, বা দীর্ঘকাল মনে রাখবে না, তবে তারা এখানে কী করেছে তা কখনই ভুলতে পারে না। আমাদের জীবিতদের জন্য, বরং এখানে যারা লড়াই করেছেন তারা এতদূর এত মহৎ ভাবে এগিয়ে আসা অসম্পূর্ণ কাজের প্রতি নিবেদিত থাকা। বরং আমাদের সামনে থাকা মহান কাজের প্রতি নিবেদিত থাকা উচিত, এই সম্মানিত মৃতদের কাছ থেকে আমরা সেই উদ্দেশ্যে আরও বেশি নিষ্ঠা গ্রহণ করি যার জন্য তারা শেষ পূর্ণ নিষ্ঠা দিয়েছিলেন, আমরা এখানে দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ যে এই মৃতরা বৃথা মারা যাবে না, ঈশ্বরের অধীনে এই

জাতি স্বাধীনতার একটি নতুন জন্ম পাবে, এবং জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের সরকার পৃথিবী থেকে ধ্বংস হবে না।"
(Ref AI Search – Library of Congress)

"Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal. "Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. "But in a larger sense we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here have consecrated it, far above our poor power to add or detract. .... I It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us,that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion, that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that ***government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.****"* (Ref; AI Search – Library of Congress; ওয়িকিপেডিয়া)

ইউনিয়ন সংরক্ষণ:

উপরের আলোচনা হতে বোঝা যায় আব্রাহাম লিংকনের রাষ্ট্রপতিত্ব এবং আমেরিকার গৃহযুদ্ধ পারস্পরিক ভাবে যুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিভক্ত করতে ঐ সময়ের একটি বৃহৎ সংগ্রাম সঙঘটিত হয়েছিল। কিন্তু একটি সিভিল ওয়ার এর মাধ্যমে তিনি

সফলভাবে অ্যামেরিকার ইউনিয়নকে ভেঙে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন।

আব্রাহাম লিংকনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব;

আমেরিকানরা সবসময়ই আব্রাহাম লিংকনকে তাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শ্রদ্ধা করে। যদিও ঐ দেশের জনক হলেন জর্জ ওয়াশিংটন; ", তবুও জনমত জরিপে আব্রাহাম লিংকন ধারাবাহিকভাবে এক নম্বরে থাকেন এবং জর্জ ওয়াশিংটন সাধারণত দ্বিতীয় স্থানে থাকেন। আমদের মনে হতে পারে আমেরিকানরা কেন এভাবে বিচার করে? সংগৃহীত তথ্য অনুসারে ১৮০৯ সালে যখন লিংকনের জন্ম হয়, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর। সেখানে ১৭৮৮ সালে বিপ্লবের পর আমেরিকার স্বাধীনতা আসে এবং তাদের স্বাধীন দেশের সংবিধান অনুমোদিত হয়। আমেরিকান বিপ্লবের আগে, উত্তর আমেরিকার তেরোটি ব্রিটিশ উপনিবেশ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। এরপর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ হয় ১৭৮৩ সালে প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটে, যা ব্রিটিশ শাসন থেকে উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা নিশ্চিত করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। লিংকনের জন্মের সময় বেশ কিছু আমেরিকান জীবিত ছিলেন যাঁরা আমেরিকান বিপ্লবে লড়াই করেছিলেন - এবং লিংকন তাঁদের চিনতেন এবং তাদের সম্পর্কে জানতেন। এই বিপ্লবীরা রাজা, রানী এবং অভিজাতদের উপর নয় বরং এই ধারণার উপর ভিত্তি করেছিলেন যে মানুষ আইনের ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের শাসন করতে পারবে। একটি নতুন সরকার ব্যবস্থা তৈরির জন্য তাঁরা উৎসাহী ছিলেন যাতে মানুষ আইনের ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের শাসন করতে পারে। রাষ্ট্রপতি, কংগ্রেস এবং বিচার বিভাগ সহ একটি সংবিধানের উপর ভিত্তি করে আমেরিকার প্রজাতন্ত্র ছিল লিংকন এবং তাঁর সমসাময়িকদের কাছে এক অনন্য পরীক্ষা. যদি ঐ সময় লিংকনের জন্ম হত অথবা তিনি যদি না ইউনিয়ন সংরক্ষনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন, তাহলে দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে ইউনিয়ন ত্যাগ করে দাস-ভিত্তিক কনফেডারেসি

তৈরি করার অনুমতি যদি দেওয়া হত। তাহলে আমেরকার ইউনিয়ন ভেঙে যেত। লিঙ্কনের মহান কৃতিত্ব ছিল ইউনিয়নকে সংরক্ষণ করা - কারণ তিনি আমেরিকানদের মধ্যে বাস করতেন যারা বিপ্লবের অংশ ছিলেন, ইউনিয়ন সংরক্ষণর গুরুত্ব ভালভাবে বুঝতেন এবং তাই তিনি আমেরিকান ইউনিয়নকে ধ্বংস হতে দেখতে চাননি। আমরা আগেই জেনেছি ১৮৬১ সালের এপ্রিলে যখন গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, তখন দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে চার মিলিয়ন দাসত্বপ্রাপ্ত আফ্রিকান আমেরিকান ছিল এবং দক্ষিণের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য যে বৃক্ষরোপণ অর্থনীতি (plantation economy) ব্যবহৃত হত তা ঐ দাসত্বপ্রাপ্ত শ্রমের উপর নির্ভর করত। ১৮৬৩ সালের ১ জানুয়ারী, অ্যান্টিয়েটামে ইউনিয়ন সেনাবাহিনীর বিজয়ের পর, লিঙ্কন ঘোষণা করেন যে "বিদ্রোহে থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে দাসত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিই মুক্ত" এবং "এখন থেকে মুক্ত থাকবেন।" ইউনিয়ন রক্ষার যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। ইউনিয়ন সৈন্যরা কনফেডারেশনের আরও গভীরে প্রবেশ করার সাথে সাথে, মুক্ত পুরুষরা ইউনিয়ন সেনাবাহিনীতে তালিকাভুক্ত হয়। এর ফলে সারা বিশ্বে লিঙ্কনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পরিশেষে, ১০০,০০০-এরও বেশি কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ মার্কিন রঙিন সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে। ১৮৬৫ সালে ইউনিয়নের বিজয়ের জন্য তাদের উপস্থিতি একটি মূল কারণ ছিল। যদিও লিঙ্কনের মুক্তি ঘোষণা আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য বর্ণগত ন্যায়বিচারের সংগ্রামের সূচনা ছিল, এটি সরাসরি ১৩তম সংশোধনীর দিকে পরিচালিত করেছিল যা চিরতরে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করেছিল। এই সাংবিধানিক পরিবর্তনের পরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী - ১৪তম - আসে যা নিশ্চিত করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী সকল ব্যক্তিই মার্কিন নাগরিক এবং সকল ব্যক্তি "আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া" পাওয়ার অধিকারী হয়। এতেও লিঙ্কনের খ্যাতি অনেক বৃদ্ধি পায়।

আমরা আগেই জেনেছি লিংকন কেনটাকির একটি কাঠের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সীমান্তে দরিদ্র হয়ে বেড়ে ওঠেছিলেন

। তাঁর মা যখন নয় বছর বয়সে মারা যান, এবং তার মৃত্যুর পর তার জীবন আরও কঠিন হয়ে ওঠে। লিংকনের মাত্র এক বছর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল কিন্তু সাত বছর বয়সে কীভাবে পড়তে হয় তা শিখেছিলেন। পরবর্তী বছরগুলিতে, তিনি নিজেকে শিক্ষিত করেছিলেন। তাঁর ঐ অসাধারণ স্ব-শিক্ষার (self-education) ফলে লিংকন ১৮৩০, ৪০ এবং ৫০ এর দশকে ইলিনয়ের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী হয়ে ওঠেছিলেন। এরপর দেশের স্বার্থে শীঘ্রই তিনি রাজনীতিতে চলে আসেন, রাজ্য আইনসভায় দায়িত্ব পালন করেন। লিংকন মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে ইলিনয়ের প্রতিনিধিত্বও করেন। ১৮৬০ সালে যখন তিনি ১৬তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এই উচ্চ পদ অর্জনকারী প্রথম রিপাবলিকান - তখন লিংকন হলেন "আমেরিকান স্বপ্ন" বাস্তবায়নের প্রতীক। ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত একজন ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার বিশাল কৃতিত্ব, অপ্রতিরোধ্য সাফল্য প্রমাণ করে যে কেন তিনি অ্যামেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রশংসিত রাষ্ট্রপতি।

(Ref. Article - What Makes Abraham Lincoln So Remarkable? By Prof. Fred Borch a lawyer and historian.)

আব্রাহাম লিংকন এবং তাঁর চরিত্রগত বিশেষ গুণাবলী

আব্রাহাম লিংকন একজন আদর্শবান ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছাড়া বিশ্ব ইতিহাসের যেকোনো ব্যক্তির চেয়ে বেশি খ্যাতিমান ব্যক্তি। তাঁর বিশেষ কিছু চরিত্রগত গুণাবলীর কারণে তিনি সারা বিশ্বে এত বিখ্যাত ও মহান ছিলেন। তাঁর জীবনী পড়লে জানা যায়, লিংকন চরিত্রগত গুণাবলী নিয়ে জন্মগ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি তাঁর বাল্যকাল হতে প্রতিদিন সেগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে অনুশীলন এবং বিকাশ করেছিলেন। তিনি অন্তর থেকে বিশ্বাস করতেন যে সকল মানুষ সমান সম্মান ও আচরণের যোগ্য। অবিরাম অনুশীলন এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে, লিঙ্কন রাষ্ট্রপতির উচ্চ রাজনৈতিক পদ অর্জন করেছিলেন। তিনি সকলের সাথে সততা, নম্রতা, সাহস, ন্যায়বিচার এবং করুণার সাথে আচরণ করতেন।লিংকনের জীবদ্দশাতেই মানুষ তাঁর প্রতি মুগ্ধ ছিল।

মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি জাতীয় লোককাহিনীতে প্রবেশ করেছিলেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমরা এখনও আব্রাহাম লিংকনের মহত্ত্ব এবং তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট। তাঁর জীবনের উদাহরণগুলি শক্তিশালী শিক্ষা প্রদান করে: সকল কাজে সৎ থাকা; শেখার জন্য এক অন্তহীন প্রচেষ্টা থাকা; ভয়ের মুখোমুখি হওয়া এবং পরাজয়কে জয় করা; অন্যদের সাথে করুণা, দয়া এবং শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করা যেমন আপনি অন্যদের কাছ থেকে চান; যা সঠিক তার পক্ষে দাঁড়ানো এবং দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো; এবং কঠোর পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক হলে সর্বোচ্চ উচ্চতায় ওঠা। আজ আমাদের এই শিক্ষাগুলির আগের চেয়েও বেশি প্রয়োজন। এই শিক্ষাগুলিকে ক্রমাগত উৎসাহিত করা যেতে পারে এবং অবশ্যই সমাজ, শিক্ষা, ব্যবসা এবং সরকারের প্রতিটি কাঠামোতে একত্রিত করা উচিত, তরুণ এবং বৃদ্ধ উভয়ের মধ্যেই।আব্রাহাম লিংকন যে সকল চরিত্রগত বিশেষ গুণাবলীর জন্য সারা বিশ্বের কাছে বিখাত এবং সমাদৃত তার মধ্যে রয়েছে: ১) সততা – ব্যক্তি, জাতি, দেশ এবং পরিস্থিতির সাথে ন্যায্যতা ও সত্যের সাথে সমান ভাবে আচরণ করতেন তিনি। ২) সহানুভূতি – দুর্বল ও নিপীড়িতের প্রতি তাঁর উদ্বেগে ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। ৩) নম্রতা – তিনি সর্বদা অন্যদের স্বার্থে ও দেশের উন্নতির জন্য কাজ করতেন; নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করতেন না। ৪) সভ্যতা – অন্যদের প্রতি ভদ্রতা এবং সম্মান প্রদর্শন করতেন। ৫) অধ্যবসায় – তাঁর অসাধারণ অধ্যবসায় জন্য তিনি পরাজয় এবং ক্ষতির সম্মুখীন হয়েও কখনো নিরাশ হতেন না। ৬) অপরিসীম সাহসিকতা – দেশের জন্য এবং জাতির স্বার্থে যে কোন বড় কাজে অসাধারণ দুসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সকল সঙ্কট এবং চরম বিরোধিতা সম্মুখে সাহসের সাথে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ৭) দূরদর্শিতা – জাতির এবং দেশবাসীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি সর্বদা সতর্ক থাকতেন এবং যথার্থ নীতি এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তিনি পরিচালিত হতেন। কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা সঙ্গে একজন নাগরিক হিসেবে নিজের কর্তব্য পালন করতেন। ৮) প্রগতিশীল নেতৃত্ব প্রদান– দেশের সেবায়, জাতির কল্যাণে, তিনি মানবতার পূজারী হয়ে ন্যায়বিচার,

ন্যায্যতা, সততা সাথে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তিনি প্রদর্শন করেছেন।

মৃত্যু

১৮৬৫ সালের ১৪ এপ্রিল ওয়াশিংটন ডিসির ফোর্ডস থিয়েটারে রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকনকে হত্যা করা হয় এবং পরের দিন সকাল ৭:২২ মিনিটে তিনি মারা যান। একটি নাটক দেখার সময় কনফেডারেটের সহানুভূতিশীল জন উইলকস বুথ তাঁকে গুলি করে হত্যা করেন। বুথের উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যাহত করা এবং সম্ভাব্যভাবে কনফেডারেসিকে সহায়তা করা। একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বুথের উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের নির্মূল করা। জন উইলকস বুথ, একজন বিশিষ্ট আমেরিকান অভিনেতা, ফোর্ড'স থিয়েটারে লিংকনের একটি নাটক দেখার সময় আব্রাহাম লিংকনের পিছনে লুকিয়ে পড়েন এবং খুব কাছ থেকে তাঁর মাথার পিছনে গুলি করেন। দক্ষিণ মেরিল্যান্ড এবং ভার্জিনিয়া জুড়ে বারো দিন ধরে ইউনিয়ন সৈন্যদের দ্বারা ধাওয়া করা বুথ, ফেডারেল সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে। বুথ অবশেষে ২৬ এপ্রিল ভার্জিনিয়ায় ইউনিয়ন সৈন্যদের দ্বারা কোণঠাসা হয়ে নিহত হন। লিখিত তথ্য অনুসারে রাষ্ট্রপতি লিংকনের হত্যাকাণ্ড ছিল একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ যার মধ্যে ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম এইচ. সিওয়ার্ডের উপর একযোগে আক্রমণ এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জনসনকে সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা।

গৌতম বুদ্ধ- বিষ্ণুর নবম অবতার

গুগুল ছবি

ভূমিকা

গৌতম বুদ্ধ, ভগবান বিষ্ণুর নবম অবতার। 'বুদ্ধ' কথার হল 'আলোকিত বা জাগ্রত'। ভাগবত পুরাণ বা শ্রীমদ ভাগবত অনুসারে ভগবান বিষ্ণুর দশটি প্রধান অবতার- মায়স্য, কূর্ম, বর্ষ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কল্কি পৃথিবীতে বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। ভগবত গীতার চতুর্থ অধ্যায়, ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন- "ভবতি ভারত, অভ্যুতানম্ অধর্মস্য তদাত্মানম্ শ্রাম্যহম্।" এর অর্থ হল, "যখনই মহাবিশ্বে ধর্ম ও নীতিগত শৃঙ্খলার অবনতি হয় এবং অধর্ম বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তখনই আমি (ঈশ্বর) নিজেকে প্রকাশ করি।" বিশৃঙ্খলা ও মন্দের

অবসান ঘটাতে এবং ধর্ম পুনরুদ্ধার করতে ভগবান কৃষ্ণ নিজেকে পৃথিবীতে অষ্টম অবতার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান রাম হলেন সপ্তম অবতার রাক্ষস রাবণের রাজত্ব ও অধর্মের শাসন ধ্বংস করতে পৃথিবীতে এসেছিলেন। নবম অবতার হলেন গৌতম বুদ্ধ। কল্কি, যাকে কল্কিনও বলা হয়, বিষ্ণুর দশম এবং শেষ অবতার। আধ্যাত্মিক পণ্ডিতরা বলেছেন যে বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে, কল্কি ২০২৬ সালে শাম্বলে জন্মগ্রহণ করবেন। এখানে আমরা ভারতের সাধক গৌতম বুদ্ধ - নবম অবতারের কিছু অলৌকিক ঘটনা এবং তাঁর অসাধারণ দর্শন নিয়ে আলোচনা করব।

আমরা প্রায় সকলেই জানি, বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম, বৌদ্ধধর্মের সূচনা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, কোরিয়া এবং জাপানে ছড়িয়ে পড়ে। আজ, সারা বিশ্বে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রয়েছে। ইতিহাস বলে- মহাযান বৌদ্ধধর্ম সিল্ক রোডের মাধ্যমে ভারত থেকে হান চীনে প্রবেশ করে, যা খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল। চীনে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রথম নথিভুক্ত হয়েছিল দ্বিতীয় শতাব্দীতে কুষাণ সাম্রাজ্যের মাধ্যমে। জেনে রাখা ভাল, সিল্ক রোড কোন প্রকৃত রাস্তা বা রুট নয়। এই শব্দটি ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত ১,৫০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যবহৃত রুটের একটি নেটওয়ার্ককে বোঝায়, যখন ১৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চীনের হান রাজবংশ ভারতের সাথে বাণিজ্য শুরু করে। ঐ সময় মহাযান বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের অনেকটা অংশে বিস্তার লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মে বর্ণপ্রথা প্রত্যাখ্যান এবং "মধ্যম পথের" নমনীয়তাই এটিকে এশিয়াতে বিস্তারে সাহায্য করে।

বৌদ্ধ ধর্ম ও গৌতম বুদ্ধ

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ। তিনি মানব সভ্যতার একজন ত্রাতা হিসেবে ভারতের মাটিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মানব জীবনের , দুঃখ , কষ্ট , যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে জীবনের পথ-নির্দেশিকা দিয়েছিলেন তিনি তাঁর অনুগামীদের। গৌতম বুদ্ধই পৃথিবীতে প্রথম বলেন, নির্বাণ লাভ অর্থাৎ কামনা-বাসনা থেকে

মুক্তি লাভে মানুষের দুঃখের অবসান ঘটে। তিনি বলেছেন- মানুষের জীবন মাত্রই সুখ-দুঃখের মিলিত রূপ। সুখের পাশাপাশি দুঃখের হাত থেকেও নিস্তার নেই কারও। জরা, রোগ, মৃত্যু- এ সবই দুঃখ। বুদ্ধের মতে মানুষের কামনা-বাসনাই দুঃখের মূল। মাঝে মাঝে যে সুখ আসে তাও দুঃখের সাথে মিশে যায় এবং ফলে সুখ অস্থায়ী হয়। সুখ থাকলে দুঃখ আসতে বাধ্য। অবিমিশ্র সুখ বলতে কিছু নেই।' গৌতম বুদ্ধই পৃথিবীতে প্রথম এই দুঃখ নিবারণের উপায় অনুসন্ধান করে মানবজাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তিনি কীভাবে মুক্তি বা নির্বাণের পথ দেখিয়েছেন সে বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। এরপূর্বে তাঁর অবতার জীবনের কিছু অলৌকিক ঘটনা তুলে ধরব।

গৌতম বুদ্ধের অলৌকিক জন্ম;

গৌতম বুদ্ধ, শাক্য বংশের রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তাঁর রাজতান্ত্রিক ধন-সম্পদ ত্যাগ করে তাঁর যৌবন কালে জীবনের সত্যের সন্ধানে সংসার ত্যাগ করেন। ধ্যান ও যোগবলে আত্ম-জ্ঞান লাভের পর সিদ্ধার্থ জ্ঞানপ্রাপ্ত পুরুষ বা 'বুদ্ধ' হয়ে ওঠেন। এরপর সর্বত্র তিনি মানবজাতির অস্তিত্বের সত্য উপলব্ধি করার জন্য আত্ম-প্রচেষ্টার মাধ্যমে আত্ম-উপলব্ধির গুরুত্ব প্রচার করেন। যখন ভারত ধর্ম এবং প্রকৃত বৈদিক শিক্ষার প্রকৃত বোধগম্যতা হারিয়ে ফেলেছিল এবং সঠিক দর্শন ছাড়াই ধর্মীয় অনুশীলনের মাধ্যমে অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিল, তখনই এই জ্ঞানপ্রাপ্ত (enlighted) মহামানব গৌতম বুদ্ধ ভারতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হিন্দুধর্মে স্বর্গ ও নরক ভোগের চিন্তাধারা বা দর্শন থেকে দূরে সরে গিয়ে তিনি মুক্তির দর্শনের দিকে মানুষকে পরিচালিত করেছিলেন। তিনি অহিংসার মাধ্যমে সকলকে ভালোবাসা, পশুহত্যা বন্ধ করে, জ্ঞানলাভের দ্বারা জীবনে মুক্তি অর্থাৎ নির্বাণ লাভের শিক্ষা প্রচার করেছিলেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে ধর্মের নামে বলিদান বা পশুহত্যা বৈদিক শাস্ত্র দ্বারা অনুমোদিত নয়। তিনি মানুষকে মানবতা, সহানুভূতি এবং করুণার সাথে সকল প্রাণীর সাথে আচরণ করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর অনন্য শিক্ষা হলো

মানুষের দুঃখকষ্টের মূল কারণ বোঝা এবং জ্ঞানলাভের মাধ্যমে তা দূর করা এবং পরিশেষে নির্বাণ লাভ করা। নির্বাণ লাভ বৌদ্ধধর্মের এই প্রধান নির্দেশ হাজার হাজার বছর ধরে বিশ্বব্যাপী মানুষ অনুসরণ করে আসছে। তাঁর জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অলৌকিকতায় পূর্ণ। তাঁর জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা রয়েছে, তার মধ্যে অসাধারণ আটটি ঘটনা যা তাঁর জন্ম, জ্ঞানলাভ, প্রথম ধর্মোপদেশ, বানরের মধু প্রদান, নলগিরি হাতির বশীকরণ, তাবতীমসা স্বর্গ থেকে অবতরণ, শ্রাবস্তীতে অলৌকিক ঘটনা এবং তাঁর মৃত্যু বা পরিনির্বাণ ক্ষেত্রে ঘটেছিল; সেগুলি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

১; বুদ্ধের অসাধারণ জন্ম কাহিনী

গৌতম বুদ্ধ হিমালয়ের পাদদেশে বসবাসকারী শাক্য বংশের এক সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই কারণেই তিনি শাক্যমুনি বা শাক্য বংশের ঋষি নামে পরিচিত। শাক্য বংশের রাজা শুদ্ধোধন ছিলেন তাঁর পিতা এবং মাতা মায়াদেবী যিনি ছিলেন কোলিয়া শহরের একজন কোলিয়ান রাজকন্যা। এই শহরটি সরযূ নদী থেকে উত্তরে হিমালয় পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে অবস্থিত। বুদ্ধের জন্ম সম্পর্কে কথিত আছে যে, তাঁর মা রাণী মায়াদেবী স্বপ্নে একটি বিশাল সাদা হাতি দেখেছিলেন। মায়াদেবী স্বপ্নে দেখেন যে একটি সাদা হাতি তাঁর ডান পাশে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং তিনি তাকে গর্ভে ধারণ করলেন। এরপর গৌতম বুদ্ধ নেপালের লুম্বিনি বাগানে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম নামে জন্মগ্রহণ করলেন। বিশ্বাস করা হয় যে, যখন তাঁর মা মায়াদেবী নেপালের দেবদহে তাঁর মাতৃগৃহে যাচ্ছিলেন, তখন সিদ্ধার্থ গৌতম রাস্তায় বৃক্ষতলে মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কথিত আছে যে, জন্মের পরপরই সিদ্ধার্থ সাতটি পদক্ষেপ নিয়ে জ্ঞানের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি যেখানেই পা রেখেছিলেন সেখানেই পদ্মফুল ফুটে উঠেছিল। সেই সাতটি পদক্ষেপে হাঁটতে হাঁটতে তিনি বলেছিলেন:

"আমিই জগতের প্রধান, আমিই জগতের জ্যেষ্ঠ,

আমিই জগতের সর্বপ্রথম। এটিই শেষ জন্ম।

আর কোন জন্ম হবে না।"

কিংবদন্তি অনুসারে, রানী মায়াদেবী একটি বাগানে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সিদ্ধার্থকে জন্ম দিয়েছিলেন। শিশুটি মায়ের ডান দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্গত হয়েই সাতটি পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। মায়াদেবী শিশুটিকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে আসার পর যখন, শিশুটিকে একজন জ্যোতিষীর সামনে উপস্থাপন করা হয়, জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিনি (শিশুটি) হয় একজন মহান রাজা হবেন অথবা একজন মহান ধর্মীয় শিক্ষক বা দার্শনিক হবেন। তারপর শিশুটির নাম রাখা হল 'সিদ্ধার্থ' যার অর্থ "যিনি তাঁর লক্ষ্য অর্জন করেন"। দুর্ভাগ্যবশত, তার জন্মের সাত দিন পর তাঁর মা মারা যান এবং তাই তাকে তাঁর মায়ের বোন মহাপ্রজাপতি তাঁকে লালন-পালন করেন। তার শৈশবে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। রাজপুত্রকে একবার এক উৎসবের সময় একা ফেলে রাখা হয়েছিল। দিনের শেষের দিকে তাকে একটি গাছের নীচে ধ্যানে বসে থাকতে দেখা যায়, যার ছায়া সূর্যের রশ্মি থেকে শিশুটিকে রক্ষা করার জন্য সারা দিন স্থির ছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, গৌতম বুদ্ধের জন্মের সঠিক তারিখ কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। তবে বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে, গৌতম বুদ্ধ ৫৬৩ থেকে ৪৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলেন। (Source; https://www.britannica.com/ Buddha-founder-of-Buddhism)

২; বুদ্ধের অসাধারণ প্রাথমিক জীবন

'রাজপুত্র সিদ্ধার্থ একজন মহান ঋষি হবেন' জ্যোতিষীর এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে, তাঁর পিতা রাজা শুদ্ধোধন ভাবলেন যে রাজপুত্রের কোনও সন্ন্যাসীর সাথে যদি যোগাযোগ হয় বা সে যদি কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস জীবনে অনুপ্রানিত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তিনি তার পুত্রকে প্রাসাদে ধরে রাখতে পারবেন না। তাই, সিদ্ধার্থের পিতা তাঁকে

বাইরের জগৎ এবং মানুষের দুঃখ-কষ্টের পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি পুত্রকে প্রাসাদের ভিতরেই আবদ্ধ রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। এভাবে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে সিদ্ধার্থ একজন অত্যন্ত শক্তিশালী রাজপুত্র হিসেবে বেড়ে ওঠেন, যেখানে সকল বিলাসিতা এবং আনন্দের বিশাল ব্যবস্থা ছিল। রাজা শুদ্ধোধন সিদ্ধার্থকে প্রাসাদের বাইরে কোন মতে যেতে দিলেন না যাতে রাজপুত্র সব কিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসী না হয়ে যান। এভাবে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বিলাসবহুল জীবন উপভোগ করতে লাগলেন এবং তাঁর পিতা জরা-ব্যাধি, বার্ধক্য, এবং মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এবং দুঃখ দুর্দশা ভরা জগতের বাস্তবতা থেকে রাজপুত্রকে অজ্ঞাত রাখলেন।রাজপুত্রকে বহির্বিশ্বের প্রকাশ থেকে রক্ষা করার জন্য শক্তিশালী রাজা তাঁকে গ্রীষ্ম, শীত এবং বর্ষার জন্য আলাদা আলাদা প্রাসাদ নির্মাণ করলেন এবং উপভোগের সকল উপায়ে ব্যবস্থা করলেন। শুধু তাই নয়, রাজপুত্রের সঠিক সেবা যত্ন প্রদানের জন্য প্রায় ৪০,০০০ পরিচারিকা নিয়োগ করেছিলেন। যশোধরা নামে এক অত্যন্ত সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে ১৬ বছর বয়সে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের বিয়ে দিয়ে দিলেন যাতে রাজপুত্র কখনো বহির্মুখী না হন। কিন্তু বড় হওয়ার সাথে সাথে বাইরের জগৎ সম্পর্কে সিদ্ধার্থের কৌতূহল বাড়তে লাগল। তিনি ধীরে ধীরে অনুভব করেছিলেন যে তাঁর বিলাসবহুল জীবন ফাঁকা এবং অপ্রয়োজনীয়।

৩; **বুদ্ধের পরবর্তী জীবনে অসাধারণ পরিবর্তন;**

রাজপুত্র যখন ২৯ বছর বয়সে পৌঁছালেন, তিনি ভালভাবে উপলব্ধি করলেন যে তাঁর বিলাসবহুল জীবন অসার, মূল্যহীন এবং অপ্রয়োজনীয়। তখন তাঁর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এলো। তিনি বাহিরের জগতটাকে দেখতে চাইলেন। তাই তিনি রাজপ্রাসাদের বাহিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী একদিন তিনি তাঁর রথচালককে রাজি করালেন যাতে সে তাঁকে রাজপ্রাসাদ থেকে নগর পরিদর্শনে নিয়ে যায়। তিনি ঘোড়ার গাড়ি চড়ে শহর ও নগর পরিদর্শনের জন্য তাঁর পিতার অনুমতি চাইলেন। রাজা অনুমতি দিলেন কিন্তু তার আগে রাজা তাঁর

লোকদের নির্দেশ দিলেন যে রাজপুত্রের রথযাত্রার পথ থেকে যেন সমস্ত অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোকদের সরিয়ে দেওয়া হয় যাতে কোনও অপ্রীতিকর দৃশ্য রাজপুত্রের নজরে না আসে এবং যাতে কোন বাস্তব অপ্রীতিকর দৃশ্য তাঁর মনকে পরিবর্তন করতে না পারে। রাজার এই সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও, নগরযাত্রার সময় রাজপুত্র চারটি বাস্তব কঠিন দৃশ্য দর্শন করলেন যেগুলি তাঁর মনকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করেদিল এবং সেই সকল বাস্তব দৃশ্য তাঁকে প্রাসাদ ছেড়ে জীবনের সত্যের সন্ধানে চলে যেতে বাধ্য করল।সেই চারটি দৃশ্য এখানে তুলে ধরা হল;

প্রথম দৃশ্য- এক বৃদ্ধ ব্যক্তি;

রথে চড়ে নগর ভ্রমণের প্রথম দিনে সিদ্ধার্থ একজন অত্যন্ত দুর্বল বৃদ্ধকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি এর আগে কখনও কোন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখেন নি। কোন বৃদ্ধ ব্যক্তির সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণাও ছিল না। তিনি তার রথচালককে ঐ দৃশ্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে বলেন। রথচালক উত্তর দেয় যে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটি একজন বৃদ্ধ মানুষ। এবং যখন মানুষ বৃদ্ধ হয়, তখন তারা শারীরিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। রথচালক আরও বলে- তিনি যে বৃদ্ধ মানুষটিকে দেখলেন, তিনিই পৃথিবীর একমাত্র বৃদ্ধ ব্যক্তি নন; পৃথিবীর সবাই – এমন কি রাজপুত্র, তাঁর বাবা, তাঁর স্ত্রী এবং তার আত্মীয়স্বজন – একদিন সকলেই বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং জরাজীর্ণ হয়ে পড়বেন।

একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রথম দর্শন সিদ্ধার্থকে বুঝতে সাহায্য করে যে কেউ চিরকাল যুবক এবং সুস্থ থাকবে না এবং কেউই বার্ধক্য এবং শারীরিক অবক্ষয় থেকে বাঁচতে পারবে না, সে রাজা হোক বা রাস্তার ভিক্ষুক হোক। এরপর রাজপুত্র প্রাসাদের বাইরে আরও তিনবার নগর ভ্রমণ করেছিলেন। ঐ নগর ভ্রমণের মাধ্যমে তরুণ সিদ্ধার্থ জীবনের আরও কঠিন বাস্তবতার সাথে পরিচিত হলেন। পরবর্তী তিনটি ভ্রমণে তিনি একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে, তারপর শ্মশান-যাত্রায় একটি মৃতদেহ এবং সবশেষে একটি গাছের নীচে ধ্যানে বসে থাকা একজন সাধুকে দেখতে পেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য - এক অসুস্থ ব্যক্তি;

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ শহর ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনে একজন অতি অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে পান। অসুস্থ ব্যক্তিটিকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে সিদ্ধার্থ হতবাক এবং বিস্মিত হলেন কারণ তিনি এর আগে কখনও এমন অসুস্থ ব্যক্তিকে রাস্তায় অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন নি। আগে তার কোন ধারণা ছিল না যে মানুষ অসুস্থ ও অসহায় হয় এবং এমনকি অসুস্থতার কারণে মারাও যায়। তখন তিনি আর একটা কঠিন বাস্তবতার অভিজ্ঞতা লাভ করলেন।

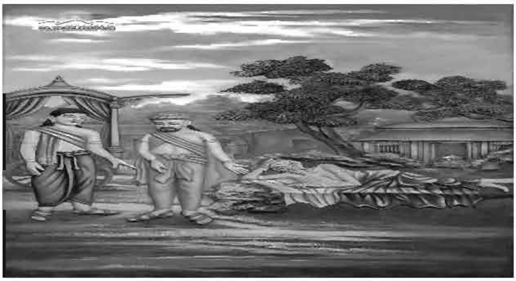

অসুস্থ ব্যক্তিকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা

তৃতীয় দৃশ্য- একটি মৃতদেহ

নগর ভ্রমণের তৃতীয় দিনে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ দেখতে পেলেন যে কয়েকজন ব্যক্তি একজন মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর জিজ্ঞাসাবাদে রথচালক রাজপুত্রকে ব্যাখ্যা করে যে, সকলেই শেষ পর্যন্ত মারা যায় এবং পৃথিবীতে কেউই মৃত্যুহীন নয়। মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য রাজপুত্রকে সবচেয়ে বেশি মানসিক আঘাত করেছিল কারণ তার আগে কোনও ধারণা ছিল না যে সকলেই মৃত্যুর অধীন। এটি ছিল তাঁর কাছে এক বিরাট সত্যের জাগরণ। তিনি বুঝে গেলেন যে কেউ চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না। কেউ পৃথিবীতে অমর নয়।

তৃতীয় দৃশ্য- একটি মৃতদেহ

চতুর্থ দৃশ্য- ধ্যানে বসে থাকা সাধক;

নগর ভ্রমণের চতুর্থ দিনে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ দেখলেন- একটি বড় গাছের নীচে ধ্যানে বসে থাকা এক সন্ন্যাসী ব্যক্তিকে (তপস্বী)। এটি ছিল তাঁর চতুর্থ দর্শন যা তাঁকে ধ্যানে থাকা ব্যক্তি সম্পর্কে খুব কৌতূহলী করে তোলে, কারণ, ধ্যানে থাকা ব্যক্তিটিকে খুব জ্ঞানী ব্যক্তি বলে তাঁর মনে হয়েছিল। তাঁর জিজ্ঞাসাবাদে, রথচালক সিদ্ধার্থকে ব্যাখ্যা করে বলে যে ধ্যানে বসে থাকা ব্যক্তিটি একজন পবিত্র ব্যক্তি যিনি সংসার ত্যাগ করে সাধনার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করছেন।

চতুর্থ দৃশ্য- ধ্যানে বসে থাকা সাধক

সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণে অভিজ্ঞতা;

চতুর্থ দিনের নগর ভ্রমণে যখন সিদ্ধার্থ সেই সাধু পুরুষকে গাছের নীচে ধ্যানে বসে থাকতে দেখেন, তখন তিনি অবাক হয়ে যান যে, চারপাশের চিৎকার ভিড় এবং কোলাহলের মধ্যেও সেই সাধু পুরুষ কি ভাবে এত শান্ত, শীতল এবং সংযত ছিলেন। রাস্তার প্রথম তিনটি দৃশ্য - একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি, একজন অসুস্থ ব্যক্তি এবং একটি মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে খুব মানসিক ভাবে ভীষণ আঘাত করেছিল, কিন্তু গভীর ধ্যানে থাকা সাধু ব্যক্তির চতুর্থ দৃশ্য তাঁকে ভীষণ আনন্দের সাথে অবাক করেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জীবনে সকলকে বার্ধক্য, রোগভোগ এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। প্রতিটি জীবনেই দুঃখ আসবে; তাই দুঃখ এবং মৃত্যু থেকে কারোরই মুক্তি নেই। তাই তিনি রাজকীয় জীবনে কোনও শান্তি এবং সুখ দেখতে পেলেন না। তিনি এটাও বুঝলেন একজন সাধু যিনি স্বাচ্ছন্দ্য, সংযত এবং করুণাময়, তিনি সবচেয়ে খুশী; কারণ তিনি জীবনের আসল স্বরূপ ও সত্য জেনে ফেলেছেন। তাই তাঁর চতুর্থ দর্শন তাঁকে খুব খুশি করেছিল।

(উৎস; (https://learningrmps.com/2017/09/14/the-four-sights-and-going-forth-buddhism)

৪; **সিদ্ধার্থের অসাধারণ আত্মত্যাগ**

এরপর সিদ্ধার্থ গৌতম সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি একজন সন্ন্যাসী বা তপস্বীর পথ অনুসরণ করবেন এবং বিলাসবহুল, জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় জীবন উপভোগ করার পরিবর্তে জীবনে দুঃখের কারণ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধানে তিনি জীবন কাটাবেন। তাই তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে প্রাসাদ ছেড়ে বনে যাওয়ার অনুমতি নিতে গেলেন। রাজপুত্রের প্রাসাদ ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত শুনে বাবা হতবাক এবং বিস্মিত হলেন। রাজা তাঁর পুত্রকে প্রাসাদে থাকতে রাজি করানোর জন্য অনেক কিছু দিলেন এবং পুত্রের পছন্দমত আরো কিছু দিতে চাইলেন। পিতার ঐ প্রতিশ্রুতি শুনে রাজপুত্র তাঁর পিতাকে নিবেদন করলেন যে তিনি (পিতা) যদি নিশ্চিত

করতে পারেন যে তিনি কখনও অসুস্থ হবেন না বা বৃদ্ধ হবেন না, বা মারা যাবেন না এবং কখনো তিনি তাঁর যৌবন এবং সম্পদ হারাবেন না; তাহলে তিনি রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যাবেন না। উত্তরে তাঁর পিতা বললেন যে এটি সম্ভব হতে পারে না যে মানুষের বার্ধক্য আসবে না বা মৃত্যু আসবে না। কারণ সকলেই ক্ষয় এবং মৃত্যুর অধীন। তাই পুত্রের জন্য সমস্ত আনন্দ এবং আরামের ব্যবস্থা করেও রাজা রাজপুত্রকে প্রাসাদে আটকে রাখতে পারলেন না। এরপর রাজপ্রাসাদের সুন্দরী মহিলারা রাজপুত্রের সাথে দেখা করলেন কিন্তু তিনি তাদের আবেদনের প্রতি উদাসীন থাকলেন। রাজপুত্র সেই রাতেই রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে একজন তপস্বীর জীবন গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। সাতদিন আগে যখন তাকে জানানো হয় যে তাঁর স্ত্রী একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, তখন তিনি বলেন, "একটি শিকল তৈরি হয়েছে।" শিশুটির নাম রেখেছিলেন 'রাহুল', যার অর্থ "শিকল।" সিদ্ধার্থ অনুভব করেছিলেন যে পারিবারিক বন্ধন তার ত্যাগের পথে বাধা হতে পারে। সিদ্ধার্থ তার পুত্রকে প্রথম দেখার পর 'রাহুল' উচ্চারণ করেন এবং সেই নামের একটি নতুন অর্থ "সম্পর্ক" এবং "বন্ধন"।

প্রসঙ্গত, রাজা রাহুলের জন্মদিন উদযাপনের উপলক্ষে রাজপুত্রের জন্য একটি জাঁকজমকপূর্ণ নৃত্য এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। দেশের সেরা নৃত্যশিল্পী, গায়ক এবং সঙ্গীতজ্ঞদের ঐ জন্মদিন উদযাপনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। উল্লেখ্য, রাজা যখন দেখছিলেন যে রাজপুত্র হতাশাগ্রস্ত এবং তাঁর নবজাত পুত্র রাহুল তাঁকে আনন্দ এবং সুখ দিতে পারছে না, তখন তিনি এই উদযাপনের আয়োজন করেছিলেন। রাজা সিদ্ধার্থের চিরকালের জন্য প্রাসাদ ছেড়ে যাওয়ার পরিকল্পনায় ভীত হয়ে পড়লেন এবং তাই রাজা শেষবারের মতো, রাজপুত্রকে আত্মত্যাগের মত নিষ্ক্রিয় চিন্তাভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রাজকীয় জীবনের প্রাচুর্য ফিরিয়ে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন ঐ জাঁকজমকপূর্ণ নৃত্য এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে। যাইহোক, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তাঁর পিতাকে খুশি করার জন্য তার ছেলে রাহুলের জন্মদিনের পার্টিতে

বাধ্যহয়ে যোগ দিয়েছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে রাতের খাবারের সময় রাজপুত্রকে সবচেয়ে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হল, দেশের সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর এবং সুন্দরী নৃত্যশিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করল, সবচেয়ে সংবেদনশীল সঙ্গীতশিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করল এবং সেরা পুতুল এবং জাদুকররা অবিশ্বাস্য অভিনয় করল। কিন্তু সিদ্ধার্থ তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে ভাবতে এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লেন। গায়ক এবং নৃত্যশিল্পীরা রাজপুত্রকে ঘুমাতে দেখে তারাও তাদের অভিনয় বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর রাতে রাজপুত্র জেগে ওঠে দেখেন অনুষ্ঠানের সকল পরিশ্রান্ত শিল্পীরা অচৈতন্য হয়ে মাটিতে ঘুমাচ্ছে। কি বিচিত্র ও দুঃখদায়ক এক দৃশ্য রাজপুত্রের চোখের সামনে এল। দেশের সকল সুন্দরী নৃত্যশিল্পী, মহান গায়িকা, সঙ্গীতজ্ঞ এবং অন্যান্য চমৎকার শিল্পী, যারা কয়েক ঘন্টা আগেও রাজপুত্রকে এত খুশি করার চেষ্টা করছিলেন, তারা অনুষ্ঠানের হলের মেঝেতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রয়েছে। সবচেয়ে কুৎসিত, লজ্জাজনক বিষয় হল এই যে কয়েকজন শিল্পী কদর্য ভঙ্গিতে শূকরের মতো প্রচন্ড নাক ডেকে অঘোরে ঘুমাচ্ছিল। তাদের চেহারা ও পোশাক-আসাক ও আচার-ব্যভারে তীব্র পরিবর্তন জীবনের কঠিন বাস্তবতা সম্পর্কে রাজপুত্রকে দুঃখে হতাশায় বিচলিত করল। উদযাপনের সেরা শিল্পীদের বাস্তব চিত্রগুলি এতটাই দমনমূলক এবং ভয়াবহ ছিল যে রাজপুত্রের মন অবিলম্বে প্রাসাদ ছেড়ে যাওয়ার দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তিনি চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে রথচালকের সাথে নীরবে দেখা করলেন এবং তাকে রথটিকে শহরের বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে বললেন। রাজপুত্রের আদেশ অনুসারে, চালক নীরবে এবং গোপনে দীর্ঘ যাত্রার জন্য ঘোড়াটিকে প্রস্তুত করল। তারপর রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তার নবজাতক পুত্র রাহুল এবং তাঁর স্ত্রীকে দেখতে অন্দরমহলে গেলেন। তাঁরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। এক মিনিটের জন্য শিশুটিকে কোলে নেওয়ার তীব্র ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর সেই প্রবল ইচ্ছা দমন করলেন; কারণ তিনি ভয় পেয়েছিলেন, যদি তিনি শিশুটিকে স্পর্শ করেন তবে তাঁর স্ত্রী জেগে উঠবেন এবং তখন তাঁর

স্ত্রী তাঁকে প্রাসাদ থেকে বের হতে বাধা দেবেন। সেই ভয়ে তিনি শিশুটিকে স্পর্শ করলেন না। তিনি কেবল তাঁদের দিকে তাকালেন এবং এই আশা নিয়ে চলে গেলেন যে তিনি ফিরে এসে একবার তাঁদের সাথে দেখা করবেন যখন তিনি যার সন্ধানে যাচ্ছেন, তার সন্ধান পাবেন।

তারপর, সিদ্ধার্থ চুপচাপ প্রাসাদ ত্যাগ করলেন। মধ্যরাত্রি হয়ে গেল, রাজপুত্র তাঁর বিশ্বস্ত রথচালক চন্নের সাথে তাঁর সাদা ঘোড়া কাঁথকের টানা রথের উপর চড়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন। যারা তাঁকে শ্রদ্ধা করত এবং ভালোবাসত তাদের সকলের কাছ থেকে তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কেউ তাঁকে থামাতে পারেনি। তিনি কপিলাবস্তু শহরের দিকে শেষবারের মতো তাকালেন – তাঁর মনে হয়েছিল সারা কপিলাবস্তু মহানগরী যেন চাঁদের আলোয় একেবারে নিঃশব্দে ঘুমিয়ে আছে। বার্ধক্য, অসুস্থতা এবং মৃত্যু- জীবনের এইসকল অনিবার্য দুঃখদায়ক ঘটনাগুলির কারণ অনুসন্ধান করতে তাঁর এই অসাধারণ আত্মত্যাগ। তিনি অনোমা নদীর তীরে এসে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। তিনি তাঁর সকল অলংকার এবং রাজকীয় পোশাক খুলে রাজার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রথচালক চন্নকে সবকিছু দিয়ে দিলেন। তারপর রাজপুত্র তাঁর তরবারি নিয়ে লম্বা চুল কেটে ফেললেন, সাধারণ পোশাক পরলেন, ভিক্ষার পাত্র হাতে নিলেন এবং এরপর চন্নকে ঘোড়ার সাথে ফিরে যেতে বললেন। ঐ সকল দেখে চন্ন খুব দুঃখের সাথে বললেন, "আপনাকে ছাড়া প্রাসাদে আমার থাকার কোন যুক্তি নেই, আমার প্রভু; আমি আপনার সাথে যেতে চাই।" চন্ন এইভাবে তিনবার তাঁর অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তাকে সেখানে থাকতে দিলেন না। অবশেষে চন্ন খুব দুঃখ নিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু ঘোড়া কান্তক চান্নার সাথে ফিরে যেতে অস্বীকার করল। রাজপুত্র ঘোড়াটিকে খুব স্নেহের সাথে বললেন। "কান্তক, দয়া করে আমার বন্ধুর সাথে প্রাসাদে ফিরে যাও। আমার জন্য অপেক্ষা করো না।" তখন কান্তক বুঝতে পারল যে সে আর কখনও তার প্রভুকে দেখতে পাবে না। রাজপুত্রকে দেখতে

দেখতে ঘোড়ার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল, যতক্ষণ না রাজপুত্র তার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। সিদ্ধার্থ দূরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কন্থক কান্নায় ভেঙে পড়ল এবং গভীর দুঃখে হৃদরোগে মারা গেলে। রথচালক চন্ন ভারী হৃদয় এবং চোখে অশ্রু নিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলে। (https://www.britannica.com/Buddha-founder-of-Buddhism)

৫ সিদ্ধার্থের বিম্বিসারের সাথে সাক্ষাৎ

কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এইভাবে বেরিয়ে গিয়ে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বনের মধ্যে প্রবেশ করেন, যেখানে তিনি ভিক্ষুকের পোশাক পরে ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে তাঁর সরল জীবন শুরু করেন। সেই সময় থেকে তিনি বন, গ্রাম এবং শহরে ঘুরে বেড়াতেন এবং ভিক্ষার পাত্রে যা কিছু দান সামগ্রী পেতেন তাই দিয়ে তাঁর জীবন ধারণ করতেন। উল্লেখ্য, গভীর সাধনায় আত্মজ্ঞান লাভের আগে রাজা বিম্বিসার রাজপুত্র সিদ্ধার্থের সাথে দেখা করেছিলেন এবং পরে রাজা বিম্বিসার গৌতম বুদ্ধের একজন গুরুত্বপূর্ণ শিষ্য হয়ে ওঠেন। সংগৃহীত তথ্য অনুসারে, তিনি তখন বৌদ্ধ শিক্ষায় জ্ঞানলাভে প্রথম স্তর অর্জন করেন এবং যখন রাজা বিম্বিসার সেটি জানতে পারেন, বিম্বিসার তখন, তপস্বী সিদ্ধার্থের মহান সমর্থক হয়ে ওঠেন এবং তাঁকে তাঁর রাজ্যের একটি ভাগ নিয়ে সেখানে থাকতে বলেন। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তাতে অস্বীকৃতি জানান কিন্তু জ্ঞানলাভের পর তাঁর কাছে ফিরে আসতে রাজি হন। পরবর্তী ছয় বছর ধরে, রাজপুত্র জ্ঞান লাভের জন্য ধ্যান করেন।

৬; সিদ্ধার্থের কঠোর তপস্যা

আমরা জেনেছি ২৯ বছর বয়সে, গৌতম বুদ্ধ তাঁর পরিবার এবং প্রাসাদের বিলাসবহুল জীবন ত্যাগ করে জীবনের বাস্তবতা এবং নির্বাণ লাভ অর্থাৎ দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা, জীবন ও পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তির সন্ধানে বেরিয়ে ছিলেন। গৌতম বুদ্ধ বনের গভীরে ঘুরে বেড়াতেন এবং এরপর তিনি কঠোর তপস্যায় বসেন। সম্পূর্ণ উপবাসের মধ্যে দিনের পর দিন তপস্যা করতেন। এরফলে তিনি

একেবারে জীবন্ত কঙ্কালে পরিণত হয়েছিলেন। জীবনের প্রকৃত জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা অর্জনের জন্য এটাই ছিল তাঁর কাছে একমাত্র উপায়। তবুও, তিনি তার লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারছিলেন না। এই ভাবে তাঁর সেই কঠোর তপস্যা প্রায় ছয় বছর ধরে চলেছিল। পরবর্তীকালে, তাঁর মনে হয়েছিল যে অনাহার এবং আত্মত্যাগ তাঁকে সেই জ্ঞান এনে দেবে না যা তিনি নিরলসভাবে খুঁজছিলেন।

৭; সুজাতার সাথে সিদ্ধার্থের সাক্ষাৎ;

সুজাতা ছিলেন একজন পশুপালক ও গোয়ালার কন্যা। সুজাতা ভীষণ দয়াশীলা ও সাধু-প্রকৃতির। তিনি তপস্যায়রত কঙ্কাল-সার গৌতম বুদ্ধকে কঠোর উপবাসের তপস্যায় দেখলেন। তাঁর দীর্ঘ উপবাস অবসানের জন্য সুজাতা তাঁকে পায়েস খাইয়েছিলেন বলে জানা যায়। ঘটনাটি এরকম ছিল- সুজাতা সন্তান লাভের আশায় সেই বনের একটি বটগাছের কাছে প্রার্থনা ও পুজা করতেন এবং তাঁর বিশেষ ইচ্ছা পুরোনের জন্য বনদেবতার কাছে প্রাথনা জানাতেন। তাই, তিনি সেখানে বটগাছে দুধ এবং পায়েস উৎসর্গ করতে যেতেন। সেই সময় কঙ্কাল শরীরে ভীষণ দুর্বল সিদ্ধার্থকে সেই গাছের নীচে ধ্যান করতে দেখতে পেলেন। সুজাতা সিদ্ধার্থকে বলেন, “তোমার শরীর এত দুর্বল যে তোমার দুধ ও ভাতের পায়েস নৈবেদ্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। গৌতম সিদ্ধার্থ প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে জ্ঞান অর্জন না করা পর্যন্ত আমি কিছু খেতে পারি না। সুজাতা বলেন যে নিজেকে খুব বেশি কষ্ট দেওয়া উচিত নয় যেমন খুব বেশি বিশ্রাম উপভোগ করা উচিত নয়, সর্বদা মধ্যপথ (মধ্যপন্থা) অনুসরণ করা উচিত। সুজাতার এই কথা গৌতম সিদ্ধার্থর হৃদয় স্পর্শ করেছিল। যাইহোক সুজাতার মধ্যপথের কথা শুনে গৌতম বুদ্ধ সুজাতার কাছ থেকে দুধ-ভাতের সোনার বাটি গ্রহণ করলেন। সুজাতার মধ্যপথের বার্তা তাঁকে জ্ঞান বিকাশ এবং জ্ঞান অর্জনের শক্তি প্রদান করেছিল বলে জানা যায়। তিনি (গৌতম) নদীর তীরে হেঁটে গেলেন, সুপ্তিথায় স্নান করলেন এবং তারপর খাবার গ্রহন করলেন। ঊনচল্লিশ দিন তপস্যার উপবাসের পর এটিই ছিল তাঁর একমাত্র খাবার। খাবারের পর, তাঁর মনে উদয় হল যে মধ্যম পথ অবলম্বন করেই কেবল জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। এরপর তিনি বোধগয়া গিয়ে একটি বোধি (ফিকাস রিলিজিওসা), যা পিপল গাছের নীচে বসেছিলেন এবং এই সংকল্প নিয়ে ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন যে "আমার দেহ ধ্বংস হয়ে গেলেও, জীবনের চূড়ান্ত বাস্তবতা না জেনে আমি চলে যাব না।" অবশেষে, তাঁর ঐশ্বরিক চোখ খুলে গেল এবং নেপালের বিক্রম

সম্বত (Bikram Sambat) ক্যালেন্ডারের বৈশাখ মাসের এক পূর্ণিমার রাতে জীবনের সত্য আবিষ্কার করেছিলেন এবং আত্ম জ্ঞান (জাগরণ) অর্জন করেছিলেন।

সুজাতা বুদ্ধকে দুধ-ভাত নিবেদন করছেন (গুগুল ছবি)

তিনি মানুষের দুঃখকষ্টের মূল কারণ এবং তা থেকে মুক্তি এবং নির্বাণ লাভের উপায় বা পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তির উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। তখন থেকে তিনি "বুদ্ধ" বা "আলোকিত বা জাগ্রত ব্যক্তি" নামে পরিচিত হন। গৌতম সিদ্ধার্থ সেই থেকে গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত হন।

৪ জ্ঞানলাভের প্রতিজ্ঞা

তাঁর প্রাসাদ ত্যাগ করার পর রাজপুত্র জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর কারণ জানার জন্য ছয় বছর ধ্যান করেছিলেন। ঐ কামনার দেবতা মারা, যিনি জানতেন যে কামনা-বাসনার অবসান ঘটাতে রাজপুত্র কঠোর তপস্যা করছেন। তাই রাজপুত্র সিদ্ধার্থ যাতে মারার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত না হতে পারে, কামনার দেবতা, মারা ধ্যানরত সিদ্ধার্থকে বাতাস, বৃষ্টি, পাথর, অস্ত্র, উত্তপ্ত কয়লা, জ্বলন্ত ছাই, বালি, কাদা এবং অন্ধকার দিয়ে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি একটি গাছের নীচে ধ্যানে বসে থাকবেন এবং জন্ম ও মৃত্যুর বাইরের অবস্থা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি ধ্যান থেকে উঠবেন না। যার ফলে মারার ক্রোধের শিলাবৃষ্টি তাঁর

কাছে ফুলের বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এরপর মারা তার তিন সুন্দরী কন্যা, কাম, তৃষ্ণা এবং অসন্তুষ্টিকে রাজপুত্রকে প্রলুব্ধ করার জন্য পাঠান, কিন্তু ধ্যান রত সিদ্ধার্থ তাঁর লক্ষে অবিচল ছিলেন। (বি.দ্র.; বৌদ্ধধর্মে, মারা হল এক রাক্ষস যে মন্দ এবং প্রলোভনের প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি "ইন্দ্রিয়ের প্রভু" বা "মৃত্যুর প্রভু" নামেও পরিচিত।)

হতাশ হয়ে মারা রাজপুত্রের গাছের নীচে মাটির সেই স্থান দখল করার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে দাবি করেন যে সিদ্ধার্থ যেখানে বসেছিলেন, সেখানকার জমি তার (মারার)। তারপর, রাজপুত্র ধ্যানমগ্ন ভঙ্গিতে বসে ডান হাত বাড়িয়ে পৃথিবী স্পর্শ করেন। পৃথিবী স্পর্শ করে, তিনি পৃথিবীর দেবীকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি নিশ্চিত করুন যে পূর্বজন্মে রাজপুত্র ভেসান্তর হিসেবে যে মহান উপহার তিনি দিয়েছিলেন, তার ফলে তিনি গাছের নীচে বসার অধিকার পেয়েছেন। তিনি কাঁপতে কাঁপতে সম্মতি জানালেন এবং মারা নিরুপায় হয়ে ঐ স্থান থেকে চলে গেলেন। এখন বুদ্ধের ভেসান্তর হিসেবে গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে বিষয়টাকে আরো পরিষ্কার করার জন্য। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, ভেসান্তর হল বুদ্ধ গৌতমের পূর্ববর্তী জন্ম। ঐ জন্মে গৌতম বুদ্ধ শিবি রাজ্যের রাজপুত্র ভেসান্তর হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জাতক কাহিনী অনুসারে, ভেসান্তর যুবরাজকে তাঁর বাস্তববাদী পিতা বনে নির্বাসিত করেছিলেন। তিনি একজন অত্যন্ত উদার এবং সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন; যিনি অন্যদের সাহায্য করার জন্য তার স্ত্রী এবং সন্তান সহ সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন। তাঁকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে দাস খুঁজতে আসা এক ব্রাহ্মণ, জুজাককে তার স্ত্রী ও সন্তানদের দিয়ে দিতে হয় । তিনি যে সকল জিনিষ উদার হস্তে দান করেছিলেন সেগুলি সব অলৌকিকভাবে, পরে তাঁর কাছে ফিরে আসে। ভেসান্তরা অবশেষে একজন ধার্মিক রাজা হওয়ার জন্য বনে নির্বাসন থেকে বাড়িতে ফিরে আসেন। ভেসান্তরের গল্পটি বৌদ্ধদের উদারতা, করুণা, বিচ্ছিন্নতা এবং বিশ্বাসের একটি উদযাপন। ভারত, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ইত্যাদি দেশে ভেসান্তরের স্মরণে প্রতি

বছর থেরবাদ বৌদ্ধ প্যাগোডাগুলিতে ভেসান্তর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

৯ বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক পটভূমি

বৌদ্ধধর্ম একটি প্রাচীন ভারতীয় দর্শন। এটি প্রাচীন মগধ রাজ্যে (বর্তমানে ভারতের বিহারে) এবং এর আশেপাশে অস্তিত্ব লাভ করে। বলা হয়; এটি প্রাচীন ভারতে শ্রমণ ঐতিহ্য (Sramana tradition) হিসেবে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উদ্ভূত হয়েছিল এবং পরে এশিয়ার বেশিরভাগ অংশ এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এই দর্শন মূলত গৌতম বুদ্ধের মূল শিক্ষার উপর ভিত্তি করে তৈরি, যাঁকে "বুদ্ধ" অর্থাৎ জাগ্রত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হত। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে, বৌদ্ধধর্ম মৌর্য সম্রাট, মহান অশোকের রাজত্বের সাথে সাথে, বৌদ্ধ সম্প্রদায় দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়: বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান দুটি শাখা হলো থেরবাদ (Theravada) এবং মহাযান (Mahayana) । থেরবাদ (Theravada): এটি বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনতম রূপ এবং "প্রাচীন পথ" হিসাবেও পরিচিত। এটি মূলত শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া এবং লাওসের মতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে প্রচলিত। মহাযান (Mahayana) এই শাখাটি "মহান যান" নামেও পরিচিত এবং এটি চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম এবং তিব্বতের মতো পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বেশি প্রচলিত। মহাযান একটি দার্শনিক আন্দোলন যা সর্বজনীন মুক্তির সম্ভাবনা ঘোষণা করে। বোধিসত্ত্ব নামক করুণাময় সত্তার আকারে অনুশীলনকারীদের সহায়তা প্রদান করেছিল। লক্ষ্য ছিল সকল সংবেদনশীল প্রাণীর জন্য বুদ্ধত্বের (বুদ্ধ হওয়ার) সম্ভাবনা উন্মুক্ত করা। বুদ্ধ কেবল একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, বরং তাকে একজন অতিপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যাঁর সকলেই হতে চান।

আবার এই দুটি প্রধান শাখার প্রতিটি ভারত এবং এশিয়ার বেশিরভাগ অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে মূল বৌদ্ধ দর্শনের এই দুটি শাখা অসংখ্য উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আধুনিক

সময়ে, যে সকল স্থানে বৌদ্ধধর্মের এই দুটি প্রধান শাখা বিদ্যমান সেগুলি হল শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় থেরবাদ এবং সিকিম, লাদাখ, অরুণাচ প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং পাহাড়, ভারতের উচ্চ হিমাচল প্রদেশের লাহুল ও স্পিতি অঞ্চল এবং পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অংশে মহাযান বিদ্যমান ।*১.

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক বলেছেন যে বুদ্ধ পরলোকগমন করেছেন, কিন্তু তাঁর মহৎ ও অতীন্দ্রিয় শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য তিনি দান করে গেছেন। এই শিক্ষাগুলি এখনও চরম পবিত্রতায় বিদ্যমান। মহান আধ্যাত্মিক গুরু গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিক্ষার কোনও লিখিত রেকর্ড তিনি রেখে যাননি। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছিলেন এবং গুরুর প্রতি নিবেদিত হয়ে গুরুর শিক্ষাগুলি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মৌখিকভাবে প্রচার এবং প্রেরণ করেছিলেন। বুদ্ধের মৃত্যুর তিন মাস পরে, রাজা অজাতশত্তুর রাজত্বের অষ্টম বছরে, মতবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষার সাথে জড়িত ৫০০ জন বিশিষ্ট আরহন্ত রাজগহে সমাবর্তন করেছিলেন বুদ্ধদেবের শিক্ষাগুলিকে অনুশীলন করার জন্য।

(বৌদ্ধধর্মে, "আরহন্ত" (পালি ভাষা) বা "অরহত" (সংস্কৃত ভাষা) হল একজন সম্পূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্ত সত্তা যিনি পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং দুঃখ ও আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত । বৌদ্ধধর্মে, তাদেরকে "যোগ্য ব্যক্তি" হিসেবে বিবেচনা করা হয় যারা আধ্যাত্মিক বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছেন, সমস্ত অপবিত্রতা দূর করে নির্বাণ অর্জন করেছেন। বুদ্ধের সবচেয়ে প্রিয় পরিচারক ছিলেন শ্রদ্ধেয় আনন্দ থেরা , যিনি স্বয়ং বুদ্ধের কাছ থেকে প্রবচন শোনার বিশেষ সুযোগ এবং অধিকার পেয়েছিলেন, এবং সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পূজ্য আনন্দ থেরাকে যথাক্রমে ধম্ম (মতবাদ) এবং বিনয় (শৃঙ্খলা) সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। এই প্রথম পরিষদ পালি তিপিটককে নির্দিষ্ট আকারে সংকলন এবং সাজানো হয়েছিল, যা বুদ্ধের সমগ্র শিক্ষাকে ধরে রেখেছে বা অন্তর্ভুক্ত করেছে *2 (ত্রিপিটক হল বৌদ্ধধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ত্রিপিটক গ্রন্থে মূল বিষয়বস্তু হল বুদ্ধের শিক্ষা।ত্রিপিটক রচিত হয়েছিল প্রায় ৫৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।)

১০; গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম

গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীর অন্যতম ঐতিহাসিক ভাববাদী বা দার্শনিক। বিবেকানন্দ গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে বলেছিলেন যে,"গৌতম বুদ্ধ কখনো কোনও কিছুর কাছে মাথা নত করেননি- না জাতপাত, না পুরোহিত, না কোন সংস্কার বা প্রচলিত প্রথা। তিনি মানবজাতির মঙ্গলের জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অন্যরা ঈশ্বরের সন্ধান করতে পারে; অন্যরা নিজের জন্য সত্য অনুসন্ধান করতে পারে; তিনি নিজের জন্য সত্য জানারও চিন্তা করেননি। মানুষ দুর্দশায় ছিল বলে তিনি সত্যের অনুসন্ধান করেছিলেন। মানবজাতিকে কীভাবে সাহায্য করবেন, এটাই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা।" তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পশু বলি বন্ধ করার জন্য নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি একবার এক রাজাকে বলেছিলেন, 'যদি একটি ভেড়ার বলি তোমাকে স্বর্গে যেতে সাহায্য করে, তাহলে একজন মানুষ বলি দিলে তোমার আরও ভালো হবে; তাই আমাকে বলি দাও।' রাজা অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন বিশ্বের প্রথম সক্রিয় ধর্মপ্রচারক। তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে পৃথিবীর সকল জীবের প্রতি ভালোবাসা এবং ত্যাগের উপর তাঁর দর্শন ও ধর্মমত দেশবিদেশ প্রচার করেছেন। নির্বাণ লাভের আগে তাঁর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর অহিংসার ধর্মমত সর্বত্র প্রচার করে গেছেন। *4

১০-১; বৌদ্ধধর্ম ও ঈশ্বর মতবাদ;

বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের মতবাদ অন্যান্য অনেক ধর্মের থেকে আলাদা কারণ বৌদ্ধধর্ম মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে তৈরি নয়। বৌদ্ধরা ব্যক্তিগত স্রষ্টা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। বৌদ্ধদের এই ধরনের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অনেক কারণ রয়েছে। বুদ্ধের মতে, নৈতিকতা, ধ্যান এবং জ্ঞানের অনুশীলন এবং বিকাশের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন হয়। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারও করেননি বা অস্বীকারও করেননি। তবে এটা নিশ্চিত যে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সেইভাবে বিশ্বাস করেননি যেভাবে পুরোহিতরা বিশ্বাস করতেন। হিন্দু পুরোহিতদের মতে; ঈশ্বরের কাছে কেবল

তাদের (পুরোহিতদের) মাধ্যমেই যাওয়া এবং জানা সম্ভব। মানুষ কেবল পুরোহিতদের অনুমতি নিয়েই পবিত্র স্থান বা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে। মানুষ কেবল পুরোহিতদের মাধ্যমেই ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে এবং ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাদের সবকিছু পুরোহিতদের হাতে অর্পণ করতে হয়। হিন্দু পুরোহিতগণ ঈশ্বরের নামে আমাদের উপর হাজার নিয়ম ও কুসংস্কারের আধিপত্য বিস্তার করে। তারা সরল সত্যগুলিকে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং তাদের অবস্থানকে উচ্চতর করার জন্য এবং মানুষের মনে ভয় তৈরি করার জন্য তাঁরা ঈশ্বরের নামে অযথা অনেক গল্প তৈরি করে বলে। তারা আমাদের বিশ্বাস করায় যে আমরা যদি জীবনে সফল হতে এবং উন্নতি করতে চাই অথবা মৃত্যুর পরে স্বর্গে যেতে চাই, তাহলে তাদের নির্দেশ মত আমাদেরকে সকল ধরণের অনুষ্ঠান ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হবে এবং ঈশ্বরের তাদের হাতে সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র তুলে দিতে হবে। মানুষকে অজ্ঞতায় রেখে ঈশ্বরের নামে হিন্দু মানুষের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে এবং মানুষকে ঈশ্বরের নাম দিয়ে শোষণ করে। এ সকল ঘটনা আজও শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজে একই ভাবে বেড়েই চলছে। বুদ্ধ ঈশ্বর বা তাঁর অস্তিত্বকে পুরোহিতদের মতো বিশ্বাস করতেন না এবং ঈশ্বরের নামে সকল অনুষ্ঠান, আচার-অনুষ্ঠান এবং বলিদানকে বাতিল করে দিতেন। তিনি কেবল সৎকর্ম, সদাচারণ এবং সকল জীবের প্রতি ভালোবাসার কথা প্রচার করতেন। গৌতম বুদ্ধ জীবনের সত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সৎকর্ম, সদাচারণ এবং সকল জীবের প্রতি ভালবাসা জীবনের এই সমস্ত মৌলিক দিক প্রচার করেছিলেন কারণ তিনি বিচার ও বিশ্লেষণ করে মানুষদের বুঝিয়ে ছিলেন যে অতি প্রাচীনকালে বৈদিক পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণরা মহান বৌদ্ধিক এবং মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁরাই বেদান্ত এবং উপনিষদের শিক্ষা দিয়ে ভারতের আধ্যাত্মিক বিকাশ শুরু করেছিলেন এবং তাঁরা ভারতীয় সমাজে হিন্দুধর্মের জন্য অনেক বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক আন্দোলন সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ধর্মীয় বিকাশের বৈদিক চেতনা যা প্রথমে ব্রাহ্মণদেরকে প্রভাবিত এবং অনুপ্রাণিত করেছিল

তা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তাঁরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সাধারণ মানুষের কষ্টের উপর মিথ্যা ক্ষমতা আরোপ করে অপ্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে শুরু করে।

গৌতম বুদ্ধ ঐ সময় দেখেছিলেন যে নিজেদের স্বার্থে ঈশ্বরের নামে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের তৈরি হাজার নিয়ম ও কুসংস্কার সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই কারণেই গৌতম বুদ্ধ ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মতো ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। সাধারণ মানুষদের উপর ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অত্যাচার ও শোষণের অন্ত ছিল না। যেমন সেই সময় একজন ব্রাহ্মণ যদি একজন মানুষকে হত্যা করত, তাহলে সেই ব্রাহ্মণকে শাস্তি দেওয়া হত না, যদি একজন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহ করত, তাহলে তার পাপ হত না, কিন্তু যদি একজন সাধারণ মানুষ এই সমস্ত সামাজিক কুকর্ম করত, তাহলে ব্রাহ্মণগণ তাদের জন্য কঠোর শাস্তির রায় দিত। জন্ম থেকেই সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণকে সমাজের প্রভু হিসেবে বিবেচনা করত। এমনকি সেই সময় অনেক দুষ্ট ব্রাহ্মণকেও দেবতার মতো পূজা করা হত।" বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষায় পুরোহিতদের এই ধরণের অন্যায় ও অত্যাচারের ক্ষমতা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছিল এবং গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যগণ এই বিষয়ে অনেকাংশে সফল হয়েছিল। সহজ কথায় বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মত ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে না *5

বুদ্ধ কোন স্রষ্টা দেবতার কথা বলেননি, কিন্তু তিনি সৃষ্টির কথা বলেছেন। বুদ্ধ স্পষ্টভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে সমস্ত ঘটনা প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং প্রকৃতির কারণ এবং প্রভাবের মাধ্যমে সব কিছুই "সৃষ্ট" হয়। আরও আমাদের জীবনের গতিপথ কর্ম (ক্রিয়াকলাপ) দ্বারা নির্ধারিত হয়। কর্ম কোন অতিপ্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় না বরং এটি তার নিজস্ব প্রাকৃতিক নিয়ম। বুদ্ধ এটাই শিক্ষা দিয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আমার অধ্যয়ন যতদূর, সেখান থেকে বুঝেছি, এই ধর্ম ব্যক্তিগত ঈশ্বরে অস্তিত্ব বিশ্বাস নাও করতে পারে, তবে সর্বোচ্চ শক্তি বা সর্বশক্তিমানের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দেয় নি। এই

কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি পাশ্চাত্যে বেদান্তের বার্তা দিয়ে হিন্দুধর্মের তাৎপর্য প্রচার করেছিলেন, তিনি গৌতম বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের প্রশংসা করেছিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধকে আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ এবং উপলব্ধির জন্য তাঁর আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করতেন। স্বামীজি বুদ্ধের মধ্যে ভারতের প্রাচীন জ্ঞান এবং গুণাবলীর নিখুঁত মূর্ত প্রতীক দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাই বুদ্ধকে ভারতের আধ্যাত্মিক প্রতীক এবং আদর্শের উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করেছিলেন।*6

১০-2; বৌদ্ধধর্মের চারটি আর্যসত্য (Four Noble Truths)

বৌদ্ধ শিক্ষার ভিত্তি হল চারটি আর্যসত্য, যা দুঃখের প্রকৃতি, এর কারণ, এর নিবারণ এবং মুক্তির পথের সন্ধান দেয়। সেই চারটি সত্য হল: ১) **দুঃখের সত্য** (দুঃখ কষ্ট জীবনের সাথে যুক্ত); ২) **দুঃখের উৎপত্তির সত্য** (দুঃখ কষ্ট - মানুষের অজ্ঞতা, কামনা, বাসনা এবং আসক্তির কারণে হয়); ৩) **দুঃখের অবসানের সত্য**-(কামনা, বাসনা এবং আসক্তির অবসান হলে দুঃখের অবসান হতে পারে; এবং ৪) **দুঃখের অবসানের পথের সত্যতা**: অষ্টমুখী পথ দুঃখের অবসানের দিকে নিয়ে যায়।

বৌদ্ধ ধর্ম বলে, প্রথম মহৎ সত্য হল আমাদের জীবনে **দুঃখের সত্য** বা দুঃখের ব্যাপক উপস্থিতি। এই সত্যটি শিক্ষা দেয় যে জীবন সর্বদা দুঃখের সাথে জড়িত, স্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম উভয় রূপেই। এমনকি যখন সবকিছু ভালো বলে মনে হয়, তখনও আমরা ভালোর ভেতরে উদ্বেগ এবং অনিশ্চয়তার একটি অন্তর্নিহিত উপস্থিতি অনুভব করি। দ্বিতীয় সত্য **দুঃখের উৎপত্তির সত্য**; বুদ্ধ বলেন দুঃখের কারণ আমাদের নিজস্ব স্বভাব ও প্রকৃতি, অজ্ঞতা এবং বাস্তবতার প্রকৃতি সম্পর্কে যুক্ত । আমরা বিভিন্ন ভুল বিশ্বাসের কারণে কষ্ট পাই । অহংকারের ভ্রান্ত ধারণা বজায় রাখার জন্য জীবন বেদনাদায়ক হয়। ৩) **অবসানের সত্য (**পালি ও সংস্কৃত ভাষায় একে বলা হয় নিরোধ)। এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়, আমাদের অন্ধকার, দুঃখ, কষ্ট ক্ষণস্থায়ী। এগুলো মেঘের মতো যা আমাদের আলোকিত প্রকৃতির সূর্যকে আড়াল করে দেয়, কিন্তু সূর্য সর্বদা

উপস্থিত থাকে। অতএব, দুঃখের অবসান হতে পারে যদি আমাদের মনের অজ্ঞতা ও অন্ধকার দূর করা যায় এবং মন জাগ্রত হয় এবং মন যদি সর্বদা উপলব্ধ ও জাগ্রত থাকে। এই অবস্থাকে বৌদ্ধধর্মে জ্ঞানার্জন বা নির্বাণ বলা হয়, যা দুঃখের সম্পূর্ণ অবসান ঘটায় । এটি জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের চক্র থেকে শান্তি এবং মুক্তির একটি অবস্থা। ৪) **দুঃখের অবসানের পথের সত্যতা;** বৌদ্ধ দর্শনের চতুর্থ এবং চূড়ান্ত সত্য হল আধ্যাত্মিক অনুশীলন, নীতিগত জীবনযাপন এবং জ্ঞান বিকাশের মাধ্যম। আমরাও বুদ্ধদের মতো জ্ঞানার্জন এবং দুঃখ থেকে মুক্তির পথে এ যাত্রা করতে পারি। অষ্টমুখী পথ অনুসরণ করে, আমরাও জেগে উঠতে পারি।

এই বিষয়ে বুদ্ধের শিক্ষা হল এই তৃতীয় সত্যের জন্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে চতুর্থ আর্য সত্য, যা অষ্টমুখী মহৎ পথ হিসেবে পরিচিত। বুদ্ধ প্রচার করেছেন যে এই অনন্য পথই একমাত্র পথ যা নির্বাণ লাভের দিকে নিয়ে যায়। এটি আত্ম-ক্ষোভ ও আত্ম-ভোগের চরমতাকে এড়িয়ে চলে যা ব্যক্তির বুদ্ধিকে দুর্বল করে এবং আত্ম-ভোগের চরমতাকে এড়িয়ে চলে; কারণ আত্ম-ক্ষোভ ও আত্ম-ভোগ ব্যক্তির নৈতিকতাকে পতনশীল করে। বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে কামনা, ঘৃণা এবং অজ্ঞতার "অগ্নি" নিভিয়ে দিলে মানুষ দুঃখ এবং চলমান পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পায়; তখনই নির্বাণ লাভ হয়। চলমান রাখে। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন যে গৌতম বুদ্ধ তাঁর জাগরণের সময় আবিষ্কার করেছিলেন এই চারটি আর্য সত্যই সংসার থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র পথ, অর্থাৎ পুনর্জন্ম, দুঃখ এবং মৃত্যুর অন্তহীন চক্র থেকে মুক্তি।

বৌদ্ধধর্মের একটি মূল শিক্ষা, আধ্যাত্মিক অষ্টমুখী পথ যা দুঃখকষ্টের অবসান এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি ব্যবহারিক পদ্ধতির রূপরেখা নির্দিষ্ট কয়ে । এটি চারটি আর্য সত্যের চতুর্থ সত্যের অন্তর্ভুক্ত এবং এটিকে মুক্তির পথ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই পথটি আটটি আন্তঃসংযুক্ত অনুশীলনে বিভক্ত। এই আটটি পথ হল ১) সঠিক বোধগম্যতা, ২) সঠিক চিন্তাভাবনা, ৩)

সঠিক বক্তৃতা, ৪) সঠিক কর্ম, ৫) সঠিক জীবিকা, ৬) সঠিক প্রচেষ্টা ৭) সঠিক মননশীলতা এবং ৮) সঠিক একাগ্রতা; এই আটটি

আটটি অনুশীলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল;

1. **সঠিক লক্ষ;** চারটি আর্যসত্য বোঝা এবং বাস্তবতার প্রকৃতি স্বীকৃতি প্রদান।
2. **সঠিক উদ্দেশ্য:** ইতিবাচক মানসিক অবস্থা গড়ে তোলা এবং ক্ষতিকারক উদ্দেশ্য এড়িয়ে চলা।
3. **সঠিক বক্তব্য:** সত্য, সদয় এবং গঠনমূলকভাবে কথা বলা।
4. **সঠিক পদক্ষেপ:** নীতিগত এবং সহানুভূতিশীল আচরণে অভ্যস্থ হওয়া।
5. **সঠিক জীবিকা:** সঠিক জীবিকা নির্বাহ করা যাতে অন্যদের ক্ষতি না হয়।
6. **সঠিক প্রচেষ্টা:** ইতিবাচক মানসিক অবস্থা বিকাশ করা এবং নেতিবাচক অবস্থা ত্যাগ করা।
7. **সঠিক মননশীলতা:** স্পষ্টতা এবং সমতার সাথে বর্তমান মুহূর্তটির প্রতি মনোযোগ দেওয়া।
8. **সঠিক ধ্যান:** ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক মনোযোগ এবং স্থিতিশীলতা বিকাশ করা।

বৌদ্ধ ধর্ম আমাদের শিক্ষা দেয় যে এই মহৎ অষ্টমুখী পথই একমাত্র সরল পথ যা নির্বাণ লাভের দিকে নিয়ে যায় যা বহির্বিশ্বের প্রতি সমস্ত অভ্যন্তরীণ আসক্তি ত্যাগ করে নির্বাণ লাভ করা যেতে পারে। বৌদ্ধ পণ্ডিতরা দাবি করেন যে গৌতম বুদ্ধের আবিষ্কৃত চারটি মহৎ সত্য দুঃখ (দুঃখ) এবং এর সমাপ্তিকে এই জীবনে মানসিক শান্তি অর্জনের উপায় হিসাবে ব্যাখ্যা করে, তবে পুনর্জন্ম এবং পুনর্মৃত্যুর চক্রের অবসানের উপায়ও নির্দিষ্ট করে। তাঁদের মতে চারটি সত্য সঠিকভাবে বোঝার মাধ্যমে, কেউ ব্যক্তি যদি এই চারটি সত্যকে সর্বদা আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে, তবে তাঁর সকল কামনা ও বাসনার অবসান ঘটে এবং সেই ব্যক্তি একটি শান্ত ও অবিচল মনের

অধিকারী হয় এবং সেই ব্যক্তি পুনর্জন্ম এবং পুনর্মৃত্যুর অন্তহীন চক্র থেকে মুক্ত হতে পারে*9

গৌতম বুদ্ধের প্রধান শিক্ষা বা দর্শন হল- দুঃখকষ্টের অবসান আছে যাকে তিনি নির্বাণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। নির্বাণ হল চূড়ান্ত মুক্তি যা পুনর্জন্মের চক্র থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দান করে এবং সাথে সাথে দুঃখকষ্টের অবসান ঘটায়। তিনি বলেছেন দুঃখকষ্টের অবসান ঘটাতে বা পুনর্জন্মের চক্র থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেতে, একজনকে অবশ্যই অষ্টমুখী পথ অনুসরণ করতে হবে।

গৌতম বুদ্ধের জীবনের কিছু অলৌকিক ঘটনা

ঘটনা ১; ছোট বালক সিদ্ধার্থের **উপর** স্থির ছায়া;

একদিন, রাজপুত্র সিদ্ধার্থের বাবা তার ছোট ছেলেকে একটি গ্রামের এলাকায় লাঙল উৎসবে নিয়ে যান। তার ধাত্রীরা ছোট বালক সিদ্ধার্থকে একা একটি গাছের নীচে রেখে দিয়ে অন্যত্র চলে যায়। উৎসবের সময়, বালক রাজপুত্র বিভিন্ন দুর্দশার দৃশ্য লক্ষ্য করেন, যেমন পরিশ্রমী মানুষ ও বলদের দুঃখ দুর্দশা, এবং লাঙলের ফলায় বহু পোকামাকড়ের মৃত্যু এবং পরে পাখিরা তাদেরকে খেয়ে ফেলে। এই দৃশ্যগুলি দেখে তিনি গাছের নীচে ধ্যান করতে শুরু করেন এবং ধৈর্য অর্জন করেন। সময়ের সাথে সাথে, গাছের ছায়া অলৌকিকভাবে একই স্থানে থাকে, সূর্য আকাশে যাওয়ার সাথে সাথে রাজপুত্রকে ছায়ায় আশ্রয় দেয়। এই ঘটনার অন্য সংস্করণে, ভাবী বুদ্ধ উৎসবের সময় গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়েন। সময় গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সূর্য আকাশ জুড়ে সরে গেলেও গাছের ছায়া বালক সিদ্ধার্থের মাথার উপর স্থির থাকে এবং তার ঘুমের সময় ছোট বালক রাজপুত্রকে ছায়ায় রাখে। (রেফারেন্স উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ)।

ঘটনা ২; ভাসমান চুলের গিঁট

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ প্রাসাদ ত্যাগ করার পর, জ্ঞানার্জনের সন্ধানে একজন তপস্বী হিসেবে তার ভবিষ্যৎ জীবনের শুভারম্ভ হিসেবে

তাঁর চুল কেটে ফেলেন। চুল কাটার পর, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তার সম্প্রতি কাটা চুলের গিঁটটি ধরে ঘোষণা করেন "যদি আমি বুদ্ধ [একজন আলোকিত] ব্যক্তি হতে চাই, তাহলে সেগুলো আকাশে থাকুক; যদি না চাই, তাহলে সেগুলো মাটিতে পড়ে যাক"। চুলের গিঁটটি ছুঁড়ে ফেললে, এটি বাতাসে অনেক দূরে চলে যায় এবং তারপর থেমে যায়, মাঝ আকাশে তাঁর চুলের গিঁটটি ভাসতে থাকে। (রেফারেন্স উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ)

ঘটনা ৩ শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের অলৌকিক প্রদর্শন

গৌতম বুদ্ধ রাজা বিম্বিসারের শাসিত অঞ্চলে বাঁশবনে শত শত ভিক্ষুর সাথে অবস্থান করছিলেন। বিম্বিসার ছিলেন বুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। রাজা তাঁর অনেক প্রজাকে বুদ্ধের শিক্ষা অনুশীলন করতে পরিচালিত করেছিলেন। সেই সময় ছয়জন অপ্রচলিত আধ্যাত্মিক শিক্ষক এবং তপস্বী রাজগৃহে (প্রাসাদে)অবস্থান করছিলেন এবং রাজার ছোট ভাই তাদের শিক্ষা অনুসরণ করেছিলেন। ঐ ছয়জন অপ্রচলিত আধ্যাত্মিক শিক্ষকদের বিপথগামী পথ এবং জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ছোট ভায়ের মনকে অন্ধকার করে দিয়েছিল। ছোট ভাইকে বিপথগামী পথ থেকে সরানোর ইচ্ছায়, রাজা তাকে পরামর্শ দিলেন যে তার বুদ্ধকে অনুসরণ করা উচিত। ছোট ভাই আধ্যাত্মিক শিক্ষকদেরকে পরিবর্তন করার কোনও কারণ খুঁজে পেল না; যাইহোক, ছোট ভাই রাজার পরামর্শ অনুসারে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। রাজার প্রতি শ্রদ্ধার কারণে ছোটভাই গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে একটি মহাভোজের সিদ্ধান্ত নিলেন যে সমাবেশে তাঁর ছয়জন শিক্ষক এবং তাদের সহযোগীরা উপস্থিত থাকবে ।

যদিও বুদ্ধ ও তাঁর সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে সেই মহাভোজের ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু রাজার ভাইয়ের ছয়জন আধ্যাত্মিক শিক্ষক আগে এসে ঐ সমাবেশে সর্বোচ্চ আসনে বসলেন। বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যরাও এসে পৌঁছালেন। তারা যখন পৌঁছালেন, তখন তারা বাকি কয়েকটি আসনের দিকে গেলেন, কিন্তু তাঁরা বাকী আসনে কাছে পৌঁছানোর আগেই, ছয়জন শিক্ষক সর্বোচ্চ আসনের পরিবর্তে

নিজেদেরকে নীচের আসনে বসতে দেখলেন। তারা তিনবার উচ্চ আসনগুলিতে বসতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু প্রতিবারই নিজেদের নীচের আসনে তারা উপবিষ্ট হতে দেখতে পেলেন। অবশেষে, লজ্জা পেয়ে তারা নীচের আসনেই বসলেন।

খাবার পরিবেশণ;

খাবার পরিবেশনের আগে, অতিথিদের হাত ধোয়ার জন্য জল আনা হল। বুদ্ধ যেহেতু সর্বোচ্চ আসনে ছিলেন, তাই উপস্থাপক (রাজার ছোট ভাই) প্রথমে তাঁকে জল অর্পণ করেছিলেন, কিন্তু বুদ্ধ তাঁর ভাইয়ের ছয় শিক্ষককে প্রথমে জল অর্পণ করতে বললেন। বুদ্ধের আদেশ মত ঐছয় শিক্ষককে জল অর্পণ করা হল, কিন্তু যখন জলের পাত্রটি কাত হল, তখন তাদের হাতে জল প্রবাহিত হল না। উপস্থাপক বারবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু জল তাদের হাতে প্রবাহিত হল না। এরপর তিনি আবার বুদ্ধকে জল অর্পণ করলেন। জল অবাধে বুদ্ধের হাতে প্রবাহিত হল, এবং এরপরে সকলের কাছে। খাওয়ার আগে, উপস্থাপক বুদ্ধকে খাবার আশীর্বাদ করতে বললেন। তিনি উপস্থাপককে আবার ছয় শিক্ষককে খাবার আশীর্বাদ করার জন্য পরামর্শ দিলেন। যখন ছয় শিক্ষক খাবার আশীর্বাদ করার জন্য প্রার্থনা করার চেষ্টা করলেন, তখন তারা একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না এবং তারা ইঙ্গিত করলেন যে খাবার আশীর্বাদ করা বুদ্ধের উচিত। বুদ্ধ স্পষ্ট, সুন্দর কণ্ঠে খাবার আশীর্বাদ করলেন। তারপর প্রথমে বুদ্ধকে খাবার দেওয়া হল, কিন্তু তিনি আবারও উপস্থাপককে তাঁর ছয়জন গুরুকে খাবার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তারপর উপস্থাপক তাদের কাছে খাবার নিয়ে গেল, কিন্তু তারা যা কিছু খাবার নিতে চেয়েছিল তা বাতাসে উড়ে গেল। এরপর বুদ্ধ খাবার খাওয়ার পর, সবকিছু তাদের হাতে চলে গেল। খাবারের পর, প্রথাগত শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপস্থাপক বুদ্ধকে অনুরোধ করলেন। বুদ্ধ আবার ছয়জন গুরুকে লক্ষ্য করে বললেন যে তাঁর ছয়জন গুরু প্রথমে তাদের মতবাদ সম্পর্কে কথা বলুন। আবার ছয়জন গুরু তাদের মতবাদ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা একটি কথাও বলতে পারলেন না;

ফলে তারা বুদ্ধকে প্রথমে কথা বলতে অনুরোধ করলেন। বুদ্ধ তারপর একটি সুন্দর কণ্ঠে কথা বললেন এবং শিক্ষা দান করলেন। প্রতিটি শ্রোতা তাঁর কথা ও শিক্ষা শুনল এবং অনুসারীদের বোধগম্যতা আরও গভীর করে তুলল এবং তাদের উপলব্ধি আনল। এরপর অনেক অনুসারী বুদ্ধের জয় গান করতে লাগলেন।

এতে ছয়জন শিক্ষক ভীষণ অপমানিত হল; ফলে তারা বেশ ক্ষুব্ধ হল। তারা এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে উদ্দত হল। এই প্রতিশোধ নিতে তারা দানবদের সাহায্য নিতে গেল। সেই দানবরা ছয়জন শিক্ষক রূপে আত্মপ্রকাশ করে বাজারে গিয়ে অলৌকিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করে এবং বুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার করতে শুরু করে। লোকেরা তাদের অলৌকিক কৃতিত্ব প্রদর্শন দেখে মুগ্ধ হতে লাগল। জনসাধারণের মধ্যে মুগ্ধ দর্শকদের সামনে, দানবরা বুদ্ধকে অলৌকিক শক্তির প্রতিযোগিতার জন্য চ্যালেঞ্জ জানায়। তারা গর্ব করে বলেছিল যে তারা বুদ্ধের সমস্ত কাজকে ছাড়িয়ে যাবে। দানবরা জোরে ঘোষণা করেছিল যে লোকেরা নিজেরাই দেখুক এবং বিচার করুক কে বেশি শক্তিশালী- ছয়জন শিক্ষক (দানব) না গৌতম বুদ্ধ।

ঐ ছয়জন শিক্ষক রাজা বিম্বিসারের কাছে গিয়ে বুদ্ধকে তাদের চ্যালেঞ্জ জানানোর কথা বলে। রাজা তাদের অহংকারে হেসে বললেন। "তোমরা বোকা। তোমাদের অলৌকিক কাজ বুদ্ধের কাজের সাথে তুলনা করা যায় না। তোমার কাজ সূর্যের আলোর কছে জোনাকির আলোর মতো, সমুদ্রের জলের সাথে তোমাদের কাজ ষাঁড়ের খুরের গর্তেরমধ্যে জলের মতো। তোমাদের কাজ শিয়ালকে সিংহের সাথে তুলনা করার মত।" এইসব বলে রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের তুলনায় তাদেরকে অতি তুচ্ছ বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু রাজার ঐ সব মন্তব্য শুনেও ছয়জন শিক্ষক তাদের চ্যালেঞ্জে অটল থাকে এবং রাজাকে বলে- আগে যা ঘটেছিল তা দিয়ে তাদেরকে বিচার করা যায় না বা প্রতিযোগিতায় কী ঘটবে তার ইঙ্গিত দেয় না; প্রতিযোগিতায় কে বড় তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।" রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের কাছে গিয়ে তাদের ঐ চ্যালেঞ্জের কথা জানালেন।

বুদ্ধ তাদের ঐ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং তাদের কাজ করার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করতে বলেন।

বুদ্ধের আদেশ অনুযায়ী, রাজা বিম্বিসার তাঁর মন্ত্রীদের একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে বলেন। সেখানে তারা একটি সিংহাসন এবং বুদ্ধের বিজয় পতাকা স্থাপন করেন। সেখানে বহু মানুষ অধীর আগ্রহে গৌতম বুদ্ধ এবং ছয়জন আধ্যাত্মিক শিক্ষকের অলৌকিক প্রদর্শনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু, সকলকে অবাক করে দিয়ে, গৌতম বুদ্ধ রাজা বিম্বিসারের রাজগৃহ ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী শহর বৈশালীতে চলে যান। তখন ঐ ছয়জন শিক্ষক দাবি করল যে গৌতম বুদ্ধ তাদের মুখোমুখি হতে ভয় পেয়েছেন। ঐ ছয়জন শিক্ষক আবার বুদ্ধকে চ্যালেঞ্জ জানাতে বৈশালীতে গেলেন, কিন্তু তারপর গৌতম বুদ্ধ বৈশালী ত্যাগ করে কৌশাম্বীতে চলে যান। এইভাবে বুদ্ধ এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং ছয়জন শিক্ষকও তাঁকে একই ভাবে অনুসরণ করতে লাগল। প্রতিটি জায়গার জটাধারী তপস্বীরা স্থানীয় শাসকের কাছে তাদের চ্যালেঞ্জ বুদ্ধের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আবেদন করতে লাগল। এক কথায় অনেকে বুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে তর্ক যুদ্ধে নামতে চায়।

অবশেষে, বুদ্ধ রাজা প্রসেনজিতের দেশ, শ্রাবস্তীতে গেলেন। তিনি যে সমস্ত দেশের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানকার রাজারা তাঁর সাথে সেখানে পৌঁছালেন, তাদের হাজার হাজার পরিচারক এবং ছয়জন গুরু (আধ্যাত্মিক শিক্ষক) তাদের নব্বই হাজার অনুসারী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। ঐ ছয়জন আধ্যাত্মিক গুরু রাজা প্রসেনজিতের মাধ্যমে বুদ্ধকে অলৌকিক শক্তির প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনের জন্য চ্যালেঞ্জ জানালেন। সেই সময় বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "তাঁর সময় জানা আছে। আপনারা এই প্রদর্শনের উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করুন।" রাজা প্রসেনজিত তাঁর মন্ত্রীদেরকে উপযুক্ত স্থান প্রস্তুতের জন্য নির্দেশ দিলেন। রাজার নির্দেশ মত উপযুক্ত স্থান ঠিক হল এবং সেখানে সিংহাসন এবং বিজয়ীর পতাকা স্থাপন করে একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হল।

বুদ্ধ ও ঐ ছয়জন গুরু (আধ্যাত্মিক শিক্ষক) তাঁদের চমৎকার অলৌকিক কাজ প্রদর্শন করলেন। সেখানে হাজার হাজার দর্শকের সামনে গৌতম অলৌকিক প্রদর্শনে বিজয়ী হলেন।

বুদ্ধের শ্রাবস্তীতে অলৌকিক ঘটনা;

এতক্ষণ আমরা যে অলৌকিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করলাম সেই ঘটনা শ্রাবস্তীর অলৌকিক ঘটনা, যা যমজ অলৌকিক ঘটনা বা মহান অলৌকিক ঘটনা নামে পরিচিত। এই ঘটনার মাধ্যমে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অনুসারীদের কাছে তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর এই প্রদর্শনে তাঁর শরীর থেকে অগ্নিশিখা এবং নীচের শরীর থেকে জল নির্গত করেছিলেন এবং সেগুলি পর্যায়ক্রমে প্রসারিত হয়ে মহাবিশ্ব আলোকিত হয়েছিলেন।

ঐ প্রদর্শনে তাঁর অলৌকিক কাজটি শুরু করেছিলেন মাঝ আকাশে একটি রত্নখচিত পথ তৈরি করে এবং তারপরে তাঁর দেহের উপরের অংশ থেকে আগুন এবং নীচের অংশ থেকে জল নির্গত হয়েছিল এবং তারপরে সেগুলি পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। বুদ্ধ যখন পর্যবেক্ষক এবং শ্রোতাদের ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন আগুন এবং জল মহাবিশ্বকে আলোকিত করার জন্য উপরে উঠে যায়। অলৌকিক ঘটনাটি অনুসরণ করে, বুদ্ধ নিজের একটি প্রতিরূপ তৈরি করতে এগিয়ে যান এবং তারপর তিনি প্রতিরূপকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বলেন যার উত্তর তিনি পর্যবেক্ষক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে দিতেন। গল্পের আর একটি সংস্করণ অনুসারে, তিনি নিজের বেশ কয়েকটি প্রতিরূপ তৈরি করেছিলেন যা বাতাসে ভাসতে থাকে- কিছু প্রতিরূপ হাঁটা, কিছু শুয়ে থাকা এবং বসা অবস্থায় দেখা গেল। বুদ্ধের ঐ অলৌকিক প্রদর্শনের পর, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মীয় গোষ্ঠীর নেতাদের (ছয় জন ধর্ম শিক্ষক) অলৌকিক প্রদর্শনের সময় এল। কিন্তু বুদ্ধের ঐ অলৌকিক ক্ষমতার প্রদর্শন দেখে ভীষণ পেয়ে গেল। ভয়ে তারা সেখান থেকে পালিয়ে গেল। তাদের আর প্রদর্শন দেখানো হল না। তারা যে বুদ্ধের অলৌকিক শক্তির কাছে কিছুই নয়- সেটা প্রমান হয়ে গেল।

ঘটনা ৫; ধ্যানে অতীত জীবনের দর্শন

জ্ঞানলাভের রাতের প্রথম প্রহরে, গৌতম সিদ্ধার্থ (গৌতম বুদ্ধ) ধ্যানের মধ্যে তাঁর সমস্ত অতীত জীবনের (পূর্বজন্ম) দর্শন পেয়েছিলেন। ঐ পূর্বজন্ম দর্শনগুলিতে তিনি তাঁর জন্মস্থান, নাম, বর্ণ, বংশ পরিচয়, এমনকি তাঁর পূর্ববর্তী জীবনগুলিতে তাঁর খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন এবং সেগুলি সকলের সামনে তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর ঐ পূর্বজন্মের দর্শন সমূহ মানুষের জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের চক্রের ইঙ্গিত বহন করে। অবশেষে এই ঘটনাটি জ্ঞানলাভের যাত্রা পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখযোগ্য হয়। ঐ রাতের দ্বিতীয় প্রহরে, তিনি ধ্যানের মধ্যে দেখেছিলেন কিভাবে প্রাণীরা তাদের অতীত কর্মের ফলে পুনর্জন্মের চক্রের মধ্য দিয়ে উত্থিত হয় এবং পড়ে। রাতের তৃতীয় প্রহরে, ভোরের আগের ঘন্টাগুলিতে, তিনি মুক্তি লাভ করেছিলেন। কিছু সংস্করণ অনুসারে এটি ছিল চারটি সত্যের শেষ সত্য অর্থাৎ নিবৃত্তির পথ; (অপর তিনটি হল-দুঃখের সত্য, দুঃখের উৎপত্তি সত্য, দুঃখের নিবৃত্তি এবং দুঃখের নিবৃত্তির পথ। বৌদ্ধ ধর্মে জাতক কাহিনী পুনর্জন্মে চক্রের ধারণা আরও বিশদভাবে বর্ণনা করে, যেখানে বুদ্ধের রাজা, নম্র ব্যক্তি, দেবতা (দেবতা বা আত্মা), এমনকি একটি প্রাণী হিসাবে পূর্ববর্তী জীবনের কাহিনীগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ সকল কাহিনীগুলি বুদ্ধত্ব লাভ ও নির্বাণ লাভের পথের নির্দেশ দেয় এবং মানুষের সদ্গুণ, সদাচার ও কর্ম-ফলের উপর জোর দেয়। অতীত জীবন দর্শনের সাহায্যে গৌতম বুদ্ধ বুঝেছিলেন যে পুনর্জন্ম হল পূর্বজন্মের কর্মের ফলাফল। বৌদ্ধ ধারণার কেন্দ্রবিন্দু হল কর্মফল এবং দুঃখচক্র সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি। পূর্বজন্মের বোধগম্যতা অর্জনের মাধ্যমে, সিদ্ধার্থ অজ্ঞতার ঊর্ধ্বে উঠে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন, বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং নির্বাণের পথ খুঁজে পান। উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে বোধিলাভের রাতেই, গৌতম বুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির সাথে নিজের অসংখ্য পূর্ববর্তী জন্ম এবং

অন্যান্য জীবদের তাদের কর্ম অনুসারে মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে দেখেছিলেন।

তাঁর অতীত জীবন দর্শন লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাৎক্ষণাৎ জনসাধারণের সামনে তাঁর পূর্বের অস্তিত্বের অনেক ঘটনা ও ঘটনাবলী ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মনের দৃষ্টিতে তিনি জীবের অস্তিত্বের এক অবস্থা থেকে অন্তর্ধান এবং তাদের কর্ম (কর্ম) অনুসারে অন্য অবস্থা বা রূপে পুনরাবির্ভূত হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন এবং জাগ্রত হয়েছিলেন। তিনি মানস চোক্ষে আরও দেখেছিলেন যে "নীচ এবং মহৎ, সুন্দর এবং কুৎসিত, সুখী এবং দুঃখী সবকিছু তাদের কর্মফল অনুসারে সৃষ্ট। তাঁর গভীর ধ্যানে তিনি জন্ম ও মৃত্যুর এই পুনরাবৃত্তির কারণগুলি অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে কর্ম, আকাঙ্ক্ষা এবং অজ্ঞতা জন্ম ও মৃত্যুর পুনরাবৃত্তির প্রধান কারণ, ফল স্বরূপ অসংখ্য পুনর্জন্ম। অনুসন্ধানে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর মোট পুনর্জন্মের সংখ্যা অন্য সকলের মতো অসংখ্য। এইভাবে তিনি তাঁর জাগরণের রাতে পুনর্জন্মের মতবাদ সম্পর্কে প্রথম ঘোষণা করেছিলেন। উল্লেখ্য, ‘থেরবাদ’ বৌদ্ধ ঐতিহ্যের একটি গ্রন্থ যা, বুদ্ধবংশ অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁর পূর্ববর্তী ২৭ জন বুদ্ধের জীবনের বর্ণনা করে। শ্রীলঙ্কা, কম্বোডিয়া, লাওস, থাইল্যান্ড এবং মায়ানমার (বার্মা) এর মতো অনেক দেশে, যেখানে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম বেশিরভাগ মানুষ পালন করে, সেখানে বৌদ্ধরা রীতিমতো মহা উৎসব পালন করে এবং 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থে বর্ণিত ২৮ জন বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। গ্রন্থটিতে পৃথিবীতে বুদ্ধের অবতারের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য নাম, জন্মস্থান, বর্ণ, পিতামাতা, সময়কাল, জ্ঞানদানের বৃক্ষ ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এই পরীক্ষা এবং ঐতিহ্যগুলি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে বহুবার অবতরন করেছিলেন;সেগুলি অবশ্য তাঁর জ্ঞানলাভের পর বুদ্ধ হওয়ার পূর্বে ঘটেছিল।

(*(Ref, Rebirth in Early Buddhism & Current Research – Bhikkhu Analayo)*

ঘটনা ৬; কুখ্যাত ডাকাত বুদ্ধের শিক্ষায় সন্ন্যাসীর হওয়া;

আঙ্গুলিমালা নামে একজন কুখ্যাত ডাকাত বুদ্ধের শিক্ষার দ্বারা সন্ন্যাসীর জীবন লাভ করেছিলেন। বুদ্ধের করুণা এবং প্রজ্ঞা অঙ্গুলিমালার রূপান্তর ও ধর্মান্তরে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল, যা তাঁকে হিংসা ত্যাগ করে শান্তি ও জ্ঞানার্জনের পথ গ্রহণ করতে পরিচালিত করেছিল। গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল- তাঁর শিষ্য এবং অনুসারীদের অজ্ঞতার কারণে সৃষ্ট নেতিবাচক আবেগ যেমন আকাঙ্ক্ষা, মানসিক উদ্বেগ, ভয় এবং উদ্বেগ থেকে মুক্তি দেওয়া এবং যুক্তির মাধ্যমে মানুষের দুঃখ-কষ্ট কাটিয়ে ওঠা, মনের শান্তি এবং প্রেমের ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ সুস্থ জীবন অর্জন করা। সেই জন্য বুদ্ধ সহজেই তাঁর অসাধারণ শিক্ষার দ্বারা "অঙ্গুলিমাল" নামে পরিচিত ভয়ঙ্কর ডাকাত এবং খুনিকে একজন মহৎ ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অঙ্গুলিমাল যাদের হত্যা করেছিল তাদের আঙ্গুল দিয়ে বাঁধা মালাটি পরে, তিনি গৌতম বুদ্ধকে হত্যা করার জন্য এবং তার মালায় আরও একটি আঙুল যুক্ত করার জন্য তার হাতে একটি ছুরি নিয়ে মুখোমুখি হয়েছিল।

ঘটনা ৭; বৌদ্ধ দর্শনে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা

বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত কোনো নির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ধারণা নেই। বৌদ্ধ ঐতিহ্য ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে উহ্য রেখে বিশ্বাস করে যে বিশ্বজগত পরিচালিত হয় প্রাকৃতিক নিয়ম এবং কর্মফল দ্বারা। বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য হলো দুঃখ থেকে মুক্তি অর্জন, যা ঈশ্বরের উপাসনা বা বিশ্বাস থেকে আলাদা। এ বিষয়ে আমাদের কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

একবার গৌতম বুদ্ধ এক গ্রামে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। গ্রামে প্রবেশ করার সময়, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি?" বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "না, " লোকটি উত্তর শুনে চলে গেলেন। বিকেলে, আরেকজন এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঈশ্বরের

অস্তিত্ব আছে কি?"। বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই।" সন্ধ্যার পর, আরেকজন এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি?"। বুদ্ধ কোন উত্তর দিলেন না এবং চুপ করে রইলেন। তারপর তিনি চোখ বন্ধ করলেন। এটা দেখে লোকটিও চুপ হয়ে গেলেন এবং চোখ বন্ধ করলেন। তারপর লোকটি তার চোখ খুললেন, হাসিমুখে এবং চোখে অশ্রু নিয়ে, বুদ্ধের পা স্পর্শ করলেন এবং কৃতজ্ঞতায় ভরা হৃদয়ে, বুদ্ধকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "আপনিই প্রথম এবং একমাত্র ব্যক্তি যিনি আসলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।"

এরপর বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ এসব দেখে-সত্য কী -এ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন । তাই যখন বুদ্ধ ঘুমাতে যাচ্ছিলেন, আনন্দ বললেন, "দয়া করে আমার সন্দেহ দূর করুন; নাহলে আমি আজ ঘুমাতে পারব না। আমি সারাদিন আপনার সাথে ছিলাম। ঐ তিনজন লোক যারা আপনার অন্য উত্তর সম্পর্কে জানে না, কিন্তু আমি তিনটি উত্তরই শুনেছি। আমার চিন্তা- ঈশ্বর সম্পর্কে সত্যটা কী হবে? আমি এই চিন্তায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। দয়া করে আমাকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দিন" বুদ্ধ বললেন, "আমি তোমার সাথে মোটেই কথা বলি নি কারণ তুমি আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করনি। তাই আমি তোমাকে কোন উত্তর দেইনি। প্রথম ব্যক্তি যিনি এসেছিলেন তিনি ছিলেন আস্তিক, দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি এসেছিলেন তিনি ছিলেন নাস্তিক, তৃতীয় ব্যক্তি যিনি এসেছিলেন তিনি ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। আমার উত্তরের ঈশ্বরের সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না, আমার উত্তরের প্রশ্নকর্তার সাথে কিছু সম্পর্ক ছিল। আমি প্রশ্নকর্তার উত্তর দিচ্ছিলাম; এটি ঈশ্বরের সাথে একেবারেই যুক্ত ছিল না। ঈশ্বর সম্পর্কে আনন্দের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য বুদ্ধ আরও ব্যাখ্যা করে বললেন;

"যে ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আমি তাকে 'না' বলব কারণ আমি চাই সে ঈশ্বর সম্পর্কে তার ধার করা ধারণা ত্যাগ করুক, আমি চাই সে ঈশ্বর সম্পর্কে তার ধার করা ধারণা থেকে মুক্ত হোক। সেই বিষয়ে কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ করেনি সে। যদি সে

অভিজ্ঞতা লাভ করত, তবে সে আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করত না; জিজ্ঞাসা করার কোন প্রয়োজন হত না।"

"যে ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করত, সে আমার কাছ থেকে তার বিশ্বাসের জন্য নিশ্চিতকরণ খুঁজছিল। আমি তাকে হ্যাঁ বলতে চাই ছিলাম না - আমি কারও বিশ্বাস নিশ্চিত করতে যাচ্ছি না। আমাকে না বলতে হয়েছিল, আমাকে অস্বীকার করতে হয়েছিল, কেবল তার বিশ্বাসকে ধ্বংস করার জন্য, কারণ সমস্ত বিশ্বাস সত্য জানার পথে বাধা। আস্তিক বা নাস্তিক, সমস্ত বিশ্বাস, হিন্দু বা খ্রিস্টান বা মুসলিম, সমস্ত বিশ্বাসই বাধা। "যে ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তারও কেবল একটি বিশ্বাস ছিল যা ভাঙতে হবে। অন্যথায় সে কখনও সত্য অনুসন্ধান শুরু করবে না এবং কেবল তার বিশ্বাসকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করবে।"

" আর যার সাথে আমি চুপ ছিলাম সে ছিল সঠিক প্রশ্নকারী। তার কোন বিশ্বাস ছিল না, তাই কোন কিছু ধ্বংস করার প্রশ্নই আসে না। আমি চুপ ছিলাম। এটাই ছিল তার কাছে আমার বার্তা: চুপ থাকো এবং অনুসন্ধান করে জানো। জিজ্ঞাসা করো না, জিজ্ঞাসা করার কোন প্রয়োজন নেই। এটি এমন কোন প্রশ্ন নয় যার উত্তর দেওয়া যেতে পারে। এটি একটি অনুসন্ধানের বিষয়; সত্য উপলব্ধির একটি তৃষ্ণা।"

"আমি তাকেও উত্তর দিয়েছিলাম; আমার নীরবতার মাধ্যমে আমি তাকে অনুসন্ধানের বার্তাটি দিয়েছিলাম এবং সে তৎক্ষণাৎ তা অনুসরণ করেছিল - সেও চুপ হয়ে গেল। আমি চোখ বন্ধ করলাম, সে চোখ বন্ধ করল; আমি আমার গভীর অন্তরে তাকালাম, সেও তাই অন্তরের ভেতরে তাকালো, এবং তারপর তার মধ্যে কিছু একটা ঘটল। এই কারণেই সে এত অভিভূত হয়ে গেল, সে এত কৃতজ্ঞতা বোধ করল, কারণ আমি তাকে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তর দেইনি। সে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরের জন্য আসেনি; বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তর খুব সস্তায় পাওয়া যায়। তার অস্তিত্বগত কিছুর প্রয়োজন ছিল। আমি তাকে যা প্রয়োজন তা দিয়েছিলাম।" উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে বুদ্ধ কোন সৃষ্টিকর্তা দেবতার অস্তিত্ব

বা অস্তিত্বহীন সম্পর্কে কিছু বলেননি। ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর নীরব থাকার আর একটি কারণ হল তিনি নিজেই অবতার বা ভগবান বিষ্ণুর অবতার।

শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে: কলিযুগের শুরুতে, ভগবান গয়া প্রদেশে ভগবান বুদ্ধ রূপে আবির্ভূত হবেন, কেবল বিশ্বস্ত ঈশ্বরবাদীদের প্রতি ঈর্ষান্বিতদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে। শ্রীল প্রভুপাদ নিম্ন বর্ণিত উপায়ে এই শ্লোকের বিস্তার করেছেন।

ভগবানের এক শক্তিশালী অবতার, ভগবান বুদ্ধ গয়া (বিহার) প্রদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তিনি অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন এবং বেদে অনুমোদিত পশুবলিকেও অবজ্ঞা করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের সময়, সাধারণ মানুষ নাস্তিক ছিল এবং অন্য কিছুর চেয়ে পশুমাংস পছন্দ করত। বৈদিক বলিদানের অজুহাতে, প্রতিটি স্থান কার্যত একটি বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছিল এবং পশুহত্যা অবাধে চলত । ভগবান বুদ্ধের অসহায় প্রাণীদের প্রতি করুণা করেছিলেন। তিনি নাস্তিকদের বিভ্রান্ত করেছিলেন কারণ তাঁর নীতি অনুসরণকারী নাস্তিকরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু তারা ভগবান বুদ্ধের প্রতি তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রেখেছিলেন, যিনি নিজেই ঈশ্বরের অবতার ছিলেন। এইভাবে অবিশ্বাসী মানুষদের ভগবান বুদ্ধের রূপে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এটাই ছিল ভগবান বুদ্ধের করুণা: তিনি অবিশ্বাসীদের তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত করে তুলেছিলেন।

গৌতম বুদ্ধের মৃত্যু, যা "মহাপরিন নির্বাণ"

গৌতম বুদ্ধ ৮০ বছর বয়সে ৪৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কুশিনগরে (বর্তমানে কুশিনগর) মারা যান। জানা যায় বুদ্ধের দেহ দাহ করা হয়েছিল এবং তাঁর দেহাবশেষ তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বুদ্ধের মৃত্যুর ঘটনাটি মহাপরিনির্বাণ নামে পরিচিত। এটি বৌদ্ধ ধর্মানুসারে পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি এবং নির্বাণ লাভের প্রতীক। *কুশিনগরে* মহাপরিনির্বাণ মন্দিরটি বুদ্ধের শেষ দিনের সাথে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এই পবিত্র স্থান পরিদর্শনের সময়

তীর্থযাত্রীরা নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান এবং অনুশীলন পালন করেন। *মৃত্যুর আগে বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের বলেছিলেন, "শোনো, সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। তোমরা নিজেদের এবং ধর্মের আশ্রয় নাও"। বুদ্ধের মৃত্যুর অনেক দিনপর তাঁকে "ভগবান বুদ্ধ" উপাধি দেওয়া হয়েছিল।* বুদ্ধের মৃত্যুর পরপরই তাঁর শিক্ষার বিভিন্ন ব্যাখ্যা উদ্ভব ঘটে। তাঁর অনুসারীরা বৌদ্ধধর্মের প্রসার অব্যাহত রেখেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হয়েছিল।

গৌতম বুদ্ধের কিছু বিখ্যাত বাণী বা উক্তি;

গৌতম বুদ্ধের বিখ্যাত উক্তি বা বাণীগুলি জীবন, ধ্যান এবং করুণা সম্পর্কে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত গভীর জ্ঞান ও জীবন দর্শন প্রদান করে চলেছে। জীবন, ধ্যান এবং করুণা সম্পর্কে তাঁর অসংখ্য বাণী ও উপদেশ রয়েছে-যা আমরা সকলে কম বেশি জানি। তবুও তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত উপদেশ বাণী এখানে তুলে ধরছি।

- "মনই সবকিছুর আসল।"
- "আনন্দ হলো বিশুদ্ধ মনের সহচর।"
- "তুমিই কেবল তোমার রক্ষাকর্তা, অন্য কেউ নয়।"
- "অতীতকে প্রাধান্য দিও না, ভবিষ্যত নিয়ে দিবাস্বপ্নও দেখবে না।"
- "রাগ ধরে রাখা অন্য কারো দিকে ছুঁড়ে মারার উদ্দেশ্যে গরম কয়লা ধরে রাখার মতো; তুমিই পুড়ে যাবে।"
- "শান্তি আসে ভেতর থেকে। বাইরে থেকে তা খুঁজো না।"
- "তিনটি জিনিস বেশিদিন লুকানো যায় না: সূর্য, চাঁদ এবং সত্য।"
- “প্রতিদিন সকালে আমরা নতুন করে জন্মগ্রহণ করি। আজ আমরা যা করি তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"
- "তোমার সবচেয়ে খারাপ শত্রু তোমার নিজের অযৌক্তিক চিন্তাভাবনার মতো এত ক্ষতি করতে পারে না।"
- তুমি কেবল সেই জিনিসটাই হারাবে যা তুমি আঁকড়ে ধরে থাকবে।"

- "তোমার মনকে শাসন করো, নইলে মন তোমাকে শাসন করবে।"
- "দুঃখের মূল হলো আসক্তি।"
- "জল থেকে এটা শিখুন: ঝর্ণার জোরে ছিটা পড়ে কিন্তু সমুদ্রের গভীরতা শান্ত থাকে।"
- "জীবনকে ভালোবাসে এমন মানুষ যেমন বিষ এড়িয়ে চলে, তেমনি খারাপ কাজ এড়িয়ে চল।"
- প্রত্যেক মানুষ তার নিজের স্বাস্থ্য বা রোগের লেখক।"
- "ভালো কাজ করার জন্য তোমার মনকে স্থির করো। বারবার করো, আর তুমি আনন্দে ভরে যাবে।"

তথ্যসূত্র এবং গ্রন্থপঞ্জি

১. গৌতম বুদ্ধের অলৌকিক ঘটনা- (উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে)
https://en.wikipedia.org/wiki/Miracles_of_Gautama_Buddha

২. (https://learningrmps.com/2017/09/14/the-four-sights-and-going-forth-buddhism)

৩. প্রাথমিক বৌদ্ধধর্মে পুনর্জন্ম এবং বর্তমান গবেষণা - ভিক্ষু আনালায়ো

৪. মহর্ষি বশিষ্ঠ

মহাঋষি বশিষ্ঠ হিন্দুধর্মের অন্যতম বিখ্যাত ঋষি। তিনি বেদান্ত দর্শনের প্রভাবশালী চিন্তাবিদ ঋষি ছিলেন. তিনি ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের প্রধান রচয়িতা এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলের (সাত মহান ঋষির) একজন অন্যতম ঋষি হিসাবেও পরিচিত। মূলত তিনি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সময় ব্রহ্মার পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। ঋষি বশিষ্ঠ তাঁর প্রথম জন্মের পর আরো দুবার পুনর্জন্ম লাভ করেছিলেন। সেই জন্য তাঁকে তিন জন্মের ঋষি বা সাধক বলা হয়। তাঁর প্রতিটি জন্মেরই তাঁর সম্পর্কে আলাদা আলাদা কিংবদন্তি রয়েছে। বিশ্বামিত্রের সাথে তাঁর শত্রুতার জন্যও হিন্দু পুরাণে বশিষ্ঠ বিশেষ ভাবে বিখ্যাত। বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের মধ্যে কয়েকটি সাক্ষাৎ সহ এখানে ঋষি বশিষ্ঠের সাধনা সম্পর্কে বেশ কিছু পৌরাণিক কাহিনীর আলোচনা করা হয়েছে। মহাঋষি বশিষ্ঠের কিংবদন্তি অনেক পুরাণে পাওয়া যায়। ঋষি বশিষ্ঠ সম্পর্কে কিংবদন্তি মূলত শিব পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। তিনি ছিলেন ত্রিকাল দৃষ্টিসম্পন্ন এবং মহান জ্ঞানী ঋষি। বশিষ্ঠের খ্যাতি ও ভূমিকা শুধুমাত্র সাধনা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, রামায়ণ, মহাভারত, এবং অন্যান্য ভারতীয় পুরাণ গ্রন্থে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন রামায়ণে, বশিষ্ঠ ছিলেন রামের গুরু এবং রঘু বংশের রাজ পুরোহিত। উল্লেখ্য, বশিষ্ঠ গোত্রটি ঋষি বশিষ্ঠ থেকে উদ্‌ভূত,

এবং এই গোত্রের সদস্যরা তাদের বুদ্ধিমত্তা, সততা এবং তপস্যা ও ভক্তির জন্য বিখ্যাত। মহাঋষি বশিষ্ঠ ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। আদি শঙ্কর বশিষ্ঠকে হিন্দু দর্শন বেদান্তের প্রথম ঋষি হিসেবে অভিহিত করেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থে ঋষি বশিষ্ঠের সাধন ক্ষমতাকে ঈশ্বরের ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তিনি একজন ব্রহ্মঋষি, সর্বোচ্চ সম্ভাব্য শ্রেণীর একজন ঐশ্বরিকভাবে উপলব্ধিপ্রাপ্ত ঋষি। বিভিন্ন পৌরাণিক ঘটনা অনুযায়ী তাঁর সাধনার বলে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সাথে এক এবং প্রায় সর্বশক্তিমান, অন্তত নশ্বর দৃষ্টিকোণ থেকে। কিছু পৌরাণিক ঘটনা ইঙ্গিত করে যে তিনি জগৎ সৃষ্টি এবং ধ্বংস করতে পারতেন এবং অনেক দেবতার চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিলেন। আমরা এখানে তাঁর জীবনের এই রকম কিছু অলৌকিক পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করব

১; মহর্ষি বশিষ্ঠের জন্ম;

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সময়, ভগবান ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টি এবং বিশ্বকে জনবহুল করার কাজে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন জীব সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর দ্বারা সৃষ্ট প্রাণীদের প্রধানত মানসপুত্র বা মন-জাত পুত্র বলা হয়। বশিষ্ঠ হলেন ভগবান ব্রহ্মার মন-জাত সন্তানদের মধ্যে একজন। উল্লেখ্য,এই সকল মন-জাত পুত্রদের প্রত্যেকের জন্ম ব্রহ্মার দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হয়েছিল। পুরাণ অনুসারে ভগবান ব্রহ্মার প্রাণবায়ু (নিঃশ্বাস) থেকে বশিষ্ঠের সৃষ্টি হয়েছিল। যেহেতু ঋষি বশিষ্ঠের তিনটি জীবনকাল ছিল, তাই পুরাণ কাহিনী অনুসারে, তিনি তিনটি জীবনে তিনটি পরিবারের অনুসরণ করেছিলেন;

প্রথম জন্ম: পিতা; ব্রহ্মা, ভাই: মারিচি, অত্রি, পুলাহু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরাস, ক্রতু, নারদ, দক্ষিণ, ভৃগু ; স্ত্রী; অরুন্ধতী, পুত্র: চিত্রকেতু, পুরাচিস, বিরচা, মিত্র, উলবানা, বসুভ্রদান এবং দ্যুমনা

দ্বিতীয় জন্ম: পিতা-ব্রহ্মা, স্ত্রী; আকসামালা, (অরুন্ধতীর পুনর্জন্ম)

তৃতীয় জন্ম: পিতা মিত্র ও বরুণ মা: উর্বশী, স্ত্রী; অরুন্ধতী (পুনর্জন্ম), পুত্র: শক্তি ও অন্যান্য 99 জন

2. মহর্ষি বশিষ্ঠের সাধনা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন;

আমরা প্রথমে মহর্ষি বশিষ্ঠের সাধনা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করব। আগেই বলেছি । ঋষি বশিষ্ঠ তাঁর জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য হিন্দুধর্মের একজন বিশিষ্ট ঋষি হিসেবে পরিচিত। তাঁর তপস্যা ও ধ্যান ঐ আধ্যাত্মিক অনুশীলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বশিষ্ঠ কেবল একজন রাজকীয় পুরোহিত এবং উপদেষ্টাই ছিলেন না, তিনি একজন সম্মানিত জ্ঞানী গুরুও ছিলেন' যিনি আশ্রমে অসংখ্য শিষ্যকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ধর্ম এবং মহাজাগতিক শৃঙ্খলা অনুসারে জীবনযাপন। আমরা পরে জানব তিনি কীভাবে সন্ধ্যাকে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সঠিকভাবে তপস্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলন যাতে সন্ধ্যা তপস্যায় শিবকে সন্তুষ্ট করতে পারেন। সন্ধ্যা তাঁর নির্দেশে কঠোর তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং তিনি তাঁর পাপ থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। উল্লেখ্য বশিষ্ঠের নির্দেশনায় সন্ধ্যা চার যুগ ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং অবশেষে শিবের কাছ থেকে বর লাভ করেছিলেন। আমরা সে ঘটনায় পরে আসব। এছাড়া সাধনায় প্রাপ্ত ঋষি বশিষ্ঠের গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান তাঁর রচিত ঋগ্বেদ স্তোত্রগুলিতে এবং যোগ বশিষ্ঠে লিপিবদ্ধ ভগবান রামের সাথে তার সংলাপে প্রতিফলিত হয়েছে। (উইকিপেডিয়া মুক্ত বিশ্বকোশ)

3. মহর্ষি বশিষ্ঠের যোগবশিষ্ঠ - সাধনার নির্দেশনা

যোগবাশিষ্ঠ মহা-রামায়ণ, আর্ষ রামায়ণ বশিষ্ঠ রামায়ণ, যোগবশিষ্ঠ-রামায়ণ ও জ্ঞানবশিষ্ঠ নামেও পরিচিত। এটি মহর্ষি **বশিষ্ঠে** কর্তৃক রচিত বলে মনে করা হয়। সম্পূর্ণ গ্রন্থটিতে ২৯,০০০টিরও বেশি শ্লোক রয়েছে। তবে এই গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রয়েছে যা লঘু যোগবশিষ্ঠ নামে পরিচিত। ঐতিহাসিকভাবে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী হিন্দুধর্মের একটি দার্শনিক গ্রন্থ, যা ষষ্ঠ বা সপ্তম খৃষ্টাব্দ সময়কালে রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়।, এই গ্রন্থটির নামকরণ এর রচয়িতা ঋষি বশিষ্ঠের নাম অনুসারে করা হয়েছে। রাজা দশরথ রামচন্দ্র ও ঋষি বশিষ্ঠের মধ্যে অধ্যাত্ম তত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা

ও কথোপকথন এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু। এই গ্রন্থের আলোচনাটি শুরু হয় রাজপুত্র রামচন্দ্র কর্তৃক পৃথিবীর অসন্তোষজনক প্রকৃতি উপলব্ধি করা এবং ঋষি বশিষ্ঠের সামনে নিজেকে উন্মোচন এবং আবিষ্কার করার মাধ্যমে।

যোগবশিষ্টে ছয়টি কাণ্ড বা অধ্যায় নিয়ে গঠিত। প্রথম কাণ্ডে জীবনের প্রকৃতি, মানুষের কষ্ট ও বিশ্বের প্রতি উদাসীনতা নিয়ে রামচন্দ্রের হতাশা উপস্থাপন করেছে। দ্বিতীয় কান্ডে রয়েছে, রামের অসাধারণ চরিত্র, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, তৃতীয় ও চতুর্থ আধ্যাত্মিক জীবনের মাধ্যমে মুক্তি এবং মুক্তির জন্য আত্ম-প্রচেষ্টা। এই দুটি কান্ডে স্বাধীন ইচ্ছা এবং মানুষের সৃজনশীল শক্তির উপর প্রাধান্য পঞ্চমটিতে ধ্যান এবং এর ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করে, শেষ কান্ডে জ্ঞানময় ও আনন্দময় রামের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এই বইটিতে অভ্যন্তরীণ চেতনাকে পরম চেতনার সাথে একত্রিত করার সুস্পষ্ট প্রয়াস

পণ্ডিতদের মতে বইটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ক্লাসিক গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি। এখানে যোগ বশিষ্ঠ শ্রী রামচন্দ্র এবং তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষক বশিষ্ঠ মহর্ষির মধ্যে একটি বিশদ কথোপকথনের বর্ণনা রয়েছে। বইটিতে আমাদের মনের সূক্ষ্ম জটিলতাগুলিকে কেন্দ্র করে আমাদের অস্তিত্বের অসংখ্য স্তর উন্মোচন করা হয়েছে। এই গ্রন্থের বেশিরভাগ অংশই রূপক গল্পের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে, যার ভেতর লুকিয়ে রয়েছে আধ্যাত্মিকতা ও মুক্তির অনেক গভীর নির্দেশনা এই বইটিতে মহর্ষি বশিষ্ঠ সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন পার্থিব দুঃখ-কষ্ট আমাদের নিজস্ব জগতের মায়া দ্বারা সৃষ্ট, এবং আমরা বাইরে যা কিছু দেখি তা কেবল আমাদের ভিতরের অনুভূতির প্রতিফলন। এই অস্থায়ী মায়াগুলির বাইরে রয়েছে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের পথ। বশিষ্ঠ মহর্ষি এখানে বর্ণনা করেছেন কীভাবে মায়ার বাহিরে গিয়ে গভীর জ্ঞানার্জনের পথে যাত্রা করতে হবে। এখানে তিনি গভীর সাধনার পথের সন্ধান দিয়েছেন।

পণ্ডিতগণ বলেছেন যোগ বশিষ্ঠে প্রাচীন দার্শনিক চিন্তাধারার এবং যোগসাধনার এক অনন্য বিশ্লেষণ রয়েছে। তাঁদের মতে যাদের মন জাগতিক আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে এবং এই পৃথিবীর বিষয়বস্তুর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছে এবং যারা মুক্তির জন্য আকুল, তারা এই বইটি দ্বারা সত্যিই মুক্তি সাধনার পথ খুঁজে পাবেন। আমি কিছুটা পড়ে যা বুঝেছি সেটি হল যোগ-বশিষ্ঠ যা হিন্দু ও বৌদ্ধ যোগিক দর্শন বা দর্শনের সংমিশ্রণ। পরম বাস্তবতার প্রকৃতি বোঝার চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষায় রাজপুত্র রামচন্দ্র এবং জ্ঞানী গুরু বশিষ্ঠের মধ্যে প্রশ্ন- উত্তরের মাধ্যমে একটি আলোচনার প্রেক্ষাপটে অসাধারণ বর্ণনা।

(Ref. An Introduction to The Yoga Vasistha by Mary Hicks; Sutra Journal; Eternal Truths)

যোগ-সাধনার জন্য যোগ বশিষ্ঠের ধারণা ও অপরিহার্য নীতিমালা-

- **গভীর দর্শন ;** পণ্ডিতদের মতে যোগ বশিষ্ঠে উল্লিখিত গল্পগুলির প্রকৃতি এবং তাদের গভীরে প্রোথিত দর্শনগুলির মাধ্যমে আমাদের সচেতনতার স্তরগুলিকে উন্মুক্ত করার প্রয়াস রয়েছে। ফলে যারা ঐসকল কিংবদন্তি অনুসারে বইটি সম্পূর্ণ করবে, সাধনার মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক বিকাশ উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত হবে। যোগ বশিষ্ঠ ভগবদ গীতা, বেদ এবং উপনিষদ- সমস্ত হিন্দু দার্শনিক গ্রন্থের সারাংশ –
- **পরম ঈশ্বরচেতনা;** এই বইটিতে পরব্রহ্মের প্রকৃতি, পরম ঈশ্বরচেতনা এবং আত্মোপলব্ধি অর্জনের পদ্ধতিগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।
- **বিশুদ্ধ চেতনা;** যোগ বশিষ্ঠের অপরিহার্য অংশটি আদি শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছে যা বিশ্বের মায়াময় প্রকৃতি এবং বিশুদ্ধ চেতনার চূড়ান্ত বাস্তবতার উপর প্রাধান্য দিয়েছে। এটি বৈরাগ্যের মাধ্যমে মুক্তির পথ শেখায়। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে এবং

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে আত্মার একত্ব উপলব্ধি করতে এই গ্রন্থটি বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

- **বৈরাগ্য:** পৃথিবীর অসন্তোষজনক প্রকৃতিকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং জাগতিক আসক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৈরাগ্য লাভ মুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
- **চূড়ান্ত বাস্তবতা:** যোগ বশিষ্ঠ বিশুদ্ধ চেতনার প্রকৃতি অন্বেষণ করে, চূড়ান্ত বাস্তবতা সন্ধান দেয়।
- **পৃথিবীর মায়া:** এই গ্রন্থটি শিক্ষা দেয় যে আমরা যে জগৎ উপলব্ধি করি তা একটি মায়া বা মানসিক গঠন, এবং পরিণামে অবাস্তব। বাস্তবতার চেতনায় এটি আমাদেরকে উদ্‌বুদ্ধ করে।
- **মুক্তি (মোক্ষ)** লাভ: মায়ার অবসান এবং প্রকৃত জ্ঞান লাভের মাধ্যমে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে এবং জন্ম ও মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে।

যোগাবশিষ্ঠ শ্রী রামচন্দ্র এবং তাঁর গুরু বশিষ্ঠ মহর্ষির মধ্যে কথোপকথনের কিছু অংশ উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরা হল; শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মহর্ষি বশিষ্ঠ;

"এই আত্মা (শাশ্বত স্ব) অবশ্যই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এবং প্রাণ থেকে আলাদা। আত্মা আনন্দময়, সর্বোচ্চ, অদ্বৈত, স্থায়ী, নিরাকার, পাপহীন এবং বিশুদ্ধ। যে মুহূর্তে এই উপলব্ধি তোমার কাছে আসবে, তুমি মুক্ত হবে।"

"যদি তুমি ক্রমাগত আত্মার কথা চিন্তা করো, তাহলে তোমার মন শুদ্ধ হবে এবং অতীতের প্রবণতাগুলির সাথে সাথে তোমার অজ্ঞতাও নির্মূল হবে; ঠিক যেমন প্রতিদিন ওষুধ সেবন করলে তোমার অসুস্থতা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। যখন তোমার মন শুদ্ধ হবে, তখন তুমি অকৃত্রিম আনন্দ পাবে।"

"যখন কেউ গুরুর নির্দেশে বা আধ্যাত্মিক গ্রন্থের নির্দেশে জীবাত্মা (মানুষের আত্মা) এবং পরমাত্মার (ঈশ্বর) মধ্যে ঐক্যের সত্য উপলব্ধি করে, তখন প্রতি মুহূর্তে অজ্ঞতার উৎস, কারণ ও প্রভাব

সহ, পরমাত্মার সাথে মিশে যাবে। উপরে উল্লিখিত অবস্থাকে মোক্ষ (মুক্তি) বলা হয়। আত্মা সর্বদা মুক্ত।"

জানা যায়, মহর্ষি বশিষ্ঠ ভগবান রামের সাথে একই বংশের ছিলেন এবং ঋগ্বেদের মন্ডল ৭ এর রচয়িতা ও স্রষ্টা। রঘুকুলের পারিবারিক পুরোহিত হিসেবেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি ভগবান রামচন্দ্র এবং তাঁর ছোট ভাই লক্ষ্মণকে শিক্ষা দান করতেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ সম্পর্কে কিছু পৌরানিক কাহিনী

১; **মহর্ষি বশিষ্ঠ, কামদেব ও সন্ধ্যার কাহিনী;**

ব্রহ্মা যখন তাঁর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি সমাপ্ত করলেন, তখন ভগবান বিষ্ণু এবং দেবী লক্ষ্মীর পুত্র কামদেব তাঁর প্রেমের শক্তি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তিনি ব্রহ্মা, তাঁর মানসপুত্র বশিষ্ঠ ও অন্য পুত্র এবং মানসকন্যা সন্ধ্যার প্রতি তাঁর প্রেমের তীর ছুঁড়ে মারলেন। এরপরে, তারা সকলেই ঘন ঘন সন্ধ্যার দিকে প্রেমের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ এবং তাঁর নয় ভাই কাম এবং প্রেমের তৃষ্ণায় সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। কামদেবের প্রভাবে স্বয়ং ব্রহ্মা এবং অন্যান্য ঋষিরাও ব্রহ্মার কন্যা সন্ধ্যাকে কামুক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। সন্ধ্যাও তাদের প্রতি প্রেমাবেগের আকর্ষণ দেখাতে লাগল। সন্ধ্যা মাঝে মাঝে তাদের প্রতি প্রেমাবেগের প্রবল অনুভূতি প্রকাশ করতে শুরু কলেন। তাঁর ভাই এবং পিতা ব্রহ্মাকে সন্ধ্যার প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখে ধর্ম (ব্রহ্মার আরেক পুত্র) ভগবান শিবের কাছে এর প্রতিকারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তাঁর প্রার্থনা মত শিব সেখানে উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মা এবং তাঁর পুত্রদেরকে তাদের অশ্লীল আচরণ এবং কার্যকলাপের জন্য তিরস্কার করলেন। তাদের অপকর্মের জন্য লজ্জা পেয়ে, বশিষ্ঠ এবং তাঁর পুত্রগণ বিব্রত হলেন এবং ঘামতে শুরু করলেন। তাদের ঘাম থেকে বিভিন্ন পিতৃপুরুষের (পূর্বপুরুষদের) জন্ম হয়েছিল। এই ঘটনাতে ব্রহ্মা কামদেবের উপর ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে অভিশাপ দেন, কিন্তু পরে তিনি তাঁকেও আশীর্বাদ করেন। এই ঘটনার পর, বশিষ্ঠ এবং অন্যান্যরা তাদের নিজ নিজ

আশ্রয়ে চলে যান। এই ঘটনাটি কালিকা পুরাণে উল্লেখ আছে বলে জানা যায়।

২; সন্ধ্যার সাধনায় বশিষ্ঠের শিক্ষা

শিবপুরাণ অনুসারে, মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং সন্ধ্যা সম্পর্কে আরেকটি আকর্ষণীয় গল্প আছে। কামদেবের প্রভাবে ব্রহ্মা এবং তাঁর দশ পুত্র সন্ধ্যার সাথে অশ্লীল কামমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য লজ্জিত হয়েছিলেন এবং তাদের দোষ বুঝতে পেরেছিলেন। সন্ধ্যাও তাঁর প্রেমের মোহ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁর অশ্লীল কর্মের জন্য অত্যন্ত অপরাধী এবং পাপ বোধ করলেন। তাই, তিনি তপস্যা করে তাঁর দেহত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং একটি ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন যে কোনও নবজাতকের যেন কখনো কাম-অনুভূতি না সৃষ্টি হয়।

সেইজন্য তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কঠিন তপস্যা করবেন এবং শিবের অনুমতি নিয়ে তিনি তাঁর জীবন শেষ করবেন। সন্ধ্যা চন্দ্রভাগা পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। শীঘ্রই, ব্রহ্মা তাঁর মানস কন্যা সন্ধ্যার দেহত্যাগ করার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারেন। ব্রহ্মা তখন বশিষ্ঠের কাছে গিয়ে বলেন, "আমার মেয়ে, সন্ধ্যা বর্তমানে চন্দ্রভাগায় তপস্যা করছে। কামের সাথে যা ঘটেছিল তার অনুসুচনায় সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। দয়া করে তাকে সঠিকভাবে তপস্যা করতে শিখিয়ে দাও।"

এরপর পিতার নির্দেশমত, মহর্ষিবশিষ্ঠ চন্দ্রভাগা পর্বতে সন্ধ্যার কাছে পৌঁছালেন সন্ধ্যাকে তপস্যার বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি শেখানোর জন্য যাতে সন্ধ্যা তপস্যার সফলতা অর্জন করতে পারে। ঋষি বশিষ্ঠ ছদ্মবেশে সন্ধ্যার কাছে গেলেন তপস্যায় সিদ্ধপুরুষ ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ করে। সন্ধ্যার তপস্যার স্থানে পৌঁছে বশিষ্ঠ তাঁর তপস্যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তার উদ্দেশ্য প্রকাশ করলেন এবং ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে তপস্যা করার নির্দেশও চাইলেন। ব্রহ্মচারী তাকে শিবের ধ্যান

করতে এবং "ওঁ নমঃ শঙ্করায় ওঁ" মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে নির্দেশ দিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁকে শিবকে সন্তুষ্ট করার মন্ত্রটি শিখিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে গঙ্গায় স্নান করতে বললেন এবং শিবের পূজা করার সময় নীরবতা পালন করতে। তিনি সন্ধ্যাকে পরামর্শ দিলেন যে প্রথম এবং দ্বিতীয় ষষ্ঠকালের সময় তার কেবল জল গ্রহণ করা উচিত। তৃতীয় ষষ্ঠকালের সময় তার সম্পূর্ণ উপবাস পালন করা উচিত। তিনি তপস্যার বিভিন্ন রীতিনীতি এবং নিয়মও শেখালেন। এবং তারপর তিনি তাঁর তপস্যার স্থান থেকে চলে যান। শিবপুরাণে বর্ণিত সন্ধ্যা চার যুগ ধরে সেই তপস্যা করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান শিব তাঁর সামনে উপস্থিত হন এবং বলেন যে তিনি তাঁর তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট। এরপর ভগবান শিব তাঁকে যা ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করতে বলেন।

3; সন্ধ্যাকে ভগবান শিবের বর প্রদান

ভগবান শিব যখন তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন, সন্ধ্যা নিজেকে ধন্য মনে করলেন এবং অতিশয় আনন্দে তিনি ভগবান শিবের কাছে তিনটি আশ্চর্য বর প্রার্থনা করলেন। প্রথম বর হিসেবে, তিনি চেয়েছিলেন যে কোনও মানুষ যেন কাম নিয়ে জন্মগ্রহণ না করে যা তাঁর জীবনে অন্যায়ভাবে ঘটেছিল এবং তাই তিনি চাননি যে এটি আবার কারও সাথে ঘটুক। তাই ভগবান শিবের কাছে তাঁর প্রথম প্রার্থনা ছিল যে জন্মের পরপরই কোন জীবের মধ্যে যেন কামের অনুভূতি না আসে। তাঁর দ্বিতীয় বর হিসেবে, তিনি চেয়েছিলেন যে কোনও মহিলা যেন তাঁর চেয়ে বেশি বিখ্যাত না হয়। সদ্গুণ এবং সতীত্বে তিনি যেন পৃথিবীতে সকল নারীর মধ্যে সেরা হন। তৃতীয় বর হিসেবে, তিনি চাইলেন সবচেয়ে গুণী এক স্বামী এবং অন্য কোনও পুরুষ যেন তাঁর দিকে কামের দৃষ্টিতে তাকাতে ভয় পায় । তাঁর তৃতীয় বর থেকে বোঝা যায় যে যদি তাঁর স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষ যদি তাঁর দিকে কামের দৃষ্টিতে তাকায়, তবে সে নিজের পতনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং একজন নপুংসক বা ভীরু হয়ে যাবেন।

তাঁর ইচ্ছা অনুসারে ভগবান শিব এই তিনটি বর অনুমোদন করলেন এবং তাঁকে বললেন যে তাঁর স্বামী একজন মহান তপস্বী হবেন এবং তাঁর সাথে তিনটি কল্পের জন্য বসবাস করবেন। ভগবান শিব সেই সময় তাকে আরও বলেছিলেন যে, "এখন থেকে জীবনের চারটি স্তর থাকবে: শিশুকাল, বাল্যকাল, যৌবন এবং বার্ধক্য। মানুষ কেবল যৌবনেই কামুক হতে পারে, কিন্তু শিশুকাল বা বাল্যকালে নয়।"

সন্ধ্যার দেহত্যাগ;

ভগবান শিবের সাথে দেখা এবং তাঁর কাছে তিনটি বর লাভের পর, সন্ধ্যা তাঁর দেহত্যাগ করার সিদ্ধান্ত শিবকে নিবেদন করেন। এই প্রসঙ্গে ভগবান শিব তাঁকে বললেন যে তিনি চন্দ্রভাগা নদীর তীরে সেই স্থানে যাবেন যেখানে ঋষি মেধাতিথি বারো বছর ধরে মহান জ্যোতিস্তোম যজ্ঞ করছেন, এবং সেখানে তাঁকে যজ্ঞের আগুনে প্রবেশ করতে হবে। এরপর তিনি ঋষি মেধাতিথির কন্যা হিসেবে জন্মগ্রহণ করবেন। আগুনে প্রবেশ করার সময় তার প্রার্থনা করা বর স্মরণ করা উচিত। ভগবান শিব আরও বলেছিলেন, "যদি তুমি তোমার পরবর্তী জন্মের জন্য তোমার স্বামীকে মনোনীত করে থাকো, তাহলে আগুনে প্রবেশ করার আগে তাকে স্মরণ করবে।" এই সকল কথা বলে শিব সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। ভগবান শিবের পরামর্শ অনুসারে, সন্ধ্যা মেধাতিথির যজ্ঞে পৌঁছে যজ্ঞের আগুনে প্রবেশ করে তার দেহত্যাগ করেন। প্রবেশের সময় তিনি ব্রহ্মচারী (ঋষি **বশিষ্ঠ**) কে তার স্বামী হিসেবে প্রার্থনা করেন।

৪; সন্ধ্যা ঋষি মেধাতিথির কন্যা অরুন্ধতি রূপে জন্ম;

মেধাতিথির যজ্ঞের শেষে, ঋষি মেধাতিথি যজ্ঞের আগুন থেকে একটি শিশুকন্যাকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পান। মেধাতিথি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তিনি সেই মেয়েটিকে নিজের কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি ঐ শিশুকন্যার নাম রাখেন 'অরুন্ধতী'। সংস্কৃতে অরুন্ধতী নামের অর্থ 'সূর্যের রশ্মিতে ধৌত '। মেয়েটির গায়ের রঙ ছিল গলানো সোনার মতো। তাই ঋষি মেধাতিথির

'অরুন্ধতী' নামকরণের আরেকটি কারণ ছিল। মেয়েটি চন্দ্রভাগা নদীর তীরে তপসরণ্যে ঋষি মেধাতিথির কন্যা হিসেবে বেড়ে উঠতে শুরু করে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, অরুন্ধতীর জন্ম এবং জীবন বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্রে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে। অরুন্ধতীর জন্ম মূলত শিব পুরাণ এবং ভাগবত পুরাণে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, হাজার হাজার বছর আগে প্রাচীন ঋষিরা আকাশে দুটি ক্ষুদ্র বিন্দুকে একটি যমজ নক্ষত্রদ্বয় হিসেবে চিহ্নিত করতে পারতেন। তাঁরা নক্ষত্রদ্বয়ের নামকরণ করেছিলেন- 'অরুন্ধতী-বশিষ্ঠ'। উল্লেখ্য,ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় মিজারকে বশিষ্ঠ এবং আলকরকে অরুন্ধতী নামে পরিচিত।

৫; মহর্ষি বশিষ্ঠের সাথে অরুন্ধতি বিবাহ

অরুন্ধতী তার পিতা ঋষি মেধাতিথির তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। সময়ের সাথে সাথে অরুন্ধতী একজন সুন্দরী যুবতী হয়ে ওঠেন। একদিন বনে অরুন্ধতীর সাথে বশিষ্ঠের দেখা হয়। বশিষ্ঠ তৎক্ষণাৎ অরুন্ধতীর প্রেমে পড়ে যান এবং অরুন্ধতীও তাঁর প্রতি অনুরাগী হন। তাঁরা একে অপরের প্রতি তাঁদের অনুরাগ প্রকাশ করেন। ঋষি মেধাতিথি এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বশিষ্ঠের সাথে অরুন্ধতির বিবাহের আয়োজন করেন। ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব তাদের বিবাহে আশীর্বাদ করেন। বশিষ্ঠ এবং অরুন্ধতীর সাত পুত্র ছিল যাদের নাম চিত্রকেতু, পুরোচিস, বিরাচ, মিত্র, উলবান, বসুভ্রাদ্যন এবং দ্যুমান। (সূত্র; সবুজ বার্তা: আধ্যাত্মিকতার চিরসবুজ বার্তা, শিব পুরাণ- সন্ধ্যার তপস্যা)

ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, কর্দম ও দেবহুতির নয় কন্যার মধ্যে অষ্টম হলেন অরুন্ধতী। তিনি পরাশরের দাদী এবং ব্যাসের প্রপিতামহী। কিন্তু আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে দেখেছি যে শিব পুরাণে অরুন্ধতীকে পূর্বজন্মের ব্রহ্মার মন-কন্যা সন্ধ্যা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য আর একটি পুরাণে তাঁকে কশ্যপ মুনির কন্যা এবং নারদ মুনির বোন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং নারদ মুনি তাকে বশিষ্ঠের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন।

মহাভারতে অরুন্ধতীকে একজন তপস্বী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যিনি সাত ঋষিদের সাথে আলাপ আলোচনা করতেন। মহাকাব্যে আরও বলা হয়েছে যে, যখন ১২ বছর ধরে বৃষ্টি হয়নি এবং সাত ঋষি জল ও ফল ছাড়াই কষ্ট পাচ্ছিলেন, তখন তিনি কীভাবে ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। তাঁর সতীত্ব এবং স্বামীর প্রতি সেবা মহাভারতে অনন্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাল্মীকি রামায়ণ অনুসারে, তিনি একশো পুত্রের জন্ম দেন, যাদের সকলে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের অভিশাপে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তিনি শক্তি নামে এক পুত্র এবং পরে সুয়জ্ঞ নামে আরও একজনের জন্ম দেন, যিনি বশিষ্ঠের আশ্রমে রামের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিছু সূত্র অনুসারে, শক্তি এবং চিত্রকেতু সহ তাঁর আট পুত্র ছিল। ১৯৯৪ সালে জগদ্গুরু রামভদ্রাচার্য রচিত অরুন্ধতী নামক হিন্দি মহাকাব্যে অরুন্ধতীর জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। (উইকিপিডিয়া) উপরোক্ত বর্ণনা থেকে মনে হয় যে বিভিন্ন পুরাণ এবং মহাকাব্যে অরুন্ধতীর জীবন বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৬; দক্ষযজ্ঞে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতি

দক্ষযজ্ঞের সাথে সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনী আমাদের অনেকের কাছেই খুবই পরিচিত। রাজা দক্ষ তার মেয়ের স্বামী নির্বাচনের বিষয়ে মেয়ের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন। এরপর যখন রাজা দক্ষ একটি মহান বৈদিক যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন, তখন তিনি সমস্ত দেবতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি শিব এবং সতীকে আমন্ত্রণ জানাননি। ক্রোধে, সতী নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে এতে যজ্ঞ অপবিত্র হবে।

ঋগ্বেদে, রাজা দক্ষ দেবী অদিতির পুত্র। আবার মহাকাব্য এবং পুরাণ শাস্ত্রে, দক্ষ হলেন স্রষ্টা ভগবান ব্রহ্মার একজন মন-জাত পুত্র। হিন্দুধর্মে, দক্ষ ছিলেন প্রজাপতিদের একজন, সৃষ্টির অধিপতি এবং একজন ঐশ্বরিক রাজা-ঋষি। পুরাণ কাহিনীতে তাকে একজন স্থূল দেহ এবং সুন্দর মুখ বা ছাগলের মাথাওয়ালা দেবতা

বা ঋষি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঋষি বা দেবতা দক্ষ সম্পর্কে অনেক পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। তাঁর ছাগলের মাথার পিছনে একটি গল্প আছে। একটি পৌরাণিক কিংবদন্তি অনুসারে, ক্রুদ্ধ দক্ষ একটি যজ্ঞ (অগ্নি-বলি) করেছিলেন, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা সতী (দুর্গা) এবং তাঁর স্বামী ভগবান শিবকে আমন্ত্রণ জানাননি। লিঙ্গ পুরাণ অনুসারে, দক্ষের যজ্ঞের সময় ভগবান শিবকে অপমান করার জন্য, সতী ক্রোধে আত্মদান করেছিলেন, শিবের একজন পরিচারক বীরভদ্র দক্ষের শিরশ্ছেদ করেছিলেন। পরে তিনি ছাগলের মাথা নিয়ে পুনরুত্থিত হন। অনেক পুরাণে বলা হয়েছে যে, মনুর যুগে দক্ষ অন্য মন্বন্তরে প্রচেত বা ঋষির গর্ভে পুনর্জন্ম লাভ করেছিলেন।

কাহিনী অনুসারে, সতীর আত্মদহনের কথা শুনে, ভগবান শিব অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন এবং তাঁর জটা থেকে বীরভদ্র এবং মহাকালী নামে দুটি দানব তৈরি করলেন এবং মহাকালী যজ্ঞ ধ্বংস করলেন এবং সেখানে অনেক অতিথিকে হত্যা করলেন। শিব সতীর মৃতদেহ নিয়ে নাচতে শুরু করলেন এবং নৃত্য করতে করতে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাদের ধ্বংসের ভয়ে অন্যান্য দেবতারা শিবকে শান্ত করার জন্য বিষ্ণুকে অনুরোধ করেছিলেন। এইভাবে, শিব উন্মত্ত হয়ে যেখানেই নাচতে নাচতে ঘুরে বেড়াতেন, বিষ্ণু তাঁদের পিছু পিছু যেতেন। তিনি সতীর মৃতদেহ ধ্বংস করার জন্য তাঁর চক্র সুদর্শনকে প্রেরণ করেছিলেন। সতীর দেহের টুকরো টুকরো হয়ে বিভিন্ন জায়গায় পড়েছিল। এরপর সতীর দেহ শেষ হয়ে গেলে, শিব মহাতপস্যায় বসলেন। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী সতীর দেহের টুকরো ভারতের ৫১টি স্থানে পড়েছিল। ঐ ৫১টি স্থান বর্তমানে শক্তিপীঠ নামে পরিচিত। উল্লেখ্য ঋষি বশিষ্ঠ এবং অরুন্ধতী ঐ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা দুই দানব আত্মার ক্রোধ এবং ধ্বংসলীলা থেকে অলৌকিক ভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন। যজ্ঞ ধ্বংস হওয়ার পর, শিব তাঁদের সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন যে বশিষ্ঠ, অত্রি, পুলস্ত্য, অঙ্গিরস, পুলাহু, ক্রতু, ভৃগু এবং মারিচী

পরের মন্বান্তরে যুগে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবেন। পুরাণে বলা হয়েছে পরের মন্বান্তরে বশিষ্ঠের পুনর্জন্ম হয়েছিল এবং ভারতবর্ষে একজন বিখ্যাত ঋষি হয়েছিলেন। তিনি অরুন্ধতীর পুনর্জন্মের আকসমলাকে বিয়ে করেছিলেন।

৭ মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং রাজা নিমি

একবার বিদেহের শাসক রাজা নিমি বশিষ্ঠকে তার গুরু এবং রাজপুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভারতীয় পুরাণে মনু ছিলেন প্রথম মানুষ। ভগবান বিষ্ণু তাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীকে পুনর্জন্ম করার এবং বিশ্বকে পুনর্নির্মাণের কাজ সম্পাদন করার জন্য শক্তি, জ্ঞান এবং সৃজনশীলতা ক্ষমতা দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। এইভাবে মনু ছিলেন প্রথম মানুষ এবং তিনি মানবজাতি সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত আইন বা নীতি মালা, মনু-স্মৃতি বা মনু সংহিতার কিংবদন্তি লেখক ছিলেন। রাজা নিমি হলেন প্রথম রাজা মনুর পৌত্র এবং ইক্ষ্বাকুর পুত্র। হিন্দু পুরাণ অনুসারে নিমি ছিলেন সূর্যবংশের (সৌর রাজবংশ) রাজা। তাকে বিদেহ রাজ্যের প্রথম রাজা হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং মিথিলার রাজা জনকের পূর্বপুরুষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

নিমি ছিলেন একজন সফল রাজা যাঁকে প্রজারা ভীষণ ভালোবাসত। একবার নিমি তার খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য ৫০০০ বছর দীর্ঘ একটি যজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি প্রায় সকল বিখ্যাত ব্রাহ্মণ এবং ঋষিদের আমন্ত্রণ জানান। নিমি তখন তার গুরু বশিষ্ঠের কাছে গিয়ে বলেন, "আমি একটি যজ্ঞ করছি। যেহেতু আপনি আমার গুরু, তাই দয়া করে আমার জন্য আপনি এই যজ্ঞটি করুন। এটি পাঁচ হাজার বছর স্থায়ী হবে এবং আমি দেবী অম্বিকাকে সন্তুষ্ট করতে চাই!" অম্বিকা দেবী হলেন ব্রহ্মাণ্ড এবং সকল প্রাণীর মা। উত্তরে বশিষ্ঠ বলেন, "ইন্দ্রদেবও এখন পাঁচশো বছর ধরে একটি যজ্ঞ করবেন। তিনি ইতিমধ্যেই আমাকে তাঁর যজ্ঞ করতে বলেছেন। ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ না করা পর্যন্ত আমাকে দিয়ে যজ্ঞ করার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। আপনি তত

বছর অপেক্ষা করুন। ইন্দ্রদেবের যজ্ঞ শেষ করার পরে, আমি আপনার যজ্ঞ সম্পন্ন করতে এখানে আসব।" বশিষ্ঠের উত্তরে রাজা নিমি ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে ওঠেন কারণ তিনি ইতিমধ্যেই দেবতা, দেবী এবং ঋষিদের সহ সকল অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর ৫০০০ বছর দীর্ঘ যজ্ঞের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থাও করে ফেলেছেন। তাই রাজা নিমি তাঁর যজ্ঞ ৫০০ বছর বিলম্বিত করার মতো অবস্থায় ছিলেন না! তিনি বশিষ্ঠকে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি ইন্দ্রদেবের যজ্ঞ এড়িয়ে যেন তাঁর যজ্ঞ শুরু করেন। কিন্তু, বশিষ্ঠ রাজার অনুরোধে রাজী না হয়ে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যান। তিনি স্বর্গে ভ্রমণ করেন এবং ইন্দ্র দেবের যজ্ঞ শুরু করেন। এদিকে, অপেক্ষা না করে, নিমি তাঁর গুরু বশিষ্ঠের পরিবর্তে গৌতম ঋষিকে নিয়ে যজ্ঞ শুরু করেন।

ইন্দ্র দেবের পাঁচশো বছরের যজ্ঞ সম্পন্ন করে বশিষ্ঠ ঋষি নিমির প্রাসাদে গেলেন। কিন্তু, রাজা নিমির প্রাসাদে প্রবেশ করে বশিষ্ঠ ঋষি দেখলেন যে অন্য এক ঋষি রাজার যজ্ঞ করছেন। রাজার ঐ অশোভন আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বশিষ্ঠ নিমিকে তিরস্কার করলেন এবং অভিশাপ দিলেন, "আমি আপনার গুরু; কিন্তু, আমাকে পরিত্যাগ করে আপনার যজ্ঞের জন্য অন্য একজনকে নিযুক্ত করেছন আপনি! আমি আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি যে আজ আপনার দেহ ধ্বংস হয়ে যাবে!" বশিষ্ঠের অভিশাপের কথা শুনে রাজা নিমি বললেন, "আপনি আমার গুরু, এবং আপনার উচিত ছিল প্রথমে আমার যজ্ঞ করা। কিন্তু, আপনি আমার চেয়ে ইন্দ্র দেবকে বেশি পছন্দ করলেন। আর এখন আপনি নিজে দোষ করে আমাকে দোষারোপ করছেন এবং অভিশাপ দিচ্ছেন। আমি যদিও কোনও ভুল করিনি তবুও আপনি আমাকে অভিশাপ দিয়েছেন। যেহেতু আপনি আমাকে বিনা কারণে অভিশাপ দিয়েছন, আমি আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি যে আপনার দেহ ধ্বংস হবে!"

বশিষ্ঠ বুঝতে পারছিলেন না যে তিনি কী করবেন। কয়েক ঘন্টার মধ্যে বশিষ্ঠ অশরীরী হয়ে গেলেন। তাঁর আত্মাই কেবল অবশিষ্ট

রইল। ঋষি বশিষ্ঠ সাহায্যের জন্য মরিয়া হয়ে অশরীরী আত্মা নিয়ে তাঁর পিতা ভগবান ব্রহ্মার কাছে গেলেন। তিনি ভগবান ব্রহ্মাকে তাঁর এবং রাজা নিমির মধ্যে যা ঘটেছিল সব ব্যাখ্যা করলেন এবং তারপর তাঁর সাহায্য চাইলেন। ব্রহ্মা ঋষি বশিষ্ঠকে মিত্র ও বরুণের দেহে প্রবেশ করে সেখানে থাকতে বললেন পুনর্জন্ম পেতে। বশিষ্ঠ প্রণাম করে বরুণলোকে গেলেন। শীঘ্রই তাঁর দেহ তাঁকে ছেড়ে চলে গেল এবং তাঁর আত্মা মিত্র ও বরুণের দেহে প্রবেশ করল।

(দেবীভাগবত পুরাণের কাহিনী)

৮- কামধেনুর যুদ্ধে মহর্ষি বশিষ্ঠের কাছে ঋষি বিশ্বামিত্র পরাজয়

কনৌজের মহান রাজা বিশ্বামিত্র একবার এক বনে শিকার অভিযানে বেরিয়েছিলেন। ঐ অভিযানের সময় তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী এবং তাঁর পুত্ররা তাঁর সাথে ছিলেন। কয়েক ঘন্টা শিকারের পর, রাজা তাঁর পুরো দলবল নিয়ে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে পৌঁছান। ঋষি বশিষ্ঠ তাঁদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "আপনারা সকলে স্নান করতে যান এবং স্নান থেকে ফিরে আসার পর আপনারা সকলে এখানে আহার গ্রহণ করবেন।" রাজা বিশ্বামিত্র এবং তাঁর সেনাবাহিনী দ্রুত স্নান করতে গেলেন। ফিরে এসে তাঁরা দেখতে পান তাঁদের সামনে একটি বিশাল ভোজের আয়োজন হয়েছে। ঐ দেখে তারা সকলে অবাক হয়ে গেলেন। অবাক হয়ে তাঁরা ভাবতে লাগল ঋষি বশিষ্ঠ বনের মধ্যে তাঁর ঐ ছোট্ট আশ্রমে এত অল্প সময়ের মধ্যে তাদের জন্য এত খাবার কীভাবে প্রস্তুত করলেন। চমৎকার খাবার উপভোগ করার পর, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে তাদের জন্য এত চমৎকার এবং বিশাল খাবার কোথা থেকে পেলেন।" বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন যে তাঁর গাভী কামধেনুই এই সমস্ত খাবারের ব্যবস্থা করেছে। বশিষ্ঠ বললেন, "কামধেনু আমাদের যা চাই তা দিতে সক্ষম। আমি একটা ভোজ চেয়েছিলাম, আর একটা ভোজ এসে গেল!"

বশিষ্ঠের ঐ উত্তর শুনে রাজা বিশ্বামিত্র কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন এবং ভাবলেন যে, কামধেনু গরুটি যদি এতই বিশেষ গুনের হয়, তাহলে কেন এটি বনে বসবাসকারী ঋষির কাছে থাকবে? ঐ বিশেষ গরু কামধেনু তারই হওয়া উচিত, কারণ তিনি ঐ দেশের শক্তিশালী রাজা। গরুটির উপর তাঁর বিশেষ নজর পড়ল। তিনি ঋষিকে বললেন, "এই গরুটি আমার হওয়া উচিত। আমি কামধেনুর বিনিময়ে আপনাকে এক লক্ষ সাধারণ গরু দেব।" বশিষ্ঠ তাঁর সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে তিনি কখনও কামধেনুকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না। রাজা বিশ্বামিত্র কামধেনুর বিনিময়ে পুরস্কারের পরিমাণ এক কোটি গরুতে বৃদ্ধি করলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ রাজার প্রস্তাবে রাজি হলেন না। ঋষি তখন রাজা বিশ্বামিত্রকে বললেন যে কামধেনু গরুটি তিনি ঈশ্বরের থেকে পেয়েছেন এবং তাই রাজার সমগ্র রাজ্যের বিনিময়েও তিনি এটি দিতে পারবেন না। ঋষি বিশ্বামিত্রকে আরো দৃঢ়ভাবে বললেন যে, যারা বেদান্তে ব্রহ্ম সত্য উপলব্ধি করেছেন কেবল তারাই এই ধরনের ইচ্ছা পূরণকারী গরু পাওয়ার অধিকার লাভ করতে পারে। ঋষির অস্বীকৃতিতে রাজা বিশ্বামিত্র ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন যে, রাজার অনুরোধ কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারে না বলে তিনি অপমানিত হয়েছেন। তিনি বলপ্রয়োগে গরুটিকে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

তারপর ক্রোধে আগুন হয়ে রাজা বিশ্বামিত্র গরুটিকে বন্দী করার জন্য তাঁর লোকদের নির্দেশ দেন। কামধেনু সৈন্যদের ঠেলে একপাশে ফেলে দিয়ে বশিষ্ঠের কাছে পালিয়ে যায়। কামধেনু বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করে, "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে সাহায্য করছেন না কেন? আমি বিপদে পড়েছি," বশিষ্ঠ অসহায়ভাবে উত্তর দেন "প্রিয় কামধেনু, বিশ্বামিত্রের বিশাল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারি না।" তখন কামধেনু বললেন, "তাহলে আমি আপনার সাধনা ও আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যবহার করে যোদ্ধা তৈরি করে রাজার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করব।"

কামধেনুর দেহ থেকে তৎক্ষণাৎ শত শত পালোয়ান যোদ্ধা বেরিয়ে এল। তারা বিশ্বামিত্রের বিশাল সেনাবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে

তাদের ধ্বংস করে দিল। বিশ্বামিত্র ভীত হয়ে শুধু দেখল যে তার বিশাল সেনাবাহিনী কামধেনুর সৈনবাহিনীর কাছে একেবারে অকেজো ও অক্ষম হয়ে পড়েছে। বিশ্বামিত্র ভয় ও ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে *ঐ* যোদ্ধাদের মারধর করতে শুরু করলেন। তার প্রতিক্রিয়ায়, কামধেনুর অন্যান্য অনেক যোদ্ধা তৈরি হয়ে গেল। এরপর বিশ্বামিত্রের পুত্ররা কামধেনু যোদ্ধাদের উপর প্রচণ্ডভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হল। এরপর, অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধের সাথে, বিশ্বামিত্র ঋষি বশিষ্ঠের সাথে যুদ্ধ শুরু করেন, যিনি তার *ব্রহ্মদণ্ড* সামনে রাখলেন। অবশেষ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ঋষি বশিষ্ঠ এক অক্ষরের একটি মন্ত্র উচ্চারণ করলে বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের অস্ত্র ভস্মে পরিণত হয়। বিশ্বামিত্রের সমস্ত তীর এবং অস্ত্র বশিষ্ঠের *ব্রহ্মদণ্ড* দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায় এবং তিনি অরক্ষিত অবস্থায় নীচে পড়ে যান। বশিষ্ঠ যখন *ব্রহ্মদণ্ড* দিয়ে রাজাকে আঘাত করার জন্য উদ্দত হলেন, রাজা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন যে তিনিও শেষ হয়ে যাবেন। অবশেষে, রাজা ব্রহ্মর্ষির শক্তি বুঝতে পেরে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। দয়ালু ও করুণাময় ঋষি বশিষ্ঠ রাজাকে প্রত্যাহার করে ক্ষমা করে দিলেন। এটাই ছিল বশিষ্ঠের অসাধারণ যোগ-সাধনার শক্তি। বিশ্বামিত্র সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে হতাশায় কনৌজে ফিরে গেলেন। ঋষি বশিষ্ঠ এবং তাঁর দেবী-শক্তি সম্পন্না গাভী কামধেনুর সাথে যুদ্ধে, রাজা বিশ্বামিত্র এক পুত্র ছাড়া অন্য সকল পুত্রকে হারিয়েছিলেন।

(উৎস; হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি পত্রিকা/www.sanskritimagazine.com/sage-vishvamitra-the-gayatri-mantra)

৯; মহর্ষি বশিষ্ঠের কাছে ঋষি বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় পরাজয়

ঋষি বশিষ্ঠের কাছে রাজা বিশ্বামিত্রের পরাজয়ের পর তাঁর একমাত্র অবশিষ্ট পুত্রকে সিংহাসন অর্পণ করেন। এরপর রাজ্য ত্যাগ করে গভীর তপস্যার জন্য তিনি হিমালয়ে চলে যান। সেখানে তিনি দীর্ঘকাল গভীর তপস্যায় মগ্ন হয়ে যান। অবশেষে, ভগবান শিব তাঁর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে বিশ্বামিত্রের সামনে উপস্থিত হন। ভগবান

শিব তাঁকে বর প্রার্থনা করার উপদেশ দেন। বশিষ্ঠের সাথে প্রতিশোধ নিতে আগ্রহী হয়ে বিশ্বামিত্র সমস্ত অস্ত্রের জ্ঞান চাইলেন ভগবান শিবের কাছে। শিব সেই বর প্রদান করেন এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে যান।বিশ্বামিত্র এরপর তাঁর পুত্রহারার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বশিষ্ঠের আশ্রমের দিকে রওনা হন। আশ্রমে পৌঁছানোর সাথে সাথে তিনি তাঁর নতুন অর্জিত অস্ত্র ব্যবহার করে সেখানে আগুন ধরিয়ে দেন। আশ্রমে বসবাসকারী সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যেতে শুরু করেন। বশিষ্ঠ তাঁর আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বামিত্রকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। বশিষ্ঠ তাঁকে বলেন, "তুমি দুষ্ট ও বোকা, আমার আধ্যাত্মিক আশ্রম ধ্বংস করার সাহস তুমি কি করে করলে? এর জন্য আমি তোমাকে হত্যা করব!" বশিষ্ঠ চিৎকার করে তাঁর শক্তিশালী ব্রহ্ম-লাঠি অস্ত্রটি আহ্বান করেন। বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠের দিকে একের পর এক অস্ত্র ছুঁড়তে শুরু করলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্রের সব অস্ত্র বশিষ্ঠের ব্রহ্ম-লাঠিতে ধ্বংস হয়ে গেলে। অবশেষে, বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্রের ডাক দিলেন, তা ছিল ব্রহ্মাস্ত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। তবে, বশিষ্ঠের ব্রহ্ম-লাঠিতে তাও ধ্বংস হয়ে গেল।

বশিষ্ঠের ব্রহ্ম-লাঠিতে ধ্বংস বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মাস্ত্র

বশিষ্ঠের আধ্যাত্মিক শক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বামিত্রের অস্ত্র কিছুই করতে পারবে না বুঝতে পেরে, বিশ্বামিত্র নিজেকে উচ্চতর তপস্যায় উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ব্রহ্মঋষি হওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হয়ে তিনি আবার কঠোর তপস্যা শুরু করেন। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মঋষি হওয়ার জন্য সুদীর্ঘ সাধনার যাত্রা পথে অনেক বাধা ছিল। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে অবশেষে কঠোর তপস্যার পর বিশ্বামিত্র ব্রহ্মঋষি হয়ে ওঠেন এবং বশিষ্ঠ তাঁকে ব্রহ্মঋষি হিসেবে গ্রহণ করেন। ঋষি বশিষ্ঠ হলেন ঋষিদের ঋষি।

(সূত্র- https://glorioushinduism.com/2021/01/25/vashishta)]

১০; বিশ্বামিত্র কতৃক বশিষ্ঠের ১০০ পুত্রের হত্যার কাহিনী;

একবার ঋষি বশিষ্ঠ যখন জানতে পারেন যে তাঁর সমস্ত পুত্রকেই বিশ্বামিত্র হত্যা করেছেন। বশিষ্ঠ এবং অরুন্ধতী নীরবে তাদের বিশাল শোকে পর্বতের ন্যায় অবিচল হয়ে পড়েন। কিন্তু সেই বিশাল শোক সহ্য করতে না পেরে বশিষ্ঠ এবং অরুন্ধতী উভয়েই আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। বশিষ্ঠ সহধর্মিণী, অরুন্ধতী ছিলেন ভারতের সতী নারীদের মধ্যে মণিরত্নের মতো পবিত্র ও মহীয়সী। বিশ্বের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদের একজন, মহান ঋষি বশিষ্ঠ শত্রুকে ধ্বংস করার পরিবর্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। লিঙ্গ পুরাণে বলা হয়েছে যে, শ্রদ্ধেয় ঋষি দম্পতি মৃত্যু বরন করতে পাহাড়ে আরোহণ করে নীচে ঝাঁপ দিয়েছিলেন । কিন্তু তারা অক্ষত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। পৃথিবী অধিপতি তখন তাঁদেরকে জগতের মঙ্গলের জন্য বেঁচে থাকার জন্য অনুরোধ করেন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক বশিষ্ঠ তাঁর সমুদ্রের মতো শোককে দ্রুত বশীভূত করে বুঝতে পেরেছিলেন যে আত্মা অবিনশ্বর, অমর এবং পবিত্র এবং দেহ ও মনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিজ্ঞতা মরীচিকার জলের মতো অবাস্তব। বশিষ্ঠের এই সমস্ত বৈদান্তিক চিন্তাভাবনা রামায়ণে তাঁর এবং শ্রী রামের মধ্যে সংলাপে উঠে এসেছে বশিষ্ঠ রামায়নে যা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর ঋষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে ক্ষমা করেছিলেন।

৯ ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র

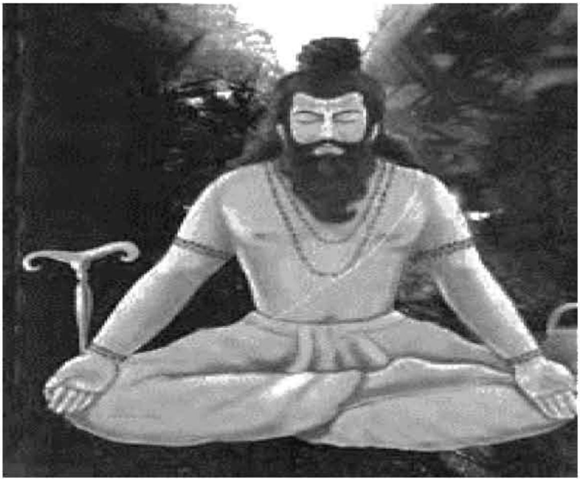

পুরাণ কাহিনী অনুসারে, **বিশ্বামিত্র**_একজন প্রভাবশালী রাজা থেকে ব্রহ্মর্ষি অর্থাৎ একজন মহান ঋষি হয়েছিলেন। তাঁর এই বিশাল রূপান্তরকামী যাত্রা এবং বৈদিক সাহিত্যে, বিশেষ করে গায়ত্রী মন্ত্রে তাঁর গভীর অবদানের কারণে ঋষি বিশ্বামিত্র হিন্দুধর্মে অত্যন্ত বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। ঋষি বশিষ্ঠের সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর সাধনাকে ঘিরে পুরাণে অনেক কাহিনী উল্লেখ রয়েছে। ঋষি বশিষ্ঠের সাথে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিছু পৌরানিক কাহিনী মহর্ষি বশিষ্ঠের জীবন কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বামিত্র কীভাবে কঠোর সাধনা দ্বারা পরাক্রমশালী রাজা থেকে ঋষিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, সেই পুরান কাহিনী মূলত এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশ্বামিত্র যদিও একজন প্রতাপশালী রাজা হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ ঐশ্বরিক শক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁকে তাঁর রাজ্য ত্যাগ করতে এবং কঠোর তপস্যা বা সাধনার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনে পরিচালিত করেছিল। তাঁর ঐ কঠোর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে তিনি ভারতের সাতজন ব্রহ্মর্ষির মধ্যে অন্যতম

হয়েছিলেন। যে সকল ঋষিদের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং জ্ঞানী হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তিনি তাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

প্রসঙ্গত, হিন্দুশাস্ত্রে সাতজন ব্রহ্মর্ষি হলেন ভৃগু, অঙ্গিরস অত্রি, বিশ্বামিত্র, কশ্যপ, বশিষ্ঠ এবং শান্ডিল্য। তবে, ভিন্ন তথ্য অনুসারে ব্রহ্মঋষিদের আর একটি ভিন্ন তালিকা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জৈমিনিয় ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রদত্ত সাত ঋষির প্রাচীনতম আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত তালিকা অনুযায়ী সাতজন ব্রহ্মর্ষি হলেন অগস্ত্য, অত্রি, ভরদ্বাজ, গৌতম, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র। আবার বৃহদারণ্যক উপনিষদের তালিকা অনুযায়ী সাতজন ব্রহ্মর্ষি হলেন অত্রি, ভরদ্বাজ, গৌতম, জমদগ্নি, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র। দেখা যায়, সমস্ত তালিকায় ঋষি বিশ্বামিত্র সাতজন ব্রহ্মর্ষির মধ্যে একজন, যিনি সত্যদ্রষ্টা হিসেবে সর্বোচ্চ শ্রেণীর ঋষি। উল্লেখ্য, ব্রহ্মর্ষি হলেন সেই ঋষি যিনি ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান এবং ব্রহ্মের সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক জ্ঞান সাধনার দ্বারা অর্জন করেছেন। (উৎস; ভারতীয় পুরান ও উইকিপিডিয়া)।

ঋষি বিশ্বামিত্রের প্রাথমিক জীবন

মহাকাব্য রামায়ণ অনুসারে, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র 'কৌশিক' নামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং একজন মহান ঋষি রাজা কুশের প্রপৌত্র ছিলেন। তিনি কুশের চার পুত্রের একজন গাধির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কুশ পরিবারের বংশধর হিসেবে তাঁকে কৌশিকও বলা হত। চন্দ্রবংশী রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত। কৌশিক তাঁর পিতার উত্তরসূরী হয়ে তাঁর রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। মহর্ষি ঋচিকার সাথে তাঁর বোনের বিবাহের পর, তাঁর পিতা গাধি বিশ্বামিত্রকে কন্যাকুব্জের (বর্তমানে উত্তর ভারতে অবস্থিত কনৌজ) রাজা করেন এবং বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার জীবনযাপনের জন্য রাজ্য ত্যাগ করেন। বিশ্বামিত্র অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সফল রাজা ছিলেন। তিনি তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনে এক মোড় আসে যখন ঋষি বশিষ্ঠের সাথে তাঁর দেখা হয়। তিনি প্রতাপশালী থেকে প্রভাবশালী ঋষিতে রূপান্তরিত হন।

ঋষি বিশ্বামিত্র রচিত গায়ত্রী মন্ত্র;

ঋষি বিশ্বামিত্র মহান গায়ত্রী মন্ত্র রচনা করেছিলেন। তিনি ঋগ্বেদের মণ্ডল ৩-এর বেশিরভাগ অংশ রচনা করেছিলেন। গায়ত্রী মন্ত্রের মাহাত্ম্যকে ওম মন্ত্রের সমতুল্য বলে মনে করা হয়। গায়ত্রী মন্ত্র হল সূর্যদেব সাবিত্রীর প্রশংসায় একটি প্রার্থনা। উপনিষদে গায়ত্রী মন্ত্রকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের আচার বা ক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এবং ভাগবত গীতায় একটি ঐশ্বরিক কবিতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। গায়ত্রী মন্ত্র হল একটি প্রাচীন বৈদিক মন্ত্র যা সবচেয়ে শক্তিশালী এবং আধ্যাত্মিক মন্ত্রগুলির মধ্যে একটি। গায়ত্রী মন্ত্র পাঠের বিশেষ তাৎপর্য হল জ্ঞানলাভ, প্রশান্তি, একাগ্রতার শক্তি, ব্রহ্মজ্ঞানের উচ্চতর জ্ঞান অর্জন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, নেতিবাচক শক্তি থেকে সুরক্ষা। গায়ত্রী মন্ত্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু মন্ত্র যা বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়। এটি বেদ থেকে নেওয়া এবং এর অর্থ হলো, "আমরা সেই দেবতাকে (সৃষ্টিকর্তা) স্মরণ করি যিনি আমাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রদান করেন এবং যিনি আমাদের সত্যের পথে পরিচালিত করেন।" মন্ত্রটি হলো: "**ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥**" এর অর্থ;

- **ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ:** ভূঃ (পৃথিবী), ভুবঃ (মধ্যম আকাশ), স্বঃ (উচ্চ আকাশ)
- **তৎ সবিতুর্বরেণ্যং:** আমরা সেই সবিতুরকে (সৃষ্টিকর্তা) স্মরণ করি যিনি সকলের দ্বারা প্রশংসিত।
- **ভর্গো দেবস্য ধীমহি:** আমরা সেই সৃষ্টিকর্তার প্রকাশ বা তেজকে ধ্যান করি।
- **ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ:** আমরা সেই সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন।

গায়ত্রী মন্ত্রের তাৎপর্য:

জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধির উন্নতি লাভের জন্য মন্ত্রটি জপ কর হয়। এটি শুভ শক্তিকে আকর্ষণ করে এবং অশুভ শক্তিকে দূর করে। এই মন্ত্র জপে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মানসিক শান্তি লাভ হয়। গায়ত্রী মন্ত্রটি আধ্যাত্মিকতা এবং হিন্দু সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে এবং এটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, যেমন - পূজা, হোম, এবং বিশেষ দিনেএটি বিশেষভাবে জপ করা হয়।

বিশ্বামিত্রের গায়ত্রী মন্ত্রের রচনার পটভূমি;

ঋষি বিশ্বামিত্র গায়ত্রী মন্ত্রের রচনার ক্ষেত্রে একটি বিশাল পটভূমি রয়েছে। সেই পটভূমি বিশ্বামিত্রের কঠোর সাধনার সঙ্গে যুক্ত। ইতিমধ্যে, 'মহর্ষি বশিষ্ঠ' অধ্যায়ে বশিষ্ঠের ঈশ্বর প্রদত্ত গাভী 'কামধেনু' নিয়ে ঋষি বশিষ্ঠের সাথে রাজা বিশ্বামিত্রের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কাহিনী জেনেছি। সেই যুদ্ধে রাজা বিশ্বামিত্রকে ঋষি বশিষ্ঠের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছিল । দয়ালু ঋষি বশিষ্ঠ রাজাকে ক্ষমা করেছিলেন। এই কাহিনী আগের অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ ঘটনায় রাজা বিশ্বামিত্র ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিলেন এবং তাই তিনি মনে মনে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন। এর জন্য বিশ্বামিত্রকে অবশ্যই বশিষ্ঠ ঋষির চেয়েও বেশি ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভ করতে হবে। বিশ্বামিত্র বুঝে ছিলেন যে ঋষি, মহাঋষি ব্রহ্মর্ষির তেজের সামনে তাঁর রাজ্য, শাসন, সম্পদ, ক্ষমতা এবং তাঁর বিশাল সম্পত্তি কিছুই নয়। তাঁর মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে সত্যের জ্ঞানের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। তাই তিনি রানী, পুত্র এবং রাজ্য ত্যাগ করে হিমালয়ে তপস্যা অনুশীলনের জন্য চলে গেলেন*। তিনি যোগ ,* ধ্যান এবং তপস্যা সম্পর্কে কিছুই না জেনে এক অচেনা অঞ্চলে ছিলেন । আরাম-আয়েশের অভাবে তিনি হতাশ ও দুঃখী বোধ করছিলেন। কিন্তু তাঁর অহংকার তাঁকে ঋষি বশিষ্ঠের নির্দেশনা গ্রহণ করতে বাধা দিয়েছিল। ঋষি বশিষ্ঠকে পরাজিত করতে জ্ঞান অর্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে কঠোর সাধনায় যেতে বাধ্য করল। তাই বিশ্বামিত্র হিমালয়ে কঠিন সাধনায় মগ্ন হলেন। বিশ্বামিত্র

হিমালয়ের শান্ত উচ্চভূমিতে ভগবান শিবের মতো মহাজাগতিক আত্মার উপর তীব্রভাবে ধ্যান অনুশীলন করতে লাগলেন। তিনি মনকে শরীর থেকে আলাদা করতে সক্ষম হলেন। ধীরে ধীরে তিনি সাধনার উচ্চ মার্গে পৌঁছে যান; ফলে তাঁর ঐশ্বরিক চেতনার উচ্চ ক্ষেত্রগুলিকে প্রস্ফুটিত হয়। স্বর্গীয় দেবতা গণ তাঁর এই কঠোর সাধনায় ভীত হয়ে পড়েন কারণ বিশ্বামিত্র স্বর্গের দেবতাদের সিংহাসন দাবী করতে পারেন। এরপরে যে ঘটনাগুলো ঘটল সেগুলি সত্যি ভীষণ বিস্ময়কর।

বিশ্বামিত্রের অসাধারন ত্যাগ ও তপস্যা

আগে যেমনটি জেনেছি, ঋষি বশিষ্ঠের কাছে পরাজিত হওয়ার পর, রাজা বিশ্বামিত্র সিংহাসন ত্যাগ করে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রের হাতে তাঁর রাজ্য হস্তান্তর করে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। সেই লক্ষ্যে তিনি রাজ্য ত্যাগ করেন এবং কঠোর ধ্যান ও তপস্যা শুরু করেন। তাঁর জীবনের সেই অংশটি ছিল অত্যন্ত কঠোর, মর্যাদাপূর্ণ এবং মহিমান্বিত। তাঁর কঠোর তপস্যা ও সাধনায় নানা ধরণের শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করেন। তাঁর সেই কঠোর সাধনার তীব্রতা দেখে কেবল সাধারণ মানুষই নয়, স্বর্গের দেবতারাও ভীত হয়েছিলেন। সাধনায় তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি এতটাই বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে স্বর্গের দেবতারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর তপস্যা এবং ধ্যানকে ব্যাহত করার চেষ্টা করেছিলেন। এই বিষয়ে দেবরাজ ইন্দ্রদেব কিছু ষড়যন্ত্র করেছিলেন। রাজা বিশ্বামিত্রকে তাঁর কঠোর ধ্যান থেকে বিচ্যুত করার জন্য তিনি স্বর্গের কিছু সুন্দরী মহিলাকে বিশ্বামিত্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন। প্রথমে দেবরাজ ইন্দ্র সাধনায়মগ্ন বিশ্বামিত্রের কাছে *এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য, মেনকাকে প্রেরণ করেন।*

ইন্দ্র মেনকাকে রাজা বিশ্বামিত্রকে প্রলুব্ধ করার জন্য চৌষট্টিটি কলা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, উইকিপেডিয়া তথ্য অনুসারে, চৌষট্টি কলা বলতে বাৎসায়নের কামসূত্র গ্রন্থে বর্ণিত ৬৪ প্রকার কার্যক্রমকে বোঝায়। নর-নারীর দাম্পত্য জীবনকে সুখী, তৃপ্তিকর এবং সন্তোষজনক করার জন্য এসব আচার-বিধির

ওপর বাৎসায়ন গুরুত্ব আরোপ করেন। (চৌষট্টি কলার মধ্যে কয়কটি উল্লেখযোগ্য কলা হল-গীতবিদ্যা, বাদ্যবিদ্যা, নৃত্যবিদ্যা, নাট্যবিদ্যা, আলেখ্যবিদ্যা, বিশেষকচ্ছেদ্যবিদ্যা, তণ্ডুলকুসুম-বলিবিকার, পুষ্পাস্তরণ ইত্যাদি।

মেনকা ইন্দ্রের পরামর্শ অনুযায়ী সমস্ত কলা ও কার্য দৃঢ়তার সাথে প্রদর্শন করলেন। অবশেষে মেনকা তাঁর অসাধারণ কলা প্রদর্শন করে বিশ্বামিত্রের তীব্র ধ্যান ভাঙতে সফল হলেন। মেনকার সৌন্দর্য এবং কলাকর্ম বিশ্বামিত্রের দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রজ্বলিত করে এবং তাঁকে তার তপস্যার লক্ষ্য ভুলে যেতে বাধ্য করে। তপস্যা ভুলে গিয়ে বিশ্বামিত্র মেনকার সাথে সাংসারিক জীবন শুরু করেন। কয়েক মাস একসাথে কাটানোর এবং একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করার পর মেনকা একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। সমাজের অনুশাসনের ভয়ে তাঁরা তাদের কন্যা সন্তানকে পরিত্যাগ করেন। তাঁদের কন্যা পরবর্তীতে একজন বিখ্যাত মহিলা হয়ে ওঠেন যিনি শকুন্তলা নামে পরিচিত ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তাঁর পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হলেও শকুন্তলা তার সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা এবং রাজা দুষ্যন্তের সাথে তার প্রেমকাহিনীর জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। শকুন্তলার প্রেমকাহিনী কালিদাস তাঁর অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন। শকুন্তলার প্রেমকাহিনী একটি ভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী। আসুন আমরা এখন শুধু বিশ্বামিত্রের তপস্যার কথা বলি। আমরা জেনেছি, বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠকে পরাজিত করার লক্ষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে কঠোর তপস্যায় বসেছিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের ষড়যন্ত্রে স্বর্গের অপ্সরা মেনকা বিশ্বামিত্রের সেই কঠোর তপস্যা ভঙ্গ করেন।

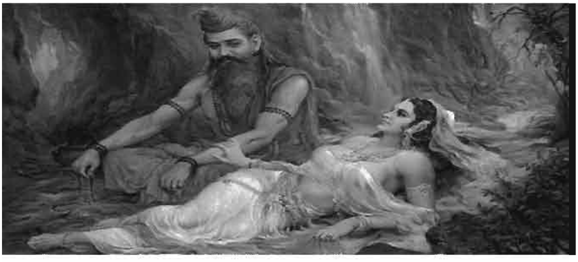

মেনকার সৌন্দর্য ও নৃত্য বিশ্বামিত্রের দেহগত ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করেছিল

কয়েক বছর পর বিশ্বামিত্র বুঝতে পারলেন যে মেনকাকে দেবতারা তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মেনকাকে স্বর্গে ফিরে যেতে বললেন। এরপর বিশ্বামিত্র হিমালয়ের কৌশিকী নদীর তীরে তপস্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর তাঁর তপস্যা এত তীব্র ছিল যে দেবতারা আবার বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁরা বিচলিত হয়ে ব্রহ্মার সাহায্য পার্থী হন। ব্রহ্মা তাঁদের বলেন যে তপস্যাবলে বিশ্বামিত্র মহর্ষি হওয়া উচিত। এরপর ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে মহর্ষির মর্যাদা দান করেন। এরপর মহর্ষি বিশ্বামিত্র ভগবান ব্রহ্মার সামনে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি তাঁর সমস্ত আবেগকে বশ করবেন এবং ব্রহ্মের জ্ঞান অর্জন এবং আরও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের জন্য আরও কঠোর তপস্যা এবং ধ্যান শুরু করবেন। ভগবান ব্রহ্মা তাকে তাঁর সমস্ত শারীরিক ইন্দ্রিয়গুলির উপর আয়ত্ত অর্জনের পরামর্শ দেন। তারপর মহর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হওয়ার জন্য আরও কঠোর তপস্যা এবং ধ্যান শুরু করেন।

বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হওয়ার জন্য ধ্যানে মগ্ন হলেন।

তিনি তাঁর তপস্যা আরও তীব্র করে তুললেন। গ্রীষ্মকালে, তিনি জ্বলন্ত আগুনের মাঝখানে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। শীতের তীব্র ঠান্ডায় এবং বর্ষাকালে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে তিনি তাঁর তপস্যা চালিয়ে যেতেন। আর শীতকালে, তিনি হিমবাহের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতেন। দেবতারা আবারও বিব্রত হলেন। বিশ্বামিত্রের তপস্যা ব্যাঘাত করার জন্য ইন্দ্র রম্ভা নামে আরও একটি অপ্সরাকে বিশ্বামিত্রের তপস্যা ক্ষেত্রে পাঠান। ইন্দ্র একটি ডালে বসে কোকিলের সুরে বসন্তের গান গেয়ে প্রেমময় অতি সুন্দর পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। আশ্রমের চারপাশে ইন্দ্র নিজেই একটি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। বিশ্বামিত্রকে প্রেমে প্রলুব্ধ করার জন্য রম্ভা রাজার সামনে প্রলোভনসঙ্কুলভাবে নাচতে শুরু করেন। এরপর অপ্সরা রম্ভা ধীরে ধীরে বিশ্বামিত্রের

কাছে আসেন। বিশ্বামিত্র চোখ খুললেন এবং সুন্দরী রম্ভাকে দেখতে পেলেন। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তিনি রম্ভার প্রতি কোনও আকর্ষণ অনুভব করলেন না। চোখ খোলার সাথে সাথেই তিনি অপ্সরা রম্ভার উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। তিনি রম্ভাকে অভিশাপ দিলেন এবং তাকে পাথরে পরিণত করলেন। তিনি বললেন, “রম্ভা, আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি যে তুমি পাথরে পরিণত হবে। একজন ব্রাহ্মণ এসে তোমাকে স্পর্শ না করা পর্যন্ত তুমি ১০,০০০ বছর ধরে পাথর হয়েই থাকবে।” রম্ভার প্রতি বিশ্বামিত্রের ঐ অভিশাপের কথা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু, বিশ্বামিত্রের ঐ ক্রোধ প্রদর্শন তাঁর তপস্যার শক্তি নষ্ট করে দিল। বিশ্বামিত্র হতাশ হয়ে পড়লেন।

এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে বিশ্বামিত্র তাঁর তপস্যা পুনরায় আরো কঠোর করলেন। এরপর থেকে তিনি ক্রোধ এবং বিকৃত ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন ত্যাগ করার শপথ নিলেন। তিনি সম্পূর্ণ নীরবতা বেছে নিলেন, খাদ্য ও জল ত্যাগ করলেন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস কমিয়ে আনলেন। তিনি প্রখর সূর্যের নীচে একটি তাকের উপর জ্বলন্ত আগুনের মাঝখানে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, বর্ষাকালে তার উপর মুষলধারে বৃষ্টিপাত সহ্য করতেন। শীতকালে, তিনি হিমশীতল নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তপস্যার তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিলেন। তার তীব্র তপস্যা ত্রিলোক বাসীদের অস্বস্তিতে ফেলেছিল। দেবতারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন সাধনায় সিদ্ধ হলে তিনি ত্রিলোক ধ্বংস করে দেবেন। তাই বিশ্বামিত্রের সামনে অনেক প্রলোভন আনতে লাগলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র যেকোনো ধরণের প্রলোভনের বিরুদ্ধে আরও সতর্ক হয়েছিলেন। বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যা দেখে ধনের দেবতা কুবের আরও ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। বিশ্বামিত্রকে প্রলুব্ধ করার জন্য এবং তার কঠোর তপস্যা থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য কুবের তার এক দাসী বিদ্যুৎপ্রভাকে পাঠালেন। বিশ্বামিত্র তাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করলেন। এতে তাঁর অহংকার আহত হয় এবং তাই সে একটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। বিশ্বামিত্র তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং তাকে তাড়িয়ে

দিয়েছিলেন। তখন তাঁর কঠোর তপস্যা থেকে তাঁকে বিরক্ত করার এবং বিভ্রান্ত করার জন্য আর কেউ থাকল না। তিনি তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে সাধনার পথ ক্ষুরের ধারের উপর হাঁটার মতো কঠিন; তাই তাঁর লক্ষ্য পথে পৌঁছানোর জন্য তিনি আরও দৃঢ়তার সাথে সাধনায় এগিয়ে যাওয়ার শপথ নিয়েছিলেন। তিনি একটি নতুন হিমালয়ের শিখরে চলে যান, যেখানে তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁর নিঃশ্বাস ধরে রেখেছিলেন এবং মহান আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করেছিলেন।

রাজা বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষি হওয়া

বিশ্বামিত্র ভয়ঙ্কর কঠোর তপস্যা অনেক এগিয়ে গেলেন। তিনি যখন নিশ্চিত হলেন যে তিনি সকল ইন্দ্রিয় অনুভূতি জয় করেছেন, তখন তিনি খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। খাওয়ার ঠিক আগে ইন্দ্র ভিক্ষুকের রূপে তাঁর পরীক্ষা করতে এলেন। ভিক্ষুক খাবার চাইলেন। বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ ভিক্ষুককে তাঁর খাবার দিলেন। এরপর বিশ্বামিত্র তপস্যা চালিয়ে গেলেন। দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মার কাছে দেবরাজ ইন্দ্র প্রার্থনা করলেন, "যদি বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মর্ষি মর্যাদা না দেওয়া হয় এখন, তাহলে তিনি ত্রিলোক ধ্বংস করে দেবেন। দয়া করে তাঁকে ব্রহ্মর্ষির মর্যাদা দিন।" তখন ব্রহ্মা বললেন, "আমি তাঁকে ব্রহ্মর্ষির মর্যাদা দান করব। তিনি এর যোগ্য,"। ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ব্রহ্মর্ষির মর্যাদা দিলেন।

ব্রহ্মা তাকে বলেছিলেন যে তিনি একজন মহর্ষির মতো দুর্দান্ত যোগশক্তি অর্জন করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মারসি হওয়ার জন্য,তাঁকে ঋষি বশিষ্ঠের আশীর্বাদ নিতে হবে। ব্রহ্মা মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে মহর্ষি বশিষ্ঠের সাথে দেখা করতে বলেন। তাঁর শত্রুর কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে হবে এটা সহ্য করতে না পেরে বিশ্বামিত্র হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন যে যতদিন ঋষি বশিষ্ঠ জীবিত থাকবেন, তিনি কখনও ব্রহ্মর্ষি হতে পারবেন না। তাই বশিষ্ঠকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্র একটি বড় পাথর সংগ্রহ করে মধ্যরাতে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে গেলেন। তিনি অপেক্ষা করতে

লাগলেন কখন ঋষি সকালের ধ্যানের জন্য নদীতে আসবেন, কখন তিনি তার মাথায় বড় পাথরটি ছুঁড়ে মারবেন। আশ্রমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনি শুনতে পেলেন যে বশিষ্ঠ তার স্ত্রী অরুন্ধতীকে বলছেন যে বিশ্বামিত্র একজন মহান ব্যক্তি এবং তিনি ব্রহ্মর্ষির মর্যাদা অর্জনের কাছাকাছি। কিন্তু এটি কেবল তখনই ঘটতে পারে যদি বিশ্বামিত্র তার সাথে দেখা করতে আসেন। "কিন্তু তুমি কি তাকে আশীর্বাদ করবে?" অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলেন। "অবশ্যই, আমি করব", ঋষি বশিষ্ঠ বললেন। এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র লজ্জিত বোধ করলেন। তিনি ভেতরে ছুটে গেলেন এবং বশিষ্ঠ ঋষির সামনে প্রণাম করলেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বললেন "এখন তুমি ব্রহ্মর্ষি হয়ে গেছো। তুমি একে একে ক্রোধ, কাম, লোভ, আসক্তি এবং অহংকারকে জয় করেছো। তুমি যে শেষ বাধা অতিক্রম করেছো তা হল ঈর্ষা। তুমি এটাও দেখিয়েছো যে মানুষের আত্মা অজেয় এবং কোন পরাজয় স্বীকার করে না", এরপর বশিষ্ঠ যখন তাঁর কপাল স্পর্শ করলেন, তখন বিশ্বামিত্রের তৃতীয় চোখ খুলে গেল এবং তিনি সাতটি ছন্দ দেখতে পেলেন যার সাহায্যে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় তাঁর কাছে পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র প্রকাশিত হয়েছিল। গায়ত্রী মন্ত্র বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা ক্রেছি।

রামচন্দ্র কর্তৃক অসুর বিনাশের পর ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের বৈদিক যজ্ঞের সমাপ্তি;

ব্রহ্মর্ষি হওয়ার পর বিশ্বামিত্র পৃথিবীর সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য এক বৈদিক যজ্ঞ শুরু করেন। কিন্তু তাঁর বৈদিক যজ্ঞের প্রক্রিয়া আসুরিক শক্তি দ্বারা বারে বারে বাধাগ্রস্ত হয়। বিশ্বামিত্র আসুরিক শক্তি ধ্বংস করার জন্য তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাঁর ধ্যান এবং অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে সমগ্র আসুরিক শক্তি এক তরুণ রাজপুত্র রামচন্দ্র দ্বারা ধ্বংস হবে। রামচন্দ্র পরবর্তীতে রঘু বংশের রাজা এবং শাসক হয়েছিলেন। আমরা জানি, রামচন্দ্র হলেন হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর অবতার এবং তাঁকে রামায়ণের আদর্শ পুরুষ এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে

বিবেচনা করা হয়। যখন ঋষি বিশ্বামিত্র বুঝতে পারেন যে রামচন্দ্র রাক্ষসদের বিনাশ করবেন, তখন তিনি অযোধ্যায় যান এবং রামের পিতা দশরথকে রাজি করান যাতে আসুরিক শক্তি ধ্বংস করার জন্য রাজা দশরথ তাঁর তরুণ রাজপুত্র রামকে তাঁর সাথে পাঠান।

মারীচ এবং সুবাহু নামক দুই শক্তিশালী রাক্ষসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য বিশ্বামিত্র রাজা দশরথকে অনুরোধ করেন রামকে তাঁর সাথে পাঠাতে। যেহেতু সেই সময় রামের বয়স মাত্র ষোল বছর, তাই রাজা দশরথ ঋষির অনুরোধে খুবই বিরক্ত হন। তাই রাজা দশরথ তাঁর পুত্র রামকে এই উদ্দেশ্যে ঋষির সাথে পাঠাতে অস্বীকার করেন। ঋষি বিশ্বামিত্র অত্যন্ত কৃরুদ্ধ হন কিন্তু অবশেষে ঋষি বশিষ্ঠের হস্তক্ষেপে রাজা দশরথ শান্ত হন। তিনি দশরথকে বিশ্বামিত্রের সাথে রামকে পাঠাতে রাজি করান, নিশ্চিত করেন যে বিশ্বামিত্রের শক্তি এবং রামের নিজস্ব ক্ষমতা তাঁকে অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল করবে। অবশেষে, দশরথ রাজি হন এবং রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্রের সাথে যান। তাদের ভ্রমণের সময়, বিশ্বামিত্র তরুণ রাজপুত্রদের 'বল অতিবল বিদ্যা' নামে একটি গোপন জ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করেন, যার অনুশীলন তাদের সর্বদা প্রাণবন্ত রাখত।

রাক্ষসদের বধ করতে রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যাচ্ছেন

যাত্রাপথে ঋষি বিশ্বামিত্রের রাম ও লক্ষণকে দেশের আইন, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অনেক বৈদিক মন্ত্র, উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র,

বিশেষ করে মন্ত্র দ্বারা মোহিত অত্যন্ত শক্তিশালী তীরের ব্যবহার ইত্যাদি অনেক বিষয় শিক্ষা দিয়েছিলেন। ঋষি বিশ্বামিত্রের সাহায্যে রাম ও লক্ষণকে যাত্রাপথে এক রাক্ষসীকে সফলভাবে হত্যা করার পর রাম ও লক্ষণ অনেক শক্তিশালী অস্ত্রও পেয়েছিলেন। ঋষি বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে রাম ও লক্ষণ যুদ্ধ-বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণও লাভ করেন এবং বৈদিক জ্ঞানে তাঁরা পণ্ডিত হয়ে উঠেন। বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষণকে স্বর্গীয় অস্ত্র (দেব-অস্ত্র) সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করেন এবং তাঁদেরকে উচ্চ পর্যায়ে আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করেন এবং তদক, মারিচ এবং সুবাহুর মতো শক্তিশালী রাক্ষসদের বধ করার জন্য তাদের উপযুক্ত নির্দেশনা দেন। অবশেষে রাক্ষসদেরকে হত্যা করার জন্য তাঁরা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছালেন যেখানে বিশ্বামিত্র মানুষের কল্যাণের যজ্ঞ করবেন স্থির করেছিলেন। তরুণ রাজপুত্ররা ছয় দিন ও রাত ধরে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। শেষ রাতে, মারীচ এবং সুবাহু রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে রাম ও লক্ষ্মণ অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু রাজপুত্র রাম অতি দক্ষতার সাথে মারীচকে আঘাত করেছিলেন। মারীচ ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেল। তিনি বিশাল ক্ষমতাশালী সুবাহুকে হত্যা করলেন। এইভাবে ঋষি বিশ্বামিত্রের নির্দেশনায় রাম এবং লক্ষণ অসুরদের ধ্বংস করেন। এরপর কোনও সমস্যা ছাড়াই ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর মহা বৈদিক যজ্ঞ সম্পন্ন করেন।

বিশ্বামিত্রের মিথিলা যাত্রা এবং অহল্যাকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করা;

মহা বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর, ঋষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলা রাজ্যে ভ্রমণ করেন। ঋষি বিশ্বামিত্র ঋষি গৌতমের স্ত্রী অহল্যার ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই মিথিলার অঞ্চলে পৌঁছে তাঁরা গৌতম ঋষির আশ্রম পরিদর্শন করেন। বিশ্বামিত্র রাজপুতদেরকে গৌতমের স্ত্রী অহল্যার কিংবদন্তি সম্পর্কে বলেন। কিংবদন্তি অনুসারে, ছদ্মবেশে ইন্দ্র অহল্যার প্রেমে পড়েছিলেন এবং তাঁর সাথে যৌন মিলনের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তিনি ইন্দ্রের ইচ্ছা পূরণ করেন কিন্তু ঋষি

গৌতম তাদের অজ্ঞান্তেই সেই ঘটনা ধরে ফেলেন। ঋষি গৌতম এরপর ইন্দ্র ও অহল্যা উভয়কে অভিশাপ দেন। অহল্যাকে আশ্রমে একাকী জীবনে নিক্ষিপ্ত করে সেখানে তাঁকে অদৃশ্য করে রেখে দেন। রাম যখন গৌতম ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করেন, তখনই অহল্যা তার অভিশাপ থেকে মুক্তি পান এবং তিনি দিব্যরূপে ফিরে আসেন।

রাম ও লক্ষণকে নিয়ে বিশ্বামিত্রের সীতার স্বয়ম্ভর অনুষ্ঠানে উপস্থিত;

মিথিলা রাজ্যে অহল্যার মুক্তির পর, ঋষি বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলার রাজদরবারে রাজকন্যা সীতার স্বয়ম্বর অনুষ্ঠানে পৌঁছেছিলেন। উল্লেখ্য, যুগ যুগ ধরে প্রাসাদে রাজা জনকের পূজিত শিবের শুভ ধনুক দেখার জন্য মিথিলার তাঁরা রাজা জনকের দরবারে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি রাজপুত্র রামকে রাজকন্যা সীতার স্বয়ম্বর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে বলেন। রাজকন্যা সীতার স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান ছিল সীতার জন্য উপযুক্ত স্বামীর সন্ধানে মিথিলার জনক রাজা আয়োজিত একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা। রাজা জনক আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে তার কন্যা সীতা সেই রাজপুত্রকে বিয়ে করবেন যিনি শিবের ধনুকের দড়ি টান দিতে পারবেন। ধনুকটি ছিল শিব শক্তি এবং ঐশ্বরিক পরাক্রমের প্রতীক। তুলসীদাস রামায়ণ অনুসারে, ভগবান পরশুরাম যখন সীতাকে ছোটবেলায় ধনুকের সাথে খেলতে দেখেছিলেন, তখন তিনি সীতার শক্তি দেখে অবাক হয়েছিলেন। বাল্মীকি রাজা জনককে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি ধনুকের সাহায্যে সীতার উপযুক্ত স্বামীর সন্ধান করে, তাঁর সাথেই তিনি সীতার বিয়ে দেবেন।

তবে ঋষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে পিনাক ধনুকটি উত্তোলন এবং ভাঙার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করলেন। তাঁর আদেশ অনুসারে রাজপুত্র রাম আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং ধনুকের কাছে পৌঁছান। তিনি অনুভব করেন যেন তিনি যেন এক অসাধারণ শক্তি লাভ করেছেন। তিনি

একবার ধনুকের চারপাশে হেঁটে দেখলেন যে এটি তাঁর উচ্চতার প্রায় তিনগুণ। কিন্তু ঋষি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে রাম এটি তুলতে সক্ষম হবেন। এই বিস্ময়কর ঘটনাটি দেখার জন্য লোকেরা প্রাসাদের চারপাশে জড়ো হতে শুরু করে। রাম ঋষি বিশ্বামিত্র এবং রাজা জনক থেকে আশীর্বাদ চাইলেন এবং তিনি তাঁর পিতামাতা ও ইক্ষ্বাকু বংশের তাঁর পরাক্রমশালী পূর্বপুরুষদেরও স্মরণ করলেন এবং মনে মনে তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। এরপর তিনি ভগবান শিবের মন্ত্র (স্তব) জপ করতে শুরু করলেন এবং তাঁর মনে হয়েছিল যেন ভগবান শিব তাঁর উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করছেন। বিষ্ণুর অবতার রাম তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা দিয়ে ধীরে ধীরে ধনুকটি উপরে উঠিয়ে ধ্নুকের তার বা ভীষণ শক্ত দড়ি ছিঁড়ে ফেললেন; তা দেখেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই আশ্চর্যজনকভাবে রাজপুত্র রামের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রাজপুত্র রাম ধনুকটি ভাঙার সাথে সাথে একটি বিশাল বজ্রধ্বনি শোনা গেল। রাজা জনকের পূর্ব ঘোষণা অনুসারে, হরধনু ভঙ্গের পর সীতার সাথে রাজপুত্র রামের শুভবিবাহ অতি আড়ম্বর সহকারে ঋষি বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য ঋষি ও রাজা মহারাজের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।:

বিশ্বামিত্রেরবিস্ময়কর ত্রিশঙ্কু স্বর্গ

হিন্দুধর্মের অন্যতম পুরাণ কিংবদন্তি। ত্রিশঙ্কু স্বর্গের সৃষ্টিতে, রাজা বিশ্বামিত্র তাঁর অনন্য যোগশক্তি ব্যবহার করেছিলেন। ত্রিশঙ্কুর স্বর্গের সৃষ্টি রামায়ণ মহাকাব্যের একটি জনপ্রিয় কাহিনী। ঋষি বশিষ্ঠ এবং ঋষি বিশ্বামিত্রের মধ্যে শত্রুতা হল এই কাহিনীর সুত্রপাত। উইকিপেডিয়া তথ্য অনুসারে পশ্চিমীরা ত্রিশঙ্কু স্বর্গকে সেন্টোরাস নক্ষত্রপুঞ্জ বলে ডাকে। সেই স্বর্গের সৃষ্টির পেছনের কাহিনীটি খুবই আকর্ষণীয় ছিল। সেই কাহিনীটি হলঃ

ইক্ষ্বাকু বংশের ত্রিশঙ্কু নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি একজন সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। অযোধ্যার জনপ্রিয় রাজা ত্রিশঙ্কু সব সময় ধর্মের সমস্ত বিধান মেনে নিষ্ঠার সাথে রাজ্য পরিচালনা করতেন। তাঁর মনে একটি মহা অগ্নিযজ্ঞ করার

বাসনা জাগল। তাঁর ইচ্ছা হল তিনি তাঁর দেহ ত্যাগ না করে স্বর্গে যাবেন । তিনি তার গুরু ঋষি বশিষ্ঠকে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি তাঁর জন্য যজ্ঞ করবেন এবং তাঁকে তাঁর নিজের দেহে থাকাকালীন স্বর্গে পাঠাবেন। ঋষি বশিষ্ঠ তা করতে অস্বীকার করেন এবং রাজাকে বলেন যে তাঁর দেহ ত্যাগ না করে স্বর্গের অভিজ্ঞতা লাভের কোন উপায় নেই। তারপর রাজা ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠের শত পুত্রের কাছে তার ইচ্ছা পূরণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি তাদেরকে বলেন যে তাদের পিতা ঋষি বশিষ্ঠ তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাই তিনি তার ইচ্ছা পূরণের জন্য তাঁদের কাছে এসেছেন।

ঋষির পুত্ররা রাজার অনুরোধ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি হলেন এবং রাজকে তাঁরা বলেন, "যেখানে রাজার গুরু ঋষি বশিষ্ঠ তা করতে অস্বীকৃতি হয়েছেন, সেখানে তাঁর সাহস কীভাবে হল সেই কাজের জন্য তাদের কাছে আসা?" তাঁদের পিতার প্রতি রাজা ত্রিশঙ্কুরের কোন শ্রদ্ধা নেই দেখে তাঁরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তারা ত্রিশঙ্কুকে অভিশাপ দেয় যে সে চণ্ডাল এবং অস্পৃশ্য হয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ, রাজা ছাই মেখে, কালো পোশাক পরা এবং লোহার অলঙ্কার পরিহিত একজন ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হন। যখন তিনি সেই চেহারা নিয়ে তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর প্রজারা তাঁকে চিনতে ব্যর্থ হন এবং তাঁকে রাজপ্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেন। সেই সময়ে রাজার খুব খারাপ লাগে এবং তাঁর আশা পূরণের জন্য ঋষি বিশ্বামিত্রের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঋষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে পৌঁছে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। ঋষি বিশ্বামিত্র রাজার অবস্থা দেখে খুব খারাপ বোধ করেন এবং তাঁকে আশ্বাস দেন যে তিনি একটি যজ্ঞ করবেন যাতে তিনি তাঁর দেহ স্বর্গে পাঠাতে পারেন। ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর পুণ্যবান পুত্রদের কাছে এসে তাদের যজ্ঞের জন্য প্রস্তুতি নিতে এবং সকল ঋষিকে যজ্ঞের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে নির্দেশ দিলেন। বিশ্বামিত্রের পুত্ররা রাজা ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞের জন্য সকল ঋষিদের আমন্ত্রণ জানালেন। ঋষি মোহাদ্য এবং ঋষি বশিষ্ঠের পুত্ররা বাদে

সকল ঋষি যজ্ঞের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ঋষি বিশ্বামিত্র যখন এই কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি তাঁর পুত্রদের তাদের আমন্ত্রণ অস্বীকার করার কারণ বলতে বললেন। যাইহোক, রাজা ত্রিশঙ্কুর অভিলাষ পূরণের জন্য বাকি ঋষিদের সাথে মিলে বিশ্বামিত্র যজ্ঞ শুরু করলেন। বাকি ঋষিরা বিশ্বামিত্রের ক্রোধের ভয়ে ঐযজ্ঞের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। যজ্ঞ শেষ হলে তারা দেবতাদের আহ্বান করার জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করেন, যাতে দেবতারা যজ্ঞে অংশ নিতে পারেন। কিন্তু কোনও দেবতা যজ্ঞে অংশ নিতে আসেননি। ঋষি বিশ্বামিত্র বৈদিক মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে ধ্যানে মগ্ন হলেন রাজা ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠানোর জন্য।

যখন কোনও দেবতা সাড়া দিলেন না, তখন ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র তাঁর সাধনার সিদ্ধি ব্যবহার করে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে আরোহণের নির্দেশ দিলেন। উপস্থিত সকলকে অবাক করে দিয়ে ত্রিশঙ্কু আকাশে উঠে স্বর্গের দ্বারে পৌঁছে গেলেন। সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে আবার পৃথিবীতে ঠেলে দিলেন। তাঁর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে ঋষি বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে আবার স্বর্গে পাঠালেন; দেবতা এবং বিশ্বামিত্র উভয়েই সমানভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, দেবতারা তাকে আবার পৃথিবীতে ঠেলে দিলেন। এটি বেশ কয়েকবার ঘটেছিল। তাই বিশ্বামিত্র তাঁর সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যবহার করে স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকা একটি বিশেষ স্বর্গ তৈরি করলেন ত্রিশঙ্কুর জন্য। পা উপরে এবং মাথা নিচু করে, ত্রিশঙ্কু মাটিতে নেমে আসেন এবং সাহায্যের জন্য চিৎকার করে বলেন, "বিশ্বামিত্র, বিশ্বামিত্র দয়া করে আমাকে রক্ষা করুন"। ইন্দ্রের এই কাজ বিশ্বামিত্রকে ক্রুদ্ধ করে তুলল। বিশাল যোগশক্তির সাহায্যে, ঋষি বিশ্বামিত্র স্বর্গ থেকে তার পতন থামিয়ে দেন এবং তার জন্য একটি নতুন স্বর্গীয় জগৎ তৈরি করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আরেকটি ব্রহ্ম (ব্রহ্মা সহ) তৈরি করতে শুরু করলেন, যা বিশেষভাবে ত্রিশঙ্কুর জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যার নাম দিয়েছিলেন ত্রিশঙ্কু স্বর্গ।

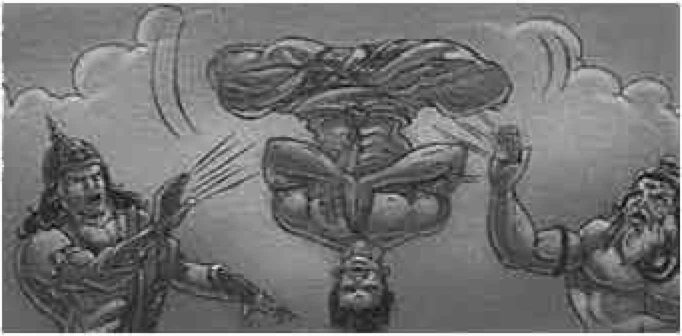

দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে শারীরিকভাবে স্বর্গে যেতে বাধা দেন।

তিনি ব্রহ্মাণ্ডের কাজ শেষ করার আগেই বৃহস্পতি তাঁকে থামতে নির্দেশ দেন। তবে, ত্রিশঙ্কু সম্পূর্ণরূপে তাঁর একান্ত স্বর্গে যেতে পারেননি। তিনি আকাশে উল্টো অবস্থায় স্থির ছিলেন। ত্রিশঙ্কু স্বর্গে, ধার্মিক রাজা ত্রিশঙ্কু অবশেষে শান্তি লাভ করেন। অবশেষে, তিনি একটি নক্ষত্রপুঞ্জে রূপান্তরিত হন, যা এখন ক্রুক্স নামে পরিচিত। পুরাণে বলা হয়েছে যে ত্রিশঙ্কু স্বর্গ সৃষ্টির সময়, বিশ্বামিত্র তাঁর সমস্ত যৌগিক শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন।পণ্ডিতেরা ত্রিশঙ্কু নক্ষত্র আজও আকাশে তারার মতো জ্বলজ্বল করছে। আমাদের কাছে, আজ, ত্রিশঙ্কু মানে হল যে কেউ এখানেও নয়, সেখানেও নয়।

ত্রিশঙ্কু স্বর্গ সৃষ্টি ছিল বিশ্বামিত্রের আরও একটি পতন এবং তিনি তার সমস্ত যোগশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন কারণ তিনি গৌপন লাভের জন্য সেগুলি ব্যবহার করেছিলেন। তার আত্মা অদম্য ছিল, তাই তিনি ধ্যান ত্যাগ না করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি হিমালয়ে একটি নতুন স্থান বেছে নিয়েছিলেন এবং তাঁর যোগশক্তি উদ্ধারের জন্য তিনি পুনরায় সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন শত শত বছর ধরে। সেইবার তাঁর যোগশক্তি এত তীব্র ছিল যে এটি সত্যলোকে ব্রহ্মাকে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন। (উৎস: উইকিপিডিয়া)

মহর্ষি বাল্মীকি

গুগুল ছবি

মহর্ষি বাল্মীকি ছিলেন একজন কিংবদন্তি কবি যিনি রামায়ণ মহাকাব্যের রচয়িতা হিসেবে বিখ্যাত। তিনি আমাদের কাছে আদি কবি হিসেবে শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত। তিনি প্রথম মহাকাব্য রামায়ণ রচনা করেছিলেন, যার 24,000 শ্লোক রয়েছে। বাল্মীকি মহাকাব্য 'রামায়ণ'500 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে 100 খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। ঋষি বাল্মীকি ভগবান রামের সমসাময়িক। সীতাদেবী গর্ভাবস্থায় ঋষি বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন যেখানে লব এবং কুশের জন্ম হয়েছিল। এই পটভূমিতে, বাল্মীকির যুগ সম্ভবত হাজার হাজার বছর আগের বলে মনে করা হয়। মহর্ষি বাল্মীকির জীবন অলৌকিক ; কারণ তিনি একজন ডাকাত থেকে একজন বিখ্যাত ঋষি এবং রামায়ণ মহাকাব্যের রচয়িতা হয়েছিলেন। এই রূপান্তরটি মূলত "মরা, মরা " জপের পর "রাম" নামটি আন্তরিকভাবে জপের জন্য হয়েছিল বলে সর্বত্র উল্লেখ রয়েছে। তাঁর "মরা" শব্দের পুনরাবৃত্তি অবশেষে কিভাবে আন্তরিক ভক্তিতে "রাম" শব্দে রূপান্তরিত হয় এবং তাঁর জ্ঞানার্জন এবং আধ্যাত্মিক জাগরণের মাধ্যমে তিনি অলৌকিক ভাবে ডাকাত থেকে কিভাবে ঋষিতে রূপান্তর হয়েছিলেন এবং পরে তিনি কীভাবে মহাকাব্য রামায়ণ রচনা করেছিলেন - সেই

সকল অলৌকিক ঘটনাগুলি এখানে সংক্ষেপে এবং সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

মহর্ষি বাল্মীকি, যিনি মূলত রত্নাকর ডাকাত নামে প্রথম জীবনে কুখ্যাত ছিলেন, তিনি ছিলেন একজন বন শিকারী যিনি ভ্রমণকারীদের ডাকাতি করতেন। ঋষি নারদের সাথে কথোপকথনের পর তাঁর হৃদয়ে এক গভীর পরিবর্তন তিনি অনুভব করেন। , ঋষি নারদ তাঁকে রাম, নাম জপ করতে উপদেশ এবং দীক্ষা দান করেছিলেন। "রাম" উচ্চারণ করতে না পেরে রত্নাকর ডাকাত "মরা, মরা " উচ্চারণ করলেন। যাইহোক, নামের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভক্তি, তাঁর রূপান্তর ঘটায় এবং তাঁর আধ্যাত্মিক যাত্রার পরিপূর্ণতা এনেছিল। পণ্ডিতদের মতে প্রাথমিকভাবে ভুল নাম উচ্চারণ করা সত্ত্বেও, মহর্ষি নারদের দীক্ষায় দস্যু রত্নাকরের মুক্তির প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা এবং ঐশ্বরিক নামের প্রতি তাঁর অটল মনোযোগ অবশেষে তাঁর জ্ঞানার্জনের দিকে পরিচালিত করেছিল তাই তিনি কুখ্যাত ডাকাত বিরাট বড় সাধক ও ঋষি হয়েছিলেন। সেই সাধনার শক্তি বলে বিশ্বের প্রথম মহাকাব্য –রামায়ণ রচনা করতে পেরেছিলেন। তাঁর ভক্তির মাধ্যমে তিনি যে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেছিলেন, যা তাঁকে রামায়ণ রচনা করতে সক্ষম করেছিল। তাঁর রচিত রামায়ন বিশ্ব সাহিত্য ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বাল্মীকির অলৌকিক জীবনী থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করি যে আন্তরিক ভক্তি এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে অতি সমস্যাগ্রস্ত মানুষও প্রকৃত শান্তি, জ্ঞান ও মুক্তি সন্ধান লাভ করতে পারে। এবার আসি বাল্মীকির অলৌকিক জীবন কাহিনীতে।

রত্নাকর হিসেবে বাল্মীকির প্রাথমিক জীবন

রত্নাকর একটি অঙ্গিরস গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। খুব অল্প বয়সে তিনি একটি ঘন বনের মধ্যে হারিয়ে যান।বনের একজন শিকারী ঐছেলেটিকে দেখে নিজের ঘরে সযত্নে নিয়ে যান। তার পালিত পিতামাতার ভালোবাসা এবং যত্নে ঐ হারিয়ে যাওয়া ছেলেটি বড় হয়ে ওঠে এবং তার নিজের

পিতামাতাকে সে ভুলে যায়। ঐ পরিবারে তার নামকরণ হয় 'রত্নাকর'। রত্নাকর তার পালিত পিতার শিক্ষা ও নির্দেশনায় একজন দুর্দান্ত শিকারী হয়ে ওঠে। বিবাহযোগ্য বয়সে পৌঁছানোর সাথে সাথে, রত্নাকর অন্য শিকারীর পরিবারের এক সুন্দরী মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর পরিবার বড় হওয়ার সাথে সাথে, রত্নাকর পরিবারের সদস্যদের খাওয়াতে ও পরাতে অসমর্থ হয়ে পড়েন। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে দস্যু বৃত্তি অবলম্বন করেন। , তিনি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়া লোকদের ডাকাতি এবং লুটপাটের কাজ শুরু করেন। তরুণ এবং শক্তিশালী রত্নাকর ধীরে ধীরে একজন কুখ্যাত ডাকাত হয়ে ওঠেন। সময়ের সাথে সাথে, তিনি অনেক সন্তানের পিতাও হলেন।

২ রত্নাকরের সাথে নারদ মুনির সাক্ষাৎ

একবার মহান ঋষি নারদ সেই বনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে রত্নাকর বসবাস করতেন এবং ডাকাতি করতেন। সুযোগ বুঝে রত্নাকর ডাকাতি করার জন্য ঋষি নারদকে আক্রমণ করেন। রত্নাকর নারদকে ডাকাতি করেন এবং তারপর তাঁকে হত্যা করতে উদ্দত হলেন । কিন্তু নারদ অবিচল থাকেন। নারদ যখন তাঁর বীণা বাজিয়ে ভগবান বিষ্ণুর প্রশংসা মূলক গান গাইতে লাগলেন, তখন রত্নাকর অনুভব করেন যে তাঁর উপর এক রূপান্তরের প্রভাব ও অনুভূতি আসছে। তারপর, ঋষি রত্নাকরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, যে পরিবারের জন্য তিনি ডাকাতি ও নির্দোষ ব্যক্তিদের হত্যা করে পাপ করছে, সেই পরিবার কি তার পাপের ভাগীদার হবে? রত্নাকর উত্তর দেন যে, যখন তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য এই সব পাপ করছেন, তখন তারা অবশ্যই তাঁর দ্বারা কৃত অপরাধের ভাগীদার হবে। ঋষি নারদ তাকে তার পরিবারের সদস্যদের কাছে যেতে বলেন এবং তার প্রিয় স্ত্রী ও সন্তানদের এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে বলেন; যে তারা কি তার অপরাধের অনুমোদন দেবে বা পাপের ভাগ নেবে? রত্নাকর নারদের কথায় তিনি পরিবারের লোকজনকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা বাদ করতে রাজী হলেন। নারদ যাতে ওখান থেকে পালিয়ে না যায় রত্নাকর নারদকে একটি গাছের

সাথে বেঁধে রাখলেন। এরপর রত্নাকর তার পরিবারের কাছে যান এবং প্রতিটি সদস্যকে জিজ্ঞাসা করেন যে তারা কি তার পাপের ভাগীদার হতে ইচ্ছুক? রত্নাকর প্রথমে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি ডাকাতি এবং খুন করে তোমাদের সকলের জীবিকা নির্বাহ করি। তুমি কি এতে রাজি? তুমি কি আমার পাপের ভাগীদার হবে?" তার স্ত্রী উত্তর দিলেন। "অপরাধটা তোমার একার, আমার নয়।" তার বাবা-মা এবং সন্তানরাও রত্নাকরের ঐ প্রশ্নের একইভাবে উত্তর দিলেন।

রত্নাকর ডাকাতির পর নারদ ঋষিকে হত্যা করতে উদ্দত

রত্নাকর বুঝতে পারলেন যে তাঁর পরিবারের কেউ তাঁর পাপের বোঝা বহন করতে রাজি নন। পরিবারের সদস্যদের উত্তর শুনে হতাশ হয়ে রত্নাকর নারদের মুনির কাছে ফিরে আসেন এবং তাঁকে তাঁর পরিবারের সদস্যদের উত্তরগুলি বলেন। রত্নাকর তাঁর পাপের জন্য অনুতপ্ত হন এবং এই উপলব্ধির পর তিনি এক নতুন মানুষ হয়ে ওঠেন। তিনি নারদ ঋষিকে মুক্তির পথ দেখাতে বলেন। তারপর নারদ তাকে ভগবান রামের নাম জপ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু রত্নাকর সঠিকভাবে 'রাম' উচ্চারণ করতে পারলেন না। তারপর নারদ রত্নাকরকে 'রাম' উল্টো করে 'মরা' উচ্চারণ করতে বলেন। নারদ যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন, তেমনই রত্নাকর তাঁর তপস্যা শুরু করেন। গভীর ধ্যানে অবিচল এবং নিশ্চল থাকায়, পিঁপড়েরা তাঁর চারপাশে একটি পিঁপড়ের পাহাড় তৈরি করে।

সংস্কৃতে "বাল্মিকা" নামে পরিচিত পিঁপড়ের পাহাড়ই তাঁর আবাসস্থল হয়ে ওঠে। গাছপালা তাঁর উপরে পিঁপড়ের পাহাড় ঢেকে দেয় এবং পাখিরা তাঁর জট পাকানো চুল এবং দাড়িতে বাসা বাঁধে। অসাধারণ রত্নাকরের সেই সাধনা।

গভীর ধ্যানে রত্নাকর কেবল ভগবান ব্রহ্মার কথাই ভাবতে লাগলেন , অর্থাৎ মহাজাগতিক বাস্তবতা। তিনি উপলব্ধি করেন "সব কিছুই ব্রহ্ম, সবই ঈশ্বর। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই কেবল ব্রহ্মাই সত্য যেখানে সমস্ত কিছু বেঁচে থাকে, গতিশীল হয় এবং অবিরামভাবে তাদের মৃত্যু হয়।" শত শত বছর পর, যখন ভগবান ব্রহ্মা তাঁকে আশীর্বাদ করার জন্য সেখানে আবির্ভূত হলেন, তখন তিনি রত্নাকরকে পিঁপড়ের পাহাড় বা 'বাল্মিকা' দ্বারা আবৃত দেখতে পান এবং তিনি তাকে বাল্মীকি নাম দেন। তিনি জেগে ওঠেন, জ্ঞান লাভ করেন এবং পিঁপড়ের পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসেন। ভগবান ব্রহ্মা তাকে আশীর্বাদ করেন। এইভাবে কঠোর সাধনার ফলে রত্নাকর ভয়ঙ্কর ডাকাত থেকে মহাঋষি বাল্মীকি হয়ে উঠেন।

৩ ঋষি **বাল্মীকির প্রথম শ্লোক – পৃথিবীর প্রথম শ্লোক**

প্রতিদিনের মত একবার ঋষি বাল্মীকি স্নানের উদ্দেশ্যে গঙ্গা নদীতে যাচ্ছিলেন। ভরদ্বাজ নামে এক শিষ্য তাঁর পোশাক নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে তারা তমসা স্রোতের ধারে এসে পৌঁছালেন। স্রোতের দিকে তাকিয়ে বাল্মীকি তাঁর শিষ্যকে বললেন, "দেখো, এই জল কত স্বচ্ছ, আমি আজ এখানে স্নান করব।" স্নান করার সময় এবং প্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য উপভোগ করার সময়, তাঁর দৃষ্টি একজোড়া সারস পাখির (ক্রৌঞ্চ) উপর পড়ল, যারা একে অপরের প্রতি গভীর প্রেমে মগ্ন ছিল। সুখী পাখিদের দেখে বাল্মীকি খুব খুশি হলেন। হঠাৎ তীরের আঘাতে পুরুষ পাখিটি ঘটনাস্থলেই মারা গেল। দুঃখে ভরা, তার সঙ্গী যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল এবং হতবাক হয়ে মারা গেল। ঋষি বাল্মীকি পাখিদের সাথে যা ঘটেছিল তাতে ব্যথিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। তারপর তৎক্ষণাৎ মহর্ষির মুখ থেকে কঠোর ভাষায় অভিশাপের আকারে একটি শ্লোক বেরিয়ে আসে।

*“মা নিষাদ প্রতিষ্টা ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
য়ত্ ক্রৌঁকামিথুনাদেকম অবধিঃ কামমোহিতম”*

(উৎস; উইকিপিডিয়া থেকে, মুক্ত বিশ্বকোষ)

"হে পক্ষিশিকারি, যেহেতু তুমি মোহগ্রস্ত ক্রৌঞ্চদের মধ্যে একজনকে হত্যা করেছ, দীর্ঘ অনন্তকাল ধরে তুমি শান্তি পাবে না । ঋষি বাল্মীকির ক্রোধ এবং শোক থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত, এই শ্লোকটি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম শ্লোক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শুধু তাই নয় বাল্মীকির এই শ্লোকটিকে সবচেয়ে প্রাচীন বলে মনে করা হয় এবং এটিকে বিশ্বের প্রথম শ্লোক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই শ্লোকের অনুবাদটি শিকারীর কাজ দেখে বাল্মীকির অনুশোচনা এবং অভিশাপের ইঙ্গিত দেয়। এই শ্লোকটি কেবল রামায়ণের সূচনাই নয়, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম শ্লোকও, যা বাল্মীকিকে "আদি কবি" বা প্রথম কবি হিসাবে চিহ্নিত করে। আধ্যাত্মিক নেতারা বলেন, একটা সময় ছিল যখন সংস্কৃতে কোনও কবিতা ছিল না। সেই সময়ে, কেবল বেদ ছিল যা কাব্যিক আকারে ছিল না। বাল্মীকি সংস্কৃতে তাঁর প্রথম শ্লোক রচনা করেন। তার আগে পৃথিবীতে কোনও কবিতা রচিত হয়নি।

ঋষি বাল্মীকি শিকারিকে অভিশাপ দিচ্ছেন

৪ ভগবান ব্রহ্মার প্রশংসা লাভ এবং প্রথম শ্লোকের নূতন ব্যাখ্যা

নদীর ধারে শিকারীকে অভিশাপ দেওয়ার পর, ঋষি বাল্মীকি মনের দুঃখে তাঁর আশ্রমে চলে গেলেন। শ্লোকের কথাগুলি তাঁর কানে বাজতে থাকে। এবং তাঁর মনে হতে থাকে যে একজন ঋষি হিসেবে ধৈর্য হারিয়ে শিকারীকে তাঁর অভিশাপ দেওয়া উচিত ছিল না। তাছাড়া, শিকারী কেবল তার ধর্ম পালন করছিল। সেই সময় ভগবান ব্রহ্মা যখন তাঁর আশ্রমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি বাল্মীকির অস্থিরভাব বুঝে তাঁর আশ্রমের ভিতরে চলে গেলেন। ভগবান ব্রহ্মা তাঁর আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন শিকারীর ক্রৌঞ্চের এক জোড়ার হত্যার জন্য বাল্মীকি হতাশ এবং দুঃখিত বোধ করছেন এবং শিকারিকে অভিশাপ দেওয়া জন্যও অনুতাপ করছেন। ভগবান ব্রহ্মাকে হঠাৎ তাঁর আশ্রমে দেখে, বাল্মীকি মহর্ষি অবাক হয়ে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালেন। ভগবান ব্রহ্মা বাল্মীকি মহর্ষির দিকে তাকালেন এবং তাঁর দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। নদীর ধারে বাগানে কী ঘটেছিল বাল্মীকি তা বর্ণনা করলেন - শিকারী কীভাবে অসহায় বেচারা পাখিটিকে তীর দিয়ে হত্যা করেছিল এবং অভিশাপের আকারে তাঁর মুখ থেকে একটি শ্লোক বেরিয়ে এল। পুরো ঘটনাটি শুনে, ভগবান ব্রহ্মা হেসে ঋষি বাল্মীকিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে; তিনি তাঁকে শ্লোকটি পরিবর্তন করতে সাহায্য করবেন। ঋষি বাল্মীকি অবাক হয়ে গেলেন যে ভগবান ব্রহ্মা কীভাবে এটি করতে পারেন। তিনি কীভাবে এটি করবেন? তিনি তাঁর শ্লোক থেকে কী অর্থ বের করেছিলেন? বাল্মীকির মনে অনেক প্রশ্ন জাগলো। ভগবান ব্রহ্মা দুঃখ ও যন্ত্রণার কারণ বুঝতে পেরেছিলেন। ভগবান ব্রহ্মা তাকে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছিলেন যে বাল্মীকির ক্রোধ ছিল গীতিমূলক। বাক্যাংশের প্রতিটি অংশে ৮টি অক্ষর দিয়ে তিনি বিশ্বের প্রথম শ্লোক রচনা করেছেন। এইভাবে বাল্মীকির শ্লোক বিশ্বের প্রথম শ্লোক হিসেবে স্থান পায়। ভগবান ব্রহ্মা তাঁর শ্লোকের তাৎপর্য অত্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন এবং বাল্মীকির রচিত

শ্লোকটিকে আরও ভালভাবে বোঝার এবং ব্যাখ্যা করার প্রস্তাব দিলেন।

পুরাণে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মা বাল্মীকির শ্লোকের অর্থ বিশেষভাবে পুনর্গঠন বা ব্যাখ্যা করেছিলেন। ব্রহ্মা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন “বৃক্ষের মাথায় সুখে বসে থাকা দুটি “কৃঞ্চ” পাখি হলেন দেবী সীতা এবং ভগবান রাম। কিন্তু রাবণের মতো শিকারী সীতাকে রাম থেকে আলাদা করেছিলেন। এর অর্থ এই যে, আমরা যদি এই রাবণকে ধ্বংস করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাহলে আমরা আমাদের জীবনের সমস্ত মঙ্গল এবং সমৃদ্ধি পেতে পারি!” এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে, যদি আমরা বিষ্ণু অবতার রামকে উপাসনা করি, যিনি তার তীর দিয়ে রাবণকে হত্যা করেছিলেন, তাহলে আমরা এই পৃথিবীতে সকল ধরণের সমৃদ্ধি লাভ করব। এইভাবে ভগবান ব্রহ্মা শ্লোককে পুনর্গঠন করেছিলেন যাতে বাল্মীকির প্রথম শ্লোকের আরও বিস্তৃত অর্থ এবং বোধগম্যতা লাভ হয়। বাল্মীকির প্রথম শ্লোকের অর্থ, ব্যাখ্যা এবং বোধগম্যতা এইভাবে বিস্তার করে ভগবান ব্রহ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে কবিতা (কাব্য) লেখা শুরু করতে বলেন। মহর্ষি বাল্মীকি ভগবান ব্রহ্মার কথায় অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "এখন আমি কী লিখব।” এরপর বাল্মীকি মহর্ষি তাঁর চারপাশে যা ঘটছে তার পুরো রহস্য বুঝতে পারেন - এটি ছিল ঐশ্বরিক খেলা যা উন্মোচিত হয়েছিল। সেই সকল উন্মোচন বাল্মীকি মহর্ষিকে রামায়ণ রচনা করতে পরিচালিত করেছিল। পরে ভগবান ব্রহ্মা বলেছিলেন যে তিনিই দেবী সরস্বতীকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁকে সেই প্রথম শ্লোকটি গাইতে সাহায্য করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণুর ইচ্ছা ছিল যে তাঁর মহিমা বাল্মীকি মহর্ষির মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হোক, এবং এই কথা বলে, ভগবান ব্রহ্মা তাঁর ঐশ্বরিক কৃপা বর্ষণ করে বাল্মীকি মহর্ষিকে রামায়ণ লেখা শুরু করতে বলেছিলেন! *1

৫; ঋষি বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনায় নারদ মুনির অনুপ্রেরণা

নারদ ঋষি বাল্মীকিকে রামায়ণ লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। একবার মহর্ষি নারদ ঋষি বাল্মীকির আশ্রমে তাঁর

সাথে দেখা করতে যান। মহর্ষি নারদকে তাঁর আশ্রমে দেখে বাল্মীকি অনুতপ্ত হয়ে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, "আপনি হলেন সেই ব্যক্তি যাকে আমি প্রায় মেরে ফেলেছিলাম! এর জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত ও মর্মাহত।" নারদ হেসে বললেন, "আমি খুশি যে তুমি তা করোনি; আর এখন, আমরা আবার মিলিত হয়েছি," তারপর বাল্মীকি ঋষি নারদকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার মহান জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা দিয়ে, সম্ভবত আপনি আমাকে বলতে পারবেন: পৃথিবীর মধ্যে নিখুঁত পবিত্র পুরুষ কে? দয়া করে আমাকে আপনি এমন সেই নিখুঁত পবিত্র ব্যক্তির কথা বলুন যার বিশাল শক্তি আছে এবং সমাজের প্রতি ভীষণ কর্তব্যবোধ আছে, যে সত্যবাদী এবং যিনি সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, করুণাময় এবং কর্মে জ্ঞানী, সুদর্শন এবং শক্তিশালী এবং যিনি রাগ ও হিংসা থেকে মুক্ত।"

উত্তরে নারদ মুনি বললেন, “এই সকল গুণাবলী সম্পন্ন বিরল ব্যক্তি হলেন রাজা দশরথের পুত্র ভগবান রাম...”। এরপর নারদমুনি বাল্মীকিকে ভগবান রামের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন। আগেই জেনেছি, ঋষি বাল্মীকি ভগবান ব্রহ্মার একটি দর্শন পেয়েছিলেন যেখানে ভগবান ব্রহ্মা ঋষি বাল্মীকিকে একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রদান করে রামায়ণ লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নারদ মুনির অনুপ্রেরণায় এবং ভগবান ব্রহ্মার নির্দেশ অনুসরণ করে ঋষি বাল্মীকি রামায়ণ লিখেছিলেন। পুরাণে আরও বলা হয়েছে যে ব্রহ্মা বাল্মীকির সামনে উপস্থিত হয়ে জগতের কল্যাণের জন্য শ্লোকে রামায়ণ লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।ভগবান ব্রহ্মা ঋষি বাল্মীকিকে অবতার রামের অতীত এবং ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। বাল্মীকি ইতিমধ্যেই গল্পের বর্তমান পর্যায় জেনেছিলেন - যেমন রাম কর্তৃক নির্বাসিত সীতা তাঁর পুত্র লব এবং কুশের সাথে তাঁর আশ্রমে অবস্থান করছিলেন।

৬; ঋষি বাল্মীকির রামায়ণ রচনা;

মহর্ষি বাল্মীকি ভগবান ব্রহ্মার ঐশ্বরিক কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করে ভগবান ব্রহ্মার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি রামায়ণ রচনা শুরু করেন। মহর্ষি বাল্মীকি ঋষি নারদের ৩২ শ্লোকের কাহিনীকে ২৪,০০০

শ্লোকের মহাকাব্যে রূপান্তরিত করেন। *১. আগেই জেনেছি যে তাঁর তৈরি প্রথম শ্লোকটি ভগবান ব্রহ্মার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে তিনি ২৪,০০০ শ্লোকের রামায়ণ রচনার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর রামায়ণ রচনা করার সময়, রামের স্ত্রী সীতাদেবী এবং তাঁদের দুই পুত্র- লুভ ও কুশ, বাল্মীকির আশ্রমে আসেন এবং সেখানেই অবস্থান করেন। বাল্মীকি রামায়ণ রচনা শেষ করার পর, লভ এবং কুশকে কাব্য-সম্পর্কে শিক্ষা দেন, যারা ঐ মহাকাব্যটির গান গেয়েছিলেন এবং তার মহিমা বহুদূরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি মহাকাব্য রামায়ণ রচনায় অনুষ্টুভ ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। যেমনটি বুঝতে পারি, রামায়ণ হল একটি যৌগিক শব্দ যার আক্ষরিক অর্থ হল ভগবান বিষ্ণুর অবতার শ্রী রামের যাত্রা। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে, রামায়ণকে প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাল্মীকি রামায়ণের শ্লোকগুলি ৩২-অক্ষরবিশিষ্ট অনুষ্টুভ ছন্দে রচনা করেছিলেন। রামায়ণ মহাকাব্য রচনার পর, বাল্মীকি ভারতীয় সাহিত্যের আদিকবি বা প্রাচীনতম কবি হয়ে ওঠেন।

মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত-বালকণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, আরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্দকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, যুদ্ধকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড। এটি ৫০০টি সর্গ বা অধ্যায় নিয়ে গঠিত একটি মহাকাব্য। আমরা প্রায় সকলেই জানি, এই মহাকাব্যে প্রাচীন ভারতের মানুষের সংস্কৃতির সাথে বিষ্ণু অবতার রামচন্দ্রের জীবন কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়গতভাবে, রামায়ণ প্রাচীন ভারতের মানুষের অস্তিত্বের বিভিন্ন দিক, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্মীয় চেতনা বর্ণনা করেছে। পণ্ডিত এবং বিশেষজ্ঞদের মতে, অনুষ্টুভ ছন্দ হল গাণিতিক ক্রম সহ সাহিত্যের ছন্দ। সংস্কৃত কাব্য এবং ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির উপর রামায়ণের বিরাট প্রভাব রয়েছে।

৭; ঋষি বাল্মীকির নির্দেশে লব ও কুশের রামায়ণ গান গাওয়া;

বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করার সাথে সাথে লব ও কুশকে বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে গান গাইতে শেখাতেন। বহু বছর পর তিনি লব, কুশ এবং তাদের মা সীতাদেবীকে অযোধ্যার উপকণ্ঠে নিয়ে যান যেখানে

শ্রীরামের দ্বারা একটি মহান বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেখানে বাল্মীকি তাঁর উপস্থিতি ঘোষণা করেন এবং শিষ্য, লব ও কুশকে যজ্ঞের মূল মঞ্চে নিয়ে যান এবং তাদেরকে রামায়ণ গান গাইতে নির্দেশ দেন। এটি ছিল জনসাধারণের সামনে রামায়ণের প্রথম আবৃত্তি-গান। মহাকাব্য রামায়ণের সৌন্দর্য এবং ছন্দে ঐ অনুষ্ঠানে সমবেত সমগ্র শ্রোতা ঐ রামগানে ভীষণ মুগ্ধ হলেন।এই পদ্ধতির মাধ্যমে বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনীকে লব এবং কুশ জীবন্ত করে তুলেছিলেন। যখন লব এবং কুশ রামায়ণের পুরো কাহিনীটি পাঠ ও গান শেষ করলেন, তখন দেখা গেল সীতার শোকে রামচন্দ্র অঝোরে কাঁদছেন। ঋষি বাল্মীকি শ্রীরামকে সীতার জন্য শোক করতে নিষেধ করলেন। বাল্মীকি মহিমান্বিত ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে সীতাকে সমবেত জনতার মধ্যে শ্রীরামের কাছে নিয়ে গেলেন। ঋষি বাল্মীকির অসাধারণ প্রচেষ্টায় রামচন্দ্রের সাথে সীতা দেবীর সাক্ষাতের সেই শুভ মুহূর্তটি দেখে সমগ্র জনতা আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত হয়েছিল।

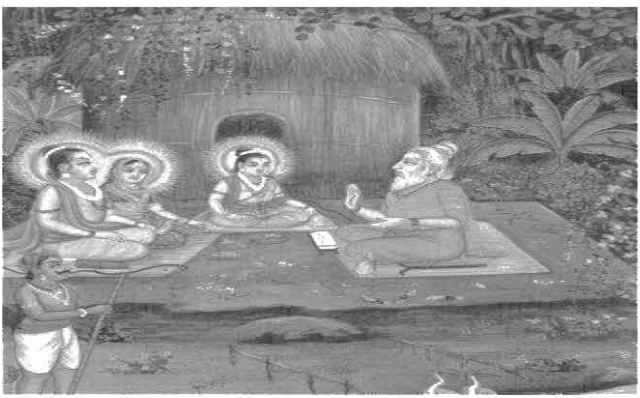

ঋষি বাল্মীকির আশ্রমে সীতা দেবীর ও দুই পুত্র লব ও কুশ

৮; ঋষি বাল্মীকির আশ্রমে সীতা এবং দুই পুত্র লব ও কুশ;

আগেই বলেছি সীতাদেবী ঋষি বাল্মীকির আশ্রমে গিয়েছিলেন। কিংবদন্তি অনুসারে, যখন রামচন্দ্র সীতার কাছ থেকে বিদায় নেন,

তখন তিনি সন্তানসম্ভবা ছিলেন। সীতাদেবী তখন মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় নিলেন। প্রসঙ্গত, রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে, বাল্মীকির আশ্রমটি কানপুর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে গঙ্গা নদীর তীরে বিথুরে অবস্থিত ছিল। সীতা সেখানেই থাকতেন এবংসেখানেই তিনি লব ও কুশের জন্ম দেন। আশ্রমে, সীতাদেবী পুত্রদের লালন-পালন করেছিলেন। তাঁরা মা শিক্ষায় এবং ঋষি বাল্মীকির দীক্ষায় লব ও কুশ বীর এবং বুদ্ধিমান হয়ে বেড়ে ওঠেন। পরে তারা ঋষি বাল্মীকির প্রচেষ্টায় অবশেষে তাঁদের পিতার সাথে মিলিত হয়েছিলেন।

রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণে ঋষি বাল্মীকির আশ্রমে সীতাদেবী, লব ও কুশের কাহিনী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গর্ভবতী সীতা যখন বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। প্রথম পুত্রকে রক্ষা করার জন্য কুশ ঘাসের সাথে একটি অনুষ্ঠান করার সময়, ঋষি বাল্মীকি বলেছিলেন। "এই সন্তানের নাম কুশ হবে," তারপর বাল্মীকি দ্বিতীয় পুত্রের জন্য কুশ ঘাসের একটি অংশ সংরক্ষণ করেছিলেন। তিনি আবারও অনুষ্ঠানটি করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "এই সন্তানের নাম লব হবে," ("লব" অর্থ "অংশ")। সীতা সবকিছু আনন্দের সাথে দেখেছিলেন। ছেলেরা বাল্মীকির আশ্রমে বেড়ে ওঠে এবং পরে বাল্মীকি তাদের "রামায়ণ" গানটি শিখিয়েছিলেন যা তিনি রচনা করেছিলেন। সে কাহিনী আগেই জেনেছি।

৯; রামচন্দ্রের সাথে ঋষি বাল্মীকির সাক্ষাৎ এবং সীতার অগ্নিপরীক্ষা;

বাল্মীকি রচিত রামায়ণ এবং সেখান থেকে রামগানগুলি রচিত হয়েছিল শ্রীরামচন্দ্রের দুঃসাহসিক কাজ এবং মাহাত্ম্য সম্পর্কে। শ্রীরামচন্দ্রের দুই পুত্র- লব ও কুশ পুরো রামায়ণ মুখস্থ করেছিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে লোকদের সামনে তা উপস্থাপন করেছিলন। যারা ছেলেদের গান শুনেছিল তারা সকলেই রামের জন্য গর্বে এবং লব ও কুশের মাধ্যমে সীতার জন্য বেদনায় বিস্মিত হয়েছিল। তারা ছেলেদের উপহার এবং আশীর্বাদ দিয়েছিল। অবশেষে, যেমনটি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ঋষি বাল্মীকি সীতা দেবীর যমজ পুত্র লব ও কুশকে নিয়ে রামের দরবারে যান। ঋষি বাল্মীকির নির্দেশ অনুসারে লব ও কুশ তাদের পিতা এবং সেখানে উপস্থিত অন্যান্য সভাসদদের সামনে রামায়ণের গান গেয়েছিলেন । তাদের গান শুনে রামচন্দ্র তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কারা? তোমরা স্বর্গীয় গন্ধর্বদের মতো দেখতে; যেন স্বর্গের সঙ্গীতশিল্পী! কিন্তু তোমরা আমার দুঃসাহসিক অভিযানের কথা কীভাবে জানলে?" রাম অবাক হয়ে এই সকল প্রশ্ন তাদেরকে করলেন।

রাজা রামচন্দ্র তাঁর সোনার সিংহাসনে বসে লব ও কুশকে আদেশ করলেন, "তোমরা গান করো! আরও বেশি করে গান করো!" কারণ রামায়ণ অনেক দীর্ঘ ছিল, এবং রাম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো গানটি শুনতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি ছেলেদুটিকে প্রাসাদে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকেন। এদিকে, অযোধ্যার লোকেরা খুব কৌতূহলী ছিল এবং লক্ষ্য করছিল। "ওই ছেলেরা আমাদের রাজার মতো," তারা একে অপরকে ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল, "এই ছেলে দুটি আসলে কে?" তাদের গল্পের শেষ পর্যায়ে ছেলেরা যখন, সীতা কীভাবে বনবাসে জন্ম দুই সন্তানের দিয়েছিলেন তার বর্ণনা করে এবং সেই বর্ণনা শুনে, রামচন্দ্র বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন; এবং, বুঝতে পেরেছিলেন ঐ যমজ সন্তান দুটিকে। "তোমাদের মাকে প্রাসাদে নিয়ে এসো," রামচন্দ্র ছেলেদের বললেন। "তাকে আবার অযোধ্যার সকলের সামনে তার নির্দোষতা প্রমাণ করতে দাও।" বাল্মীকি সীতাকে অযোধ্যায় নিয়ে এসে রামের কাছে উপস্থাপন করলেন। "এই যে সেই নির্দোষ পবিত্র রমণী যাঁকে আপনি গুজবের কারণে নির্বাসিত করেছিলে," বাল্মীকি রামচন্দ্রকে বললেন। "আর এই ছেলেরা আপনার পুত্র। এখন কি সীতা আবার তার নির্দোষতা ও পবিত্রতা প্রমাণ করবে?" রামের প্রতি আনুগত্য প্রমাণ করার জন্য সীতাকে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল তা বাল্মীকি রামায়ণে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য বাল্মীকির রামায়ণ অনুসারে, সীতা আত্মহত্যা করেননি, বরং রামের কাছে নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করার জন্য

অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে, রাম সীতাকে তাঁর রাজ্যের লোকদের কাছে নিজের সতীত্ব প্রমাণ করার জন্য জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সীতা ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি যদি রামের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতেন, তবে আগুন তাঁর কোনও ক্ষতি করবে না। তিনি অগ্নি থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসেন এবং অগ্নিপরীক্ষায় তিনি তাঁর পবিত্রতার পরিচয় দিয়েছিলেন। রাজ্ধানী সীতাকে পবিত্র বলে স্বীকার করে নেয়।

সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা

১০; সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশ এবং বাল্মীকি রামায়নের সমাপ্তি

সীতার পাতাল প্রবেশ দিয়ে বাল্মীকি তাঁর রামায়ণের যবনিকা টানেন। বাল্মীকির রচনা অনুসারে অবশেষে, সীতা দেবী ধরিত্রীতে প্রবেশ করেন কারণ তিনি বারবার নিজের নির্দোষতা প্রমাণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষকরে কিছু লোকের কাছে যারা তার সতীত্ব মেনে নিতে রাজি ছিল না। সীতা ধরিত্রী মাতাকে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি এসে তাঁকে যেন তাঁর জন্মস্থানে নিয়ে যান। যেহেতু লব এবং কুশ তাদের পিতার সাথে পুনরায় মিলিত হয়েছিল, তিনি ভেবেছিল যে দুই পুত্রের প্রতি তাঁর (সীতার) কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে এবং তাই তিনি পৃথিবী ছেড়ে তার নিজের

আবাসে (স্বর্গধামে) যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর প্রাথনায় ভূমিদেবী মাধ্যমে তিনি বিষ্ণুধামে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করলেন। বাল্মীকির রামায়ণে সীতার ধরিত্রীতে প্রবেশের যুক্তি এটাই। বাল্মীকির বর্ণনা অনুসারে ভূমিদেবী মাটির নিচ থেকে উঠে একটি উজ্জ্বল সিংহাসনে বসেছিলেন। ভূদেবী তাঁর কোলে সীতাদেবীকে তুলে নিলেন, এবং তারপর তাঁরা আবার ডুবে গেল, এবং মাটি তাদের উপর বন্ধ হয়ে গেল। দেবতারা সীতার সম্মানে ফুল বর্ষণ করেছিলেন। আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্যের এটিই অকল্পনীয় সমাপ্তি।

১১; রামচন্দ্রের সাথে ঋষি বাল্মীকির সাক্ষাৎ নিয়ে বিতর্ক; তথ্যসূত্র

বাল্মীকির ভগবান রামের সাথে সাক্ষাৎ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে –তা আমরা কম বেশি অনেকেই জানি।

কিছু বিশ্বাস অনুসারে, একদিন বাল্মীকি তাঁর আশ্রমে ভগবান রাম, তাঁর স্ত্রী সীতা এবং ভাই লক্ষ্মণকে অভ্যর্থনা জানান। বাল্মীকির পরামর্শে ভগবান রাম আশ্রমের কাছে চিত্রকূট পাহাড়ে তাঁর কুঁড়েঘর তৈরি করেন। তবে, বাল্মীকির ভগবান রামচন্দ্রের সাথে সাক্ষাৎ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। উত্তরা কাণ্ড, যেখানে তিনি সন্তানদের লালন-পালন করছিলেন, তা অনেকেই তাঁর নিজস্ব কাজ বলে বিতর্ক করেন। অনেকে মনে করেন তিনি দ্বাপর যুগে বাস করতেন, যদিও আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে রাম ত্রেতা যুগের অবতার। তাই যুক্তিসঙ্গতভাবে ভগবান রামের সাথে বাল্মীকির সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে ঋষি বাল্মীকি পূর্বজন্মে ভগবান রাম, সীতা এবং তাদের পুত্র - লভ এবং কুশের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এখানে কেউই কোনও চূড়ান্ত মন্তব্য করতে পারে নি।

বিতর্কটি সমাধান করার জন্য এবং ঋষি বাল্মীকি ভগবান রামের সাথে দেখা করেছিলেন কিনা তার সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য কোন গবেষণা করার মতো জ্ঞান এবং ক্ষমতা আমার নেই। আমি পুরাণ

সাহিত্য অনুসারে ঋষি বাল্মীকির অলৌকিক জীবন সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করেছি। তবে, আমি বিশ্বাস করি মহর্ষি বাল্মীকির জ্ঞান এবং ভগবান রামের প্রতি তাঁর প্রেম ও ভক্তি দিয়ে রচিত রামায়ন মহাকাব্য আমাদের হৃদয়কে বিষ্ণুর অবতার ভগবান রামের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তিতে পূর্ণ করে।

তথ্যসূত্র

১. মহর্ষি বাল্মীকির শিক্ষা; https://mysticalbee.com/teachings-of-maharishi-valmiki/

২. প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র থেকে ভারতীয় ধর্ম- ব্যবস্থাপনার মুক্তা উৎস

৩. https://theindiandharma.org/2017/03/24/episode-24-lord-brahma-rephrases-valmiki-maharishis-first-sloka/

৪. https://thedal.info/maa-nishaada-worlds-first-sloka/

৫. উইকিপিডিয়া

৬. https://pressbooks.pub/ramayana/chapter/chapter-10-valmiki-and-the-ramayana/

মহর্ষি ব্যাস (বেদব্যাস)

মহর্ষি ব্যাসদেব বা বেদব্যাস হিন্দুধর্মের একজন অত্যন্ত বিখ্যাত ঋষি। মহর্ষি বেদব্যাস আবার কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস নামেও পরিচিত। তাঁকে বেদ-ব্যাস বা "বেদের বিভাজক" বলা হত কারণ তিনি বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করেছিলেন যাতে মানুষ বেদের ঐশ্বরিক জ্ঞান সঠিকভাবে বুঝতে পারে। পণ্ডিতেরা বলেন, বেদ ব্যাসের আক্ষরিক অর্থ হল "বেদের সংকলক"। মহর্ষি ব্যাসদেব, বেদ সংকলন ও মহাভারত রচনার জন্য বিখ্যাত। তিনি বেদকে সহজবোধ্য করার জন্য একটি নতুন বিন্যাস তৈরি করেন, যা আগে ছিল না। তিনি আরও মহাভারত রচনা করেন, যা ভারতীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ব্যাসদেব বেদের চারটি অংশ - ঋগবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ যা তিনি সংকলন করেন। ঐতিহ্যগতভাবে মহাভারত, পুরাণ এবং ব্রহ্মসূত্র রচনার ব্যাসদেবের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। ব্যাসদেব মহাভারত একটি বিশাল কাব্য। ব্যাসদেব ছিলেন জ্ঞান ও দর্শনের এক বিশাল ক্ষেত্র। তিনি বিভিন্ন ঋষির কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন, যেমন- নারদ ও ব্রহ্মার কাছে। তবে তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

বলা হয়, মহর্ষি ব্যাস সকল সৃষ্টির রহস্য জানতেন। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান তাঁকে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারত রচনার সমর্থ করেছিল। যেহেতু তিনি কর্ম, বেদ, তপস্যা ও যোগ, ধর্ম, প্রার্থনা, অর্থ (বস্তুগত সম্পদ), কাম (কামনা), শাস্ত্র এবং সমাজ সম্পর্কে সবকিছু জানতেন, তাই তিনি ঐ সকল জ্ঞান প্রয়োগ করে মহাভারতের ন্যায় বিশাল মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। তিনি প্রায় সমস্ত জনপ্রিয় হিন্দু সাহিত্যের কিংবদন্তি লেখক বলে কথিত আছে, যেমন মহান ব্রহ্মসূত্র, ১৮টি মহাপুরাণ এবং ১৮টি ক্ষুদ্র পুরাণ, যার মোট ৪,০০,০০০ শ্লোক রয়েছে। তাঁর রচিত ১৮টি মহা পুরাণ হল: ব্রহ্ম পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, শিব পুরাণ বা বায়ু পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, নারদ পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বরাহ পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, বামন পুরাণ, কূর্ম পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, গৌরী পুরাণ, শারীরিক পুরাণ। ব্যাসদেব এই পুরাণগুলিকে দ্বাপর যুগে সংক্ষিপ্ত করেন বলে পুরাণ শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে।

জন্ম

ব্যাসদেব সত্যবতী এবং পরাশর মুনির পুত্র। তাঁর জন্ম যমুনা নদীর দ্বীপে, তাই তাঁর অন্য নাম ছিল দ্বৈপায়ন। যদিও তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ কোথাও উল্লেখ করা হয়নি তবে তাঁর শুভ জন্মদিনটি জুন-জুলাই মাসের পূর্ণিমা তিথিতে গুরু পূর্ণিমায় পালিত হয়। সত্যবতী ব্যাসদেবের মা ছিলেন শান্তনু রাজার সাথে বিবাহের পূর্বে। তাঁর জন্ম সম্পর্কে একটি বিশাল পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে।

বেদব্যাসের জন্ম সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনী

আগেই বলা হয়েছে, ঋষি ব্যাসদেব ছিলেন সত্যবতী এবং ঋষি পরাশরের পুত্র। যৌবনকালে, সত্যবতী ছিলেন একজন জেলে যিনি নদীতে নৌকা চালাতেন। একদিন, ঋষি পরাশর দূরবর্তী স্থানে এক যজ্ঞে যোগদানের জন্য ভীষণ ব্যাস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সত্যবতী তাকে নদীর সীমানা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছিলেন। পরাশর সত্যবতীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে তার

উত্তরসূরী চেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি পরাশরের ইচ্ছায় রাজি হননি এবং বলেছিলেন যে অন্যান্য সাধু সেটা দেখবেন এবং তাঁর পবিত্রতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠবে। তাই পরাশর ঝোপঝাড় দিয়ে একটি গোপন স্থান তৈরি করলে সত্যবতী তাঁদের যৌনমিলনে রাজি হলেন। পরে সত্যবতী ব্যাস নামে একটি শিশু পুত্রের জন্ম দেন। বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে, ব্যাস যমুনার কল্পী দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিংবদন্তি অনুসারে, তিনি যমুনা নদীর একটি দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দেহের বর্ণ কালো হওয়ার কারণে, ব্যাসের নাম কৃষ্ণ রাখা হয়েছিল, 'দ্বৈপায়ন' নামটিও যোগ করা হয়েছে, যার অর্থ "দ্বীপে জন্মগ্রহণকারী"। এইভাবে তার সম্পূর্ণ নাম হয় কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ ব্যাস

সত্যবতীর নৌকায়, সত্যবতীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ ঋষি পরাশর

এইভাবে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্মের পর ঋষি পরাশর তাকে তাঁর সাথে নিয়ে যান। তিনি এই ঘটনাটি গোপন রেখেছিলেন, এমনকি রাজা শান্তনুকেও বলেননি যে তিনি পরবর্তীকালে কাকে বিয়ে করেছিলেন। পুরাণ কিংবদন্তি অনুসারে, পূর্বজন্মে ব্যাস ছিলেন ঋষি অপান্তরতম, যিনি ভগবান বিষ্ণু "ভূ" উচ্চারণ করার সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন। জন্ম থেকেই তিনি বেদ, ধর্মশাস্ত্র এবং উপনিষদের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বিষ্ণুর নির্দেশে, তিনি ব্যাস রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন।

মহাবিষ্ণু নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ব্যাস দ্বাপর যুগে পরাশরের পুত্র হিসেবে পুনর্জন্ম লাভ করবেন, এবং বেদের বিভাজন এবং

পদ্ধতিগতকরণের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হবে। কথিত আছে, যেহেতু মহাবিষ্ণুর উচ্চারিত "ভু" ধ্বনি থেকে আপান্তরতমসের জন্ম হয়েছিল, তিনি জন্ম থেকেই বেদ, ধর্মশাস্ত্র এবং উপনিষদে জ্ঞানী ছিলেন। (ref. https://manavata.org/vyasa/)

হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু ও রাণী সত্যবতী এবং ব্যাসদেবের বিস্ময়কর কাহিনী;

মহাকাব্য মহাভারতে, হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু এবং সত্যবতীর কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সত্যবতী ছিলেন তাঁর গ্রামের জেলেদের প্রধানের দত্তক কন্যা। একসময় শান্তনু যখন যমুনা নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন তিনি সত্যবতীকে দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন, তিনি সত্যবতীকে বিয়ে করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর বাবা, একজন জেলে হয়েও শর্ত রেখেছিলেন যে সত্যবতীর পুত্র রাজা হবেন। অর্থাৎ সত্যবতীর পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করার জন্য জোর দিলেন, যার অর্থ শান্তনুর প্রথম পুত্র ভীষ্ম, সিংহাসনের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। শান্তনু প্রথমে তার পুত্র ভীষ্মের জন্মগত অধিকারের কারণে এই শর্তটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই অবস্থায় গভীরভাবে দুঃখিত শান্তনু গভীর অনুশোচনার সাথে বিষয়টি বিবেচনা করেন। ভীষ্ম তাঁর পিতার দুর্দশা বুঝতে পেরে ব্রহ্মচারী থাকার প্রতিজ্ঞা করেন এবং সত্যবতীর পুত্রকে রাজা করার জন্য ভীষ্ম সিংহাসনের অধিকার ত্যাগ করেন। এরপর রাজা শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতী বিবাহ হয়। কালক্রমে, শান্তনু এবং সত্যবতীর দুটি পুত্র হয়, যাদের নাম চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য। শান্তনুর মৃত্যুর পর, চিত্রাঙ্গদ অল্প সময়ের জন্য রাজা হিসেবে রাজত্ব করেন, কিন্তু গন্ধর্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দুঃখজনকভাবে চিত্রাঙ্গদ নিহত হন। অন্যদিকে বিচিত্রবীর্য চিরকাল দুর্বল এবং অসুস্থ ছিলেন। এরপর সত্যবতী ভীষ্মের কাছে গিয়ে তাঁর দুর্বল ও অসুস্থ পুত্র বিচিত্রবীর্যের জন্য রানী খুঁজতে বলেন। ভীষ্ম কাশীর (বর্তমানে বারাণসী) রাজার আয়োজিত স্বয়ম্বরে যোগ দেন এবং অন্যান্য সমস্ত রাজাদের উপর বিজয় লাভ করেন। তবে, অম্বা প্রকাশ্যে স্বয়ম্বরের বিরোধিতা করেন

কারণ তিনি ইতিমধ্যেই শল্বের রাজপুত্রের প্রেমে পড়েছিলেন, যা অনুষ্ঠানের নিয়মের বিরুদ্ধে ছিল। ভীষ্ম পরে জানতে পারেন যে কাশীর রাজা তাঁর বড় মেয়ের প্রেম সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। ফলস্বরূপ, ভীষ্ম অম্বাকে মুক্তি দেন, রাজপুত্র শাল্ব রাজ্যে গিয়ে রাজপুত্রকে বিয়ে করার অনুমতি দেন, দুর্ভাগ্যবশত, রাজপুত্র তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। অম্বা ভীষ্মের কাছে ফিরে এসে তাকে বিয়ে করার জন্য ভীষ্মকে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্যের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিলেন। সত্যবতীর ইচ্ছাতেই ভীষ্ম আগেই বাধ্য হয়ে অঙ্গীকার করেছিলেন যে তাঁর বংশধররা কখনও হস্তিনাপুরের সিংহাসন দাবি করবে না। অম্বা ভীষ্ম এবং শাল্বের ঘোর চক্রের হতাশ হয়ে তিনি ভীষ্মকে হত্যা করার শপথ নেন।

এরপর ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যকে কাশীর রাজার দুই সুন্দরী কন্যা অম্বিকা এবং অম্বালিকার সাথে বিবাহ দেন। বিচিত্রবীর্য তার স্ত্রীদের খুব ভালোবাসেন। কিন্তু সাত বছর ধরে যৌন মিলনের পরও তিনি নিঃসন্তান থাকেন এবং যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন এবং তার বন্ধুবান্ধব এবং চিকিৎসকদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সুস্থ হতে পারেননি। তার ভাই চিত্রাঙ্গদের মতো, তিনিও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। ফলে সত্যবতী হতাশায় ডুবে যান এবং বংশের বিলুপ্তি কীভাবে রোধ করা যায় সে নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েন। তিনি ভীষ্মকে দুই রাণীর সাথে বিবাহ করার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা এবং তাঁর পিতার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি ছিল তিনি কখনও বিবাহ করবেন না। ফলস্বরূপ, তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারেননি। হতাশায়, সত্যবতী ভীষ্মের কাছে তার অতীতের গোপন কথাগুলি বিশ্বাস করে বলেন এবং ঋষি ব্যাসদেবকে হস্তিনাপুরে ডেকে আনার জন্য অনুরোধ করেন।

তাঁর বংশের সম্ভাব্য বিলুপ্তির মুখোমুখি হয়ে, রানী সত্যবতী তার পুত্র বেদব্যাসকে তার বিধবা পুত্রবধূ অম্বিকা এবং অম্বালিকার সাথে সহবাস করার জন্য অনুরোধ করেন, যাতে তারা সন্তান জন্ম দিতে পারে। মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে, ঋষি ব্যাসের মধ্য থেকে তখন বেরিয়ে এসেছিল এক তীব্র ও উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক আভা। তীব্র ও

উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক আভাযুক্ত দাড়িওয়ালা বেদব্যাসকে দেখে অম্বিকা চোখ বন্ধ করে ফেলেন এবং ফলস্বরূপ একটি অন্ধ পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়।

ব্যাসের সাথে দেখা করার পর অপর রাণী অম্বালিকা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যান, যার ফলে তাদের সন্তান পাণ্ডুর গায়ের রঙও ফ্যাকাশে হয়। এই পরিণতিতে ভীত হয়ে সত্যবতী ব্যাসকে অনুরোধ করেন অম্বিকার সাথে আবার দেখা করে তাকে আরেকটি পুত্র সন্তান দান করার জন্য। পরিবর্তে, অম্বিকা তার দাসীকে ব্যাসের সাথে দেখা করতে পাঠান। ধৈর্যশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ দাসী শান্ত থাকেন এবং পরবর্তীতে একটি সুস্থ সন্তানের জন্ম দেন, পরে যার নাম 'বিদুর' রাখা হয়। এইভাবে, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর উপরোক্ত উপায়ে ব্যাসের পুত্র হন, যেখানে তাঁর প্রকৃত আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী ছিলেন শুক নামে আরেক পুত্র। শুকের জন্ম তাঁর স্ত্রী পিঞ্জলা (যা ভাটিকা নামেও পরিচিত), যিনি ঋষি জাবালির কন্যা ছিলেন। গল্পে মাঝে মাঝে শুককে তরুণ কুরু রাজপুত্রদের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হিসেবে দেখা যায় যিনি তাদেরকে জ্ঞান ও নির্দেশনা প্রদান করতেন। এই হল হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু ও রাণী সত্যবতী এবং ব্যাসদেবের বিস্ময়কর কাহিনী। (উৎস; পুরান সমগ্র, মহাভারত, ও উইকিপেডিয়া)

ব্যাসদেবের শিক্ষা ও দর্শন

বেদব্যাসের শিক্ষা ও দর্শনের মূল বিষয়গুলি আমদের জানা দরকার। বেদব্যাসের রচনা ও সাহিত্য বিশেষ করে ধর্ম (ধার্মিকতা), ভক্তি এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। তাঁর রচনাগুলি সত্য, করুণা এবং ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ শেখায়। বিশেষ করে ভগবদগীতা ব্যক্তিদের মুখোমুখি হওয়া নৈতিক দ্বিধাগুলিকে সমাধান করে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে আমদের ধার্মিক জীবনযাপনের উপর তার রচনা ও দর্শন নির্দেশনা প্রদান করে। বেদব্যাসের জীবন ও রচনা হিন্দু দর্শন এবং বিশ্ব সাহিত্যেও এক অমোচনীয় ছাপ রেখে গেছে। তাঁর বেদ সংকলন, মহাভারতের রচনা এবং পুরাণের রচনা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে

অনুপ্রাণিত ও পথপ্রদর্শন করে চলেছে। তাঁর রচনা এবং অবদান হিন্দু দর্শন, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করেছে। তাঁকে চিরঞ্জীবী (অমর সত্তা) হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং একজন কালজয়ী ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মানিত করা হয়, কারণ তাঁর শিক্ষা যুগ যুগ ধরে প্রাসঙ্গিক।

ব্যাসদেবের জীবনে কিছু অলৌকিক ঘটনা;

ঐশ্বরিক পিতৃত্ব;

যেমনটি শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর একটি ঐশ্বরিক জন্ম এবং ঐশ্বরিক শতাংশ ছিল। ঋষি পরাশর এবং সত্যবতীর মধ্যে একটি ঐশ্বরিক মিলনে গর্ভধারণের মাধ্যমে তাঁর জন্ম হয়। ঋষি পরাশর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তান একজন মহান ঋষি, ভগবান বিষ্ণুর আংশিক অবতার, যিনি বেদ সংকলন করবেন, সবার শ্রদ্ধেয় আধ্যাত্মিক শিক্ষক এবং দার্শনিক হবেন।

অসাধারণ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান

শৈশবকাল থেকেই, ব্যাসদেব বেদ এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের উপর গভীর প্রজ্ঞা এবং বোধগম্যতা প্রদর্শন করেছিলেন, যার ফলে তিনি সেগুলিকে বর্তমান আকারে সংকলন এবং সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর অনন্য এবং অসাধারণ জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা তাঁকে মহাভারতের ন্যায় একটি বিশাল মহাকাব্য রচনা করতে সক্ষম করেছিল। কথিত আছে যে যখন তিনি মহাভারত লিখছিলেন, তখন ভগবান গণেশ তাঁর লেখক বা প্রতিলিপিকার হিসেবে দ্রুত গতিতে মহাকাব্যটি লিখেছিলেন।

মহাকাব্যটি লেখার সময় গণেশ বেদব্যাসের লেখক হিসেবে দ্রুত গতিতে লিখছেন

হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণে তিনি তাঁর অপরিসীম জ্ঞান, অসাধারণ বৌদ্ধিক ক্ষমতা এবং অনেক অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের পবিত্র সংগ্রহ বেদ সংকলন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাকাব্য মহাভারত রচনার জন্য তাঁর যুগান্তকারী কৃতিত্ব রয়েছে। এখানে তাঁর জীবনের আরও কিছু অলৌকিক সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল। :

১০১ পুত্রের সৃষ্টি: কথিত আছে যে ব্যাসদেব তাঁর যোগশক্তি ব্যবহার করে গর্ভের নির্জীব অংশ থেকে ১০১ জন পুত্র সৃষ্টি করেছিলেন।

সর্বজনীন জ্ঞান এবং বেদের সংকলন: জন্ম থেকে ব্যাসদেবের বিশাল জ্ঞান উপলব্ধি এবং প্রতিভা তাঁর বেদ সংকলনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, যার জন্য অপরিসীম বৌদ্ধিক ক্ষমতা এবং ঐশ্বরিক নির্দেশনার প্রয়োজন ছিল।

পোকামাকড়ের রূপান্তর: ব্যাসদেব একটি জীবন্ত পোকামাকড়কে মানুষে পরিণত করার ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত। প্রাকৃতিক জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমত্ প্রদর্শন করেছেন।

ভবিষ্যদ্বাণী: ব্যাসদেব যে বিষয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন, এমনকি নির্দিষ্ট কর্মের পরিণতিও সম্পর্কেও ভবিষ্যৎ বানী করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি অম্বিকা এবং অম্বালিকার গর্ভে অন্ধ শিশুদের জন্মের সম্ভাবনার কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং তাদের জন্মের ফলে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অবতার এবং আধ্যাত্মিক দীপ্তি: কিংবদন্তি অনুসারে, ব্যাসের জন্মের সাথে তিনি দ্বীপে একজন উজ্জ্বল এবং সুদর্শন শিশুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।ব্যাসের জন্মকে পবিত্র গর্ভধারণের

একটি উদাহরণ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। তাঁর সত্যবতী কুমারী অবস্থায় তাঁকে জন্ম দিয়েছিলেন।

মহাভারত এবং ধর্ম জ্ঞান: ব্যাসের মহাভারত রচনাকে একটি অলৌকিক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এতে ধর্ম, কর্তব্য এবং মানব জীবনের জটিলতা সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দর্শন রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্য এবং লক্ষ্য লক্ষ্য ভক্তদের কাছে এক মহান ত্রাণকর্তা; ঈশ্বরস্বরূপ। অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সারাটা জীবন ছিল অদ্ভূত লীলাময়। তাঁর জন্মের আগে থেকেই তাঁর পিতামাতা তাঁর জন্ম-সম্পর্কে বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ঐ সকল ঘটনার মধ্যে কয়েকটি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় বাঙালি যোগীপুরুষ, সাধক, দার্শনিক ও ধর্মগুরু। তাঁর ধর্মীয় চিন্তাধারায় তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মিশন। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ –এই দুই সাধক এবং সন্ন্যাসী ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর হিন্দু নবজাগরণ এবং সনাতন বৈদিক হিন্দুধর্ম নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা ছিলেন।

জন্ম ও শৈশব

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ১৮ই ফেব্রুয়ারি,১৮৩৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। গদাধর শৈশবে গদাই নামে তাঁর গ্রামবাসীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। অঙ্কন ও মাটির প্রতিমা নির্মাণে তাঁর ছিল সহজাত দক্ষতা। যদিও প্রথাগত শিক্ষায় তাঁর আদৌ মনোযোগ ছিল না। সেযুগে ব্রাহ্মণসমাজে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষাকে তিনি

"চালকলা-বাঁধা বিদ্যা" বলে উপহাস করতেন।তবে পাঠশালার শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাঁর ঔদাসিনতা থাকলেও নতুন কিছু বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। গান বাজনা এবং রামায়ণ, মহাভারত ও ধর্মীয় উপাখ্যান অবলম্বনে যাত্রাভিনয়ে তিনি শৈশবে ভীষণ পারদর্শী ছিলেন। তীর্থযাত্রী, সন্ন্যাসী এবং গ্রাম্য পুরাণ কথকদের গল্পকথা শুনে অতি অল্প বয়সেই পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত শাস্ত্রে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। মাতৃভাষা বাংলায় তাঁর মাত্র অক্ষরজ্ঞান ছিল; তিনি সংস্কৃত ভাষা অনুধাবনে সক্ষম হলেও সেই ভাষা তিনি বলতে পারতেন না। পুরীর পথে কামারপুকুরে বিশ্রামরত সন্ন্যাসীদের সেবাযত্ন করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্মীয় আলোচনা মন দিয়ে শুনতেন তিনি। ছয়-সাত বছর বয়স থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবতন্ময়তা দেখা দিয়েছিল। এবিষয়ে অনেক অলৌকিক ঘটনা রয়েছে।

পিতৃ পরিচয়

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ক্ষুদিরাম অতিশয় ধর্মপরায়ণ, নির্ভীক ও সত্যপ্রিয় ছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁর অতিশয় ভক্তি ছিল। নিত্যকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করে প্রতিদিন তিনি রঘুবীরের পূজান্তে জলগ্রহণ করতেন। নিষ্ঠা ও সদাচারের জন্য গ্রামবাসীরা তাঁকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মান করত। কথিত আছে, সত্যনিষ্ঠার জন্য প্রজাপীড়ক জমিদার ক্ষুদিরামকে সর্বস্বান্ত করে স্বগ্রাম হতে বিতাড়িত করেছিলেন। সত্য রক্ষার জন্য ক্ষুদিরাম অনেক অত্যাচার ও অবিচারের স্বীকার হয়েছিলেন। তাঁর দেবভক্তি অত্যন্ত গভীর ছিল। বালক গদাধরের বয়স যখন সাত বৎসর তখন ক্ষুদিরাম দেহত্যাগ করেন। পরিণত বয়সে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে ভক্তদের নিকট পিতা ক্ষুদিরামের ঈশ্বরভক্তি ও ধর্মনিষ্ঠার কথা বলতেন।

মাতৃ পরিচয়;

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভাগ্যবতী জননী চন্দ্রমণিদেবী। চন্দ্রমণিদেবীর জন্ম মায়াপুর গ্রামে। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী ছিলেন স্নেহ ও সরলতার মূর্ত প্রতীক। প্রতিবেশীগণ সম্পদে-বিপদে তাঁর ন্যায় দয়া ও সহানুভূতি সম্পন্না রমণী আর কোথাও পেত না। গ্রামের দরিদ্র প্রতিবেশীরা জানত, চন্দ্রাদেবীর নিকট তারা যখনই উপস্থিত হবে, তখনই যথাযথ সাহায্যের সাথে তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা পাবে। ভিক্ষুক ও সাধুদের জন্য তাঁর দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকত। চন্দ্রমণি ৪৫ বৎসর বয়সে গদাধরের আবির্ভাবের পূর্বে প্রায়ই স্বপ্নে দেবদেবীর দর্শনলাভ করতেন।

শ্রী রামকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যকালে কিছু অলৌকিক কাহিনী

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখ্রিষ্ট, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূ, আদিগুরু শঙ্করাচার্যের ন্যায় সকল অবতারগণের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁদের পিতামাতারা যেমন নানারূপ দিব্যদর্শন, দেবস্বপ্ন বা দৈববানী লাভ করেছিলেন, তেমনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা-মাতাও শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের কিছু দিব্যদর্শন ও দেবস্বপ্ন লাভ করেছিলেন। এখানে ঐরূপ কিছু অলৌকিক ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে।

১.১; ক্ষুদিরামের স্বপ্নে বিষ্ণু-অবতার গদাধরের দর্শন লাভ;

রামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম রঘুবীরের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি বিভোর হয়ে রঘুবীরের পুজা-আর্চাদি করতেন। ১৮৩৫ সালে রামকৃষ্ণের জন্মের আগে ক্ষুদিরাম তাঁর পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধারকল্পে পিন্ডদানের উদ্দেশ্যে গয়াধামে গিয়েছিলেন। প্রায় একমাসকাল গয়াধামে অবস্থান করে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম গয়াধামে পিণ্ডদান করেন। যথাবিধি ক্ষেত্রকার্জ সম্পাদন করে তিনি সেখানে বিষ্ণু-অবতার গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ড দান ও অঞ্জলি প্রদান করেন। এরপর সেখানে রাত্রিকালে নিদ্রায় স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেলেন; তিনি যেন মন্দিরে গদাধরের শ্রীপাদপদ্ম সম্মুখে পুনরায় পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করছেন এবং সেই পিতৃপুরুষগন যেন দিব্য জ্যোতির্ময় শরীরে ঐ পিণ্ডগ্রহণ

পূর্বক তাঁকে (ক্ষুদিরামকে) আশীর্বাদ করছেন। ঐ স্বপ্নের মধ্যে তিনি দেখলেন তাঁর পিতৃপুরুষগন অতি শ্রদ্ধাসহ নবদূর্বাদল-শ্যাম জ্যোতির্ময়তনু-সম্পন্ন বিষ্ণু এবং অবতার গদাধরকে প্রনাম করছেন। ঐ স্বপ্নের মধ্যে তিনি আরও দেখলেন দিব্যপুরুষ গদাধর যেন তাঁর স্তুতি ও বন্দনায় পরিতৃপ্ত হয়ে বলতে লাগলেন, "ক্ষুদিরাম, তোমার ভক্তি ও বন্দনায় আমি অতিশয় প্রসন্ন হয়েছি। তাই আমি তোমার সন্তান রূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হয়ে তোমার সেবা গ্রহণ করব।" ঐ দিব্য পুরুষের আশিস বানী শুনে দরিদ্র ক্ষুদিরাম ঐ অকল্পনীয় সৌভাগ্যে স্তম্ভিত হলেন এবং সেই সঙ্গে বিচলিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "প্রভূ, আমি অতি দরিদ্র, কী ভাবে আমি তোমার সেবা করব? তুমি পুত্র হয়ে এলে তোমাকে রাখব কোথায়?" ক্ষুদিরামের ঐ করুণ বচন শুনে গদাধর অনেকবেশী প্রসন্ন হয়ে বললেন, "ভয় নেই, ক্ষুদিরাম, যেমন পারবে, সেভাবেই তুমি আমার সেবা করবে। তুমি যাহাই দেবে, তাহাই আমি তৃপ্তিভরে গ্রহণ করব।" প্রভুর এই আশিস বানীতে ক্ষুদিরামের মনপ্রান ভরে গেল। এরপর তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হলে ক্ষুদিরাম তাঁর ঐ স্বপনের বাস্তবতা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর তখন মনে হয়েছিল এহেন দেবস্বপ্ন বৃথা যাবে না। এরপর স্বপ্নের নির্দেশ অনুযায়ী ক্ষুদিরাম 'রঘুবীর' শালগ্রামশিলা লাভ করেন এবং গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠাপূর্বক তিনি গদাধরের নিত্যপূজা করতে লাগলেন। ক্রমশঃ ক্ষুদিরামের হৃদয় শান্তি, সন্তোষ ও ঈশ্বরভক্তিতে ভরে উঠল। অবশেষে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং তাঁর দেবস্বপ্ন সত্যি হল। তিনি সেই পুত্র সন্তানের নাম রাখলেন গদাধর যিনি পরে হলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

১.২; মাতা চন্দ্রাদেবীর দেবস্বপ্ন;

গয়াধামে ক্ষুদিরাম গদাধরের আবির্ভাবের যে অদ্‌ভুত স্বপ্নাদেশ লাভ করেছিলেন সে কথা বাড়িতে ফিরে কাউকে বলেন নি। নীরবে তিনি প্রমানের অপেক্ষায় থাকবেন- এই সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। তাই চন্দ্রাদেবী স্বামীর স্বপাদেশের কথা আগে জানতে পারেন নি। কিন্তু

স্বামীর ন্যায় স্ত্রী চন্দ্রাদেবীও বাড়িতে *ঐ* সময় দেবস্বপ্ন লাভ করেছিলেন। ক্ষুদিরাম যখন পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দানের জন্য একমাসকাল গয়াধামে ছিলেন সেই সময় চন্দ্রাদেবী এদিকে রাত্রিতে এক অদ্‌ভুত স্বপ্ন দেখলেন। তিনি স্বপ্নের মধ্যে দেখলেন, এক অভূতপূর্ব জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁর শয্যার পাশে যেন শুয়ে রয়েছেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন তাঁর স্বামী শয্যায় শুয়ে রয়েছেন কিন্তু পরে তাঁর মনে হল কোন পার্থিব মানুষের *ঐ*রূপ অপূর্ব রূপ হওয়া সম্ভব নয়। তারপর চন্দ্রমনিদেবীর নিদ্রাভঙ্গ হল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে হঠাৎ *ঐ* জ্যোতির্ময় দিব্যপরুষের স্বপ্ন দেখে তিনি ভীষণ ভয় পেয়েগেলেন।চন্দ্রমনি ভাবতে লাগলেন রাতের অন্ধকারে তাঁর ঘরে কি কোন সৌমদর্শন পুরুষ ঘরে ঢুকেছিল? তাই তিনি তাড়াতাড়ি উঠে প্রদীপ জ্বালালেন। কিন্তু দেখলেন, দরজায় খিল দেওয়া আছে, ঘরের মধ্যে কেউ নেই। ভয়ে তাঁর নানাবিধ চিন্তাভাবনা মনে এল। তিনি ভাবতে লাগলেন- কেউ হয়ত কৌশলে অর্গল খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং জেগে গেছেন দেখে পুনরায় কৌশলে অর্গল বন্ধ করে পালিয়ে গেছে। ভয়ে *ঐ*রুপ নানা চিন্তাভাবনা তাঁর মনে আসতে লাগল। পরদিন সকালে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচরী, ধনী কামারিনী (*মধুসূদন কর্মকারের কন্যা)* এবং ধর্মদাস লাহার কন্যা প্রসন্নকে ডেকে সবকিছু বিস্তারিতভাবে তিনি বললেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন সত্যিই কি তাঁর ঘরে কোন লোক ঢুকেছিল? এই সব কথা *শুনে ধনী কামারিনী ও* প্রসন্ন *দুজনেই হাসতে হাসতে অনেক গালাগালি করে* চন্দ্রমনিকে বলল যে স্বপ্ন দেখে তিনি পাগলামি শুরু করছেন। তারা দুজনে চন্দ্রমনিকে সাবধান করে বলল; *"তোমার অনেক বয়স হয়েছে; তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? স্বপ্ন দেখে এসব উল্টোপাল্টা ভাবছ;* অন্য কাউকে এসব কথা বলার দরকার নেই।*এসব কথা লোকে শুনলে তোমাকে ছি ছি করবে। তো্মার নামে অপবাদ রটিয়ে দেবে।* কেউ তোমার অন্ধকার ঘরে ঢুকেনি রাতে। তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে-ভূলে যাও এসব কথা।" কিন্তু চন্দ্রমনি দেবী কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না যে তিনি সৌমদর্শন এক পুরুষকে স্বপ্নের মধ্যে দেখেছিল। তাঁর এটাও মনে হল কোন সাধারণ মানুষ এত সুন্দর

হতে পারে না। ফলে তাঁর কৌতূহল রয়েই গেল। ভাবলেন স্বামী গয়া থেকে ফিরে এলে এর রহস্য তিনি জানবেন।

১.৩; শিবমন্দিরে মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ থেকে নির্গত দিব্যজ্যোতি চন্দ্রমনিদেবীর শরীরে প্রবেশ;

এরপর একদিন চন্দ্রাদেবী ধনি কামারিনীর সঙ্গে গ্রামের শিবমন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিলেন। ঐ দিন একসময় তিনি শিব মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ধনি কামারিনীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ থেকে নির্গত হয়ে এক দিব্যজ্যোতিতে মন্দির উজ্জ্বল হয়ে গেল।এরপর চন্দ্রাদেবী অনুভব করলেন, সেই দিব্যজ্যোতি বায়ুর ন্যায় তরঙ্গাকারে প্রবলবেগে তাঁর দিকে ছুটে এসে তাঁকে ছেয়ে ফেলল এবং তাঁর শরীরে সহসা প্রবেশ করল। তিনি তখন ধনি কামারিনীকে বলতে লাগলেন দিব্যজ্যোতি তাঁর শরীরে প্রবেশ করছে। কিন্তু এই কথা বলতে বলতে তিনি ভয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ধনি তাঁর চোখে মুখে জল দিয়ে তার মূর্ছা ভাঙ্গিয়ে তাঁকে ঘরে নিয়ে এলো। ধনির শুশ্রূষায় কিছুটা সুস্থ হলে চন্দ্রাদেবী সবকথা পসন্ন ও ধনিকে বললেন। সবকথা শুনার পর তারা প্রথমে স্তম্ভিত হল এবং পরে বলল যে তাঁর বায়ুরোগ হয়েছে। চন্দ্রাদেবী তখন ধনি ও পসন্নকে বললেন "আমার মনে হচ্ছে, ঐ জ্যোতি আমার উদরে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে এবং আমার যেন গর্ভধারনের উপক্রম হয়েছে।" ধনি ও পসন্ন চন্দ্রাদেবীর ঐসব কথা শুনে তাঁকে 'পাগল', নির্বোধ প্রভৃতি বলে তিরস্কার করতে লাগল। কিন্তু চন্দ্রাদেবী অনুভব করলেন- তিনি সন্তান সম্ভবা হয়েছেন।

শ্রীক্ষুদিরাম গয়াধাম থেকে ফিরে এলে চন্দ্রমনিদেবী তাঁর স্বপ্নের কথা এবং শিবমন্দিরে তাঁর শরীরে দিব্যজ্যোতির প্রবেশের ঘটনা সবিস্তারে স্বামীকে জানালেন। ক্ষুদিরাম গয়াধামে নিজের দেব-স্বপ্নের কথা স্মরণ করতে করতে চন্দ্রমনির ঐ স্বপ্ন এবং শিবমন্দিরের ঘটনা মনোযোগ সহকারে শুনলেন। সবকিছু শোনার পর ক্ষুদিরাম চন্দ্রমনিদেবীকে বুঝাতে লাগলেন যে তাঁর ঐ স্বপ্ন কোন এক সাধারণ স্বপ্ন বা শিবমন্দিরের ঘটনা কোন সাধারন ঘটনা

নয়। ওটি ছিল যথাক্রমে একটি দেবস্বপ্ন এবং দিব্যদর্শন। কিন্তু এতে ভয়ের কোন কারন নেই। শ্রীরঘুবীর স্বপ্নের মধ্যে তাঁর দর্শন দিয়েছেন। ঐ ব্যাপারে আরও নিশ্চিত করানোর জন্য গয়াধামে তিনিও যে দিব্যপুরুষ গদাধরের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে কথা চন্দ্রমনিকে বিস্তারে বর্ণনা করলেন। তিনি চন্দ্রমনিকে বললেন যে গয়াধামে তাঁর অবস্থানকালে স্বপ্নের মধ্যে শ্রীরঘুবীর তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে স্বয়ং গদাধর তাঁদের পুত্রসন্তান হয়ে তাঁদের গৃহে অবতীর্ণ হবেন। তারপর তিনি চন্দ্রমনিদেবীকে সতর্ক করে বললেন, "এরপর থেকে তুমি যদি ঐরুপ কোন স্বপ্ন বা দেবদর্শন অনুভব কর, আমাকে ছাড়া আর কাউকে তুমি ঐ কথা বলবে না। শ্রীশ্রীরঘুবীর কৃপাপূর্বক আমাদেরকে যাহাই দর্শন করাবেন তাহাই আমাদের কল্যাণের জন্য"।

যত দিন যায় চন্দ্রমনিদেবীর দেবস্বপ্ন, দিব্যদর্শন ও অনুভব ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বহু জীবনীচরিত থেকে পাওয়া যায়, রামকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে অলৌকিক ঘটনাগুলীর তিন চার মাস বাদ প্রায় সকলে ধীরে ধীরে বুঝতে পারল যে ক্ষুদিরামের পত্নী সত্যি গর্ভধারন করেছেন। ঐ সময় তাঁর দেবস্বপ্ন, দিব্যদর্শন ও অনুভব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তিনি প্রায় প্রতি রাত্রে স্বপ্নে দেবদেবীর দর্শন লাভ করতেন। কখনো কখনো তিনি স্বপ্নের মধ্যে দৈব্যবানীও শ্রবণ করতেন। ঐ সময় চন্দ্রমনিদেবীর রুপলাবন্য অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঐ অবস্থায় তাঁর অভূতপূর্ব রুপলাবন্য দেখে অনেকে ভাবতেন "বুড়োবয়সে গর্ভবতী হয়ে যেভাবে তাঁর রূপ ফেটে পড়ছে, প্রসবকালে হয়তো সে মৃত্যুমুখে পড়বে।" যাইহোক দেবস্বপ্ন, দিব্যদর্শন, দৈববানী শ্রবণ ও ঐশী-অনুভবের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীরঘুবীরের শরণাগত হয়ে ব্রাহ্মণ-দম্পতি তাঁর আবির্ভাবের অপেক্ষায় দিন কাটাতে লাগলেন।

১.৪; ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিষ্ঠ হওয়ার অলৌকিক ঘটনা;

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে ছিল। সেদিন শ্রীরঘুবীরের ভোগ রাঁধতে রাঁধতে আসন্ন প্রসব কালে চন্দ্রমণি দেবী মনের মধ্যে এক অদ্ভুত দৈব-আনন্দ অনুভব

করতে লাগলেন যদিও তাঁর শরীর অবসন্ন হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাঁর মনে হতে লাগল যে তাঁর প্রসব-সময় উপস্থিত। তিনি অতিশয় দুশ্চিন্তায় স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখুনি যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে কে শ্রীরঘুবীরের জন্য ভোগ রন্ধন করবে? বিধিমেনে কেইবা তখন শ্রীরঘুবীরকে ভোগ নিবেদন করবে?" তাঁর দুশ্চিন্তার কথা শুনে ক্ষুদিরাম বললেন, "ভয় নাই, তোমার গর্ভে যিনি আসছেন, তিনি মোটেই শ্রীরঘুবীরের পূজা-সেবায় বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন না। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অতএব, অদ্যকারের শ্রীরঘুবীরের সেবা তুমিই করবে। আগামীকাল থেকে ঠাকুরসেবার জন্য ভিন্ন বন্দোবস্ত করা হবে।" স্বামীর ঐ আশ্বাসে হৃষ্টচিত্তে চন্দ্রাদেবী নিজেই শ্রীরঘুবীরের মধ্যাহ্ন-ভোগ এবং সন্ধ্যাকালীন পূজা আরতি নির্বিঘ্নে সম্পাদন করলেন। রাত্রিতে ধনী এসে চন্দ্রাদেবীর কক্ষে একসঙ্গে শয়ন করল।স্থানাভাবে পার্শ্বস্থ চালাঘর-ঢেঁকিশালে আঁতুড়ঘর নির্দিষ্ট হল। রাত্রি শেষ হতে কিছু বাকী এমন সময় চন্দ্রাদেবীর প্রসবব্যাথা শুরু হল। ধনী তাঁকে ঢেঁকিশালে আঁতুড়ঘরে নিয়ে গেল। অবিলম্বে ঐ ব্রাহ্মান দম্পত্তির বহু আকাঙ্ক্ষিত মহাপুরুষ-পুত্রসন্তান অর্থাৎ আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হলেন ঢেঁকিশালে আঁতুড়ঘরে ধনী কামররিনীর তত্ত্বাবধানে। সেদিনটা ছিল ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন অথবা ইংরেজি ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী। উল্লেখ্য ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরমুহূর্তেই ধনীকামারিনী ও চন্দ্রমণির অলক্ষে হঠাৎ সদ্যোজাত শিশু ভিজে পিচ্ছল মাটিতে পিছলতে পিছলতে উনুনের ভিতর পড়ে গেল, যদিও উনুনে তখন কোন আগুন ছিল না, কিন্তু ছাই-এ ভর্তি ছিল। সদ্যোজাত শিশুকে ভস্মমাখা অবস্থায় ঠাণ্ডা উনুনের ভিতর হতে উঠিয়ে অবতার পুরুষের প্রথম মুখদর্শন ও প্রথম তাঁকে কোলে নেওয়ার পরম সৌভাগ্য ঐ ধনী কামানীই অর্জন করেছিলেন।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরমুহূর্তেই সদ্যোজাত শিশু উনুনের ভিতর

<u>**শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যও কৈশোরকালে অলৌকিক ঘটনা**</u>

১.৫; পাঁচবছর বয়সে ভক্তি-সঙ্গীত, যাত্রাপালাগান, মূর্তি তৈরীতে গদাধরের পারদর্শীকতা;

পাঁচ বছর বয়স থেকে জমিদার ধর্মদাস লাহার নাটমন্দিরের সামনে একটি পাঠশালায় গদাধরের পড়াশুনার শুরু হয়। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই পড়তে এবং লিখতে সমর্থ হলেন। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর খুব একটা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু গদাধরের অনুকরণ ও উদ্ভাবনী শক্তি খুব ভাল ছিল। গ্রামের কুম্ভকারদের দেবদেবীর মূর্তি বানাতে দেখে, তিনি বাড়িতে খুব অল্প বয়সেই দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করে ফেলতেন। আবার চিত্রপট-ব্যবসায়ীদের চিত্রপট তৈরি করতে দেখে তিনি অল্প-বয়সেই ভাল চিত্র অঙ্কন করতে পারতেন। গ্রামের কোথাও পূরানকথা বা পালা যাত্রাগান হচ্ছে শুনলেই সেখানে গিয়ে শাস্ত্রোপখ্যানগুলি তিনি মনোযোগ সহকারে শিখতেন। কিভাবে সেগুলি অভিনয় করা হত, তাহাও তিনি ভালভাবে অনুকরণ করতেন এবং সেগুলি তিনি ভালভাবে অভিনয় করে দেখাতেন ঐ অল্প বয়সে। ফলে সঙ্গীত, দেব-দেবীর স্তব, যাত্রা অভিনয়, মূর্তি তৈরী, ছবি আঁকায় তাঁর ছিল সহজাত পারদর্শীতা। গদাধরের ছিল অসাধারন মেধা ও স্মৃতিশক্তি। অল্প বয়সে তাঁর সাহস, সরলতা ও দেবভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধ্যান, জপ, পূজা করেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন। বাচ্চা বয়স থেকে

তাঁর এতটাই সাহস ছিল যে গ্রামের বয়স্কলোকরা যেখানে ভূতপ্রেত্নির ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকত, তিনি সেখানে অবাধে যাতায়াত করতেন। কিন্তু সংসারের বিষয় বুঝতেন না। টাকা-পয়সা গুনতে জানতেন না।

১.৬; বাল্যকাল থেকেই তাঁর ভাবতন্ময়তা;

ছয়-সাত বছর বয়স থেকেই বালক শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবতন্ময়তা দেখা দিত। বাল্যকালে অনেককার তাঁর ভাবসমাধি হয়েছিল। একবার সবুজ ধানক্ষেতের আলপথ দিয়ে হাঁটার সময় তাঁর চোখ পড়ল আকাশের দিকে। তিনি দেখলেন ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে সারা আকাশ। কাজল কালো মেঘের কোলে সারি বেধে এক ঝাঁক শুভ্র ধবল বক উড়ে যাচ্ছিল। প্রকৃতির ঐ অপরূপ শোভা দর্শনে অতীন্দ্রিয় ভাবসমাধির আবেশে বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে তিনি মাঠের পথে পড়ে যান। মাঠে উপস্থিত বয়স্ক ব্যক্তিগণ তাঁকে ঐ অবস্থায় পথে পড়ে থাকতে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে তাঁর পিতামাতাকে সংবাদ পাঠান এবং ঐ অবস্থায় তাঁকে মাঠ থেকে তুলে বাড়িতে নিয়ে যান। পরে সুস্থ হওয়ার পর বালক গদাধর সকলকে তাঁর সেই অবস্থার ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে প্রকৃতির এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে তিনি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। বাল্যকালে আরও কয়েকবার তাঁর অনুরূপ ভাবতন্ময়তা ঘটেছিল।একবার দেবী বিশালাক্ষীর পূজার সময় এবং আরেকবার শিবরাত্রি উপলক্ষে যাত্রায় শিবের চরিত্রাভিনয়কালে তাঁর ভাবসমাধি ঘটে।

একবার গ্রামের মহিলারা কামারপুকুর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে আনুড় নামে একটি গ্রামে যাচ্ছিলেন বিশালাক্ষি দেবীকে পুজো দিতে। বালক গদাধর তাঁদের সঙ্গ নিয়েছিলেন। মধুর কণ্ঠে মায়ের গান করতে করতে যাচ্ছিলেন তিনি। দেবীর মহিমা কীর্তন করতে করতে গদাধর হঠাৎ বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে মাতৃভাবে তন্ময় হয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর ভাব সমাধি ঘটল। অবিরল ধারায় জল গড়াতে থাকল গদাধরের চোখ থেকে। সন্ত্রস্ত মহিলারা একমনে বিশালাক্ষী দেবীকে স্মরণ করে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

তারপর মহিলারা কিছুক্ষণ তাঁর কানে মা-বিশালাক্ষি দেবীর স্তব করার পরে গদাধর স্বাভাবিক হয়ে ওঠলেন।

১.৭; শিবরাত্রিতে যাত্রায় শিবের চরিত্রাভিনয়ে ভাবসমাধি;

শৈশবে গদাধর গ্রামবাসীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। যদিও প্রথাগত শিক্ষায় তাঁর আদৌ মনোযোগ ছিল না, তবে শাস্ত্রপাঠ, গানবাজনা, অঙ্কন ও মাটির প্রতিমা নির্মাণ, ধর্মীয় উপাখ্যান অবলম্বনে যাত্রাভিনয়ে তিনি খুব পারদর্শী ছিলেন। দলবেঁধে ছেলেদের সঙ্গে যাত্রা করার সময় তিনি কখনো শিব, কখনো কৃষ্ণ সাজে অপূর্ব অভিনয় করতেন।

একবার শিবরাত্রির ব্রত উপলক্ষে গ্রামের সীতানাথ পাইনের বাড়িতে শিব উপাখ্যান নিয়ে যাত্রাভিনয়ের বন্দোবস্ত হয়েছে। সন্ধ্যার সময় খবর এল, যাত্রার দলে যে ছেলেটির শিব পালা করার কথা, সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ফলে যাত্রাপালা বন্ধ হয়ে যাবে। শিব না হলে শিবের পালা হবে কি করে? কাজেই শিব সাজার লোকের খোঁজ পড়ল।তখন সকলে বলতে লাগল, গদাইয়ের বয়স অল্প হলেও সে অনেক শিবের গান জানে। শিব সাজলে তাকে দেখাবেও ভাল। সকলের আগ্রহে গদাইকে শিব সাজিয়ে দেওয়া হল। তারপর এক সময়ে তার আসরে ডাক পড়ল। গদাই উন্মনা ভাবে কোনও দিকে না তাকিয়ে ধীর মন্থর গতিতে আসরে উপস্থিত হলেন। তাঁর জটাজুটমণ্ডিত মস্তক, বিভূতিলব্ধ দেহ, ধীরস্থির পদক্ষেপ ও অচল অটল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা, আর অন্তর্মুখী নির্নিমেষ দৃষ্টি ও ঠোটের কোণে ঈষৎ হাঁসি, এই সব মিলিয়ে এক অপার্থিব রূপ তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে –যা দেখে সকলে বিস্ময়ে ও আনন্দে অবিভূত হল।তাঁর ঐ অপূর্ব ঐশ্বরিক রূপ দেখে মোহিত হয়ে গ্রামবাসীগণ উচ্চৈঃস্বরে হরধ্বনি দিতে লাগল। মেয়েরা কেউ কেউ উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করতে লাগল। গদাধর কিন্তু নির্বিকার। সকলে দেখল গদাধর একইভাবে আসরে স্থির ভাবে দন্ডায়মান রয়েছেন। অনেকক্ষণ পরেও সে স্থান পরিবর্তন করছে না বা কোন কথাও বলছে না। এই দেখে সকলে বিস্মিত হল। দেখা গেল দন্ডায়মান অবস্থাতেই তিনি বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছেন। তাঁর শরীর

আড়ষ্ট হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত পালাগান ভেঙ্গে গেল। আর কয়েকজনে মিলে গদাধরকে কাঁধে তুলে কোনরকমে বাড়িতে পৌঁছে দিল।। সে রাত্রে অনেক সেবা-যত্নেও গদাইয়ের অন্তর্ধানভাব ভঙ্গ হল না।পরদিন সকালে সূর্যোদয় হলে তিনি আস্তে আস্তে প্রকৃতিস্থ হলেন।

গদাধরের বয়স যখন মাত্র সাত বছর তখন ক্ষুদিরামের মৃত্যু হয়। অকস্মাৎ পিতৃবিয়োগে গদাধরের মনে যেমন খুব আঘাত লেগেছিল এবং জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল। ভূতির খাল ও শ্মশান সংলগ্ন বটগাছের তলায় একাকী বালক মগ্ন হয়ে থাকতেন গভীর চিন্তা ও ধ্যানে।তাই পিতৃবিয়োগের পর দশ-বারো বছর বয়স থেকে তাঁর ঐধরনের ভাবসমাধি একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১.৮; বাল্যকালে সাধু-সঙ্গ ও কৌপিন ও বহির্বাস পরে বিভূতি লাগিয়ে সাধু সাজা;

গ্রামে পুরী যাওয়ার পথে জমিদার লাহাবাবুরা যাত্রীদের উদ্দেশ্যে একটি পান্থশালা নির্মাণ করেছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবদর্শনে যাওয়া ও আসার সময় সাধুরা সেখানে বিশ্রাম নিতেন। পিতার মৃত্যুর পর গদাধরের মণে সংসারে অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা তাঁকে পান্থশালায় সাধু-বৈরাগীদের সঙ্গ লাভে অনুপ্রাণিত করত। পান্থশালায় সাধু-সন্ন্যাসীদের সেবা করতে এবং তাঁদের থেকে ধর্মীয় আলোচনা শুনতে তাঁর খুব ভাল লাগত। তাছাড়া গদাধর শাস্ত্র পড়ে জেনেছিলেন যে সাধু-সন্ন্যাসীগন সংসার পরিত্যাগ করে ভগবানের দর্শনাকাঙক্ষী হয়ে বৈরাগ্যে জীবন যাপন করেন এবং সাধুসঙ্গ মানুষকে প্রকৃত শান্তি প্রদান করে। তাই পান্থশালায় ঐ সকল সাধু-বৈরাগীদের কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করতে শুরু করলেন তিনি। সেখানে তিনি দেখতেন সাধু-বৈরাগীরা সকাল ও সন্ধ্যায় ধুনি প্রজ্বলন করে ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন থাকেন এবং ভিক্ষালব্ধ সামান্য আহার ঈশ্বরকে নিবেদন করে অতি সন্তুষ্টচিত্তে প্রসাদ গ্রহণ করতেন। তাঁদের ঐধরনের সহজ সরল ও শান্তিপূর্ণ জীবনধারন বালক গদাধরকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করল। তিনি তাঁদের সঙ্গে

বসে তাঁদের শাস্ত্রালোচনা মনদিয়ে শুনতেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতেন। কখন কখন তাঁদের রন্ধনাদির সুবিধার জন্য, কাষ্ঠ সংগ্রহ করে দিতেন। সাধু-বৈরাগীরাও বালক গদাধরের ভক্তিশ্রদ্ধায় পরিতৃপ্ত হয়ে তদের সঙ্গে বালককে ভোজন করাতেন। যে সকল সাধু ঐ পান্থশালায় দীর্ঘকাল বাস করতেন, তাদের সঙ্গে গদাধর ভীষণ গভীরভাবে মিশে যেতেন। এই ভাবে মাসের পর মাস কাটতে লাগল। গদাধর যখন অষ্টমবর্ষে পড়ল পান্থশালায় ঐ সকল সাধু-বৈরাগীদের সঙ্গে প্রতিদিন গদাধরের অনেকটা সময় কাটতে লাগল। জননী চন্দ্রাদেবী তাঁর সন্তানের প্রতি সাধুদের প্রসন্নতাকে তাঁদের আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করে তাঁদেরকে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য পাঠাতেন। একদিন এক অপূর্ব ঘটনা ঘটল যা চন্দ্রাদেবীর মনে ভয়ের সঞ্চার করল। সেইদিন হঠাৎ নিজের গোটা ভাল কাপড়কে ছিন্ন করে সাধুদের মত কৌপিন ও বহির্বাস পরে সারা শরীরে বিভূতিভুষি লাগিয়ে গদাধর পান্থশালা থেকে ঘরে ফিরে মাকে বললেন; "মা সাধুরা আমাকে কেমন সাজিয়েছেন দেখ"। চন্দ্রাদেবী পুত্রের ঐরূপ বেশভূষা দেখে ভীষণ উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, সাধুরা কোন দিন হয়ত তাঁর ছেলেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাদের সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে এবং তাঁর ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহ ত্যাগ করবে। মায়ের দুশ্চিন্তা এবং কষ্ট দেখে গদাধর খুব মানসিক অশান্তিতে পড়লেন এবং মনে মনে সঙ্কল্প নিলেন যে তিনি সাধুবৈরাগীদের কাছে আর যাবেন না। তাই তিনি সেখানে গেলেন তাদের কাছে শেষ বিদায় নিতে। সেখানে গিয়ে তাঁদেরকে তাঁর মায়ের দুশ্চিন্তার কথা বললেন। ঐ সাধুরা তাঁর মায়ের কাছে এসে বললেন যে পিতামাতার অনুমতি ছাড়া এই অল্পবয়স্ক বালককে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সাধু তৈরি করাকে তারা বড় অপরাধ বলে মনে করেন।

১.৯; বালক গদাধরের রামায়ণ পাঠ শুনে হনুমান পা জড়িয়ে ধরে;

একদিন বিকেলবেলা বালক গদাই রামায়ণ পাঠ করছেন। গ্রামের বৃদ্ধ বৃদ্ধারা মনোযোগ দিয়ে তাঁর রামায়ণ পাঠ শুনছেন। যেখানে

গদাধর রামায়ণ পাঠ করছিলেন তার কাছেই আমগাছের ওপর বসেছিল মস্ত বড় এক হনুমান। হঠাৎ সে লাফ দিয়ে নেমে ঠিক গদাধরের কাছে এসে বসল এবং গদাধরের পা জড়িয়ে ধরল। হনুমানের ভয়ে হইচই করে শ্রোতারা যে যেদিকে পারল পালিয়ে যেতে লাগল। গদাধর কিন্তু একটুও নড়ল না। সে হাসিমুখে হনুমানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। মনে হল শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদ পেয়ে খুশি হয়ে রামভক্ত হনুমান আবার লাফ দিয়ে গাছে উঠে গেল।

১.১০; বিশালাক্ষীর মন্দিরের বালক গদাধরের ভাব সমাধি

কামারপুকুর থেকে দু'মাইল দূরে আনুড় গ্রাম। সেখানে বিশাল এক গাছের তলায় দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির।মাঠের মধ্যে খোলা আকাশের নীচে দেবীর অবস্থান।আশপাশের গ্রামের লোকেরা ভক্তিভরে বিশালাক্ষীর মন্দিরে পুজো দিত। একবার কামারপুকুর গ্রামের মেয়েরা দলবেঁধে চলেছে বিশালাক্ষী দেবীর পুজো দিতে। হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এসে গদাধর সেই দলে ঢুকে পড়ল। দেবীর গান করতে করতে সকলের সঙ্গে চলতে লাগল।বিশালাক্ষী মন্দিরের কাছে যেতেই হঠাৎ গদাইয়ের গান থেমে গেল। তাঁর দুচোখ বেয়ে পড়তে লাগল জলের ধারা। অবশ হয়ে গেল তাঁর শরীর। প্রসন্ন নামে মেয়েটি এগিয়ে এসে তাকে ধরতেই তার কোলে অবসন্ন হয়ে ঢলে পড়ল গদাই। তাঁর এই অবস্থা দেখে মেয়েরা ব্যাকুল হয়ে পড়ল। সকলে গদাইকে ঘিরে বসে তাকে হাওয়া বাতাস এবং চোখেমুখে জল দিতে লাগল। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ফিরল না। অবশেষে বালকের ওপর দেবীর ভর হয়েছে মনে করে মেয়েরা দেবীজ্ঞানে গদাইকেই সম্বোধন করে ডাকতে লাগল এবং বলতে লাগল "মা বিশালাক্ষী, প্রসন্ন হও , মা রক্ষা কর। মা মুখ তুলে তাকাও।" মেয়েরা কয়েকবার ওই রকম দেবীর নাম করতে না করতেই গদাইয়ের জ্ঞান ফিরে এল। সে হাসিমুখে উঠে বসল। প্রসন্ন তখন মেয়েদের ডেকে গদাইকে কিছু খেতে দিতে বলল। কিন্তু কি খেতে দেবে গদাইকে তারা? তাদের কাছে মায়ের ভোগের সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। প্রসন্ন বলল, "ভোগের জিনিসই আলাদা

করে ওকে দাও। ওকে খাওয়ালেই আমাদের পুণ্যি হবে "। তখন অনেকে সরল বিশ্বাসে পুজোর জন্য আনা নৈবেদ্য থেকে কলা, দুধ, বাতাসা গদাইয়ের মুখে তুলে দেয়। আট বছরের গদাই সকলকে বলল যে দেবীর চিন্তা করতে করতে তাঁর পাদপদ্মে তার মন লয় হওয়াতে তার ঐ রকম অবস্থা হয়েছিল।

১.১১; বালক গদাধরের জাতিভেদ ও লোকাচারে বিরোধিতা।

সাত বছর বয়সে গদাধরের পিতৃবিয়োগ ঘটে। গদাধর যখন নয় বৎসরে পদার্পণ করেন, তাঁর মাতা ও অগ্রজ রামকুমার তাঁর উপনয়নের বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। ঐসময় একটা সমস্যা এসে দেখা দিল। চন্দ্রাদেবীর ঘনিষ্ঠ সহচরী, ধনী কামারিনী গদাধরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং বাল্যকালে অনেক সময়ে তাঁকে খাওয়াতেন ও দেখাশুনা করতেন। ধনী কামারিনী গদাধরের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন-তাঁর উপনয়নের সময় তার (কামারিনীর) কাছ থেকে তিনি যেন প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করে তাকে মাতৃসম্বোধনে কৃতার্থ করেন। গদাধরও সেদিন ধনী কামারিনীর ঐ ইচ্ছা পুরনের জন্য অঙ্গীকার করেছিলেন। ধনী কামারিনী তাঁর অঙ্গীকারকে সম্পূর্ন বিশ্বাস করে তার অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে যথাযথ অর্থ সংগ্রহ করে ঐ শুভ দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল থেকেই ধনী কামারনীকে 'মা' বলে ডাকতেন। নয়বছর বয়সে উপনয়নের সময় গদাধর জেদ ধরলেন-তাঁর দাইমা ধনী কামারনীকে ভিক্ষে মা করতে হবে, কারণ তিনি এব্যাপারে আগেই কথা দিয়ে ছিলেন। প্রচলিত লোকাচারের বিরুদ্ধে গিয়ে সত্যরক্ষায় দৃঢ় সংকল্প বালকের সামনে কারোর কোনো আপত্তি বাধা নিষেধ টিকলো না। অন্য সকলের মতের বিরুদ্ধে ধনীর নিকট হতে সর্বাগ্রে ভিক্ষা গ্রহণ করে তাঁর পূর্বাভিলাষ পূরণে স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তিমতী ধাত্রীমাতা ও ভিক্ষামাতা ধনীও বাৎসল্যভাবে অসীম আনন্দ লাভ করলেন। এটি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

সকলের মতের বিরুদ্ধে ধনীকামারনীর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাগ্রে ভিক্ষা গ্রহণ

২; শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক সাধনা লীলা

২.১; "সব ধর্মের উপর অসাধারণ সাধনা;

"যত মত তত পথ" - সব ধর্মের এই সার কথাটি এত সহজ করে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কোন অবতার বা মহাপুরুষ বলে যেতে পারেননি। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব ধর্মের উপর সাধনা করে এবং ধর্ম-সমুদ্র মন্থন করে তিনি আমাদের জন্য তুলে এনেছিলেন বিশ্বধর্মের এই অমৃতবাণী। তবে তাঁর এই বানী শুধুই তাঁর কথার কথা নয়। জীবন দিয়ে এবং বিভিন্ন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই পরম সত্য। এমনকী তিনি গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম ধর্মও।

গদাধরের বয়স যখন সতের বছর, তাঁর অগ্রজ রামকুমার তাঁকে কলকাতায় নিজের টোলে নিয়ে আসেন। গদাধর তখন অগ্রজকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে তিনি চালকলা বাঁধা বিদ্যা শিখবেন না। তিনি এমন বিদ্যা শিখতে চান যার দ্বারা তাঁর প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় এবং তিনি সত্যিকারের মানুষ হতে পারেন। ১৮৫৫ সালে কলকাতার কৈবর্ত সমাজের ধনী জমিদারপত্নী রানি রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন তখন রামকুমার সেই মন্দিরে প্রধান পুরোহিতের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।জমিদারপত্নীর অনুরোধেই গদাধর সেই মন্দিরে আসেন।তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ হন নি। তিনি ও তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রাম (হৃদে) রামকুমারের সহকারী

পূজক হিসাবে প্রতিমার সাজসজ্জার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৫৬ সালে রামকুমারের মৃত্যু হলে গদাধর তার স্থলাভিষিক্ত হন। মন্দিরের আঙিনায় তাঁকে একটি ছোটো ঘর দেওয়া হয় তাঁর থাকার জন্য। এই ঘরেই তিনি অতিবাহিত করেন তাঁর সাধনা এবং লীলাময় জীবন। সেখনে শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত নিকটজন ভাগ্নে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় (হৃদে)সুদীর্ঘ তেইশ বছর তাঁর সেবা করে তাঁর সাধনায় সহায়ক হয়েছিলেন। দু'জনে প্রায় সমবয়সী ছিলেন।হৃদে সবসময় নিত্য-সেবক হয়ে মামার সঙ্গে ছায়ার মত থেকে সাধন-কর্মে সাহায্য করতেন। এছাড়া রাণী রাসমণির সেজ জামাতা মথুরা মোহন বিশ্বাস (মেথুরবাবু নামে পরিচিত)যিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবজ্ঞানে ভক্তি করতেন।

১৮৬০ সালের ডিসেম্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে ছেড়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। বিবাহের পর শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে পুণরায় মন্দিরের কাজ গ্রহণ করেন। তখন থেকে তাঁর অধ্যাত্ম-পিপাসা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর সাধনা সুরু হয়। প্রধানত ১৮৬১ থেকে ১৮৭৩ পর্যন্ত এই ১৩ বৎসর ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকাল। তিনি ১৮৬১-৬৩ সালে তন্ত্রসাধনা, ১৮৬৪ সালে বৈষ্ণবীয় ভক্তিসাধনা, ১৮৬৪-৬৫ তে বৈদান্তিক সাধনা, ১৮৭৩ সালে খ্রিস্টীয়ধর্মে সাধনা করেছিলেন। এছাড়া ১৮৮৬-৮৭ সালে তিনি ইসলাম সাধনা করেছিলেন। এই ভাবে বিভিন্ন ধর্মমতে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে প্রকৃত সত্যের সন্ধান করেছিলেন এবং এর ফলে অতি সহজ ও সরল ভাবে বিশ্ববাসির কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁর সেই অমৃতবাণী 'যত মত তত পথ'। তাই শ্রীঅরবিন্দ লন্ডন থেকে দেশে ফেরার পর থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগী হয়ে ছিলেন। তিনি তাঁর 'ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে—লিখেছেন; 'পাঁচশত বিগত বৎসরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মতো দ্বিতীয় এক পুরুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন নি।' তাঁর এই মন্তব্যের প্রেক্ষাপট কি ছিল সেটা আমরা পরে আলোচনা করব। এখন আমরা আলোচনা করব কি ভাবে তিনি এতগুলো সাধনায় সিদ্ধি

লাভ করেছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে উল্লেখ রয়েছে তিনি ভক্তদেরকে একবার তাঁর নানারূপ সাধনর বর্ণনা দিতে বলেছিলেন;

"তিনি (জগন্মাতা) আমায় নানারূপ সাধন করিয়েছেন। প্রথম, পুরাণ মতের — তারপর তন্ত্র মতের, আবার বেদ মতের। প্রথমে পঞ্চবটীতে সাধনা করতাম। তুলসীকানন হল — তার মধ্যে বসে ধ্যান করতাম। কখনও ব্যাকুল হয়ে 'মা! মা!' বলে ডাকতাম — বা 'রাম! রাম!' করতাম। "যখন, 'রাম রাম' করতাম তখন হনুমানের ভাবে হয়তো একটা ল্যাজ পরে বসে আছি! উন্মাদের অবস্থা। সে সময়ে পূজা করতে করতে গরদের কাপড় পরে আনন্দ হত — পূজারই আনন্দ!

"তন্ত্র মতের সাধনা বেলতলায়। তখন 'তুলসী গাছ' আর 'সজনের খাড়া' — এক মনে হত!

"কুকুরের উপর চড়ে তার মুখে লুচি দিয়ে খাওয়াতাম, আর নিজেও খেতাম। সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। —

"অবিদ্যাকে নাশ না করলে হবে না। আমি তাই বাঘ হতাম — হয়ে অবিদ্যাকে খেয়ে ফেলতাম!

"বেদমতে সাধনের সময় সন্ন্যাস নিলাম। তখন চাঁদনিতে পড়ে থাকতাম — হৃদুকে বলতাম, 'আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, চাঁদনীতে ভাত খাব'!" "হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম! মাকে বললাম, আমি মুখ্যু – তুমি আমায় জানিয়ে দাও – বেদ, পুরান, তন্ত্রে- নানাশাস্ত্রে কি আছে! "মা বললেন, বেদান্তের সার – ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কথা বেদে আছে, তাঁকে তন্ত্রে বলে সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ – আবার তাঁকেই বলে সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ। ..."

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উল্লিখিত উক্তি থেকে এটাই পরিস্ফুট হয়, শুধু ঈশ্বর লাভ করার জন্য তিনি করেছিলেন নানান সাধনা। এবং তিনি তাঁকে পেয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর ভক্তদেরকে বলেছেন; *"প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা যা অবস্থা শাস্ত্রে আছে, সেসব হয়েছিল।বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ, জড়বৎ। "আর শাস্ত্রে*

যেরূপ আছে, সেরূপ দর্শনও হত। "কখন দেখতাম জগৎময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ!

"কখন চারিদিকে পারার হ্রদ, — ঝক্‌ঝক্ করছে। আবার কখনও রূপা গলার মতো দেখতাম।

"কখন দেখতাম রঙমশালের আলো যেন জ্বলছে! "তাহলেই হল, শাস্ত্রের সঙ্গে ঐক্য হচ্ছে।" (উৎস; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)

২.২; সর্বসমক্ষে ঠাকুরকে ঈশ্বরের অবতাররূপে ঘোষণা

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-জীবন একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরলাভ। তাই তিনি পেয়েছিলেন জীবনের প্রথম থেকেই। বাল্যকাল থেকেই তিনি মন থেকে কামিনি-কাঞ্চনাসক্তি বর্জন করেছিলেন। মাটি টাকা টাকা মাটি - এই ছিল তাঁর প্রধান জীবন দর্শন। এই প্রসঙ্গে,১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পানিহাটীর চিঁড়া মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কলকাতার পণ্ডিত সমাজে বিখ্যাত ব্যক্তি বৈষ্ণবচরণ গোস্বামীর প্রথম সাক্ষাৎ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চিঁড়া মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখামাত্র বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী তাঁকে আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাসম্পন্ন অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলে নিশ্চিত করেন। বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী সেদিন অধিকাংশ সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অতিবাহিত করে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন এবং পরবর্তী কালে বৈষ্ণবচরণ সর্বসমক্ষে ঠাকুরকে ঈশ্বরের অবতাররূপে ঘোষণা করেন। একবার ঠাকুর ভাবসমাহিত অবস্থায় বৈষ্ণবচরণের স্কন্ধে আরোহণ করেন। বৈষ্ণবচরণ এই ঘটনাতে উৎফুল্ল হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বন্দনা করতে থাকেন। বৈষ্ণবচরণ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। 'মাটি টাকা টাকা মাটি'-শ্রীরামকৃষ্ণের এই জীবন দর্শন এর জন্যই বৈষ্ণবচরণ তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। 'মাটি টাকা টাকা মাটি'- শ্রীরামকৃষ্ণের এই জীবন দর্শণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মন থেকে কাঞ্চনাসক্তি একেবারে দূর করার জন্য একদিন তিনি কয়েকটি মুদ্রা মৃত্তিকা সহিত হাতে নিয়ে সদবিচারে মগ্ন হলেন।এরপর তিনি

মুদ্রা ও মৃত্তিকা সমান-ভাবে মূল্যায়ন করে 'মাটি টাকা টাকা মাটি' বলতে বলতে মাটি ও টাকা উভয়কে গঙ্গা গর্ভে নিক্ষেপ করলেন। (লি প্র-৯০)

২.৩; শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনা

১৮৬১সালের মাঝামাঝি, ভৈরবী ব্রাহ্মণী নামে এক যোগিনী দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। একদিন ভৈরবীর নৌকো দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরের গায়ে বকুলতলার ঘাটে এসে ভিড়ল। তখন তাঁর পরনে ছিল উজ্জ্বল গেরুয়া বসন, আলুলায়িত কেশ, কন্ঠে ছিল লাল শালুতে বাঁধা ইষ্টদেবতা রঘুবীরের শিলামূর্তি। তাঁকে দূর থেকে দেখেই ঠাকুর বুঝেছিলেন ইনি তাঁরই পথের পথিক, তাঁকেই খুঁজতে এসেছেন। ভাগ্নে হৃদয়কে দিয়ে ঠাকুর ডাকিয়ে আনলেন তাঁকে। মা জগদম্বার স্বপ্নাদেশে ঠাকুরকে খুঁজতে খুঁজতে ভৈরবী দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছেছেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর প্রকৃত নাম ছিল যোগেশ্বরী এবং তাঁর বয়স ছিল তখন চল্লিশের কাছাকাছি। তিনি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞা ও তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাধনে সিদ্ধা। শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীর কাছে তার ভাবতন্ময়তা ও দৈহিক পীড়ার কথা বর্ণনা করলে ভৈরবী তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে তিনি পাগল হয়ে যান নি; বরং আধ্যাত্মিক 'মহাভাব' তাঁকে আশ্রয় করেছে। বিভিন্ন ভক্তিশাস্ত্রের উদাহরণ দিয়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণী বিভিন্ন পণ্ডিতদেরকে দেখিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে রাধা ও চৈতন্য মহাপ্রভুরও একই ভাব উপস্থিত হয়েছে। ভৈরবীর পথ নির্দেশনায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রসাধনা করেছিলেন। এই সাধনায় তার সমস্ত শারীরিক ও মানসিক পীড়ার উপশম হয়েছিল। ব্রাহ্মণী ভৈরবীর সহায়তায় তিনি তন্ত্রোল্লেখিত ৬৪ প্রকার প্রধান সাধন অভ্যাস করেছিলেন। উল্লেখ্য, তন্ত্রসাধনায় সাধারণত সাধকদের কিছু ধর্মবিরোধী পন্থাও অভ্যাস করতে হয়; যার মধ্যে মাংস ও মৎস্য ভক্ষণ, মদ্যপান ও যৌনাচার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তন্ত্রসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো মদ্যপান ও যৌনাচার এই দুটি পন্থা অভ্যাস করেন নি। শুধুমাত্র সেগুলির চিন্তনের মাধ্যমেই তিনি এই সাধনার ফল লাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 'বামাচার' কে একটি জ্ঞানমার্গ বলে উল্লেখ করলেও, তিনি অন্যদেরকে এই পথে সাধন

করতে নিষেধ করতেন। প্রসঙ্গত,স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁকে বামাচার সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তিনি বলেন, "(এই পথ) বড় কঠিন, নিজেকে ঠিক রাখা যায় না, পতন হয়।"

ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে কুমারীপূজা সম্পর্কে শিক্ষা দেন। এছাড়াও ভৈরবীর সহায়তায় শ্রীরামকৃষ্ণ কুণ্ডলিনী যোগেও সিদ্ধ হন। ১৮৬৩ সাল নাগাদ তার তন্ত্রসাধনা সম্পূর্ণ হয়। তন্ত্রসাধনা ছাড়া ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীগৌরাঙ্গজ্ঞানে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি বৈষ্ণবগ্রন্থ শুনিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীকে মাতৃভাবে দেখতেন। আবার ভৈরবী সর্বদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতাররূপে দেখতেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম সর্বসমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে ঘোষণা করেন। (wiki)

২.৪; শ্রীরামকৃষ্ণের **অসাধারণ ভক্তিসাধনা**

আমরা জানি হিন্দু ধর্মে বিষ্ণু, শিব ও শক্তি এই ত্রি-ঈশ্বরের পূজা-অর্চনার প্রধান মাধ্যম বা উপাদান হল ভক্তি। এই ত্রি-ঈশ্বর সাধনার প্রানকেন্দ্র ভক্তিবাদ হলেও সমগ্র ভারতবর্ষে 'ভক্তিবাদ' সার্বাধিক উৎসারিত হয়েছে মূলত বিষ্ণুর দুই পার্থিব অবতার রাম ও কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। প্রসঙ্গত আমাদের দুই মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' এবং পৌরানিক গ্রন্থ 'পুরাণ' হিন্দুধর্মে অসংখ্য মতবাদের সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যে অন্যতম হলো ভক্তিবাদ যার কেন্দ্রবিন্দু শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ। ভগবানের এই দুই অবতারকে ভালবাসা ও ভক্তির মাধ্যমে লাভ করাই হল ভক্তিবাদ। এই ভক্তিবাদ সবচেয়ে বেশি প্রকট হয় বৈষ্ণবীয় ভক্তিসাধনা। তাই বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র হল ভক্তিসাধনার প্রকৃষ্ট উৎস। বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম নিবেদনে পাঁচটি ভাবের উল্লেখ রয়েছে – শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ভক্তিসাধনার সাধকদের মতে ঈশ্বরে প্রতি ভালবাসা প্রাথমিক অবস্থায় সাধারনত কিছুটা বিক্ষিপ্ত হয়। ঈশ্বরের প্রতি সাধকের ভালবাসা যত গভীর হতে থাকে মন তত একমুখী হতে থাকে। আর মন যত একমুখী হয় সাধক তত ভক্তি মার্গে প্রবেশ করে। ভক্তিসাধনা মন যত একনিষ্ঠ হয় ভালবাসা তত গভীর হতে গভীরতর হয়ে গভীরতম অবস্থায় প্রবেশ করে। তাই

যখন মন শান্তভাবে ঈশ্বরের প্রতি ঐ ভালবাসা একনিষ্ঠ হয়ে থাকে তখন সাধকের শান্তভাব আসে বলে বলা হয়। সাধকগণ বলেন- মনে যত শান্ত ভালবাসার উদয় হয় তত ভালবাসার গভীরে প্রবেশ হয়। ঐ গভীর ভালবাসা শুরু হয় দাস্যভাব দিয়ে। এই দাস্যভাব এর অর্থ হল 'তুমি প্রভু , আমি দাস।' দাস্যভাবে কিছুটা দূরভাব থাকে। যেমনি প্রভুর প্রতি চাকরের শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও শরণাগতি থাকলেও— মনের দিক দিয়ে কিছুটা দূরভাব থাকে। তবে যখন ধীরে ধীরে মন ভালবাসার গাঢ়তর অবস্থায় পৌঁছে যায়, তখন ঐ দূরভাব দূরে চলে যায়। দূরভাব যত দূরে চলে যায় মনে তত আপন বোধ জাগতে থাকে। এই আপন বোধের শুরু হয় সখ্যভাব দিয়ে। অর্থাৎ দাস্যভাব এবং সখ্যভাবের মধ্যে সামান্য একটু তফাৎ রয়েছে সেটি হল আপন-বোধ। কিন্তু যখন ভালবাসা দাস্যভাব থেকে বন্ধুভাবে পৌঁছায় তখন ঈশ্বরের সঙ্গে সাধকের 'নিকট বোধ' জাগে।যখন সাধক সর্বদা ভগবানের নিকটে থাকতে চায় তখন তাঁর মধ্যে সখ্যভাব আসে। সাধক এই সখ্যভাব অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে এরপরে সিদ্ধাবস্থা 'বাৎসল্যতে' পৌঁছায়। এই বাৎসল্যভাব যখন ধীরে ধীরে মধুর ভাবে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করে তখন সাধকের ভক্তিসাধনা সিদ্ধ হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাবগুলির প্রায় সব কয়েকটি অভ্যাস করেছিলেন এবং তাঁর লোকশিক্ষার কর্মযজ্ঞে এই ভাবগুলির সবকটি প্রয়োগ করতেন বলে জানা যায়।

দাস্যভাব-সাধনা

তন্ত্রসাধনার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু সময়ের জন্য দাস্যভাবের সাধনা করেছিলেন। ঐ সাধনায় হনুমানভাবে আবিষ্ট হয়ে তিনি রামচন্দ্রের আরাধনা করেন। ঐ সময় তাঁর হাবভাব ও চালচলন সবকিছু হনুমানের মতো হয়েছিল।যেমন ঐ সময় তিনি কদলী ভক্ষণ করতেন, অধিকাংশ সময় বৃক্ষের উপরে কাটাতেন, এমনকি বানরের মতো অস্থির চোখের দৃষ্টিও লাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর ভক্তদেরকে একসময় বলেছিলেন, তাঁর মেরুদণ্ডের নিচে সামান্য অংশও এই সময় লেজের মতো প্রসারিত

হয়েছিল। দাস্যভাবে সাধনার সময় তিনি রামের পত্নী সীতাদেবীর দর্শন পান এবং সীতার মূর্তি তাঁর শরীরে অন্তর্হিত হতে দেখেন।

বাৎসল্যভাব সাধনা

১৮৬৪ সালে দেবীপ্রতিমায় মাতৃভাব আরোপ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বাৎসল্যভাবের সাধনা করেন। এই সময় তিনি 'রামলালা' অর্থাৎ বালক রামচন্দ্রের একটি ধাতুমূর্তি পূজা করতেন। পরে তিনি বলেছিলেন, এই সময় তার হৃদয় মাতৃভাবে পূর্ণ হত। তার মধ্যে নারীর ভাব ফুটে উঠত এমনকি তার কথাবার্তা ও হাবভাবও মেয়েলি আকার নিত। ঐ সময় তিনি ধাতুমূর্তিতেই জীবন্ত বালক রামচন্দ্রকে চাক্ষুষ করতেন।

মধুরভাব সাধনা

পরবর্তীকালে গোপিনী রাধার ভাব আরোপ করে কৃষ্ণের প্রেমিকা রূপে মধুর ভাবের ভক্তি সাধনা করেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। এই প্রেম উপলব্ধি করার জন্য তিনি দীর্ঘকাল নারীর বেশে নিজেকে বৃন্দাবনের গোপিনী কল্পনা করতেন- সে কথা আমরা জানতে পারি বিভিন্ন লেখা থেকে। পণ্ডিতগণ এটাও বলেন যে এই মধুরভাব সাধনার ফলে তাঁর কল্প সমাধি হয় অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণের সাথে আধ্যাত্মিক মিলনে মিলিত হন। প্রসঙ্গত, নবদ্বীপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও প্রভূ নিত্যানন্দের জন্মস্থান ভ্রমণকালে তিনি ভাবচক্ষুতে নৃত্যরত অপূর্ব সুন্দর দুই বালককে তাঁর দেহে অন্তলীন হতে অনুভব করেছিলেন।প্রসঙ্গত বাল্যকাল হতে ঠাকুরের মধুর-ভাবের স্বভাব প্রকাশ পেয়েছে বলে জানা যায়। দক্ষিণেশ্বরে এসে তাঁর এই স্বভাবের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। *(উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ)*।

২.৫; সন্ন্যাস গ্রহণ ও অসাধারন বৈদান্তিক সাধনা

১৮৬৩-৬৪ সালে তোতাপুরী নামে এক পরিব্রাজক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তারপর শুরু হয় তাঁর বৈদান্তিক সাধনা। তোতাপুরী ছিলেন জটাজুটধারী এক বিশাল

চেহারার উলঙ্গ নাগা সন্ন্যাসী। গুরুর নাম গ্রহণ করা শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ; তাই শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে 'ল্যাংটা' বা 'ন্যাংটা সন্ন্যাসী' বলে উল্লেখ করতেন। তোতাপুরী 'নেতি নেতি' দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ দর্শন করতেন। অদ্বৈতবাদ বেদান্ত স্বীকার করে তিনি বলতেন জগতের সবকিছু মায়া ও মিথ্যা কেবল ব্রহ্মই সত্য। দেব-দেবীর মূর্তিপূজাকেও তিনি উপহাস করতেন। বিশ্বাস করতেন এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। তোতাপুরী ছিলেন একজন রমতা সাধু। কথায় আছে; "রমতা সাধু, বহতা পানি। যহ কভি না মৈল লখানি॥" অর্থাৎ যে জল প্রবাহিত হয়, তাহা যেমন বিশুদ্ধ থাকে, তদ্রূপ যে সাধু ভ্রমণ করে বেড়ান, তিনিও তদ্রূপ পবিত্র থাকেন। যাইহোক শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু, তোতাপুরী ছিলেন সেরকমেরই একজন রমতা সাধু, যিনি পরবর্তীকালে 'নাঙ্গা বাবা' যা 'পাঞ্জাবী বাবা' নামেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী সাধক। পশ্চিমাঞ্চল পরিক্রমা শেষ করে গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনদিন থাকবেন এই ইচ্ছা নিয়ে তিনি সেখানে এসেছিলেন। অদ্বৈত বেদান্তের নানা তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোতাপুরী প্রায় এগারো মাস দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট থেকে যান। তোতাপুরী যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন, শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স তখন পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ, আর তোতাপুরীর বয়স ষাট থেকে সোত্তর। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম তোতাপুরীকে দর্শন করেন দিব্য-আবেশে, বা অলৌকিক শক্তির সাহায্যে। সে এক অদ্ভুত ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন মন্দিরে বসে পূর্বদিকে মুখ করে বসে মা ভবতারিণীর পূজা করছিলেন। আর পুণ্যসলিলা গঙ্গানদী ছিল পশ্চিমে, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের পিছন দিকে। পূজার আসনে বসে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হল অলৌকিক জ্যোতির্ময় পথে। সেই তূরীয় অবস্থায়, তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে দেখতে পেলেন, একজন জটাজুটধারী প্রবীণ সাধু গঙ্গায় স্নান করছেন। এই সাধুর সর্বাঙ্গ বিভাময়—পরনে কৌপীন মাত্রও নেই, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। এই দিব্যদর্শনের পরই দক্ষিণেশ্বরের অতিথি শালায় তাঁর প্রথম দেখা হল এই সাধুর সঙ্গে। তখনও পর্যন্ত ঐ সাধুর নাম জানেন না শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সেই নাম জানতে পারেন পরে মা

ভবতারিণীর কাছ থেকে। প্রথম দেখাতেই প্রবীণ সাধু তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেয়া বাছা, কুছ্ সাধন করো গে?' শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন ঐ সাধুকে সরল চিত্তে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তা এখনই আমি কিছু বলতে পারছি না। আগে মা-র (মা ভবতারিণী) কাছে তাঁর মতামত নিতে হবে। তারপর বলব।' মহাযোগী এই উত্তর শুনে বিস্মিত হন। তাই জানতে চান, 'মা-কে জিজ্ঞাসা?'—কে তোমার মা? শ্রীরামকৃষ্ণ সরল বালকের মতোই মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করলেন তাঁর মায়ের কাছে। মা তাঁকে সম্মতি দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, এই সাধকের নাম তোতাপুরী। মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে মায়ের সম্মতির কথা জানালেন যোগীকে এবং এ-কথাও জানিয়ে দিলেন, তিনি মা এর আদেশ পেয়েছেন। তিনি তাঁর কাছে সাধনা করবেন। আরও জানিয়ে দিলেন, তাঁর নাম যে তোতাপুরী—এটা মা-ই তাঁকে বলে দিয়েছেন। সবকিছু শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তোতাপুরী। তিনি ভাবতে লাগলেন এই তরুণ-সাধক তাঁর নাম জানলেন কীভাবে? তোতাপুরী বললেন, 'আমি তিনদিন এখানে থাকব। তারপর অন্যতীর্থে চলে যাব।' কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে ঐ প্রবীণ সাধু এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে রয়ে গেলেন। প্রসঙ্গত, শ্রীরামকৃষ্ণ তখনও গদাধর। রামকৃষ্ণ হন নি। তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর গদাধরের নাম করণ হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। প্রবীণ সাধু তোতাপুরীর কাছে গোপনে গদাধর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন কারণ, তিনি গর্ভধারিণী মায়ের মনে কোন কষ্ট দিতে চান নি। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তোতাপুরীর সহায়তায় শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্যাত্মজীবনের চরম অবস্থা নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন ছিলেন। বিনা সাধনায় ও প্রস্তুতিতে এমন নির্বিকল্প সমাধি দেখে গুরু তোতাপুরীও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। (Ref. উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ)

২.৬ শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম ধর্মে সাধনা

১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের প্রায় শেষভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর গুরুর নাম ছিল গোবিন্দ রায় (জানা যায়, পরে তাঁর নাম হয়েছিল ওয়াজেদ আলি খান। দক্ষিণেশ্বরে শান্ত, ভক্তিমান

গোবিন্দ রায়কে দেখে, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বাস এল যে, উনি সাক্ষাৎ ভগবান লাভ করেছেন। তাই গোবিন্দ রায়ের কাছে ইসলামে ধর্মে দীক্ষা নিয়ে, সেই ধর্মমতের শেষে কী আছে, তা তিনি নিজে বুঝতে চাইলেন। উল্লেখ্য শিয়া, সুন্নি ও সুফি- মুসলমানদের এই তিন ভাগের মধ্যে গোবিন্দ রায় ছিলেন সুফি মতের সাধক। সুফি মত অনেকটাই হিন্দু বেদান্তের আদর্শের কাছাকাছি। এই মতেই দীক্ষা নেন ঠাকুর, কলমা বা আল্লা ব্যতীত কেউই উপাস্য নেই-এই মন্ত্র গ্রহণ করেন। তিন দিন ইসলাম ধর্মে গভীর সাধনা করেন ঠাকুর। সে সময় ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনও চিন্তা তিনি মাথায় রাখেন নি এবং অচিরেই এ পথে সিদ্ধিলাভ করেন। সেই সময় মন্দিরে পুজার্চনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এমনকী হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি বা ছবির দিকেও তাকাতেন না। তখনই শুরু হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম ধর্মে সাধন। পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করা খাবারও খেয়েছিলেন তিনি। ঐ সময় একজন মুসলমানের মতোই তিনি মন্দির সীমানার বাইরে গিয়ে থাকতেন। খাওয়া-পরা এবং প্রার্থনা – সবকিছুতেই তিনি হয়ে উঠলেন একজন খাঁটি মুসলমান। স্বামী নির্বেদানন্দ তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ' বইটিতে উল্লেখ করেছেন যে ঐ সময় হিন্দু দেবদেবী –সংশ্লিষ্ট সমস্ত চিন্তা, দর্শন ও ভাবাবেগ শ্রীরামকৃষ্ণের মন থেকে তখনকার মতো একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি 'আল্লা' মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। শ্রদ্ধাবান মুসলমান ফকিরের মতো নিয়মিতভাবে নামাজ পড়তে লাগলেন।(Ref; ত্রিলোত্তমাসম্ভব; https://www.prohor.in/muslim-guru-govinda-roy-led-ramakrishna-to-meet-mohammed

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে যে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত গোবিন্দ রায়ের সঙ্গে ধর্মালোচনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ ভীষণভাবে মোহিত হন। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে ইসলাম ধর্ম সাধন করেন এবং মহম্মদের দর্শন লাভ করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত গোবিন্দ রায় আরবী পারসী

ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। গোবিন্দ রায় নানাধর্মের বহু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে অবশেষে ইসলাম ধর্মের উদার মতবাদে আকৃষ্ট হন এবং তাতেই আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কোরাণ পাঠে নিমগ্ন থাকতেন এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সহিত ধর্মচর্চা করে সিদ্ধি লাভের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তিনি দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর নিকট তাঁর সাধনার স্থান নির্বাচন করেন। সেই সময় ঠাকুর তাঁর ধর্মনিষ্ঠা এবং ভগবৎপ্রেমে আকৃষ্ট হন।

তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ প্রসঙ্গে কথামৃতে ঠাকুর নিজেই জানিয়েছেন যে ইসলাম সাধনায় তিনি এতটাই তন্ময় ছিলেন যে, হিন্দু দেবদেবীর দিকে দেখতে তাঁর মনও চাইত না। এমনকি সেই সময় তাঁর গোমাংস ভক্ষণেরও সাধ জেগেছিল। কিন্তু মথুরবাবুর অনুরোধে তিনি গোমাংস ভক্ষণ করেননি। কিন্তু তিনি নিয়মিত নামাজ পড়তেন। মসজিদে যেতেন। কথামৃতে লেখক ঠাকুরের উক্তি তুলে ধরে লিখছেন, 'গোবিন্দ রায়ের কাছে আল্লা মন্ত্র নিলাম। কুঠিতে প্যাঁজ দিয়ে রান্না ভাত হলো। খানিক খেলুম।' অন্যত্র বলছেন, "বটতলায় ধ্যান করছি, দেখালে একজন দেড়ে মুসলমান সানকি করে ভাত নিয়ে সামনে এলো। সানকি থেকে ম্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে দুটি দিয়ে গেল। মা দেখালেন, এক বই দুই নাই। সচ্চিদানন্দই নানা রূপ ধরে রয়েছেন। তিনিই জীবজগৎ সমস্তই হয়েছেন। তিনিই অন্য হয়েছেন।"

২.৭; খ্রিস্টধর্মের সাধনা- যিশু খ্রিস্টের ছবিতে জীবন্ত যিশুর দিব্যদর্শন লাভ;

1874 সালে শম্ভুনাথ মল্লিকের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের কাছে শম্ভুনাথ মল্লিকের একটি বাগান ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ শম্ভু মল্লিকের ঐ বাগানবাড়িতে অনেক সময় কাটাতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। যদিও খ্রিস্টান ছিলেন না, তবুও তিনি শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে বাইবেল পড়তেন। এইভাবে যিশুখ্রিস্ট এবং খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যানের মাধ্যমে

দিব্য যিশুখ্রিস্টকে উপলব্ধি করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলেন এবং সেটি একটি অদ্ভুত উপায়ে পূরণ হয়েছিল। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত যদুলাল মল্লিকের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে ছিলেন। দেয়ালে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবির মধ্যে মেরিমাতার কোলে যিশু খ্রিস্টের ছবি দেখতে পান। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐশ্বরিক শিশুর সাথে মেরিমাতার ছবির দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে থাকলেন এবং তাঁর মধ্যে তখন খ্রিস্টের বিস্ময়কর জীবন প্রতিফলিত হল। তিনি জীবন্ত যিশুর দিব্যদর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে সেই ছবিতে মেরি এবং খ্রিস্টের মূর্তি থেকে যে আলোক রশ্মি নির্গত হচ্ছে তা তাঁর মধ্যে প্রবেশ করছে এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দিচ্ছে। তিনি তখন উৎসুক হয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করলেন, 'মা, তুমি আমার সঙ্গে কি করছ?' হিন্দু দেবতাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা সেই জোয়ারের ঢেউ দ্বারা যেন ভেসে গিয়েছিল, এবং তার পরিবর্তে খ্রিস্ট এবং খ্রিস্টান গির্জার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁর হৃদয়কে পূর্ণ করে দিয়েছিল। তিনি চোখের সামনে খ্রিস্টান ভক্তদের ধূপ ও মোমবাতি জ্বালানোর দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। তিন দিন ধরে সেই ভাবনাগুলো তাঁর মনে দাগ কেটেছিল। চতুর্থ দিন, তিনি যখন পঞ্চবটীতে হাঁটছিলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে এক অসামান্য চেহারার শান্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তিনি তাঁকে একবারে বিদেশী লোক বলে জানতে পারলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হলেন এবং ভাবতে লাগলেন ঐ বিদেশী লোকটি কে হতে পারেন? শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে একটি কথা ভেসে এল: 'ইনি হলেন সেই যিশুখ্রিস্ট যিনি মানবজাতির মুক্তির জন্য তাঁর হৃদয়ের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন এবং সেই জন্য অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। তিনি আর কেউ নন, সেই যোগী যীশু, প্রেমের মূর্ত প্রতীক।' তারপর মানবপুত্র শ্রীরামকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে তাঁর মধ্যে মিশে গেলেন। এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিতে চলে গেলেন এবং তাঁর বাহ্যিক চেতনা হারিয়ে গেল। উলেখ্য, তাঁর ঘরে হিন্দু দেবদেবীদের সঙ্গে যিশুর

একটি চিত্র ছিল, সেটিতে তিনি প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় ধূপারতি করতেন।*(উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ)*।

পঞ্চবটীতে শান্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে যীশু তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে

২.৮; শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ও অসাধারণ বানী "যত মত তত পথ"

এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হিন্দু ধর্মের বৈষ্ণব, শাক্ত, তন্ত্র, বেদান্ত এরপর বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইসলাম, সকল পথে সাধনা করে দেখালেন তিনি অনন্ত ভাবময়। সকলেই জানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নতুন কোন ধর্ম সংস্থাপন করেননি। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বিভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বীদের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব এক ভয়ঙ্কর পরিণতি এনে দিয়েছে। একে অন্যের আধ্যাত্মিকতার পথের আদর্শকে ঘৃণার চোখে দেখছে। ফলে সমাজে হানাহানি, মারামারি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দেখে তিনি ভীষণ মর্মাহত হতেন। তাই তিনি ঐ ভয়ঙ্কর সামাজিক অবস্থা দূরীকরণে তিনি অহিংস, ত্যাগ ও প্রেমের পথ দেখানোর জন্য সকল ধর্ম মতে সাধনা করে সকলের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "সকল ধর্মীয় মত পথ সত্য। আন্তরিক হলে সকল পথে পরম স্রষ্টাকে লাভ করা সম্ভব।" পৃথিবীতে অনেক ধর্ম রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ঐ সকল ধর্মগুলোকে ঈশ্বর লাভের এক একটি পথ হিসেবে প্রায় সবকটি পথে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছেন। সেই কারনে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ বানী "যত মত তত পথ" মাথায় রেখে 'ভারতের সাইক্লোন সন্ন্যাসী' স্বামী

বিবেকানন্দ সারা বিশ্বে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ বানী “যত মত তত পথ এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের বানী সোচ্চারকন্ঠে প্রচার করেছিলেন। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ সর্বধর্ম সমন্বয় সমন্ধে বলেন; " খ্রিস্টান হিন্দু বা বৌদ্ধ হয় এটা তাঁর অভিপ্রায় নয়। হিন্দু বা বৌদ্ধ খ্রিস্টান হওয়ার জন্য নয়। কিন্তু প্রত্যেককে অবশ্যই অন্য ধর্মের আত্ম বা অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কে একত্রিত করতে হবে এবং তবুও তার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করতে হবে এবং তার নিজের বৃদ্ধির নিয়ম অনুসারে তাকে অগ্রসর হতে হবে। যদি এই ধর্মের পার্লামেন্ট বিশ্বকে কিছু দেখায়, তা হল: এটি বিশ্বকে প্রমাণ করেছে যে পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, দান, দয়া এবং দাক্ষিণ্য পৃথিবীর কোনো গির্জার একচেটিয়া সম্পদ নয় এবং প্রতিটি ব্যবস্থাই পুরুষ ও মহিলাদের তৈরি করেছে সবচেয়ে উন্নত ও মহিমান্বিত চরিত্র।" স্বামী বিবেকানন্দের এই সর্বধর্ম সমন্বয় বানী সমুদ্রের ন্যায় অতলস্পর্শী যা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বানী “যত মত তত পথ” এর উপর প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব ধর্মে সাধনা এবং সেই সকল সাধনার ভিত্তিতে তাঁর “যত মত তত পথ” বানীর তাৎপর্য আমরা তখনই বুঝতে পারব যখন আমরা স্মরণ করব যে পৃথিবীতে ধর্মীয় বিদ্বেষ নিয়ে যত রক্তপাত হয়েছে, অন্যকোন কারনে এত হয়নি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকায় লিখেছিলেন- “বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা/ ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।/ তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে/ নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে;/ দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি/ সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।” ঐ জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, “ধর্মীয় ধ্বংসাত্মক এমন ঊষর একটি যুগেও তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদের সারসত্য উপলব্ধি করেছেন, বহু সাধনার আপাত পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্বমুখর ধারাগুলি মিলিত হয়েছে তাঁর হৃদয়ের প্রশস্ততায়, তাঁর আত্মার সারল্য চিরকাল ধিক্কার জানায় পণ্ডিত আর ধর্মবেত্তাদের সমস্ত আড়ম্বর আর

আত্মম্ভরিতাকে। সব ধর্মের পথ পরিক্রমা করে তিনি প্রায় সকল ধর্মের মধ্যে একটা সেতু রচনা করে গেছেন।"

২.৯; মৌনবাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মথুরবাবু ও তাঁহার স্ত্রী জগদম্বার সঙ্গে কাশীতে গিয়েছিলেন। ভাগ্নে হৃদয় ঐবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এ-যাত্রায় কাশীধাম, প্রয়াগ, শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করেন। কাশীতে মণিকর্ণিকায় সমাধিস্থ হইয়া বিশ্বনাথের গম্ভীর চিন্ময় রূপ দর্শন করেন। ঐ সময় মৌনবাবা ব্রতধারী ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। বিশ্বনাথ দর্শনের পর তিনি ভাগ্নেকে বললেন, 'হৃদে চল, এ বার জীবন্ত বিশ্বনাথ দর্শন করে আসি'। হৃদে বলল, 'জীবন্ত বিশ্বনাথ! তোমার মাথাটা এবার সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে মামা'। শ্রীরামকৃষ্ণ একগাল হেসে বললেন, 'আয় না রে পাগল... হাঁটা চলা করা, কথা বলা বিশ্বনাথ দেখবি চল'।

কাশীর মনিকর্ণিকা ঘাটে গিয়ে রামকৃষ্ণ দেখলেন, তাঁর জীবন্ত বিশ্বনাথ চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। রামকৃষ্ণ তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ধীরে ধীরে চোখ খুললেন মহাযোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামী। দু দিক থেকে আসা সাগরের পথে যেতে যেতে দু'টি নদী যেন মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। অপলক দৃষ্টিতে দু'জন দু'জনকে দেখতে লাগলেন, অন্তরের গোপন ভাষায় তাঁরা কথা বললেন... এক মহাপুরুষ আর এক মহাপুরুষকে চেতনায় অনুভব করলেন।

পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'ত্রৈলঙ্গ স্বামীই হলেন মানুষরূপী বিশ্বেশ্বর। আমি ইশারায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ঈশ্বর এক না অনেক? উনি ইশারায় আমাকে বলেছিলেন, সমাধিস্থ হয়ে দেখলে এক, না হলে যতক্ষণ আমি, তুমি, জীব, জগৎ ইত্যাদি নানা জ্ঞান রয়েছে, ততক্ষণ অনেক'। কোনও শব্দ ব্যয় না করেই তাঁদের ঐ পারস্পরিক বোঝাপড়া ও আলাপ পরিচয় অন্তরের কোনও এক গোপন ভাষায় হয়েছিল! তাই এই যোগাযোগ যেন অপার্থিব বলে অনেকে মনে করেন।

৩; দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা কাহিনী

৩.১; আপনজন ভেবে ভগবানকে ভালোবাসার পথ প্রদর্শন;

আগেই বলেছি দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরে গদাধর (শ্রীরামকৃষ্ণ) তাঁর দাদা রামকুমারের সহকারী হিসাবে প্রতিমার সাজসজ্জার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ঐ সময় মন্দিরে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল- হঠাৎ বিষ্ণু বিগ্রহের পা ভেঙে গেলে। সকলে এই ঘটনাতে অমঙ্গলের আশঙ্কা করতে লাগল।পা ভাঙা বিগ্রহটি নিয়ে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা নিয়ে রানী রাসমণি ও তাঁর জামাতা মথুরবাবু খুব দুশ্চিন্তায় পড়লেন। তাঁরা এই ব্যাপারে সঠিক সিধান্ত নেওয়ার জন্য কিছু পণ্ডিতদেরকেও আহ্বান করলেন। বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন পরামর্শ দিতে লাগলেন।অধিকাংশ পণ্ডিতদের উপদেশ ছিল -পা ভাঙা বিগ্রহটিকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা এবং নূতন করে তার অভিষেক করা। ফলে রানী রাসমণি ও মথুরবাবু কোন সঠিক সিধান্তে আসতে পারলেন না। পরিশেষে তাঁরা গদাধরকে জিজ্ঞাসা করলেন এই ক্ষেত্রে তাদের কি করা উচিত। অল্পবয়সী গদাধর সঙ্গে সঙ্গে একটা সহজ ও সঠিক উপায় বলে দিলেন। তিনি বললেন,"রাণীর কোন জামাইয়ের যদি পা ভেঙে যায় তাহলে সেই জামাইকে কি ত্যাগ করা হবে? না চিকিৎসা করে পা সারাবার চেষ্টা করা হবে?" এই কথা বলে সেদিন গদাধর অতি অল্প বয়সে ভগবানকে নিজের আপনজন ভেবে ভালোবাসা ও সেবা করার সহজ পথ সকলকে দেখালেন। রানী রাসমণী ও মথুরবাবু সাগ্রহে গদাধরের পরামর্শ মেনে নিলেন এবং সেই দিন থেকে তাঁরা রাধা গোবিন্দের পূজার ভার শ্রীরামকৃষ্ণের উপর দিয়ে দিলেন।

৩.২; মা কালীর সাক্ষাৎ উপলব্ধি;

দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দের পূজা করার সময় গদাধর শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এর কিছু পরে অগ্রজ রামকুমারের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ মা-কালীর পুজার দায়িত্ব পেলেন। তাঁর মধ্যে তখন ভাবতন্ময়তা অদ্ভুতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কালীকে তিনি মা ও

বিশ্বজননীরূপে ভাবতে শুরু করলেন। এই সময় দেবীর প্রত্যক্ষ রূপ দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস পাষাণপ্রতিমা জীবন্ত হয়ে তাঁর নিবেদিত অন্নভোগ গ্রহণ করবেন। পূজা করতে করতে দেবীর দর্শন না পেয়ে তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠতেন। রাত্রিকালে নিকটবর্তী জঙ্গলে গিয়ে বস্ত্র ও উপবীত ত্যাগ করে নির্জনে ধ্যান করতেও শুরু করেন। এই সব দেখে কেউ কেউ বলতে থাকে যে তিনি পাগল হয়ে গেছেন, আবার কেউ বলেন তিনি ঈশ্বরের প্রেমে আকুল হয়েছেন। অনেকে বলতে লাগল- দেবীপূজায় নবীন পুরোহিতের কোনও পরিমিতি বোধ নেই। সময়-শৃঙ্খলার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন ছিলেন তিনি। পুজার নিয়ম ও আচার বিধির ব্যাপারে উচিত-অনুচিতের কোন বিচার ছিল না তাঁর। বড় বিচিত্র ছিল তাঁর পূজা। সকালে ফুল তুলে, মালা গেঁথে দেবীকে সাজাতেই অনেকটা সময় চলে যেত তাঁর। পূজায় বসে নিজের মাথায় একটা ফুল দিয়েই কখনো কখনো দু-ঘণ্টা ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন।কিংবা দেবীকে ভোগ নিবেদন করে মা ভোগ গ্রহণ করছেন-এই ভেবে অনেকটা সময় ধ্যানের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন। দেবীকে প্রসন্না করতে কখনও পূজার মাঝখানে, কখনও-বা পূজার শেষে গান গাইতে থাকতেন। কখনো কখনো কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হয়ে মা-কে বলতেন, "মা তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় কেন তবে দেখা দিবি না? আমি ধন, দৌলত, সুখভোগ কিছুই চাই না, আমায় দেখা দে, দেখা দে মা।" এইভাবে প্রার্থনা করতে করতে চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যেত, চোখ ও মুখ লাল হয়ে উঠত। সন্ধ্যায় তন্ময় হয়ে মা-কে বিভোর হয়ে গান শোনাতেন। আরতি করতে কতটা সময় যাচ্ছে হিসেব রাখতেন না তিনি। আরতি করলে, তাঁর আরতি আর শেষ হত না। পূজা করতে বসলে, পূজা আর তাঁর শেষ হত না। বারবার মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর পুজা বা আরতি কখনো সময়ে শেষ হত না। প্রথাবহির্ভূত সৃষ্টিছাড়া এই পূজার জন্য গদাধর অনেকের কাছে উপহাসের পাত্র হতেন, আবার কারুর কাছে শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছিলেন।দাপুটে জমিদার মথুরবাবুর বিষয়-অহংকারের আড়ালে তাঁর অন্তরে গভীর শ্রদ্ধাভাব লুকিয়েছিল। তাই ঐ তরুণ পূজারি গদাধরের অকল্পনীয়

আধ্যাত্মিক ভাবধারা তাঁর ভক্তিময় দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। সেই কারনে অনেকের বাধা আপত্তি এবং বিদ্রুপ কে অগ্রাহ্য করে তিনি গদাধরের প্রথাবহির্ভূত দেবীপূজাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করতেন এবং গর্ব করে বলতেন, "অদ্‌ভুত পূজক পাওয়া গেছে, দেবী বোধহয় শীঘ্রই জেগে উঠবেন।" কিন্তু প্রশ্ন ছিল -কে কাকে জাগ্রত করবেন?- পূজক দেবীকে, না দেবী পূজককে?

পণ্ডিতেরা বলেন- দিনের পর দিন মা-এর পুজো-আরতিতে, ভোগ নিবেদন ও সঙ্কীর্তনে, শয়ন-উত্থানে মা-র সঙ্গে থাকতে থাকতে গদাধর তাঁর সত্তার মধ্যে জগন্মাতার অস্তিত্ব অনুভব করতেন, জগন্মাতাও তাঁর রূপ ও সুরভীতে, স্মিত হাসির মাধুর্যে, নূপুরের রিনিঝিনি শব্দে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাবাবিষ্ট ও সন্মোহিত করে রাখতেন। মা-কে যদিও তিনি তখন দু চোখ ভরে বাহিরের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেন নি সত্য, কিন্তু মা-এর চিন্ময়ী রূপ তিনি ইন্দ্রিয় দিয়ে ভীষণভাবে অনুভব করতেন। তাঁর অন্তরে প্রত্যক্ষ মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষা দিনের পর দিন ভীষণ তীব্র হতে লাগল।উন্মত্তের মতো মধ্যরাতে মন্দির-সংলগ্ন জঙ্গলে গিয়ে পরনের কাপড় এবং উপবীত খুলে রেখে পাশমুক্ত মনে আমলকী গাছতলায় বসে দিনের পর দিন ধ্যান করতে লাগলেন।গভীর রাতে পঞ্চবটীর গহন জঙ্গলে মাতৃধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকতে লাগলেন। ভালোভাবে খেতে পারতেন না, ঘুমোতে পারতেন না। সন্ধ্যা হলে গঙ্গার ধারে মাটিতেই মুখ ঘষে কেঁদে কেঁদে তিনি বলতেন; "মা আর একটা দিন চলে গেল তোর দেখা পেলাম না'। তাঁর ভাবস্থ অবস্থা দেখে, অনেকে ভাবত তিনি অসুস্থ হয়েছেন। এই সন্দেহে কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদকে তাঁর চিকিৎসার জন্য ডাকা হল। কিন্তু তাঁর প্রয়াস নিষ্ফল হয়েছিল। দিনরাত শুধু মায়ের চিন্তা আর তাঁর কেঁদে কেঁদে বলা "মা দেখা দে"। তিনি আকুল ক্রন্দনে বুক ভাসাতেন। এরপর তাঁর মনে এক সংশয় দেখা দিল—মা কি সত্যই আছেন, না কি শুধুই কল্পনা? কিন্তু যেহেতু ইতিপূর্বে তিনি অনেকবার মায়ের দিব্যজ্যোতি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং যেহেতু দেবীর অস্তিত্বের নানা সংকেত অনুভব করেছেন তাই মায়ের অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁর সংশয় আস্তে আস্তে চলে

গেল। কিন্তু মা-কে নিজের চোক্ষে প্রত্যক্ষ করার আকাঙ্ক্ষা কমলো না। তিনি তাই মা-এর বাহিরের প্রকৃত সত্তা প্রত্যক্ষ করতে চাইলেন, যেমন পেরে ছিলেন রামপ্রসাদ। তাই তিনি সেই মা-কে প্রত্যক্ষ করতে ব্যাকুল হলেন। সেই অদ্‌ভুত ব্যাকুলতার প্রাবল্যে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। মা-কে প্রত্যক্ষ করতে তিনি উন্মত্ত হলেন, চোখ ও মুখ লাল হয়ে উঠল; দুই চোখ অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে গেল। কিন্তু তিনি মা-কে প্রত্যক্ষ করতে পারলেন না। অবশেষে একদিন অস্থিরতার বশে তিনি সংকল্প করেন দেবীর দর্শন না পেলে জীবন বিসর্জন দেবেন। দেওয়াল থেকে খড়্গ তুলে নিয়ে তিনি গলায় কোপ বসাবেন, এমন সময় অকস্মাৎ সমগ্র কক্ষ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।চারদিক থেকে তার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা গর্জন করে যখন তাঁর উপর এসে পড়ল, তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন এক অনির্বচনীয় আলোর উদ্ভাস। মাতা-পুত্রের মধ্যবর্তী অদৃশ্য আবরণটা হঠাৎই সরে গেল। মায়ের অপরূপ দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ ধন্য হলেন। পরবর্তী সময়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রথম কালীদর্শনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটা সঞ্জীব চক্রবর্তী তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণের কালীসাধনা' এই গ্রন্থে সুন্দর ভাবে উল্লেখ করেছেন;

"সহসা মার অদ্‌ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম! তাহার পর বাহিরে কি যে হইয়াছে, কোন দিক দিয়া সেদিন ও তার পরদিন যে গিয়াছে, তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই! অন্তরে কিন্তু একটা অদ্‌ভুত জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম!... ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল – কোথাও যেন আর কিছুই নাই! আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র! – যেদিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া

সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।" (উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে)

এইভাবে মায়ের অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করে শ্রীরামকৃষ্ণ ধন্য হলেন। তারপর থেকে তিনি সব সময়ে মাকে কাছে পেতেন। মার সঙ্গে কথা বলতেন। কেবল মন্দিরেই নয় মা কালীকে তিনি দেখতে পেতেন নিজের ভিতরে, সব মানুষে, সব প্রাণীতেই, সর্বভূতে। পুজোর সময়ে মন্দিরে বেড়াল ঢুকলে তার ভেতর মা কালীকে দেখতে পেয়ে ভোগের খাবার তাকে খাইয়ে দিতেন। প্রথাগত পুজো তিনি আর বেশিদিন করতে পারলেন না। পণ্ডিতদের মতে, বৈধীভক্তি যখন, প্রেমভক্তি বা রাগভক্তি পরিণত হয়, তখন সাধক আর প্রথাগত বিধিআচারসম্পন্ন পূজাপদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন না।

খড়্গ নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ গলায় কোপ বসাবেন সেই সময় অনির্বচনীয় আলোর উদ্ভাসে মা কালীকে দর্শন

৩.৩; বারবণিতার মধ্যে দিব্য মাতৃমূর্তি দর্শন;

আগের ঘটনাতে আমরা দেখেছি গদাধরের অন্তরে মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল।পাগলের মত মাঝরাতে মন্দির-সংলগ্ন জঙ্গলে গিয়ে পরনের কাপড় এবং উপবীত খুলে রেখে মাতৃধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকতেন। ভালোভাবে খেতে পারতেন না, ঘুমোতে পারতেন না। এই সকল দেখে নানান লোক গদাধরের উন্মত্ততা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিদ্রুপ মন্তব্য করতে লাগল।ঐ

বিদ্রুপ মন্তব্য শুনতে শুনতে রাণী রাসমণি ও মথুর বাবুর মনে হতে লাগল, গদাধর হয়ত দীর্ঘ ব্রহ্মচর্যজনিত কোনও দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। কিন্তু তাঁর ব্যাধির নিরাময় করতে ডাক্তার-বদ্যি সব ব্যর্থ হয়েছে। তাই নিরুপায় হয়ে তাঁরা ভেবে ছিলেন, লছমীবাই প্রমুখ সুন্দরী বারবধূ বা বারবনিতার সাহাজ্যে গদাধরের ঐ কঠিন মানসিক ব্যাধি হয়ত নিরাময় হবে। তাই তাঁরা প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে এবং পরে মেছুয়াবাজারের নিকট একটি ভবনে সুন্দরী বারবনিতার দ্বারা গদাধরকে প্রলুব্ধ করার চেস্টা করলেন। কিন্তু বারবণিতা দিয়ে গদাধরকে প্রলুব্ধ করার তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। গদাধর ঘরের মধ্যে অতি আকর্ষণীয় সুন্দরী মহিলাকে দেখে তিনি তাকে 'মা, মা' বলে ডাকতে শুরু করলেন।সেই বারবণিতার মধ্যে তিনি দিব্য মাতৃমূর্তি দর্শন করে তাকে 'মা, মা' বলে ডাকতে ডাকতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।এরপর তিনি হলধারীকে চিৎকার করে বললেন, 'ভাই, এসে দেখ আমার ঘরে কে ঢুকেছে।' গদাধর ও হালধারী অন্য সবাইকে বিষয়টি তৎক্ষণাৎ জানাতে শুরু করলেন। অতঃপর তিনি 'মা, মা' বলে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, 'মা, আমাকে বাঁচাও। মা, আমাকে শুদ্ধ কর যাতে আমার মন সঠিক থেকে ভুলের দিকে না যায়"। এইভাবে বারবণিতা দিয়ে গদাধরকে প্রলুব্ধ করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরে বলেছিলেন "ঐ সকল নারীর মধ্যে শ্রীশ্রী জগন্মাতাকে দেখতে পেয়ে তিনি ঐসময় 'মা' 'মা' বলতে বলতে বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছিলেন"।

৩.৪; রানি রাসমণির মানসিক অবস্থা বিচার;

একদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবীর পূজা করছেন। সেখানে রানি রাসমণি উপস্থিত রয়েছেন । হঠাৎ রানিকে আলতো চাপড় মেরে ঠাকুর বললেন, "কেবল ওই চিন্তা! এখানেও ওই চিন্তা!" ঠাকুরের এই আচরণে সকলেই যখন অভিভূত তখন রানি নিজেই লজ্জিত মুখে স্বীকার করলেন, দেবীর সামনে বসেও দেবীর ধ্যানে তিনি মনোযোগ দিতে পারেননি। বরং তিনি তখন একটি বিশেষ মোকদ্দমা বিষয়ে চিন্তা করছিলেন।

৩.৫; বিবাহের অলৌকিক ঘটনা;

কামারপুকুরে গুজব রটে গেল, অতিরিক্ত সাধনার শ্রম ও চিন্তায় গদাধর পাগল হয়ে গেছেন এবং দক্ষিণেশ্বরে গদাধর পূজার কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। গদাধরের উন্মত্ততার কথা শুনে তাঁর মা চন্দ্রমণিদেবী এবং মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বর ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। গদাধর চন্দ্রাদেবীর অতি আদরের কনিষ্ঠ সন্তান। তাই পুত্রের দুরাবস্থার কথা শুনে শোকে দুঃখে অস্থির হয়ে তাড়াতাড়ি তিনি পুত্রকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন। চন্দ্রাদেবী দেখলেন, গদাধর দিনরাত শুধু 'মা' 'মা' করে মাকালীকে ডাকে আর কেঁদে কেঁদে বলে 'মা দেখা দে'। আকুল ক্রন্দনে তিনি বুক ভাসাতে থাকেন।সব ব্যাপারে তাঁর উদাসীনতা, চঞ্চলভাব। তাঁর খাওয়া দাওয়া ও নিদ্রা সবকিছু প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তাই তাঁর মা ও মেজদাদা ব্যাকুল হয়ে গদাধরের ঐ ব্যধির প্রতিকারের নানারূপ চিন্তা ও চেষ্টা করতে লাগলেন।ঔষধাদি প্রয়োগের সাথে সাথে শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুক প্রভৃতি দৈব ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করলেন তাঁরা। কারন প্রতিবেশীদের মধ্যে একটি ধারনা তৈরি হয়েছিল, গদাধর হয়ত অপদেবতাবিষ্ট হয়েছেন। তাই ঔষধাদি সাথে সাথে ঐ সকল ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করেছিলেন বাড়ির লোক। কিন্তু ফল কিছুই হল না। গদাধরের অবস্থার কিছুই উন্নতি হল না।তাঁর সাধন-ভজনের উন্মত্ততার জন্য আবার অনেকেই তাঁকে বায়ুরোগগ্রস্ত বলে মনে করতে লাগল। ফলে একদিন কয়েকজন বিখ্যাত ওঝাকে ডাকা হল। চন্দ্রাদেবীর কথামত তারা পুজাদি করে রাতে চণ্ডককে নামাল। কথিত আছে পুজা ও বলি গ্রহণপূর্বক প্রসন্ন হয়ে, চন্ডক তাদের কে বলল যে গদাধরকে ভূতে পায় নি। তার কোন ব্যাধি হয়নি।যাইহোক কয়েকমাস থাকার পরে গদাধর মায়ের দেখাশুনার ফলে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হলেন। এর অন্যতম কারন হল এর মধ্যে তিনি অনেকবার শ্রীশ্রীজগদম্বার অদ্‌ভুত দর্শন লাভ করেছিলেন। তাতে তাঁর বিশ্বাস এল এরপরও তিনি নিরন্তর শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শন লাভ করবেন।এইসকল কারনে পূর্বের ন্যায় তিনি আর ক্রন্দন করতে করতে ব্যাকুল হয়ে মা মা বলে ডাকতেন না। উন্মত্ত হয়ে

চোখমুখ লাল করে ফেলতেন না। সময় মত আহারাদি করতেন। যাইহোক গদাধরের প্রকৃতিস্থ কার্যকলাপ এবং আচার-আচরণ দেখে চন্দ্রামণির মনে হল গদাধরের বায়ুরোগ অনেকটা পশমিত হয়েছে, যদিও তাঁর উন্মনাভাব ও উদাসীনতা তখনও বিদ্যমান। তাই চন্দ্রাদেবীর পুত্রের উন্মনাভাব ও উদাসীনতা সম্পূর্ণ দূর করার জন্য এবং সাংসারিক বিষয়ে তাঁকে আকৃষ্ট করার জন্য পুত্রের বিয়ের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি আরও চিন্তা করলেন যে যদি বিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে হয়ত তিনি পুনরায় বায়ুরোগে আক্রান্ত হতে পারেন।এইসব দুশ্চিন্তায় তিনি তড়িঘড়ি পুত্রের বিবাহের চেষ্টা করতে লাগলেন। তাই তাঁর মাতা এবং অগ্রজ গদাধরের জন্য উপযুক্ত পাত্রী সন্ধানে চারিদিকের গ্রামগুলিতে বিভিন্ন লোক পাঠালেন। কিন্তু দুরভাগ্যের বিষয়, বহু চেষ্টা করেও উপযুক্ত পাত্রী পাওয়া গেল না। যদিও কয়েকটি পাওয়া গেল, কিন্তু তাদের পিতামাতা অত্যাধিক পণ চাইল। ফলে ঐ সকল স্থানে তাঁর অগ্রজ রামেশ্বর গদাধরের বিয়ে দিতে সমর্থ হলেন না।ফলে গদাধরের বিবাহ নিয়ে তাঁর মাতা এবং অগ্রজ ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়লেন। এই দেখে একদিন গদাধর কিছুটা ভাবাবিষ্ট হয়ে তাঁদের কে বলেছিলেন, “অন্যত্র আপনাদের অনুসন্ধান বৃথা, জয়রামবাটি গ্রামের শ্রী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটিতে বিবাহের পাত্রীর কুটবাঁধা হয়ে রয়েছে।” গদাধরের ঐ কথায় বিশ্বাস না করলেও তাঁর মাতা এবং অগ্রজ ওখানে লোক পাঠালেন ঐ ব্যাপারে সংবাদ নেওয়ার জন্য। ওখান থেকে সংবাদ এল যে পাত্রী নিতান্তই একটি বালিকা। পাত্রীর বয়স মাত্র পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করে ষষ্ঠতে পড়েছে। তখন গদাধরের বয়স প্রায় চব্বিশ। যাইহোক অপ্রত্যাশিত বরং অলৌকিকভাবে পাত্রীর সন্ধানলাভে চন্দ্রাদেবী অতিশয় আনন্দিত হলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে বিবাহে ৩০০টাকা পণ দিয়ে চন্দ্রাদেবী ১২৬৬ সালের (ইং-১৮৫৯) বৈশাখ মাসে শ্রী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সারদামণির সহিত গদাধরের বিয়ে দিলেন। বলা বাহুল্য, যদিও পাত্র ও পাত্রীর দুটি বাড়ি থেকে দেখাশুনো করে শ্রীরামকৃষ্ণের এবং সারদামণির বিয়ে হয়েছিল, তবুও তাঁদের বিয়ের ব্যাপারে কয়েকটি অলৌকিক কাহিনী রয়েছে। সেইজন্য

শ্রীরামকৃষ্ণের বিয়েটা সত্যি অলৌকিক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই বিষয়ে আর একটি অলৌকিক ঘটনাটি হল; হুগলি জেলায় কামারপুকুর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের বাস আর সারদামণির গ্রামের নাম জয়রামবাটি- দুটিই হুগলি জেলার কাছাকাছি গ্রাম। এই দুই গ্রামের সন্নিকটে আর একটি গ্রাম- তার নাম শিহড়। সেখানে দুজনেরই মামাবাড়ি, দুই পরিবারেরই সে-গ্রামে যাতায়াত ছিল। ঐ শিহড় গ্রামের শিবমন্দির প্রাঙ্গণে এক যাত্রা অনুষ্ঠানে তিন বছর বয়সী সারাদামণি এক আত্মীয়ার কোলে বসেছিলেন। গ্রাম্য মহিলাদের স্বভাব অনুযায়ী সেই আত্মীয়া এতটুকু মেয়ে সারাদামণিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এত লোকের মধ্যে কাকে তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে করে?" তিন বছরের বালিকাটি আঙুল তুলে ভিড়ের মধ্যে বসে থাকা যে যুবকটিকে দেখিয়েছিল; সেই যুবকটি আর কেউ নন – তিনি হলেন সবার প্রিয় গদাধর।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি ঘটনা না লিখলে নয়; ভীষণ আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে চন্দ্রাদেবী শুধু পুত্রকে ভাল করার জন্য তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। পুত্রবধূকে বিয়ের সময় কিছু গহনা দেওয়ার মত তাঁর অবস্থা ছিল না। ফলে মনতুষ্টি ও সামাজিক রীতিনিতি মানার জন্য জমিদার বন্ধু লাহাবাবুদের বাড়ি থেকে সোনার গহনা এনে নববধূকে সাজিয়ে বরন করেছিলেন। বিয়ের শেষে লাহাবাবুদের সোনার অলংকারগুলি ফেরৎ দেওয়ার পালা।কিন্তু চন্দ্রাদেবীর ভাল লাগছিল না বালিকা বধূর গা থেকে সোনার অলংকারগুলি খুলে ফেলতে। না পারে খুলতে আর না পারে অন্যের গহনা সম্পর্কে বালিকা পুত্রবধূকে কিছু বলতে। চন্দ্রাদেবী তাই এই বিষয়ে ভয়ঙ্কর মনঃকষ্টে ভুগছিলেন। গদাধর মায়ের মনঃকষ্ট সহজেই বুঝেছিলেন। তাই মাতাকে শান্ত করার জন্য তিনি নিদ্রায়মগ্ন ঐ বালিকার গা থেকে অতি সন্তর্পণে সমস্ত সোনার অলংকারগুলি খুলে, মাকে দিয়ে দিলেন। বধু বালিকা কিছুই বুঝিতে পারল না। মা এই ব্যাপারে অনেকটা আঘাত পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিরুপায় ছিলেন। পরেরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ঐ বালিকা যখন কেঁদে কেঁদে বলতে থাকে তার গায়ে যেসব গহনা ছিল,সেগুলো আর নেই,

চন্দ্রমনি তখন অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বালিকাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন-"মা, তোমাকে গদাধর এদের থেকে অনেক ভালো গহনা গড়িয়ে দেবে। তুমি দুঃখ করো না।কেঁদো না"। কিন্তু এরপর যে ঘটনা ঘটল সেটা খুবই দুঃখদায়ক।ঐদিন কন্যার এক খুল্লতাত তাকে দেখতে এসে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা জানতে পারলেন। তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে সারাদামণিকে পিত্রালয়ে নিয়ে চলে গেলেন। বিবাহের পর গদাধর প্রায় এক বৎসর সাত মাস অসুস্থতার কারনে কামারপুকুরেই ছিলেন।কলিকাতায় ফিরিলে তাঁর বায়ুরোগে তিনি আবার আক্রান্ত হতে পারেন, সেই কারনে চন্দ্রাদেবী তাঁকে এতদিন তাঁর কাছেই রেখেছিলেন।যাইহোক কলিকাতায় আসার আগে সারাদামণিকে শ্বশুরবাড়িতে আনা হয়।অনেক পরে সারদামণি দক্ষিণেশ্বরে আসেন। লিখিত তথ্য অনুযায়ী সারদামনি আঠার বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে স্বামীর সাধন কর্মে যোগ দেন। রামকৃষ্ণ মা-সারদাকে দিব্য মাতৃকাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন।সহধর্মিণীকে সাক্ষাৎ জগদম্বা রূপে দেখতেন।

৩.৬; দিব্যোন্মাদে গদাধরের ভয়ঙ্কর গাত্রদাহ ও অনিদ্রা

বিয়ের পর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে গদাধর আগের মত শ্রীশ্রীজগদম্ভার সেবাকার্যে তন্ময় হয়ে গেলেন। মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, সংসার, সংসারের অনটন –কামারপুকুরের সবকথা যেন শ্রীশ্রীজগদম্ভার সেবাকার্যের মধ্যে চাপা পড়ে গেল।সংসার এবং সাংসারিক বিষয় তাঁর কাছে তখন বিষবৎ বোধ হতে লাগল। শুধু তাই নয় ভয়ঙ্কর গাত্রদাহ হতে লাগল। দিনরাত শ্রীশ্রীজগন্মাতার ধ্যান,জপ, স্মরণ ও মননে রাতের ঘুম একেবারে চলে গেল।সবসময় শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সকলের মধ্যে দেখতে পাবেন- সেই চিন্তায় একরকম পাগল হয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে পূজা করতে করতে তিনি অদ্ভূত ঈশ্বরীয়রূপ দর্শন করতে লাগলেন। আরতি করেন, আরতি আর শেষ হয় না। পূজা করতে বসলে, পূজা আর শেষ হত না। কিছুদিন পরে পুজা আর করতে পারলেন না-উন্মাদের ন্যায় এধার ওধার বিচরণ করতে লাগলেন। মথুরবাবু তাঁকে মহাপুরুষ বোধে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। মায়ের পূজার

জন্য অন্য পূরোহিতের বন্দোবস্ত করলেন। ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় মূখোপাধ্যায়ের উপর মথুরবাবু মায়ের পূজা ও ঠাকুরের সেবার ভার দিলেন। ঠাকুর আর পূজা করলেন না এবং সংসারও করলেন না- ফলে দেখাগেল তাঁর বিবাহ শুধু নামমাত্র। দিনরাত শুধু মা মা করতে লাগলেন। কখন জড় কাষ্ঠপুত্তলিকার মত, কখন আবার উন্মাদের মত এধার ওধার বিচরণ করতে লাগলেন।কখন কখন তিনি বালকের ন্যায় কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত বিষয়ী লোকদের দেখে তিনি লুকিয়ে যেতেন।ঈশ্বরীয় কথা আর ঈশ্বরীয় লোক ছাড়া তিনি কিছুই ভালবাসতেন না। সর্বক্ষণ শুধু তাঁর মা মা ডাক।তিনি দিনের পর দিন অনিদ্রা ও অনাহারে দিন কাটাতে লাগলেন।তিনি অদ্ভূত এক গাত্রদাহতে ভীষণ কষ্ট পেতে লাগলেন।তাঁর গাত্রদাহ,অনিদ্রা, বায়ুপ্রকোপজনিত রোগের উপশমের জন্য বড় বড় ডাক্তার কবিরাজকে ডাকা হল। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না।বরং গাত্রদাহ, অনিদ্রা, ইত্যাদি অনেক বেড়েই গেল।ঐ সময় পূর্ববঙ্গের একজন বিখ্যাত ডাক্তার ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। রোগের সবকিছু লক্ষণ দেখে এবং শুনে তিনি বলেছিলেন, ঠাকুরের ব্যাধি কোন ওষুধে উপশম হবে না কারন সেটা হল যোগজ ব্যাধি।তাঁর গাত্রদাহ অনিদ্রা প্রভৃতির প্রধান কারন হল দিব্যোন্মাদ। এ সহজে যাওয়ার নয় বা ঔষধেও উপশম হওয়া সম্ভব নয়।তিনিই প্রথম গদাধরের ব্যাধির প্রকৃত কারন নির্দেশ করে ছিলেন।কিন্তু পূর্ববঙ্গের ঐ বিখ্যাত ডাক্তারের কথা কেউ বিশ্বাস করল না। মথুরবাবু প্রমুখ ঠাকুরের হিতৈষী ব্যক্তিবর্গ তাঁর ঐ অস্বভাবী রোগের জন্য ভীষণ চিন্তিত হয়ে নানা ধরনের চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু সে চিকিৎসায় রোগেরত কোন উপশম হলই না, বরং ক্রমশ বাড়তে লাগল।এই সংবাদ কামারপুকুরে চন্দ্রাদেবীর কাছে পৌছে গেল। চন্দ্রাদেবী পুত্রের এই সংবাদে অস্থির হয়ে কোন উপায় না পেয়ে, কামারপুকুরের জাগ্রত বুড়ো শিবের মন্দিরপ্রান্তে প্রায় উপবেশন করে বৃদ্ধা বুড়ো শিবের কাছে হত্যা দিলেন। দু-তিন দিন এই ভাবে থাকার পর বৃদ্ধার স্বপ্নে মহাদেব আবির্ভূত হয়ে বললেন, "ভয় নেই, তোমার পুত্র পাগল হয়নি। ঐশ্বরিক আবেশে তার এইরূপ অবস্থা।

৩.৭; সর্বসমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে ঘোষণা;

আমরা আগেই ভৈরবী ব্রাহ্মণী নামে এক যোগিনী কথা বলেছি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীকে মাতৃভাবে সম্বোধন করতেন। অন্যদিকে ভৈরবী ঠাকুরকে ঈশ্বরের অবতার রূপে ব্যাক্যালাপ করতে লাগলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী যখন গদাধরের কাছ্ থেকে তাঁর, ভাবতন্ময়তা, দৈহিক পীড়ার ও অনিদ্রা ইত্যাদি অস্বাভাবিক ব্যাধির কথা মনোযোগ সহকারে শুনলেন, তিনি গদাধরকে বললেন যে তিনি মোটেই পাগল হয়ে যাননি; বরং আধ্যাত্মিক 'মহাভাব' তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়েছে। এই মহাভাবের কারনেই তিনি দিব্যপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছেন।

ভৈরবীই প্রথম মথুরবাবুকে বুঝিয়ে দিলেন, এসব ছিল ঠাকুরের ভাবাবেশ, যে আবেশ কৃষ্ণ বিহনে রাধার আসত, শ্রী চৈতন্যের আসত, তেমনি মায়ের জন্য ঠাকুরের আসে।" ভৈরবী আরও ব্যখ্যা করে বলেছিলেন যে "গীতায় ভগবান যুগে যুগে অবতার রূপে আবির্ভাবের সঙ্কল্প করেছিলেন, ঠাকুর তাঁদেরই একজন। উনিশ শতকের ধর্মসঙ্কটের সন্ধিক্ষণে যুগাবতার রামকৃষ্ণ আবির্ভাব হয়েছিলেন। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মোটেই উন্মাদ নন। এটা তাঁর দিব্যোন্মাদ।শুধু তাই নয় বিভিন্ন ভক্তিশাস্ত্রের উদাহরণ দিয়ে এবং তাঁর কাছে যে সকল পুঁথি ছিল সেগুলি বিভিন্ন পণ্ডিতদের দেখিয়ে ভৈরবী বলেছিলেন যে রাধা ও চৈতন্য মহাপ্রভুরও একই ভাব এসেছিল। ভক্তিশাস্ত্রে এ বিষয়ে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে। তিনিই ছিলেন প্রথম শাস্ত্রজ্ঞা যিনি প্রথম সর্বসমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে ঘোষণা করেন এবং প্রমান করেন। পরিশেষে ভৈরবী গদাধরের দৈহিক পীড়া উপশমের নিদানও দিয়েছিলেন। ভৈরবীর পথনির্দেশনায় শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রমতে সাধনা শুরু করলেন।জপ ও পুরশ্চরণের মতো মন্ত্রসাধনায় চিত্ত শুদ্ধ করে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ স্থাপন করলেন। (শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩য় ভাগ, ২য় পরিচ্ছেদ)

৩.৮; শ্রীরামকৃষ্ণের একটা জবা গাছে সাদা ও লাল জবা;

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন মথুরবাবু। চলতে চলতে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল দুজনের মধ্যে। সেই সময় মহারানী ভিক্টোরিয়ার শাসনকাল। সেই প্রসঙ্গ টেনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "এদেশের রানী এখন ভিক্টোরিয়া, তিনি কত আইন করেছেন। আবার আজ যে আইন আছে, কাল ইচ্ছা করলে তিনি তা বদলাতেও পারেন। সে-জায়গায় নতুন আইনও করতে পারেন। এখানেও ঠিক সেরকমই। ইচ্ছাময়ী মা কালীর যা ইচ্ছা, তাই সম্ভব।" এই কথা শুনে মথুরবাবু ঠাকুরকে বললেন, "ভগবানকেও জগতের নিয়ম মেনে চলতে হয়; তিনি ইচ্ছা করলেই সব করতে পারেন না।" ঠাকুর বললেন, "তা কেন হবে গো? — "হ্যাঁ গো, মায়ের মহিমায় কোন কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি ইচ্ছাময়ী, ইচ্ছা করলে তিনি সবই করতে পারেন। সমস্ত সৃষ্টি যে তাঁরই হাতে।" মথুরবাবু বললেন, "তিনি ইচ্ছা করলে এই লাল জবাফুলের গাছে কি সাদা জবা করতে পারেন?" ঠাকুর বললেন,"তা পারেন বই কি? তাঁর ইচ্ছা হলে এই লাল জবার গাছেই সাদা ফুল ফুটতে পারে।" কিন্তু মথুরবাবু সে কথায় ততটা যেন বিশ্বাস করতে পারেননি। বাস্তবিকই কয়েকদিন পরে দেখা গেল, দক্ষিণেশ্বরের বাগানে একটা জবাফুলের গাছে এক ডালে সাদা ও অপর ডালে লাল জবা ফুটে আছে। ঠাকুর ডালের গোড়াসুদ্ধ ফুল দুটো এনে মথুরবাবুকে দেখালেন। মথুরবাবু মহা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, "বাবা, আর তোমার সঙ্গে তর্ক করব না।" (অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ লিখছেন প্রণবেশ চক্রবর্তী)

৩.৯; মথুরবাবু কতৃক শ্রীরামকৃষ্ণের শিবকালীর রূপ দর্শন

একদিন মথুরবাবুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই শিব ও শক্তির রূপ-দর্শন করলেন। সেদিন দক্ষিণেশ্বরের একটি ঘরে বসে ছিলেন মথুরবাবু। আর ওই ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষ-সন্নিহিত একটি বারান্দায় শ্রীরামকৃষ্ণ আপন ভাবে বিভোর হয়ে এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছেন আর আসছেন। কুঠিবাড়ির ঘর থেকে মথুরবাবুর চোখ পড়ল বারান্দার দিকে যেখানে রামকৃষ্ণদেব এদিক থেকে

ওদিক আপনমনে বিচরণ করছেন। মথুরবাবু হঠাৎ দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যখন পশ্চিমদিকে যাচ্ছেন, তখন তাঁর মধ্যে শিবমূর্তি প্রকাশিত, আবার যখন পূর্বদিকে যাচ্ছেন তখন তাঁর মধ্যে প্রকাশিত কালীমূর্তি। একই দেহে দুই রূপ। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।ভাবতে লাগলেন-এও কি সম্ভব? মথুরবাবু ভাবলেন, তারই বুঝি দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে। কিন্তু চোখ ঘসে তিনি যতবার দেখছেন, ততবারই সেই একই রূপ। এবার তিনি রামকৃষ্ণ-লীলায় অভিভূত হয়ে মথুরবাবু ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়লেন লীলাময়ের পদতলে। মথুরবাবু সেইদিন ঠাকুরের ভীতর শিব ও শক্তির রূপ-দর্শন করে তাঁকে জীবন্ত দেবতাজ্ঞানে পূজা করেছিলেন। দাপুটে জমিদার মথুরবাবু ঐদিন থেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবতাজ্ঞানে সর্বদা বিশ্বাস এবং ভক্তি করতে লাগলেন। (অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ; প্রণবেশ চক্রবর্তী ও লি...প্র ১০৩)

৩.১০; শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় দিব্যদেহ;

দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরের যে ঘরটিতে থাকতেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সেই ঘর থেকে বেরিয়ে একদিন রাতে পঞ্চবটীর পথে চলেছেন।তাঁর সঙ্গে ছায়ার মত চলেছেন তাঁর নিত্য-সেবক হৃদয়। হাতে তাঁর গাড়ু ও গামছা—যদি মামার কোন প্রয়োজনে লাগে। শ্রীরামকৃষ্ণ যাচ্ছেন গঙ্গাতীরের নির্জনে পঞ্চবটীর নীচে স্থাপিত তাঁর ধ্যানের আসনে। সেই অন্ধকারে গঙ্গাতীর ধরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এগিয়ে যাচ্ছেন। আর সেই অন্ধকারে তাঁর দিকে তাকাতে তাকাতে হৃদয়ও তাঁর পিছন পিছন এগিয়ে চলেছেন। হঠাৎ হৃদয়ের সামনে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে ছিল এক দিব্য ঘটনার দৃশ্য। হৃদয় তাঁর চোখের সামনে যাঁকে দেখছেন তিনি ঠিক তাঁর মামার মতই কিন্তু মামার সেই স্থূল শরীর সেখানে নেই।হৃদয় দেখতে পাচ্ছে না মামার সেই রক্ত মাংসের দেহ। হৃদয় আস্তে আস্তে বুঝতে পারলেন তিনি যা দেখছেন তা মামার (শ্রীরামকৃষ্ণদেবর) বাহ্যদেহ নয়। সেটা ছিল না তাঁর পার্থিব কায়া, ছিল এক জ্যোতির্ময় দিব্যদেহ যা তাঁর (হৃদের) আগে আগে এগিয়ে চলেছে এবং সেই জ্যোতির্ময় দিব্যদেহ থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এক অনির্বচনীয় দিব্যরশ্মি। সেটা

দেখে হৃদয় নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। হতবাক হয়ে বারেবারে ভাবছেন, তিনি এ কী দেখছেন? তিনি দেখছেন, দিব্যলোকের মত দৃশ্যমান তাঁর মামার দেহ শূন্যপথে এগিয়ে চলেছে। সেই আশ্চর্য জ্যোতির্ময় দিব্যদেহের পা দুটি মাটি স্পর্শ করছে না। একবার দু'বার নয়, হৃদয় বারবার লক্ষ করলেন ভাল করে। কিন্তু সেই একই দৃশ্য। ভাবলেন, সবই কি তাঁর চোখের ভুল? ভাল করে চোখ দুটি রগড়ে নিলেন তিনি। কিন্তু যতবার দেখেন, ততবারই তিনি দেখতে পান সেই শূন্যপথে চলমান জ্যোতির্ময় দিব্যদেহ। তিনি বুঝলেন সেটা তাঁর মামার পার্থিব স্থূল শরীর নয়, সেটা ছিল তাঁর মামার অভূতপূর্ব জ্যোতিস্মান তনু। এরপর ঘটল আরএকটি অদ্ভুত কাণ্ড। হৃদয়রাম হঠাৎই নিজের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। তিনি নিজেকে লক্ষ করে দেখলেন, এটাও তো তাঁর নিজের স্বাভাবিক শরীর নয়, এ-ও যে এক দ্যুতিময় কায়া। কোনও দৈব শক্তিবলে মামার ন্যায় তিনিও এক জ্যোতির্ময় দিব্যদেহ ধারন করেছেন। তিনি যেন এক অবিশ্বাস্য দিব্যরূপ লাভ করেছেন। এ-যেন অন্য হৃদয়রাম, এ-যেন এক নতুন দিব্যপুরুষ! এবার আনন্দে উল্লাসে তিনি চিৎকার করে মামাকে ডাকলেন, বললেন, "আমাদের যখন এখন দিব্যতনু লাভ করেছি, এখন আমাদের আর স্থূল শরীরে ফিরে গিয়ে কাজ নেই। চলো, এবার আমরা সুক্ষ শরীরে দেশে দেশে গিয়ে জীবের উদ্ধার করি!' হৃদয়ের চিৎকার শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ এগিয়ে এসে বললেন, "হৃদু চুপ কর। কী হয়েছে যে, এমন করছিস? এমন শুনলে সব লোক ছুটে আসবে। সে-এক মহা বিপদ হবে। হৃদয় তখন আত্মহারা, ভাবের ঘোরে বলে চলেছেন, 'তুমি যেমন রামকৃষ্ণ, আমিও তেমনি" । এইভাবে দিব্যদর্শন করে হৃদয়রাম তাঁর ভাবের ঘোরে চিৎকার করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবন এবং যোগবিভূতির সম্পর্কে যাবতীয় কথা বলতে লাগলেন। পাছে লোকে এসব কথা জানতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি হৃদয়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁর বুকে ছোঁয়ালেন নিজের হাত। বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'থাক শালা জড় হয়ে।' হৃদয় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'কেন মামা আমায় জড় করে দিলে?' এরপর হৃদয় শান্ত হলেন। এটা ছিল একটি দিব্য ঘটনা

বা ঠাকুরের লীলা খেলা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দিব্যজীবনে যাবতীয় যোগবিভূতি ও অলৌকিক শক্তিকে সতর্কভাবে সব সময় সকলের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতেন। *(অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ; প্রণবেশ চক্রবর্তী)*

৩.১১; মথুর বাবুর দেবী বিসর্জন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

রানি রাসমণির জানবাজারের প্রাসাদ-বাড়ির দুর্গা পূজোর সময় একবার এক অদ্ভূত ঘটনা ঘটে ছিল। ঐ ঘটনাটি ঘটেছিল দুর্গা পূজোয় দেবীর বিসর্জনের দিন। রানী রাসমণির জানবাজারের বাড়িতে দূর্গাপূজা চলছে তিন দিন ধরে। এরপর প্রতীমা বিসর্জনের দিন এল। প্রতীমা বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত সকলে। হঠাৎ মাথুর বাবু বললেন যে দুর্গা মাকে তিনি বিসর্জন দিতে পারবেন না। সকলে মথুরবাবুকে অনেক ভাবে বোঝাতে লাগলো যে পুজোর শেষে প্রতিমা বিসর্জন দিতে হয়। কিন্তু মথুরবাবু কারুর কথা শুনলেন না। তিনি জেদ ধরলেন কেউ দূর্গামা কে বিসর্জন দিতে নিয়ে যাবে না। তাঁর স্ত্রী জগদম্বভা তাকে অনেক করে বুঝালেন। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। তিনি বললেন মা কে ছেড়ে তিনি কোনমতে একা থাকতে পারবেন না। তিনি মাকে কিছুতেই জলে ফেলে দিতে পারবেন না। তাঁর এই কথা শুনে সকলে বিপদে পড়ল।

নিরুপায় হয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সেখানে আনা হল মথুরবাবুকে বুঝিয়ে রাজী করানোর জন্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মথুর বাবুকে বিভিন্ন ভাবে আধ্যাত্মিক যুক্তি দিয়ে বোঝালেন মা দূর্গাকে বিসর্জন দিতে হবে। কিন্তু মথুর বাবু কিছুই বুঝবেন না। মথুর বাবু বললেন, "আমি মা কে প্রতিদিন পূজা করতে চাই। প্রতিমাকে জলে ফেলে দিলে আমি মাকে প্রতিদিন পূজা করব কিভাবে?" এই কথা শুনে বুকে হাত বুলাতে বুলাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আস্তে আস্তে বুঝালেন,"তুমি দুঃখ করো না। আমি তোমার কথা বুঝেছি। তুমি কিছু ভুল বলছো না। কিন্তু আমার একটা কথা বোঝার চেষ্টা কর। তুমি তিন দিন মায়ের আরাধনা করেছ বাড়ির দালানে। সকলের সম্মুখে তুমি মাকে ডেকেছ। কিন্তু নিজের মত করে তুমি নিভৃতে নির্জনে মাকে ডাকতে পারনি। এখন থেকে তুমি মাকে তোমার

মনের মন্দিরে পূজা করবে। মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্লেষনে প্রতিমা বিসর্জনে রাজী হলেন।

৩.১২; শ্রীরামকৃষ্ণের নবদ্বীপ দর্শন এবং নৌকাতে ভাবাবেশ;

একদিন মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রামকে নিয়ে নৌকাতে করে নবদ্বীপ দর্শন করতে বেরিয়েছিলেন। যথা সময়ে তাঁরা সকলে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত বিশেষ ঐতিহ্যমণ্ডিত নবদ্বীপ শহর বা নবদ্বীপ ধামে পৌঁছালেন। ভাগিরথী ও জলঙ্গী নদীর মিলন স্থলের পাশে একটি অতি আকর্ষনীয় স্থান নবদ্বীপ ধাম। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সবকিছু মনদিয়ে প্রায় সব দর্শনীয় বস্তু বা বিষয়গুলি অতি আগ্রহ সহকারে অনেক সময় ধরে দেখতে লাগলেন। নবদ্বীপধামের মূল আকর্ষণ হলো মহাপ্রভুর মন্দির। প্রায় ৫৫০ বছরের পুরানো সেই মন্দিরে রয়েছে অপরূপ সুন্দর সোনার গৌরাঙ্গ। ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দির, সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির এবং সোনার গৌরাঙ্গকে তিনি অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। এছাড়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বেশ কিছু দেব-দেবীর বিগ্রহ ও মন্দির পরিদর্শন করলেন। যেমন- চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান মন্দির, রাধারাণীর মন্দির, রাধা মদনমোহন জীউর মন্দির, হরিসভা মন্দির, দ্বাদশ শিব মন্দির, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্মস্থান, মা ভবতারিণী মন্দির, পোড়ামা কালীমন্দির, ভবতারণ শিব মন্দির, বুড়োশিব মন্দির, রাধা কৃষ্ণের যুগল বিগ্রহসহ গৌর নিতাইয়ের অপরূপ বিগ্রহ পরিদর্শন করলেন তিনি। এই সব মূর্তি বা মন্দির সবকিছু শ্রীরামকৃষ্ণের শুকনো শুকনো লাগল। তারপর সকলে নৌকাতে ফিরে গেলেন।যেই মাত্র নৌকা ছাড়ল, ঠাকুরের ভাব হয়ে গেল।আর সেই ভাবের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নৌকা থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন।হৃদে তাঁকে ধরে ফেললেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হলে হৃদে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মামা হঠাৎ তোমার কি হল? হঠাৎ তুমি পড়ে যাচ্ছিলে কেন?" ঠাকুর বললেন, *"গৌরবর্ণ ও স্বর্ণালি আভাযুক্ত অপূর্ব সুন্দর কমল লোচন সম্পন্ন দুটি কিশোর বাহু তুলে হরি হরি বলে অসাধারণ প্রেমদৃষ্টিতে আকাশ পথে আমার দিকে তাকিয়ে হাঁসতে হাঁসতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।সে এক অলৌকিক দৃশ্য।সেই*

অলৌকিক দৃশ্য দেখে আমি অদ্ভুত এক আনন্দ ও বিস্ময়ে ভাবাবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। আরে ঐ দুই বালক আর কেউ নয়- তাঁরা হলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আর প্রভু নিত্যানন্দ। গৌর ও নিতাইয়ের অপূর্ব দৃশ্য দেখে ভাবে বিভোর হয়ে নৌকা থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম।গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হলেন অবতার।তাঁর কি অপূর্ব রূপ" হৃদে তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "মামা, সারা নবদ্বীপ ঘুরলে। অনেক মন্দির ও অনেক বিগ্রহ দেখলে, মন্দিরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও প্রভূ নিত্যানন্দের অপূর্ব মূর্তি দর্শন করলে-সেখানে তোমার ভাবাবিষ্ট হল না, নৌকাতে উঠে গঙ্গার বুকে তুমি হঠাৎ এভাবে সমাধিস্থ হলে কেন?" তখন মথুর বাবু বললেন, "গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে নবদ্বীপ নগরে জন্ম হয়েছিল সেটা গঙ্গার স্রোতে ভেঙে জলের তলায় চলে এসেছে।ঐ বালুময় নদীর চড়াই ছিল গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মভূমি। সেটা হালের নবদ্বীপ শহর নয়।তাই গঙ্গার বুকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রকৃত জন্ম স্থলে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন" ।

৩.১৩; শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুর মধ্যে ভাবসমাধি আনেন

মথুরবাবু, রাসমনির সেজ জামাতা এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। তিনি একবার রামকৃষ্ণের কাছে আবদার করেন যে, ঠাকুরের যেমন ভাবসমাধি হয়, তিনিও তেমনিভাবে ভাবসমাধির অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আবদারে রাজী না হলে, তিনি বলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগ্নে হৃদয়রাম যদি তাঁর দ্বারা ভাব সমাধী লাভ করে থাকে, তাহলে তিনিও পারবেন ভাব-সমাধিতে যেতে। এই বলে মুথর বাবু ভীষণভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন তাঁর মধ্যে ভাব সমাধি এনে দেওয়ার জন্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "কি হবে তোমার ভাব সমাধি তে গিয়ে। তুমিত ভাল ই আছো। এধার ওধার -দুই দিক দেখছ। মা ব্রহ্মময়ীকে পূজা অর্চনা করছ, আবার জমিদারীও দেখছ। কি হবে তোমার ভাব সমাধিতে গিয়ে। তুমি সংসার ধর্ম করছ। সংসার ধর্ম ছেড়ে ছুড়ে তোমার পক্ষে ভাব সমাধিতে যাওয়া

উচিত নয়। তাছাড়া, ঐ ভাব সমাধি তোমার কাজ নয়। তোমার অনেক কাজ রয়েছে। সেসব কাজ কে করবে। তুমি যেমন আছ, ঐ ভালো। মা ব্রহ্মময়ী তোমার সহায় আছেন। যা আছ ঐ ভালো।" কিন্তু মথুর বাবু নাছোড়বান্দা। শেষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাধ্য হয়ে বলেন, "ঠিক আছে, মা-কে বলব, তিনি যা করার তাই করবেন।" এর কয়েকদিন পরেই হঠাৎ মথুরবাবুর মধ্যে সমাধিস্থ ভাব উপস্থিত হয়। এক জায়গায় মথুরবাবু তিনদিন স্থির হয়ে জড়ের মত ঠায় বসে রইলেন। চোখ মুখ লাল হয়েগেছে। তাঁর চোখ থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরছে। খাওয়া দাওয়া নেই। বিষয় আসয়ে এবং কাজ কর্মে তাঁর মন নেই। কারুর সঙ্গে কোন কথাবার্তা নেই।এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে পাগলের মত বসে আছেন। সেই অবস্থায় মথুরবাবুকে দেখে সকলে ভয় পেয়ে গেল। তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ডাকা হল মথুরবাবুকে ঠিক করার জন্য। ঠাকুর এসে দেখেন মথুরবাবু অদ্ভুতভাবে বসে আছেন। তাঁর দু চোখ দিয়ে শুধু অশ্রু অবিরত ঝরে পড়ছে। কোনদিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। তাঁর মধ্যে বাহ্যজ্ঞান নেই। ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ করলেন।অমনি ঠাকুরকে দেখে তাঁর পা জড়িয়ে ধরেন মথুরবাবু। গদগদ কন্ঠে বলেন, " বাবা আমার ঘাট হয়েছে। তুমি তোমার ভাব ফিরিয়ে নাও। ভাবসমাধি এসব আমার জন্য নয়।" ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন "কেন কি হয়েছে?" মথুরবাবু; "এ কী করলে ঠাকুর! আমার সবকিছু তছনছ হয়ে গেল।আমি যে আর বিষয়কর্মে কিছুতেই মন দিতে পারছি না। যতই চেষ্টা করি কাজ কর্মে মন দেই, কিন্তু উঠতে পারছি না কিছুতেই ভাবসমাধি থেকে। বিষয় আসয়, কাজ-কর্ম আমার মন থেকে চলে গেছে। কাজকর্মে মন দিতে চেষ্টা করলেও মন উড়ে উড়ে যাচ্ছে। আর পারছি না। আমি আর এই অবস্থায় থাকতে পারছিনা। এই তিন দিনে বারো ভূত ছেড়ে তেত্রিশ ভুতে আমাকে পেয়েছে। এই অবস্থায় আমি আর থাকতে পারছি না। বিষয় আসয় এবং জমিদারী দেখাশুনা সব চুলোয় গেছে"। এইসব শুনে ঠাকুর হেসে বললেন, "কেন, এখন এসব কথা বলছ। আমি ত আগেই বলেছিলেম, ভাবসমাধি তোমার কাজ নয়। তোমাকে কতবার বলেছিলাম- তোমার জমিদারী আছে, কত কাজ আছে। ও সব কে দেখবে? কিন্তু

তুমি আমার কোন কথাই শুনলে না। জোরকরে তুমি চাইলে ভাবসমাধি। তবে এখন কেনএসব বলছ।" মথুরবাবু বললেন, "আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আর সহ্য করতে পারছিনা" । ঠাকুরঃ "শুধু কষ্ট হচ্ছে, কেন আনন্দ নেই?" মথুরবাবুঃ "হ্যাঁ, আনন্দ আছে। কিন্তু সেই আনন্দ আমার জন্য নয়।সে আনন্দ যিনি নিত্যানন্দ অর্থাৎ তোমার জন্য। আমার কাজ হল শুধু পদসেবা।শুধু পার জ্ঞানে পর সেবা। ভাবসমাধি এবং তার আনন্দ –এসব আমার জন্য নয়।এসব কিছু তোমার জন্য।তুমি ফিরিয়ে নাও আমার ভাব সমাধি।" মথুরবাবুর এসব কথা শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আস্তে আস্তে মথুরবাবুর বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। মথুরবাবু ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়ে গেলেন।

৩.১৪; শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের আসনে উপবিষ্ট

বৈষ্ণব পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভীষণ অনুরাগী ছিলেন। বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধক*। কলিকাতার পণ্ডিত সমাজে ছিল তাঁর বিশাল খ্যাতি। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পানিহাটীর চিঁড়া মহোৎসবে তিনি ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। তখন হতেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং পরবর্তী কালে সর্বসমক্ষে তিনি ঠাকুরকে ঈশ্বরের অবতাররূপে ঘোষণা করেছিলেন। একবার ঠাকুর ভাবসমাহিত অবস্থায় বৈষ্ণবচরণের কাঁধে আরোহণ করেন। বৈষ্ণবচরণ এতে উৎফুল্ল হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বন্দনা করতে থাকেন।বৈষ্ণবচরণ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসতেন।একবার তিনি ঠাকুরকে কাছিবাগানের তাঁর কর্তাভজা সমাজে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁহার নিমন্ত্রণেই ঠাকুর কলুটোলার হরিসভাতে গিয়ে কীর্তনে যোগ দেন এবং ভাবোন্মত্ত অবস্থায় নৃত্য করতে করতে শ্রীগৌরাঙ্গের চৈতন্যদেবের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হয়েছিলেন। বৈষ্ণবচরণ চৈতন্যসভার সভাপতি ছিলেন। একসময় বৈষ্ণবচরণ মথুরবাবুকে বলেছিলেন, এ-উন্মাদ সামান্য নহে —প্রেমোন্মাদ। ইনি ঈশ্বরের জন্য পাগল। ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও বৈষ্ণবচরণ অনেকবার ঠাকুরের

মহাভাবের অবস্থা লক্ষ্য করেই বলেছিলেন-ঠাকুর সামান্য উন্মাদ নহে—তিনি প্রেমোন্মাদ। শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় কখনও অন্তর্দশা (তখন জড়বৎ সমাধিস্থ), কখন অর্ধবাহ্য, কখনও বা বাহ্যদশা। কিভাবে তিনি কলুটোলার হরিসভাতে গিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের চৈতন্যদেবের আসনে উপবিষ্ট হয়ে ছিলেন এবং তারপরে কি অপূর্ব লীলা হয়েছিল –সেটা একটু সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক।

ভজন-কীর্তন করা বৈষ্ণবদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক কর্ম। পরমহংস জ্ঞানে কলকাতার কলুটোলার একটি বাড়িতে হরিসভায় বৈষ্ণবভক্তগন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন ভজন-কীর্তন শুনার জন্য আমন্ত্রণ করেন।ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে গিয়েছেন এবং চুপচাপ বসে ভজন-কীর্তন শুনছেন। ঐ হরিসভায় রীতি অনুযায়ী সভার মাঝখানে শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ আসন পাতা থাকে। ঐটিকে শ্রীগৌরাঙ্গের আসন বলা হয়।ধরে নেওয়া হয়, ভজন-কীর্তনের সময় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সভায় মাঝখানে এসে ঐ আসনে অধিষ্ঠান করেন আর ভক্তগন তাঁর উদ্দেশ্যে ভজন-কীর্তন করতে থাকেন। বৈষ্ণবদের প্রথা অনুযায়ী ভজন-কীর্তন শুরু করার পূর্বে তাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে আবাহন করেন, তিনি যেন অবতীর্ণ হয়ে তাঁর আসন গ্রহণ করেন।। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে মহাপ্রভু সত্যসত্যই হরিসভায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি তাঁর আসনে উপবিষ্ট হন। সেদিনও সেখানে সেই উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের আসন পাতাছিল। ঐ দিনও প্রথাগত বৈষ্ণবভক্তগন তাঁদের আবাহনী ভজন শুরু করলেন এবং তৎক্ষনাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে সেই পবিত্র আসন গ্রহণ করলেন। কেউ কেউ ভাবলেন, কাজটা তিনি ঠিকই করেছেন কারণ তাঁকে সবাই উচ্চকোটির সাধু বলে জানতেন। কিন্তু অন্যরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন এবং আপত্তি জানালেন। যাঁরা ঠাকুরের ঐভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আসন গ্রহণ করার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ব্যাক্তি হলেন বিখ্যাত সাধু ভগবান দাস। তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর অসম্মতি সকলের সামনে প্রকাশ করেছিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন শুনলেন যে ভগবান দাস তাঁর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন,

তিনি তাঁর কাছে যেতে চাইলেন। তখন বাধ্য হয়ে মথুরবাবু একটি নৌকার ব্যাবস্থা করলেন। তিনি মথুরবাবু ও হৃদের সঙ্গে ভগবান দাসের আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কিন্তু মথুরবাবু বারে বারে বলতে লাগলেন,"বাবা, তুমি কেন ঐ লোকটার কছে যেতে চাইছ? আমদের ওখানে গিয়ে কি হবে?" কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "চল আমরা যাই।" ভগবান দাস হলেন বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার এক প্রবীন ও সিদ্ধ বৈষ্ণব। তাঁর ত্যাগ, শান্ত স্বভাব, ভগবৎ প্রেম, আধ্যাত্মিক শক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতার কথা ঐ সময় প্রায় সকলে জানত। এবার আসি ভগবান দাসের আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ আগমনের কথায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ আশ্রমে সর্বাঙ্গ-বস্ত্রাবৃত হয়ে যখন প্রবেশ করলেন, তখন ভগবান দাস হঠাৎ অনুভব করলেন চারিদিকে চন্দনের সুরভী বইছে। তখন তাঁর মনে হল তাঁহার আশ্রমে কোন মহাপুরুষ আগমন করেছেন। ভগবানদাস বাবাজীকে সর্বদা জপের মালা ঘুরাতে দেখে হৃদয়রাম তাঁকে প্রশ্ন করেন যে সিদ্ধ পুরুষ হয়েও তিনি কেন সর্বদা মালা জপ করেন। তখন তিনি উত্তর দেন যে, তিনি শুধু লোকশিক্ষার জন্য তা করেন। তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ অবস্থায় ভগবান দাসের ঐ কথার প্রতিবাদ করে তাঁর অহংকার চূর্ণ করেন। শেষ পর্যন্ত ভগবানদাস শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ত্ব বুঝতে পারেন এবং স্বীকার করেন যে, তিনিই (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ) কলুটোলা হরিসভার শ্রীচৈতন্য আসনে উপবিষ্ট হওয়ার অধিকারী। এই ঘটনার পরথেকে তিনি সবাইকে বলে বেড়াতেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ একজন অবতার, তাই শ্রীগৌরাঙ্গের আসন গ্রহণ করার অধিকার তাঁর আছে।

৩.১৫; মা সারদা একটি সন্তান চচাওয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর;

মা সারদামনি একসময় অন্য কিছু মেয়েদের কথা শুনে বাধ্য হয়ে একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন "সকলে বলছে, আমার অনেক দিন বিয়ে হয়েছে কিন্তু আমার এখনো কোন সন্তান হয়নি। তারা এই জন্য আমাকে বিভিন্নভাবে দোষারোপ ও অপমান করছে। আমি নাকি অনেক অধর্ম কাজ করছি। সব মেয়েরা একরকম ঘর

সংসার করে, আর আমি করছি অন্য ভাবে। তাই ওরা আমাকে অনেক গালাগালি করে। ওরা বলে আমি নাকি জানি না সংসার কি? স্বামী কি-আমি কিছুই জানি নে। আমার ছেলেপুলে না হলে আমাকে ওরা কিছুতেই ক্ষমা করবে না। তাই আমার একটি সন্তান চাই। আপনি না করবেন না।" ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামনির ঐসব কথা শুনে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতেই পারেন নি যে সারদামনি তাঁকে এই ধরনের কথা বলে বিপদে ফেলে দেবেন। তিনি ভাবতে লাগলেন কি ভাবে সারদাময়ী সম্পর্কে তাঁর বিচার বিবেচনা, চিন্তা ধারা সব ভুল হয়ে গেল। তিনি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে মনে মনে মা ব্রহ্মময়ীকে ডাকলেন আর জিঙ্গাসা করলেন, "মা তুই কি সারদাকে দিয়ে আমার পরীক্ষা নিচ্ছিস? এ তোর কি ধরনের পরিক্ষা? আমাকে বিপদে ফেলে তুই কি আনন্দ পাচ্ছিস? মা তুই আমাকে টলাতে পারবি না।" এরপর চোখ তুলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাময়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি একটা সন্তান চাইছ্ কেন গো? সময় মতো তোমার এত সন্তান হবে, তাদের জ্বালায় তুমি পাগল হয়ে যাবে। তোমায় সকল সময় তারা মা মা বলে ডাকবে, তখণ তাদেরকে সামলানো তোমার ভার হয়ে উঠবে। তুমি একটু ধৈর্য ধর। দু'দিন পরে এত মা-মা ডাক শুনবে যে সন্তানকে সময় দিয়ে নিজের জন্য সময় আর বাঁচবেনা।"

পরে আমরা সকলেই দেখলাম, ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী একদিন সত্যি হল।সন্তানস্নেহে প্রতিটি ভক্তকে আপন করে নিতেন মা সারদা। তাই মা সারদা বলেছিলেন, 'আমার শরৎ যেমন ছেলে, ওই আমজাদও তেমন ছেলে'। শরৎ, অর্থাৎ পরবর্তী কালে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ। সিস্টার নিবেদিতা ঠাকুরের সেই ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যাওয়ার প্রত্যক্ষদর্শী। ১৯০৯ সালে, বিশেষ করে আলিপুর বোমা মামলার রায় প্রকাশের পরে বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে যেন বিপ্লবীদের ঢল নেমে গিয়েছিল। সবাই মায়ের আশীর্বাদ চান। তখনই নিবেদিতা সারদামণিকে বলেছিলেন, ''মা, ঠাকুর বলেছিলেন, কালে আপনি বহু সন্তান লাভ করবেন। মনে হয় সেই সময় অতি নিকট। সমগ্র ভারতবাসী আপনার সন্তান।''

তাঁর ছিল শাশ্বত মাতৃপ্রেম।তিনি হলেন সকলেরই মা। তাইত সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে ঐ ভবিষ্যৎবানীটি করেছিলেন।

সিস্টার নিবেদিতা লিখেছেন, 'সকল মহান জাতীয়তাবাদীই তাঁর (শ্রীশ্রী মার) চরণ স্পর্শ করে যেতেন। সারদাময়ী কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না। যদিও তিনি জানতেন এটা খুবই ঝুঁকির কাজ হয়ে যাচ্ছে'। ১৯০৯ সালের ২২ জুলাই মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'সব দলগুলিই ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলছে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিকট হতে নূতন প্রেরণা আসছে। কারাগার হতে মুক্তিলাভ করে দলে দলে সকলে শ্রী মাকে প্রণাম করিয়া যাচ্ছে'। আর সারদামণি সেই সন্তানদের নিয়ে গর্ব করে বলছেন, ''কী সাহস! এমন সাহস কেবল ঠাকুর আর নরেনই আনতে পারে। দোষ যদি কারও হয়, সে তো তাদেরই।'' বিপ্লবীরা অসহায় সন্তানের মত ছুটে আসতেন সারদামণির কাছে। কেন? এর উত্তর পাওয়া যায় বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের লেখা থেকে। তিনি লিখেছিলেন, ওই শান্ত সমাহিত নীরব জীবনের মধ্যেই রয়েছে অতিবিপ্লবের বীজ। রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ-এই ত্রয়ী মহাবিপ্লবের প্রতীক"। আমরা সকলেই জেনেছি মা সারদা কত শত শত মানুষকে সন্তানজ্ঞানে তাদের জীবনের বিপদবহুল পথ থেকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এ কারণেই তিনি বিশ্বজননী।

৩.১৬; শ্রীঅরবিন্দের সঙ্কটময় লগ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের বিদেহী সত্তার সূক্ষ্ম শরীরী উপস্থিতি;

শ্রীঅরবিন্দ একাধারে একজন মহাবিপ্লবী এবং এক মহাসাধক ছিলেন। প্রসঙ্গত ঐ মহাসাধকের জীবনের এক সঙ্কটময় সময়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর দেহহীন সত্তায় অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরে মহাসাধকের সামনে। বিভিন্ন লেখা থেকে পাওয়া যায় শ্রীঅরবিন্দ মাত্র সাত বছর বয়সে ১৮৭৯ সালে বিলেতে যান এবং ১৮৮৬সালে শ্রীরামকৃষ্ণের যখন মহাসমাধি হয়, সেইসময় শ্রীঅরবিন্দ লন্ডনেই ছিলেন। সামনাসামনি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে কখনো দেখেননি। লন্ডন থেকে তিনি ভারতে ফিরে আসেন ১৮৯৩ সালে এবং তারও ঠিক পনেরো বছর বাদে, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের

দেহত্যাগের প্রায় ২২ বছর পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সূক্ষ্ম শরীরী উপস্থিতি অনুভব করেন। প্রণবেশ চক্রবর্তীর লেখা 'অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ' বইটি থেকে আমরা জানতে পারি যে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে মতিলাল রায়ের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। মতিলাল রায় শ্রীঅরবিন্দের মুখে যে-সব বিবরণ শুনেছেন, সে-সবই লিখে রেখেছেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক জীবনসঙ্গিনী গ্রন্থে। প্রণবেশ চক্রবর্তীর লেখা থেকে জানা যায়, মতিলাল লিখেছেন, " গ্রে স্ট্রিট হইতে পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া (বোমা মামলায়) একখানি ঠিকা গাড়ি করিয়া তাঁহাকে (শ্রীঅরবিন্দকে) যখন লালবাজার পুলিস কোর্টে আনা হইতেছিল, সেই সময় তাঁহার সম্মুখে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সারাক্ষণ বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা ও ভরসা দিয়াছিলেন।" প্রণবেশ চক্রবর্তী আরও উল্লেখ করেছেন যে দেশে ফেরার পর শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশ-বাসের শুরু থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী ছিলেন।তাই বোধ হয়, মহাসাধক শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে—লিখেছেন, 'পাঁচশত বিগত বৎসরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মতো দ্বিতীয় এক পুরুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হননি।' সেই শ্রীরামকৃষ্ণই এক গভীর সঙ্কটের সময় (মানিকতলা বোমার মামলা) শ্রীঅরবিন্দের সামনে সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

৩.১৭; ভৈরবীর ইষ্টদেবতাকে নিবেদিত অন্নভোগ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেশে খাওয়া

ভৈরবী সর্ব প্রথম বলেছিলেন তাঁর প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীকে মাতৃভাবে দেখতেন। একদিন ভৈরবী তাঁর ইষ্টদেবতা রঘুবীরকে অন্নভোগ নিবেদন করে তাঁরই ধ্যানে মগ্ন হয়ে আকুল হয়ে তাঁকে আবাহন করছিলেন। তখন নিজের ঘরে বসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মনে হঠাত ভাবাবেশ এলো। বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে ভৈরবী যেখানে তাঁর ইষ্টদেবতা রঘুবীরকে অন্নভোগ নিবেদন করছিলেন সেখানে এসে হাজির হলেন। তারপর তিনি সেখানে বসে রঘুবীরকে নিবেদিত অন্নভোগ খেতে লাগলেন। ভৈরবী তখন চোখ বন্ধ করে

তাঁর ইষ্টদেবতা রঘুবীরকে ধ্যানে মগ্ন হয়ে আকুল হয়ে ডেকে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর ঠাকুরের আবেশ কাটল; চেতনা ফিরল। আর চেতনা ফিরতেই তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন ভাবাবিষ্ট হয়ে রঘুবীরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন তিনি উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছে। তিনি ভাবতে লাগলেন "ওমা, ভৈরবীর কাছে আবার কখন এলুম! হাতে অন্ন, মুখে অন্ন, সামনে উচ্ছিষ্ট অন্নভোগ। হায়, হায়, এ আমি কী করলুম! রঘুবীরের অন্ন উচ্ছিষ্ট করলুম! বড্ড ভুল হয়ে গেল।" নিজের প্রতি এই কথা বলতে বলতে তিনি উদ্ভ্রান্তের মতো চলে গেলেন। ততক্ষণে ভৈরবীরও অবশ্য ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেছে। তিনি সব দেখেছেন, সব শুনেছেন। আর সব দেখেশুনেই তাঁর মনে অন্য এক ভাবের উদয় হল। তাঁর মনে হল, দক্ষিণেশ্বরের ছোট ভটচাযের রূপ ধরে ওই নৈবেদ্য যেন স্বয়ং রঘুবীরই এসে গ্রহণ করলেন। যেমন, কৃষ্ণরূপে অতিথির প্রার্থনা গ্রহণ করেছিলেন, নিমাইরূপে তৈর্থিক ব্রাহ্মণের প্রার্থনা গ্রহণ করেছিলেন, এখানেও এই অবতারও তেমনটাই করলেন। ভৈরবী বুঝলেন, তাঁর নৈবেদ্য রঘুবীরই এসে গ্রহণ করলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন- এতদিন ঠাকুরকে তিনি হৃদয়ে অবতাররূপে উপলব্ধি করেছিলেন। আজকে তিনি তাঁকে যেন পেলেন। তাই ঠিক করলেন তিনি যখন ঠাকুরকে পেয়ে গেছেন, তাঁর আর শিলার ঠাকুরের প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর সালগ্রাম শিলাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন।

৩.১৮; পঞ্চমন্ডীর আসনে বেদীর উপর রামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনা;

কোথা থেকে এক খুব সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে এসে ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন, "এই অপূর্ব সুন্দরী নারীকে তুমি সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে পূজা করো। কোন রকম কামনা বাসনা নিয়ে তুমি এর দিকে তাকাবে না।" এরপর ভৈরবী সেই অপূর্ব সুন্দরী যৌবনা রমনীকে পঞ্চমন্ডীর আসনে বেদীর উপর একেবারে নগ্ন হয়ে বসতে বললেন। তারপর ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে ঐ মেয়ের কোলে বসে ধ্যান করতে বললেন। ভৈরবীর এই কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে একটু ইতস্তত বোধ করলেন। ঐ মেয়ের কোলে বসে

রামকৃষ্ণ সর্বসমক্ষে ঐ অপূর্ব সুন্দরী নারীকে মা ব্রহ্মময়ী রূপে একমনে পূজা করতে লাগলেন। এইভাবে রামকৃষ্ণ বিভিন্ন তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ পুরুষ হয়েছিলেন। যেমন ঐ অলৌকিক শক্তি বলে তিনি যখন খুশি এবং যেখানে খুশি যেতে পারতেন সকলের অলক্ষে। কেউ তাকে দেখতে পাবে না। কোথাও দাঁড়ালে তার ছায়া পড়বে না। তন্ত্র সাধনার এই শক্তি কে বলে সিদ্ধাই। তন্ত্র সাধনার অধিকাংশ সিদ্ধ পুরুষ গন এই সকল সিদ্ধাই নিয়ে মেতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সিদ্ধাই শক্তি ব্যবহার করেন নি। বরং তিনি এই সিদ্ধাই শক্তি প্রয়োগের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

৩.১৯; রামলালা ও শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক ঘটনা

১৮৬৪ সালে দক্ষিণেশ্বরে একজন ভ্রাম্যমান জটাধারী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এসেছিলেন। সেই সন্ন্যাসী রামচন্দ্রকে আদর্শ দেবতা জ্ঞানে পূজা ও ধ্যান করতেন। তিনি সর্বদা বালক রামচন্দ্রের একটি ছোট ধাতব মূর্তি তাঁর সঙ্গে বহন করতেন, যাঁকে তিনি রামলালা নামে ডাকতেন। সর্বদা তিনি এই ছোট্ট মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেবপুত্র রামের প্রতি কৌশল্যার কোমল স্নেহ ভালবাসা প্রদর্শন করতেন। আজীবন আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ফলে তিনি আসলে ধাতুর প্রতিমূর্তিতে তাঁর আদর্শ দেবতার উপস্থিতি অনুভব করতেন। রামলালা তাঁর কাছে শুধু একটি ধাতব মূর্তি নয়,তিনি ঐ মূর্তির মধ্যে প্রাণবন্ত ঈশ্বরকে খুঁজে পেতেন। ছোট্ট বালক রূপে রামলালাকে আদরকরে দুধ খাওয়ানো,স্নান করানো, তার সাথে খেলা করা,তাকে নিয়ে বেড়ানো- এইভাবে সারাদিন ঐ সন্ন্যাসী রামলালাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন এবং বালক রামচন্দ্রকে তাঁর স্নেহ, ভালবাসা ও ভক্তি প্রদর্শন করতেন। সে সারাদিন রামলালার সাথে কথা বলে আর যখন যেটা চায় তাই হাঁসি মুখে মহা আনন্দে খেতে দেয়। রামকৃষ্ণ প্রায় ওখানে যেতেন আর দেখতেন।

রামের প্রতি জটাধারী বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে,ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ,ঐ সন্ন্যাসীকে দক্ষিণেশ্বরে কিছু দিন কাটাতে অনুরোধ করেন। তারপর শীঘ্রই রামলালাও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গী হয়ে ওঠেন। একদিন রামকৃষ্ণ সাধুর সাথে রামলালের খেলা দেখার পর

ওখান থেকে চলে আসছে এমনি ঐ রামলালা রামকৃষ্ণের পিছু পিছু চলে আসছে। রামকৃষ্ণ রামলালাকে বারে বারে ঐ জটাধারীর কাছে ফিরে যেতে বলছে, কিন্তু রামলালা কিছুতেই জটাধারীর কাছে আর ফিরে যেতে চায় না। সে রামকৃষ্ণের পিছু পিছু আসবেই।

পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন যে, ভাবের মধে দেখতেন- কীভাবে রামলালা (ছোট্ট মূর্তিটি) তার সামনে সুন্দরভাবে নাচত, তার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাঁকে কোলে বা বাহুতে নেওয়ার জন্য জোর করত,কোলে উঠত, তাঁর সঙ্গে রোদে মাঠে দৌড়াতো, বাগান থেকে ফুল ছিঁড়ত, নদীর জলে তাঁর সঙ্গে খেলা করত। সারাদিন দুষ্টুর ছেলের মতো মজা করত আর তিনি রামলালার সাথে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতেন। রামলালার সঙ্গে তাঁর একটা খুব মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ঐ জটাধারী সন্ন্যাসীর মত তিনিও ঐ মূর্তির মধ্যে বালক রামচন্দ্রকে দেখতে পেতেন।

একদিন জটাধারী সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন যে তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে বিদায় নেবেন এবং রামলালাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে রেখে যাবেন কেননা রামলালার সঙ্গে তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণর) একটা খুব মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাছাড়া রামলালা তার অন্তরের প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। এই বলে জটাধারী সন্ন্যাসী অশ্রুসিক্ত চোখে রামলালাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে রেখে খালিহাতে দক্ষিণেশ্বর থেকে বিদায় নিলেন। কিছু দিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ রামলালার মাধ্যমে রামচন্দ্রের দর্শন পেয়ে ছিলেন এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন।

বিদায় নেওয়ার সময় জটাধারী সন্ন্যাসী রামলালাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে রেখে যাচ্ছেন

৩.২০; তোতাপুরীর লুপ্ত চেতনা ফিরিয়ে আনা

আমরা তোতাপুরী সম্পর্কে আগে জেনেছি; শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম তোতাপুরীকে দর্শন করেন দিব্য-আবেশে, অথবা তাঁর অলৌকিক শক্তির সাহায্যে। তোতাপুরীর কাছেই একটানা তিনদিন নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বিনা সাধনায় ও প্রস্তুতিতে এমন নির্বিকল্প সমাধি! বুদ্ধিতে এর বিচার অসাধ্য। এই 'নেংটা' সাধু তিনদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে বৈদান্তিক তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে অনেক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সব সময় মাকালীকে মা মা করে পাগল হয়ে যেতেন। তিনি শক্তি সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন— তোতাপুরী এসব মেনে নিতে পারতেন না। তাঁর মতে, এসবই ভ্রান্তি। অদ্বৈত বেদান্তী তোতাপুরী মা কালীকে মানতেন না, শক্তি সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন না—তাঁর কাছে সবই ছিল 'মায়া'। এই ব্যাপারে তোতাপুরীকে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অলৌকিক ঘটনা রয়েছে।

দক্ষিণেশ্বরে থাকতে থাকতে একদিন তোতাপুরী কঠিন অসুখে পীড়িত হয়ে পড়েন। সুঠাম, সবল পাঞ্জাবী শরীর ছিল তাঁর। বাঙলার জল বোধহয় তাঁর সহ্য হল না। তিনি পড়লেন ভয়ঙ্কর রক্ত আমাশয়। কোন কিছুতেই রোগের উপশম হচ্ছে না। দীর্ঘদিন রোগে ভুগতে ভুগতে তাঁর শরীর জীর্ণ হয়ে গেল। উদর যন্ত্রণা এতটাই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল যে, তিনি শেষ পর্যন্ত ঠিক করে ফেললেন, ঐ শরীর আর রাখবেন না, গঙ্গায় বিসর্জন দেবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ওদিকে তোতাপুরীর ঐ মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। একদিন রাত্রে আত্মবিসর্জনের সঙ্কল্প নিয়ে তোতাপুরী গিয়ে নামলেন ভরা গঙ্গার জলে। তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন গভীর জলের দিকে। কিন্তু যতই তিনি গভীর জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, ততই তিনি দেখলেন, জল যেন কিছুতেই হাঁটুর উপর আর উঠছে না। ডুব যে দেবেন সেই জলটুকুও তিনি পেলেন না এত বড় গঙ্গায়। একান্ত নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন তিনি। গঙ্গায় এক অজ্ঞাত

রহস্যময় কারণে আত্মবিসর্জন করতে পারলেন না তোতাপুরী, এদিকে তাঁর পেটের অসহ্য যন্ত্রণা বাড়তেই থাকে। চোখের সামনে নিষ্কৃতির অন্য কোনও উপায় না দেখে তিনি তাঁর শিষ্যকে স্মরণ করলেন। এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, মিনতি করে বললেন, 'আমাকে বলে দাও, এই যন্ত্রণা থেকে কীভাবে মুক্তি পাব।'শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'শ্যামা মা-কে প্রণাম করে তাঁর কাছে নিরাময় হবার প্রার্থনা করো, তাহলেই হবে।' তোতাপুরী তখনি গেলেন মা ভবতারিণীর মন্দিরে। হাত-জোড় করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন মা কালীকে। তারপর যখন মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন, তখনই তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর পেটের যন্ত্রণা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই বুঝলেন, সেই ভয়ঙ্কর ব্যাধিটা আর নেই। সেদিন তোতাপুরী বুঝলেন, এতদিন তিনি শক্তিকে উপেক্ষা করে ভ্রান্তির জালে জড়িয়ে ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁকে সেই ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করলেন। তখন থেকেই তাঁর বিশ্বাস হল শক্তিতে, লাভ করলেন পূর্ণজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক মহিমাই ফিরিয়ে দিল তোতাপুরীর লুপ্ত চেতনা। (অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ - প্রণবেশ চক্রবর্তী)

৩.২১; শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথকে বলেন তিনি জনক রাজার মত দুখানা তরোয়াল ঘোরায়

রামকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ভালই যোগাযোগ ছিল। ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই তাঁকে দেখতে আসতেন, তিনিও যেতেন। ব্রাহ্মসমাজের বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়েছিল, যার মধ্যে অন্যতম রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৮৬৬ সালে, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এক পরম সাধক, আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার প্রচলন করেন। কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার সংস্পর্শে আসেন। দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরচিন্তা করেন শুনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মথুরবাবুর সাথে একদা মহর্ষির বাড়িতে তাঁকে দেখতে যান। প্রথম পরিচয়েই ঠাকুর মহর্ষির

ভিতর সাধকের লক্ষণ দেখতে পান। অত জ্ঞানী এবং ঈশ্বরোপাসক হওয়া সত্ত্বেও মহর্ষিকে সংসারের কাজে ব্যাপৃত দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে 'কলির জনক' বলেন। তাঁর অনুরোধে মহর্ষি তাঁকে বেদ হইতে কিছু কিছু অংশ শোনান। ঠাকুরের ধ্যানাবস্থায় দর্শনের সঙ্গে এর মিল ছিল। মহর্ষিও ঠাকুরের সহিত ধর্মালোচনায় প্রীত হন ও তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যিনি 'মহর্ষি' আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই কেশবচন্দ্র সেন সখেদে একবার শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "মশাই, বলে দিন কেন আমার ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে না।" কেশবচন্দ্র সেনের ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন; "দেবেন্দ্রনাথ ভক্তিমান, নিত্য উপাসক, ভাবুক। তিনি মহর্ষি। গৃহী হয়েও তিনি ঈশ্বরের নাম করেন।"ঠাকুর রামকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে তাঁকে বলেছেন— "তুমি জনক রাজার মতো দু'খানা তরোয়াল একসঙ্গে ঘোরাও, একখানা জ্ঞানের অন্যখানা কর্মের।"

৩.২৩ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঐতিহাসিক ষোড়শীপুজা;

১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস -ফল হারিণী কালী পূজার দিন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীশ্রী জগদম্বাকে পূজা করার বিশেষ আয়োজন হয়েছে। ঐ আয়োজন কিন্তু মন্দিরে না হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে গোপনে তাঁর গৃহে ব্যবস্থা হয়েছে। পূজা কালে দেবীকে বসতে দেওয়ার জন্য আলিম্পন রঞ্জিত একটি পিঠ পূজকের আসনের দক্ষিণ পার্শে স্থাপিত হয়েছে। অমাবস্যার নিশির গাঢ় অন্ধকার নেমে এল। সেদিন ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় রাত্রিকালে মন্দিরে বিশেষ পূজা করবে। গৃহে ঠাকুরের পূজার যথাযত ব্যবস্থা করে হৃদয় মন্দিরে চলে গেলে। দিনু পূজারী এসে রাত্রিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সাহায্য করতে লাগলেন। দেবীর পূজার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হতে রাত প্রায় ৯ টা বেজে গেল। মাতা ঠাকুরানী অর্থাৎ সারদা মাকে পূজা কালে উপস্থিত থাকার কথা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ইতিপূর্বে বলে ছিলেন। তাই তিনিও ঐ ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর পুজায় বসলেন।

পূজা সামগ্রী সকল সংশোধিত হয়ে পূর্বকৃত্য সম্পাদিত হল। ঠাকুর এইবার আলিম্পন রঞ্জিত পীঠে শ্রীশ্রী মা সারদাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। পূজা দর্শন করতে করতে মা সারদা ইতঃপূর্বেই অর্ধবাহ্য দশা প্রাপ্ত হয়েছিলেন । সুতারং তিনি কি করছেন তাহা সম্মুখ না বুঝে মন্ত্র মুগ্ধার ন্যায় তিনি এখন পূর্ব মুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণ ভাগে উত্তরাস্যা হয়ে উপবিষ্টা হলেন। সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্র পূত বারি দ্বারা ঠাকুর বারং বার শ্রীশ্রীমাকে যথা বিধানে অভিষিক্তা করলেন এবং অনন্তর মন্ত্র শ্রবন করাইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন - " হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধি দ্বার উন্মুক্ত কর। এঁর (শ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করে ইহাতে আবির্ভূতা হয়ে সর্ব কল্যাণ সাধন কর ।''

অতঃপর শ্রীশ্রীমাকে মন্ত্রসকলের যথা বিধানে ন্যাস পূর্বক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ দেবী জ্ঞানে তাঁকে ষোড়শোপচারে পূজা করলেন এবং ভোগ নিবেদন করলেন । বাহ্যজ্ঞান তিরোহিতা হয়ে শ্রীমা সমাধিস্থা হলেন । ঠাকুর ও অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সম্পূর্ণ সমাধি মগ্ন হলেন । সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পূর্ণ ভাবে মিলিত ও একীভূত হলেন ।

নিশার দ্বিতীয় প্রহর অতীত হল । আত্মারাম ঠাকুরের এইবার বাহ্য সংজ্ঞার কিছু কিছু লক্ষন দেখা দিল। পূর্বের ন্যায় অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হয়ে তিনি এখন " দেবী কে আত্ম নিবেদন করিলেন। অনন্তর আপনার সহিত সাধনার ফল ও জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব শ্রীশ্রীদেবী পাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জন পূর্বক মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তাঁহাকে প্রনাম করলেন --" হে সর্ব মঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপে , হে সর্ব কর্ম নিষ্পন্ন কারিণী , হে শরণ দায়িনি, হে গৌরি , হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম , তোমাকে প্রণাম করি । পূজা শেষ হল -মূর্তিমতী বিদ্যা রূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীয় উপাসনা পূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হল --- তাঁর দেব-মানবত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করিল ।

অদ্বৈত-ব্রহ্মলাভের পরেও শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শীপুজার মাধ্যমে আবার গুনময়ী দেবীর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই পূজায় তিনি সারদা দেবীকে দিব্য মাতৃকাজ্ঞানে পূজা নিবেদন করেছিলেন। তাঁকে দেবী কালীর পীঠে বসিয়ে পুষ্প ও ধূপদানে তাঁর পূজা সম্পাদন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, তিনি যে নারীমাত্রেই জগজ্জননীর রূপ দর্শন করেন, তাঁর নিজের স্ত্রীও তার ব্যতিক্রম নয়। এমনকি তিনি বারবণিতাদেরও মাতৃসম্বোধন করতেন।

পণ্ডিতেরা মনে করেন নারীই ভগবতীর একএকটি রূপ হলেও যে শরীর অবলম্বন করে ভগবতী আবির্ভূতা,তাঁর আরাধনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বের কাছে অনুপম একটি মাতৃমূর্তি দিয়ে গেছেন। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ লিখছেন, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমন্ত্রে তাঁর সাধনা করেছিলেন। জগতের প্রতিটি নারীকে তিনি জগজ্জননীর সাক্ষাৎ মূর্তিরূপে এবং আরাধ্যা ভবতারিণীরূপে। তিনি দেখতেন, মৃন্ময়ী জননী জীবন্ত হয়ে বালিকার রূপে মন্দিরের চুড়ায় নৃত্যরতা। এই পুজার মাধ্যমে,তিনি বিশ্বকে চিরকালের জন্য দিয়ে গেছেন অমৃতত্ব!সেই সারদার পূজাতেই শেষ হলো সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা, সারদানন্দজী লিখছেন, “মূর্তিমতী বিদ্যারূপিনী মানবীর দেহালম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটলো। ”

৩.২৪ মা সারদাকে শ্রীরামকৃষ্ণের দৈবলীলা প্রদর্শন;

মা সারদা তখন ঠাকুরের সেবাব্রত নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ছোট্ট ঘর নহবতে থাকতেন। সেখানেই তাঁর থাকা, রান্না, খাওয়া, শোয়া এবং ঠাকুরের সেবাকর্মে সদা জাগ্রত থাকা। মা সারদা দক্ষিনেশ্বরে বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের দৈবলীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি।

১) একদিন দক্ষিনেশ্বরী মা ভবতারিণীর জন্য তিনি জুঁই আর রুক্সিনী ফুল দিয়ে একখানা মালা গেঁথে ঠাকুরের কাছে পাঠালেন। ঠাকুর শ্যামা মাকে সেই মালা পরিয়ে দিয়ে বৃন্দাকে দিয়ে বলে পাঠালেন, মালাখানি যে গেঁথেছে তাকে একবার ডেকে নিয়ে আয়, দেখে যাক মাকে কেমন দেখাচ্ছে। বৃন্দা গিয়ে মাকে ঠাকুরের কথা বললেন। মা মন্দিরে এলেন। মন্দিরে এসে তিনি এক অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করলেন। তিনি দেখলেন শ্যামা মায়ের মুখের ওপর অবিকল ঠাকুরের মুখ আঁকা! গলায় তাঁর হাতের সদ্য গাঁথা মালা। এই অপূর্ব দর্শনের মধ্য দিয়েই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ঠাকুর আর মায়েতে আসলে কোন ভেদ নেই। মায়ের মধ্যেই তিনি, তাঁর মধ্যেও মা।

২) ঠাকুর তখন শেষ শয্যায়। গলার ভেতরের ঘা বাইরেও দেখা দিয়েছে। ঠাকুরের ঐ কষ্ট দেখে মা আর থাকতে পারতেন না। ঠাকুরকে সারিয়ে তোলার তীব্র বাসনা নিয়ে মা তারকেশ্বরে গিয়ে হত্যে দিলেন তারকনাথের চরণে। কিন্তু বাবা তারকনাথ সুকৌশলে ফিরিয়ে দিলেন মাকে। তিনি যখন হত্যে দিয়ে অসাড় হয়ে পড়ে আছেন, মা মানস চোক্ষে দেখলেন, এক জ্যোতির্ময় পুরষের বেশে স্বয়ং তারকনাথ তাঁর সামনে দাঁড়ালেন এবং মাকে বললেন; "মানুষ হয়ে জন্মালে মরতে হবেই। তারও তো একটা হেতু চাই, এই রোগটাই সেই হেতু।" এই কথা শুনে মা ফিরে এলেন। উতলা মন তবুও মানতে চায় না। গেলেন প্রাণের দেবী মা শ্যামার কাছে। পরম ভক্তের রোগমুক্তির জন্য মা এবার শ্যামার কাছে করবেন প্রার্থনা। কিন্তু তখনও হল তাঁর এক আশ্চর্য দর্শন। দেখলেন, মা শ্যামার

গলাতে ফুটে উঠেছে ভক্তের গলার ঘা। মা শ্যামা সারদামাকে আর একবার বুঝিয়ে দিলেন যে, ভক্ত ও ভগবান আসলে অভিন্ন সত্তা, ভক্তের কষ্টই ভগবান ভোগ করেন। যিনিই রামকৃষ্ণ, তিনিই ভবতারিণী শ্যামা। সারদা কার কাছে কার নিরাময় চাইবেন ! ভক্ত ও ইষ্টকে একই সত্তা জেনেছিলেন বলেই ঠাকুর যখন দেহ রাখলেন, তখন শ্যামা মায়ের পায়ের তলায় মা সারদা লুটিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন এই বলে- 'মা কালী গো! তুমি এমন করে আমায় ফেলে কোথায় চলে গেলে গো!"

৩) ঠাকুর দেহ রাখার পর মা সারদার বৈধব্যদশায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিদেহ সত্তায় মা সারদার সামনে অভির্ভুত হয়ে ছিলেন একটি বিশেষ কারণে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের বিয়ের সময় সারদার বয়স ছিল মাত্র ছয় বৎসর আর রামকৃষ্ণদেবের বয়স ছিল প্রায় চব্বিশ বৎসর। আমরা আগেই জেনেছি ঠাকুর রামকৃষ্ণের মা ছিলেন খুব গরীব। তাই বউমাকে গয়না গড়িয়ে দিতে পারেননি শাশুড়ি চন্দ্রমণি। লাহা বাবুদের বাড়িতে গহনা ফেরত দেওয়ার জন্য নাবালিকা সারদা ঘুমিয়ে পড়লে সেইসব গয়না নিজের হাতে খুলে রামকৃষ্ণদেব দিয়েছিলেন মাকে। ঘুম থেকে উঠে গায়ের গয়না না দেখতে পেয়ে ছোট্ট মা সারদা খুব কেঁদেছিলেন। তখন তাঁকে আর ভোলানো খুব কষ্ট হয়েছিল! সারদাকে দুঃখ দিয়ে ঠাকুরেরও খুব কষ্ট হয়েছিল। তাই পরবর্তীকালে সারদাকে তিনি একজোড়া সোনার বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুর দেহ রাখলে বৈধব্যদশায় মা সারদা সেই বালাজোড়া খুলে রাখতে গেলে ঠাকুর স্বয়ং আবির্ভুত হয়ে বাধা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমি তো কোথাও যাইনি। শুধু এ ঘর থেকে ও ঘর হয়েছি মাত্র। মুহূর্তেই মায়ের কাছে খুলে গিয়েছিল এপার ওপারের দরজা। বুঝেছিলেন, মৃত্যুতেই সব শেষ হয়ে যায় নি, ঠাকুর সর্বত্র বিরাজ করছেন অখণ্ড সত্তায়। সেই অখণ্ড সত্তারূপেই ঠাকুর সবসময় সারদামায়ের কর্মে ও কর্তব্যে সঙ্গে ছিলেন আজীবন। মায়ের লীলাসঙ্গিনী হয়ে অখণ্ড সত্তায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ সারদামাকে লোকজননী হয়ে ওঠার পথ দেখিয়েছিলেন।

৩.২৫; ঠাকুর রামকৃষ্ণ বাংলা থিয়েটারকে অশুচিতা থেকে শুচিতায় তুলেছিলেন;

তখন বাংলা থিয়েটারের অভিনেত্রীরা আসতেন পতিতালয় থেকে। ফলে সাধারণ মানুষ থিয়েটারে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বাংলা থিয়েটার সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে থিয়েটারকে সম্মানের জায়গায় নিয়ে আসেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। ১৮৮৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর রবিবার। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখতে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র আত্মজীবনীতে লিখেছেন, '.............দেখিলাম, তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া থিয়েটারের Compound মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; আমি তাঁকে নমস্কার করিতে না করিতে তিনি অগ্রে নমস্কার করিলেন, আমি নমস্কার করিলাম, পুনর্বার তিনিও নমস্কার করিলেন, আমি আবার নমস্কার করিলাম, পুনর্বার তিনিও নমস্কার করিলেন। আমি ভাবিলাম, এই রূপই তো দেখিতেছি চলিবে। আমি মনে মনে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া আসিয়া একটি Box-এ বসাইলাম ও একজন পাখাওয়ালা নিযুক্ত করিয়া দিয়া শরীরের অসুস্থতা বশতঃ বাড়ি চলিয়া আসিলাম।' থিয়েটার শুরু হল। ঠাকুর নাটক দেখতে দেখতে প্রায়ই ভাবসমাধিস্থ হয়ে পড়ছেন। থিয়েটার শেষের পর ভক্তেরা ঠাকুরকে নিয়ে গেলেন মঞ্চের পাশে অফিসঘরে। জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন,'কেমন লাগল নাটক?' ঠাকুর জবাব দিলেন, 'আসল নকল সব এক হয়ে গেছে।' একে একে সবাই ঠাকুরকে প্রণাম করতে এলেন। চৈতন্যলীলার চৈতন্যরূপিণী নটী বিনোদিনী যখন এসে দাঁড়ালেন, ঠাকুর তাঁর পায়ের ওপর পড়তে যাচ্ছিলেন, ভক্তেরা অবশ্য ঠাকুরকে ধরে ফেলেছিলেন। বিনোদিনী তাঁকে প্রণাম করতেই ঠাকুর আশীর্বাদ করে বললেন, 'মা তোর চৈতন্য হোক।' মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'বল মা, হরি গুরু, গুরু হরি।'

এমন অভিনব ঘটনার গুরুত্ত্ব উপলব্ধির বিষয়। কারণ সেই সময় কোন ভদ্রঘরের মেয়েরা থিয়েটার পাড়ায় এসে অভিনয় করেননি।

সকল অভিনেত্রীরাই আসতেন নিষিদ্ধপল্লি থেকে। রঙ্গমঞ্চের প্রথম দিকে পুরুষেরাই নারী চরিত্রগুলিতে অভিনয় করতেন। মধুসূদন দত্তের পরামর্শে বেঙ্গল থিয়েটারেই প্রথম নারী চরিত্রে অভিনেত্রীদের প্রবেশ ঘটে। যখন ভদ্রঘরের মেয়েদের পাওয়া যেত না তখন পতিতালয় থেকে অভিনেত্রীদের আনা হতো। ফলে সেদিন থেকে ভদ্র শিক্ষিত সমাজ থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন। এমনকী থিয়েটারের নটেরা পর্যন্ত সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে পড়লেন। এখানেই শেষ নয় কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকার ১২৮১ বঙ্গাব্দের ১ পৌষ সংখ্যায় লেখা হল; 'যাত্রার পরিবর্তে নাটক অভিনীত হইতে দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম যে এতদিনের পর বিশুদ্ধ আমোদ আস্বাদ করিবার উপায় হইল। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়িল। বেশ্যাদ্বারা অভিনয় করাইলে, নাট্যমন্দির আর বিশুদ্ধ আমোদের স্থল রহিল না।" শুধু কি তাই ঠাকুরের খুব কাছের মানুষ রামচন্দ্র দত্ত ঠাকুরের সর্বক্ষণের সঙ্গী থাকলেও, তিনি থিয়েটারে যাননি, অশুচিতার ভয়ে। রাস্তার যে ফুটপাতে থিয়েটার আছে, সে ফুটপাত দিয়ে হাঁটতেন না স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি নারীর কল্যাণ কর্মে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তিনিও থিয়েটারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন ঐ একই কারণে।

৩.২৬; চৈতন্যলীলা নাটক দেখে বিনোদিনীকে আশীর্বাদ;

চৈতন্য মহাপ্রভুর ভূমিকায় নটীবিনোদিনীর অভূতপূর্ব ভাবদ্যোতক সাত্ত্বিক অভিনয় ঠাকুরকে এতখানি অভিভূত ও আত্মহারা করে তুলেছিল যে, তাৎক্ষণিক মুহূর্তে ঠাকুরের দৃষ্টিতে আসল-নকল সব এক হয়েগিয়েছিল। শুধু গিরিশচন্দ্র ঘোষ কেন, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চেরই পরম প্রাপ্তি ঘটেছিল সেই 'চৈতন্যলীলা' নাটক থেকে। ঠাকুর সেদিন বিনোদিনীকে যে আশীর্বাদ করেছিলেন তা বিশেষ এক শিল্পীর প্রতি নয়, নবজাত রঙ্গমঞ্চের প্রতি গুরুর অসীম আশীর্বাদ। ভদ্র সমাজের, বিশেষ করে ব্রাহ্ম সমাজের ঘৃণায় জর্জরিত শিল্পীকুল সেই আশীর্বাণী থেকে আপন কর্তব্য ও অধিকারের নির্দেশ খুঁজে পেয়েছিলেন। এই শিল্পীরা যে সমাজেরই অবিভাজ্য

অংশ এবং সমাজের কল্যাণ সাধনে লোকশিক্ষা দানের মাধ্যম রূপে নাটকের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে ছিলেন তিনি। তাই তো নাট্যশিল্পীকুল অপরিসীম শ্রদ্ধায় ঠাকুরকে গ্রহণ করেছেন মঞ্চের গুরুরূপে,দেবতারূপে। তাই নিঃসন্দেহে বলা চলে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চেরই ইতিহাসে 'চৈতন্যলীলা' এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবর অসীম আশীর্বাদে।

ঠাকুর দেহ রাখার পর রামচন্দ্র দত্ত স্থাপিত যোগোদ্যান তাঁর অস্থি প্রতিষ্ঠার দিন শোভাযাত্রার পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন অভিনেত্রী সমাজ। তাঁরা উদার কণ্ঠে গেয়েছিলেন 'চৈতন্যলীলা' নাটকের গান; 'হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়'। ব্রাহ্মসমাজ প্রভাবিত গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হয়ে নরেন্দ্রনাথ দেখতে গিয়েছিলেন 'চৈতন্যলীলা'। রঙ্গমঞ্চের বদ্ধ পরিবেশ থেকে 'চৈতন্যলীলা'র গান ছড়িয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্টার থিয়েটারে যে নাটকগুলি দেখেছেন সেগুলি হল চৈতন্যলীলা, প্রহ্লাদচরিত, নিমাই সন্ন্যাস, দক্ষযজ্ঞ, বৃষকেতু ও বিবাহ বিভ্রাট। প্রথম পাঁচটি গিরিশচন্দ্রের লেখা। যে বিনোদিনীকে তিনি প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করেছেন, উপরিউক্ত নাটকগুলিতে তিনি অভিনয় করেছেন; 'চৈতন্যলীলা'য় নিমাই, 'প্রহ্লাদচরিতে' প্রহ্লাদ, 'নিমাই সন্ন্যাসে' চৈতন্য, 'দক্ষযজ্ঞে' সতী, 'বৃষকেতু'তে পদ্মাবতী, 'বিবাহ বিভ্রাটে' (বিলাসিনী কারফরমা) । 'প্রহ্লাদচরিত' দেখতে এসে ঠাকুর গিরিশকে বলছেন; 'বা! তুমি বেশ লিখেছো না!' গিরিশ প্রত্যুত্তরে বললেন, 'মহাশয়, ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি।' ঠাকুর বললেন, 'না, তোমার ধারণা আছে। সেই দিন তো তোমায় বললাম ভিতরে ভক্তি না থাকলে চালচিত্র আঁকা যায় না।' অভিনয় যে লোকশিক্ষার প্রধান বাহন, একথা ঠাকুর মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সারাজীবন যুক্ত থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে লোকশিক্ষা বিতরণ করুক, ঠাকুর সর্বদা সে সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রকে উৎসাহ দিয়েছেন। গিরিশ ঘোষ একবার বললেন; 'থিয়েটারগুলো আর করা কেন?' বাধা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'না না, ও থাক, ওতে লোকশিক্ষা হবে।' গিরিশচন্দ্রের

কাছে ঠাকুর হয়ে উঠেছিলেন অবতার পুরুষ। একদিন ঠাকুরই গিরিশকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি আমার মধ্যে কি দেখেছ?' গিরিশচন্দ্র নতমস্তষ্ককে করজোড়ে বলেছিলেন, 'ব্যাস বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেন নি, আমি তাঁর কী বলতে পারি?' এই অচল অটল বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন মহাকবি গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্র আরও অভিভূত এই কারণে যে, যে অভিনেত্রী সমাজে হীন, ঘৃণিত ছিলেন, পতিতপাবন তাঁকে শ্রীচরণে স্থান দিয়েছেন। গিরিশচন্দ্রে এই প্রসঙ্গে বলেছেন-"অনেকে আজীবন তপস্যা করিয়া যে মহাফললাভে অসমর্থ হয়, সেই চতুর্বর্গ ফলস্বরূপ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের পাদপদ্ম বিনোদিনী লাভ করিয়াছে।'

৩.২৭; রামকৃষ্ণের অসাধারণ গান গাওয়া ও রসেবশে থাকা;

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার কাছে আবদার করে বলেছিলেন, "আমাকে রসেবশে রাখিস মা। শুকনো সাধু করিস নি।" তিনি গান গাইতে এবং গান শুনতে ভীষণ ভাল বাসতেন। শুধু কি তাই তিনি কচুরি, জিলিপি খেতে বড় ভালবাসতেন। ঠাট্টা করে বলতেন, "আমি মায়ের নাম করি বলে এই সব জিনিস খেতে পাচ্ছি!" সাত ফোকরের বাঁশিতে বিভিন্ন রাগরাগিণী শুনতে পছন্দ করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের গান ভীষণ পছন্দ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও সঙ্গীতের আসরে। স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর গান করতেন সুমিষ্ট ও সুসঙ্গতভাবে কোকিলবিনিন্দিত স্বরে।" গানের সুরে, নৃত্যের তালে আসর মাতিয়ে রাখতেন। দক্ষিণেশ্বরে এলেই নরেন্দ্রকে গান শোনাতে বলতেন তিনি। তাঁর গান শুনে রামকৃষ্ণ ভাবাবেগে ভেসে যেতেন। উল্লেখ্য, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন রামকৃষ্ণের একজন প্রিয় গৃহস্থ ভক্ত। সুরেন্দ্র নাথ মিত্রের বাড়িতেই আধ্যাত্মিক উৎসবে রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দেখা করেছিলেন। এই উৎসবে নিযুক্ত গায়ক কোনো কারণে উপস্থিত হতে না পারায় তরুণ নরেন্দ্রনাথকে গান গাওয়ার জন্য সকলে অনুরোধ করলেন। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন প্রতিভাবান গায়ক। তরুণ নরেন্দ্রনাথ সেদিন কয়েকটি ভক্তিমূলক গান গেয়েছিলেন

এবং রামকৃষ্ণ তাঁর গানের প্রতিভাতে ভীষণ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর গান শুনে সেদিন তিনি নরেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করার আমন্ত্রণ জানান।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্যতম শিষ্য ত্রৈলোক্যনাথেরও গান খুব পছন্দ করতেন। কথামৃতে আছে, ১৮৮৪ সালের ২ মার্চ ত্রৈলোক্যনাথ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে বসে গাইছেন, 'তোর কোলে লুকায়ে থাকি মা।/ চেয়ে চেয়ে মুখপানে মা মা মা বলে ডাকি।' ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বসে। তাঁর দুই চোখে প্রেমাশ্রু, বলছেন, "আহা! কি ভাব!" ত্রৈলোক্য যখন গাইলেন, 'লজ্জা নিবারণ হরি আমার'— ঠাকুর খাট থেকে নেমে এসে মেঝেতে বসলেন। শেষে ত্রৈলোক্যের গানের সুখ্যাতি করে বললেন, "আহা! তোমার কি গান! তোমার গান ঠিক ঠিক। যে সমুদ্রে গিয়েছিল সেই সমুদ্রের জল এনে দেখায়।" ত্রৈলোক্য আবার গাইলেন, '(হরি) আপনি নাচো, আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে/ মানুষ তো সাক্ষীগোপাল মিছে আমার আমার বলে।' ত্রৈলোক্যনাথ এই গানটি শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভীষণ ভক্তি ভরে গেয়েছিলেন।

৪; শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনের কিছু কথা;

৪-১) বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন;"আনন্দ তিন প্রকার --বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। বিষয়ানন্দ হল কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ। অধিকাংশ সংসারী মানুষ সর্বদাই বিষয়ানন্দ নিয়ে থাকে। ঈশ্বরের নাম গান থেকে আসে 'ভজনানন্দ'। ঈশ্বর লাভের আনন্দ হল ব্রহ্মানন্দ। ঋষিগন ব্রহ্মানন্দ লাভের জন্য সাধনা করেন। "

এই প্রসঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর দৃষ্টান্ত নিয়ে তিনি বলেছিলেন, "চৈতন্যদেবের তিন প্রকার অবস্থা হত-অন্তদর্শা, অর্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা। অন্তদর্শায় ভগবানদশর্ন করে সমাধিস্থ হতেন। অর্ধবাহ্যদশায় একটু হুঁশ থাকত। বাহ্যদশায় নাম-গান ও গুণকীতর্ন করতে পারতেন।" ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঠিক একই অবস্থা হত। তিনি মাঝে মধ্যে ভক্তদের সঙ্গে গান গাইতেন, নৃত্য করতেন; তখন তিনি

ভজনানন্দ লাভ করতেন। তিনি যখন সমাধিস্থ হয়ে অন্তদর্শায় ভগবানদশর্ন করতেন তখন তিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করতেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই বিষয়ানন্দ থেকে মুক্ত ছিলেন।

৪-২) "কাঁচা আমি", "পাকা আমি" এবং আত্মজ্ঞান
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড়ে জেনেছি- শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুত্বপূর্ণ দুটি কথা ---'কাঁচা আমি' আর 'পাকা আমি'"। এদুটি ঠাকুরের একেবারে নিজস্ব কথা যা আমাদের কাছে আজ অমৃতকথা। তিনি বলতেন; দুই রকম 'আমি' আছে - একটা 'পাকা আমি' আর একটা 'কাঁচা আমি'। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার ছেলে - এগুলো হল সব কাঁচা 'আমি'। আর 'পাকা আমি' হচ্ছে - আমি তাঁর (ঈশ্বরের) দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য-মুক্ত-জ্ঞানস্বরূপ।

তিনি একদিন ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশব সেনকে 'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি' সম্পর্কে কিছু ভালো কথা বলেছিলেন; "মন থেকে 'আমি' ত্যাগ না করলে হবে না"। এই কথা শুনে কেশব সেন বললেন, "তাহলে মহাশয়, 'আমি' ত্যাগ করলে যে আর কিছুই থাকে না। দলটল কিছুই থাকে না"। তখন ঠাকুর বললেন "কাঁচা আমি," "বজ্জাত আমি" -- তাই ত্যাগ করতে বলছি, কিন্তু "পাকা আমি", "বালকের আমি", "ঈশ্বরের দাস আমি", "বিদ্যার আমি" --এতে দোষ নাই। কিন্তু "কাঁচা আমি" হল "সংসারীর আমি" -- "অবিদ্যার আমি" এসব --একটা মোটা লাঠির ন্যায়। সচ্চিদানন্দসাগরের জলকে ওই লাঠি যেন দুই ভাগ করে। কিন্তু "ঈশ্বরের দাস আমি," "বালকের আমি," "বিদ্যার আমি" জলের উপর রেখার ন্যায়। জল এক, বেশ দেখা যাচ্ছে --শুধু মাঝখানে একটি রেখা, যেন দুভাগ জল। বস্তুতঃ একজলই সর্বত্র দেখা যায়।"

তিনি কেশব সেনকে আরও বলেছিলেন; *" 'আমি ' বা 'আমার' এসব হল অজ্ঞান। 'আমি কর্তা' আর আমার এই সব স্ত্রী , পুত্র, বিষয়-আশয়, মান , সম্ভ্রম- এ সবকিছু অজ্ঞান ছাড়া কিছুই নয়। এ সব অভিমান এবং 'কাঁচা আমি' --- এইটি ত্যাগ কর তুমি। 'কাঁচা আমি' ত্যাগ করে 'পাকা আমি ' হয়ে থাকো। আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর ভক্ত, আমি অকর্তা , তিনি কর্তা। ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা*

--এইটা হচ্ছে 'পাকা আমি'র লক্ষণ। দেহ -মন- বুদ্ধির গন্ডির মধ্যেই আমাদের সব মনে করি। কিন্তু এর ঊর্ধ্বে যে আরেকটা 'আমি' আছে, সেটা ভুলে যাই। সেই 'আমি ' আছে বলেই এই 'আমি ' কাজ করছে --এই মন কাজ করছে, দেহ কাজ করছে, বুদ্ধি কাজ করছে ।সেই 'আমি ' --পরমাত্মা। আমার প্রকৃত রূপ হচ্ছে সেটা ।সেটাই 'পাকা' আমি' । এই 'পাকা আমি' ই সত্য। 'কাঁচা আমি' মিথ্যা। 'কাঁচা আমি 'টা চিরস্থায়ী নয় --ভেঙে যায় একদিন। আজ হোক, কাল হোক কিংবা কয়েক জন্ম পরেই হোক -ভেঙে যায়। যত তাড়াতাড়ি ভাঙে ততই মঙ্গল। কারণ, সেই আমি --ছোট আমি, ক্ষুদ্র আমি। তার জন্যই দুঃখ পাই।"

এই 'আমি' নিয়ে তিনি আরও বলেছেন; "*কাঁচা-আমি বন্ধনের কারণ। ঈশ্বরকে জানতে দেয় না। আমার স্বরূপটা আমাকে জানতে দেয় না। অর্থাৎ অজ্ঞান করে রাখে আমাকে। ঈশ্বর তো চাইছেনই আমার হৃদয়ে আসতে। কিন্তু আমি যে সেখানে খুব সাজিয়ে -গুজিয়ে মহা-আড়ম্বর করে আমি নিজেকেই বসিয়ে রেখেছি। ঈশ্বর এসে দেখেন যে তাঁর জন্য কোন আসন তো পাতা নেই, তাঁর জন্য কোন স্থান তো খালি নেই। তিনি ফিরে যান তখন।*"

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আমিত্ব এবং জ্ঞান ও অজ্ঞান সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে একটা খুব ভাল কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন; "আমি ও 'আমার' এই দুটি শব্দ হল অজ্ঞান। 'আমার বাড়ি', 'আমার টাকা', 'আমার বিদ্যা', 'আমার এই সব ঐশ্বর্য' — এই যে-ভাব এটি অজ্ঞান থেকে হয়। 'হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর এ-সব তোমার জিনিস — বাড়ি, পরিবার, ছেলেপুলে, লোকজন, বন্ধু-বান্ধব — এ-সব তোমার জিনিস' — এই ভাব থেকে জ্ঞান হয়।" আত্মজ্ঞান সম্পর্কে ঠাকুর এক অদ্‌ভুত দৃষ্টান্ত তুলে ধরে ছিলেন তাঁর ভক্তদের সামনে; একজন সাধু সর্বদা জ্ঞানোন্মাদ-অবস্থায় থাকতেন, কারুর সঙ্গে কথাবার্তা করতেন না, লোকেরা তাঁকে পাগল ভাবত। একদিন লোকালয়ে এসে ভিক্ষা করে এনে একটা কুকুরের উপর বসে সেই ভিক্ষান্ন নিজে খেতে লাগলেন আর কুকুরকে খাওয়াতে লাগলেন। তাই দেখে অনেক লোক অবাক হয়ে তাঁকে পাগল বলে উপহাস

করতে লাগল। সাধু তখন ঐ সকল লোকদিগকে বলতে লাগলেন, "তোমরা হাসছ কেন? তারপর বলে উঠলেন;

বিষ্ণুপরি স্থিতো বিষ্ণুঃ
বিষ্ণুঃ খাদতি বিষ্ণবে।
কথং হসসি রে বিষ্ণো
সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।"

আত্মজ্ঞান দর্শনের মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। 'আমি কে' ভালরূপ বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, 'আমি' বলে কোন জিনিস নেই এই জগতে। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি - এর কোনটা 'আমি'? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে 'আমি' বলে কিছুই পাইনে! শেষে যা থাকে, তা হল আত্মা চৈতন্য। 'আমার' 'আমিত্ব' দূর হলে ঈশ্বর লাভ হয়।

(উৎস; স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ'

৪-৩) বিদ্যা ও অবিদ্যার এবং ব্রহ্মজ্ঞান দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদেরকে শংকরের মায়াবাদ দর্শনের কথা বলতেন। তিনি ভক্তদেরকে "ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈচ নাপরঃ" শঙ্করের মায়াবাদের এই বিখ্যাত দার্শনিক তত্ত্ব বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে ভক্তদেরকে বুঝিয়ে বলতেন। ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈচ নাপরঃ এই তত্ত্বের অর্থ হল- ব্রহ্মাই হলেন একমাত্র নিত্য সত্য, একমাত্র নিত্য অস্তিত্ববান; অন্য কোন কিছুর নিত্য অস্তিত্ব নেই; অর্থাৎ অনিত্য। আমরা চর্মচক্ষে যে জীব দেখি তা সবই অবাস্তব, সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী। জীব বা ব্যক্তির আত্মা সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম থেকে অবিচ্ছেদ্য। তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন "ব্রহ্ম হলেন অনাদি অনন্ত। তাঁর জন্ম-মৃত্যু নেই। তিনি নিরাকার ও নির্গুণ। তিনি সচ্চিদানন্দ, অর্থাৎ একমাত্র সত্য ও বিশুদ্ধ চেতনস্বরূপ। এই জ্ঞান হল ব্রহ্মজ্ঞান।

তাঁর ব্যাখ্যায় ব্রহ্মের মহামায়াতে এই জগৎসংসার। আবার এই মায়ার মধ্যে রয়েছে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই-ই আছে। বিদ্যা-মায়ার আশ্রয় নিলে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য -- এই সব হয়। অবিদ্যা-মায়া -- পঞ্চভূত আর ইন্দ্রিয়ের বিষয় -- রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ; যত ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিস; এরা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। বিদ্যার প্রভাবে মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং ব্রহ্মের সাথে নিজেকে এক করে ফেলে। অবিদ্যার প্রভাবে মানুষ জিনিসের প্রকৃত স্বরূপ এমন কি নিজের স্বরূপও উপলব্ধি করতে পারেন না।[]

বিদ্যাসাগরকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন; "শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন। সেই আমি যখন ব্রহ্মদর্শন করে তখন সেই আমি-মানুষটি চুপ করে যায়। যতক্ষণ না ব্রহ্মদর্শন হয়, ততক্ষণই সব বিচার। ততক্ষণই আমি 'কাঁচা-আমি' থাকে।........." এরপর তিনি বিদ্যাসাগরকে ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বললেন; "ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল, কারন তাঁদের বিষয়বুদ্ধি ছিল না। বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁদের এই ব্রহ্মজ্ঞান হত না। ঋষিরা কত পরিশ্রম করতেন। সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে যেতেন। একলা সমস্ত দিন ধ্যান করতেন, রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফলমূল খেতেন। দেখা, শুনা, ছোঁয়া — এ-সব বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখতেন, তবেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতেন।" ......"কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। এ-অবস্থায় 'সোহহং' বলা ভাল নয়। 'আমিই ব্রহ্ম' বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, যাদের 'আমি' কোন মতে যাচ্ছে না, তাদের 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত' এ-অভিমান ভাল। ভক্তিপথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়।"(উৎস; বিদ্যাসাগর ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ; কথামৃত)

৪-৪) কর্মযোগ দর্শন ও রামকৃষ্ণ;

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন; "কর্মযোগ হল নিষ্কামকর্ম যার দ্বারা জগতের উপকার হয়। পূজা, হোম, যজ্ঞ- এসব কিছুই নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে, তাহলে আর এ-সব কর্মের বেশি দরকার নাই। যেমন, যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই

পাখার দরকার; যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার?” তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেছিলেন,“তুমি যে-সব কর্ম করছ, এ-সব সৎকর্ম। যদি ‘আমি কর্তা’ এই অহংকার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পার, তাহলে খুব ভাল। এই নিষ্কামকর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কামকর্ম করতে করতে ঈশ্বরলাভ হয়। ঈশ্বরদর্শন হল নিষ্কামকর্মের প্রধান উদ্দেশ্য” তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছিলেন, “ঈশ্বরের উপর যত ভক্তি ও ভালবাসা আসবে, ততই তোমার কর্ম কমে যাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয় —শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। যতই মাস বাড়ে, শাশুড়ী কর্ম কমায়। দশমাস হলে আদপে কর্ম করতে দেয় না, পাছে মায়ের ভিতরে শিশুর কোন ক্ষতি বা হানি হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়। নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে। জগতের উপকার মানুষ করে না,তিনিই করছেন, যিনি চন্দ্র-সূর্য করেছেন, যিনি মা-বাপের স্নেহ, যিনি মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধু-ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে-লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করবে সে নিজেরই মঙ্গল করবে।”

(“https://www.thakurmaaswamiji.com/2021/08/vidyasagar-thakur-ramakrishna.html)

৪-৫) বেদান্ত দর্শন;

শ্রী রামকৃষ্ণ অধিকাংশ সময় গভীর ধ্যান, সমাধি এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক অনুশীলনে ডুবে থাকতেন। তিনি প্রায়শই উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় চলে যেতেন যেখানে তিনি অসীম বাস্তবতা অর্থাৎ ব্রহ্মের সাথে মিশে যেতেন। তাঁর জন্য, সমস্ত অস্তিত্বের ঐক্যের উপর বেদান্ত শিক্ষা একটি তত্ত্বের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তিনি সরাসরি ব্রহ্ম উপলব্ধি করতেন এবং তাই বেদান্ত তত্ত্ব ছিল তাঁর উপলব্ধ সত্য শুধুমাত্র তত্ত্বকথা নয়। ঈশ্বর দর্শনের প্রবল তৃষ্ণায় শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাখা সহ বিভিন্ন ধর্মের পথ

অনুসরণ করেছিলেন। শ্রী রামকৃষ্ণের উপদেশের কথাগুলি যা কথামৃত নামে জনপ্রিয়, তা প্রায়শই বেদান্তের বানী ছিল।

৫- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ- ও অবতার তত্ত্ব

৫-১) অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ;

বহু পণ্ডিত এবং মহাপুরুষগণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে একজন অবতার রূপে বর্ণনা করেছেন।তাঁর বহু সন্ন্যাসী এবং গৃহী ভক্তরা শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারতেন না।তাঁর ভক্তদের বিশ্বাস ছিল "যেই রাম, যেই কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণ" তাঁর সকল ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতাররূপে বিশ্বাস করতেন এবং সেইভাবে তাঁর পূজা ও বন্দনা করতেন।শ্রীরামকৃষ্ণ একজন অবতার ছিলেন–শুধু এইটুকু জানলেই আমাদের হবে না। আমাদের এটাও জানা দরকার কেন তিনি অবতার ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারবাদ সম্পর্কে প্রথমে বলি স্বামী বিবেকানন্দের বিচার। উল্লেখ্য, প্রথমঅবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে কোনভাবেই অবতাররূপে স্বীকার করেন নি, যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য ভক্তগণ তাঁকে অবতাররূপে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজা করতেন।বহু বিচার ও বিশ্লেষণের পর স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, রামানুজ, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেবর ন্যায় একজন অবতার। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে তিনি বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা, বিচার- বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন।এই সম্বন্ধে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে কিছু কথা আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে।

৫-২) ভক্তদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের গুহ্যকথা;

এটা ছিল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, ৭ই মার্চ। কিছু ভক্তদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণর বিভিন্ন বিষয়ে গভীর আলোচনা হচ্ছে। ঐ আলোচনার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন "এখানে বাহিরের লোক কেউ নাই, তোমাদের একটা গুহ্যকথা বলছি। সেদিন দেখলাম, আমার ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বাইরে এসে রূপ ধারণ করে বললে, আমিই যুগে

যুগে অবতার। দেখলাম পূর্ণ আর্বিভাব, তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।" ভক্তগণ ঐ সকল কথা শুনে হতবাক হলেন।কেউ কেউ আবার শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ কথা শুনার পর গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহাবাক্য স্মরণ করতে লাগলেন —

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

এই সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের অন্য একদিনের আলোচনা যা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে পাই; সেই দিনটা ছিল ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, জন্মাষ্টমী। ঐদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নরেন্দ্রনাথ সহ বহু ভক্তের সমাগম হয়েছে। ঐ সময় গিরিশ ঘোষ মহাশয় দু- একটি বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি করে দক্ষিণেশ্বরে কাঁদতে কাঁদতে এসে উপস্থিত হলেন। তা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে গিরিশ ঘোষের মাথায় পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন। গিরিশ ঘোষ এরপর মাথা তুলে হাতজোড় করে বললেনঃ "তুমিই পূর্ণব্রহ্ম। তাযদি না হয়, সবই মিথ্যা। বড় খেদ হয়,আমি তোমার সেবা করতে পারলাম না। দাও বর ভগবন, একবৎসর তোমার সেবা করব।" বারবার গিরিশ ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। বারবার স্তব করতে দেখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তখন গিরিশ ঘোষকে বললেনঃ "ছি, ও-কথা বলতে নাই, ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণবৎ। তুমি যা ভাব, তুমি ভাবতে পার। তোমার গুরু তো ভগবান, তাহলে ও-সব কথা বলায় অপরাধ হয়।"

(উৎস; শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত; দশম পরিচ্ছেদ; শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও অবতারবাদ)

৫-৩) শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব নিয়ে গিরিশ ঘোষ ও নরেন্দ্রমাথের বিচারঃ

অবতারবাদ নিয়ে, ডাক্তার সরকার, গিরিশ ঘোষ এবং নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার সময় গিরিশ ঘোষ বলে উঠলেন," I see it, I see

the Light! শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার Prove (প্রমাণ) করব — তা নাহলে জিব কেটে ফেলব। এর কিছুদিন পরে নরেন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের যখন অবতার বিষয়ের কথা হচ্ছিল, ঠাকুর নরেন্দ্রকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন; 'আচ্ছা, কেউ কেউ যে আমাকে ঈশ্বরের অবতার বলে, তোর কি বোধ হয়?" নরেন্দ্রনাথ বললেন, "অন্যের মত শুনে আমি কিছুই বলব না; আমি নিজে যখন বুঝব, নিজের যখন বিশ্বাস হবে, তখনই আমি বলব।" এরপর একটা অদ্ভূত ঘটনা ঘটল। কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ক্যানসার রোগে যন্ত্রণায় ছট পট করছেন, ভাতের তরল মণ্ড পর্যন্ত খেতে পারছেন না তিনি, তখন নরেন্দ্রনাথ একদিন ঠাকুরের নিকট বসে ভাবছেন, এই যন্ত্রণামধ্যে যদি বলেন যে,'আমি ঈশ্বরের অবতার' তাহলে আমার বিশ্বাস হবে- তিনি অবতার। চকিতের মধ্যে ঠাকুর বলে উঠলেন- "যে রাম যে কৃষ্ণ, ইদানিং সে-ই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।" নরেন্দ্র এই কথা শুনিয়া অবাক্ হয়ে গেলেন। এরপর ঠাকুর স্বধামে গমন করলেন। তখন স্বামীজী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হলেন।এবং তিনি স্বদেশে-বিদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাতে লাগলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে এবং এমন কি ভারতের বাইরে নানাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতারপুরুষ হিসেবে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাই ভারতে এবং ভারতের বাহিরে অনেক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন হয়েছে। সেইখানেই তাঁর নিত্য সেবাপূজাদি হচ্ছে। আরতির সময় স্বামীজীর রচিত স্তব সকল স্থানেই সুর-সংযোগে গীত হচ্ছে। আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি- স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ঐ স্তবমধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে নির্গুণ সগুণ নিরঞ্জন জগদীশ্বর বলে সম্বোধন করিয়াছেন। ঐ স্তবে তিনি বলেছেন, "হে ভবসাগরের কাণ্ডারী! তুমি নররূপ ধারণ করে আমাদের ভব-বন্ধন খণ্ডন করার জন্য যোগের সহায় হয়ে এসেছ! তোমার কৃপায় আমার সমাধি হইতেছে। তুমি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ করেছ। হে ভক্তশরণ! তোমার পাদপদ্মে আমার অনুরাগ দাও।

তোমার পাদপদ্ম আমার পরম সম্পদ। উহাকে পাইলে ভবসাগর গোষ্পদের ন্যায় বোধ হয়" ।

৬- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু উপদেশ বাণী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে তাঁর অসংখ্য উপদেশবানী রয়েছে যেগুলি তিনি তাঁর ভকতদেরকে অসাধারণ উপমা, উদাহরণ এবং গল্পের মাধ্যমে বোঝাতেন। তাঁর কিছু উপদেশ বানী এখানে সংক্ষেপে লেখা হল।

৭.৪.১ ঈশ্বর লাভ মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দ্যেশ্য

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন---"ঈশ্বর লাভই হল মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দ্যেশ্য। আর ঈশ্বর লাভ করতে হলে সর্বপ্রথম জীবনকে দিব্য ছাঁচে ঢেলে সাজানোর শপথ নিতে হবে।তাই ঈশ্বর লাভের পথে চলার প্রথম ধাপ সদ্গুরুর কাছে মন্ত্র দীক্ষা লাভ। দীক্ষা নেওয়া প্রথম ধাপ হলেও, শেষ কথা কিন্তু নয়। দীক্ষা জীবনের এক মহত্তম অঙ্গীকার।দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের যে নতুন জীবনের সূত্রপাত হয়,তাকে সঠিক ভাবে পরিচালিত করে ঈশ্বর লাভের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করাই আমাদের মূল উদ্দ্যেশ্য হওয়া উচিৎ"। তিনি বলতেন, "জীবনে দীক্ষা লাভ করা মানেই ঈশ্বর লাভ করা নয়। তার জন্য প্রয়োজন আপোসহীন, শান্ত ভাব, নিরুচ্চার সংগ্রাম। লক্ষ্য তে অবিচলিত থেকে গুরুবাক্যে বিশ্বাস রেখে নিরন্তর এগিয়ে চলা। সাপের মতো আমাদেরকে জীবনের পুরনো খোলস ত্যাগ করে নতুন দিব্য জীবন কে বরণ করে নেওয়ার জন্য সাধনা করলে তবেই ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা যায়। এবং ঈশ্বরের কৃপা লাভ হলে তবেই ঈশ্বর লাভ সম্ভব হয়। তাই এর জন্য দরকার গভীর সাধনা এবং আপোসহীন, শান্ত ও নিরুচ্চার সংগ্রাম" তাই তিনি বলতেন-- "গুরু হলেন এক সচ্চিদানন্দ। সৎ,চিৎ,আনন্দ স্বরূপ – অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান।গুরু শক্তি মানবিক নয়।গুরুর কৃপাতেই আমাদের ইষ্ট দর্শন হয়।"

৭.৪.২) **কর্মযোগ ও ঈশ্বরলাভ সম্পর্কে ঠাকুরের উপদেশ**

সংসারী মানুষের কিভাবে ঈশ্বরলাভ বিষয়ে একজন ভক্ত বলেছিলেন, "মহাশয়, সব কিছু ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না?" উত্তরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসে বসে আছো, বেশ আছো। আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি। কেউ দশে আছো, কেউ ছয়ে আছো। কেউ পাঁচে আছো। ...... তাই তোমরা আমার মত জ্বলে যাও নাই। খেলা চলছে – এতো বেশ"। সত্যি বলছি, তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নেই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে রাখো। কর্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।" তিনি বলেছিলেন, "মনেতেই বন্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙে ছুপবে।। যেমন, ধোপা ঘরের কাপড়। লাল রঙ্গে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও, নীল, সবুজে ছোপাও, সবুজ। যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙে ছুপবে। দেখ না যদি একটু ইংরেজী পড়, তো অমনি ইংরেজী কথা এসে পড়ে ফুট-ফাট, ইট-মিট। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে, অমনি শ্লোক ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখ, তো সেই রকম কথাবার্তা বা চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখো, ঈশ্বর চিন্তা, হরিকথা –এই সব হবে। মন নিয়ে সব। একপাশে পরিবার, একপাশে সন্তান, একজনকে একভাব, সন্তান আর এক ভাবে আদর করে। কিন্তু একই মন।" (উৎস; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)

তিনি বলেন ভগবান সকলের মধ্যে বিরাজ করেন। তিনি সকলকে দেখতে পান, কিন্তু তাঁকে কেউ দেখতে পায় না; যেমন বড়লোকের মেয়েরা চিকের (বাঁশের শলার পর্দা) ভেতর থেকে সকলকে দেখতে পায়, কিন্তু তাদের কেউ দেখতে পায় না; ভগবান ঠিক সেইরূপে বিরাজ করছেন। তিনি সকলকে দেখছেন কিন্তু তাঁকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কেবল তাঁর ভক্তরা সাধনার দ্বারা ঈশ্বরকে দেখতে পান। এইভাবে ভক্তরা ঈশ্বর লাভ করে থাকেন। তিনি ঈশ্বর লাভ সম্পর্কে আর একটি বিশেষ কথা বলেছেন; "যার যেমন ভাব বা ভাবনা তার তেমনি ঈশ্বর লাভ; ভগবান হলেন কল্পতরু। তাঁর কাছে যে যা চায়,

সে তাই পায়।" এই সম্পর্কে তাঁর একটি উপমা; "গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখে হাইকোর্টের জজ হয়ে মনে করে, "আমি বেশ আছি।" ভগবানও তখন বলেন, "তুমি বেশ থাক।" তারপর যখন সে পেনশন নিয়ে ঘরে বসে, তখন সে বুঝতে পারে এ জীবনে করল্লুম কি? ভগবানও তখন বলেন, "তাই তো, তুমি করল্লে কি?"

৭.৪.৩) মায়াবাদ সম্পর্কে উপদেশ;

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার ভক্তদেরকে বলেছিলেন; " মায়া হল বাবা, মা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, ভাগ্নে, ভাইপো, ভাইঝি - এই সব আত্মীয়দের প্রতি বিশেষ টান হল মায়া। কিন্তু সর্বভূতে হরি আছেন এই জেনে আমার সকলকে সমান ভালবাসি, তখন সেটা হয় দয়া। " তিনি আর একবার ভক্তদেরকে মায়া সম্পর্কে বলেছিলেন যে সূর্য যেমন পৃথিবীকে আলো করে রেখেছে, ঠিক সেইরূপ, সর্বব্যাপী ও সর্বসাক্ষিস্বরূপ ঈশ্বর বা সচ্চিদানন্দ আমাদের চারপাশে বিরাজমান। কিন্তু, সেই সর্বব্যাপী ও সর্বসাক্ষিস্বরূপ ঈশ্বরকে সামান্য মায়া-আবরণবশতঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি না।ঠিক সামান্য একখণ্ড মেঘ সম্মুখে এসে যদি সূর্য কে ঢেকে ফেলে, তখন কিছু সময়ের জন্য সূর্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হন না; মায়া সেই মেঘের মত আমাদের সামনে প্রকৃত আবরণ করে রাখে। আমরা মিথ্যাকে সত্য বলে ভাবতে থাকি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন মহিমাচরণের সঙ্গে মায়া সম্পর্কে আলোচনায় একটি সুন্দর উপমা দিয়েছিলেন। মহিমাচরণ ছিলেন অতিশয় বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধার্মিক, জ্ঞানী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি গভীরভাবে বেদান্ত চর্চা করতেন।সংস্কৃত ও ইংরাজীতে বহুগ্রন্থ পড়ে তিনি ধর্মশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি। তাঁর সঙ্গে মায়াবাদ সম্পর্কে আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন; "বেদান্ত বিচারে, এই সংসার মায়াময়,— স্বপ্নের মতো, সব মিথ্যা। আবার, জাগরণও যেরূপ, স্বপ্নও সেরূপ সত্য। যিনি পরমাত্মা, তিনি- জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থারই সাক্ষিস্বরূপ।" এরপর এই সত্যটা আরও পরিষ্কার করে বোঝানর জন্য তিনি মহিমাচরণকে

একটা গল্প বলে ছিলেন। তিনি বললেন "এক গ্রামে একটি চাষা ছিল। সে অতিশয় জ্ঞানী ব্যক্তি ছিল। চাষবাস করত।বাড়িতে তার স্ত্রী ছিল।অনেকদিন পরে তার একটি ছেলে হয়েছিল; তার নাম ছিল হারু। ছেলেটিকে বাবা-মা দুজনেই খুব ভালবাসত; কেননা, ছেলেটি ছিল তাদের সবে ধন নীলমণি। চাষাটি খুব ধার্মিক। সেইজন্য গ্রামের সব লোক তাকে খুব ভালবাসত। একদিন মাঠে ঐ চাষা কাজ করছে, এমন সময় একজন এসে খবর দিলে, হারুর কলেরা হয়েছে। চাষাটি বাড়ি গিয়ে অনেক চিকিৎসা করালো। কিন্তু ছেলেটি মারা গেল। বাড়ির সকলে শোকে কাতর হয়ে পড়ল।কিন্তু চাষাটির যেন কিছুই হয় নাই। সে মোটেই ভেঙ্গে পড়ল না। উল্টে সে সকলকে বুঝাতে লাগল; "শোক করে কি হবে?" তারপর সে আবার চাষ করতে গেল। বাড়ি ফিরে এসে দেখে, তার স্ত্রী আরও কাঁদছে। তার স্ত্রী বলল, 'তুমি নিষ্ঠুর — ছেলেটার জন্য একবার কাঁদলেও না?' চাষা তখন স্থির হয়ে বললে, 'কেন কাঁদছি না বলব? আমি কালরাতে একটা অদ্ভূত স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেখলাম যে, 'আমি রাজা হয়েছি আর আট ছেলের বাপ হয়েছি। খুব সুখেই রয়েছি। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। এখন মহা ভাবনায় পড়েছি — আমার সেই আট ছেলের জন্য শোক করব, না, তোমার এই এক ছেলে হারুর জন্য শোক করব?' তিনি বললেন "চাষা প্রকৃত জ্ঞানী, তাই সে দেখছিল অর্থাৎ বুঝেছিল স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা; এক নিত্যবস্তু- সে হল আত্মা।"

তিনি বলতেন; "মায়া দুই প্রকার - বিদ্যা এবং অবিদ্যা। আবার এই বিদ্যা মায়া দুই প্রকার - বিবেক এবং বৈরাগ্য। এই বিদ্যা মায়া আশ্রয় ক'রে জীব ভগবানের শরণাগত হয় এবং মায়া থেকে মুক্ত হতে থাকে। আর অবিদ্যা মায়া ছয় প্রকার - কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য। অবিদ্যা মায়াতে 'আমি' ও 'আমার' এই দুই ভূল ধারনা মনুষ্যদিগকে মায়ার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। কিন্তু বিদ্যা মায়ার প্রকাশে জীবের অবিদ্যা একেবারে নাশ হয়ে যায়। তখন 'আমি' ও 'আমার' এই দুই ভূল ধারনা মন থেকে চলে যায়। তখনই আসে জীবনের প্রকৃত মুক্তি।"

৭.৪.৪ গ্রাহর্স্থ্যজীবন সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ;

ঠাকুর বলেন, "সংসার আর মুক্তি দুই-ই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনিই সংসারে অজ্ঞান করে রেখেছেন, আবার তিনিই ইচ্ছা করে যখন ডাকবেন তখন সংসারীর মুক্তি হবে। যখন তিনি মুক্তি দেবেন তখন তিনি সাধুসঙ্গ করিয়ে নেবেন। আবার তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল করে দেন। কর্ম গেলে কেরানির যেমন ব্যাকুলতা হয়। সে যেমন রোজ অফিসে অফিসে ঘোরে, আর জিজ্ঞাসা করে, "কোনো কর্মখালি হয়েছে?" কেরানী অফিসে কাজ পাওয়ার জন্য ভীষণ ব্যাকুল হয়ে পড়ে।ঐ কেরানীর মত একজন সংসারীর মন ঈশ্বর লাভের জন্য যদি ব্যাকুলতায় ছটফট করে, তখন তার ঈশ্বরলাভ হয়।কিন্তু গোঁপে চাড়া, পায়ের উপর পা দিয়ে যদি সংসারী বসে থাকে এবং পান চিবুতে থাকে, ঈশ্বরলাভের কোন ভাবনা চিন্তা না রাখে—এরূপ অবস্থা হলে ঐ সংসারীর কখনো ঈশ্বরলাভ হয় না।"

তিনি বলেন; "সংসারধর্ম; তাতে দোষ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে, কামনা-বাসনা শূন্য হয়ে সংসারের কাজকর্ম করতে হবে। কীভাবে একজন সংসারী মানুষ সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি মন রাখবে সেই কথা বোঝাতে গিয়ে তিনি একটি উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বললেন যে যদি কারুর পিঠে একটা ফোঁড়া হয়, তখন ফোঁড়ার দিকে তার মন পড়ে থাকে। অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা করুক বা সংসারের সকল কাজকর্ম করুক- যাই করুক না কেন, তাঁর মন ফোঁড়ার দিকে পড়ে থাকে।ঠিক তেমনি ভাবে সংসারের সকল কাজকর্মের মধ্যে একজন সংসারী মানুষকে সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি মন রাখতে হবে। তিনি বলেছেন; "একজন সংসারী মানুষ স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা সকলকে নিয়ে থাকবে এবং তাদের সেবাও করবে- যেন তারা কত আপনার লোক কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়। এই সম্বন্ধে তাঁর একটা উপমাঃ "বড় লোকের বাড়িতে এক দাসী সব কাজ করে। সকলকে ভালবাসে। কিন্তু ঐ দাসীর মন পড়ে থাকে দেশে নিজের বাড়ির দিকে । সে কথা কেউ বুঝতে পারে না। আবার সে মনিবের ছেলেদের নিজের ছেলের মতো মানুষ করে। বলে 'আমার রাম', 'আমার হরি'—কিন্তু মনে বেশ জানে—

এরা আমার কেউ নয়। মনিবের কাজে জবাব দিলে ব্যস, আর কোনো সম্পর্ক নাই। ঠিক তেমনিভাবে সংসারী মানুষ স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা সকলকে নিয়ে থাকবে, তাদেরকে ভালবাসবে এবং তাদের সেবাও করবে। কিন্তু তার মন পড়ে থাকবে ঈশ্বরের পাদপদ্মে।"

এইভাবে তিনি সংসারী মানুষকে সংসার ধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঈশ্বরমুখী হতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি সংসারী মানুষকে যেমন ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হতে উপদেশ দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে সংসারীকে সংসারের দায়িত্ব পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে সংসারী মানুষ সংসারের দায়িত্ব অবহেলা করতে পারে না। সংসারের দায়িত্ব যে অবহেলা করে সে কখনই ঈশ্বরের প্রতি মন দিতে পারে না।

সংসারী-জীবেন ঈশ্বর লাভের উপায় সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন, "সংসার জীবনে থেকে কেউ ঈশ্বরকে যদি লাভ করতে পার, সংসার অসার বলে বোধ হবে না। যে তাঁকে জানতে পেরেছে, সে দেখে যে, 'জীবজগৎ—সে তিনিই হয়েছেন'।যখন সংসারী মানুষ ছেলেদের খাওয়াবে, তখন ভাববে সে যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছ। পিতামাতাকে ঈশ্বর-ঈশ্বরী রূপে দেখবে ও সেবা করবে। ঈশ্বরকে জেনে সংসার করলে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। দু-জনেই ভক্ত, কেবল তাদের মধ্যে ঈশ্বরের কথা হবে। স্বামী-স্ত্রী ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নিয়ে থাকবে। ভক্তের সেবা করবে। সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন, তাঁর সেবা দু-জনে করবে। কিন্তু এরূপ স্ত্রী-পুরুষ অতি বিরল। বিষয়ী লোকেরা তাদেরকে চিনতে পারে না। তবে এরূপটি হতে গেলে দু-জনেরই ভাল হওয়া দরকার। দু-জনেই যদি সেই ঈশ্বরানন্দ পেয়ে থাকে, তাহলেই এটি সম্ভব হয়। ভগবানের বিশেষ কৃপা চই। না হলে সর্বদাই অমিল হয়।

https://www.thakurmaaswamiji.com/2021/03/100-Sri-Ramakrishna-quotes-about-Sansarashram-In-Bengali.html

৭.৪.৬) পুরুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাখ্যা;

৬ই ডিসেম্বর ১৮৮৪, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অধরলাল সেনের বাড়িতে গিয়েছেন। সেখানে অধর সেন কয়েকটি বন্ধুকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে এসে বসলেন। সেই বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অধরবাবু বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে ঠাকুরকে বললেন, "মহাশয়, ইনি খুব পণ্ডিত ব্যক্তি, অনেক বই লিখেছেন।আপনাকে দেখতে এসেছেন। ওনার নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রসিকতা করে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, *"বঙ্কিম, তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো?"* বঙ্কিমচন্দ্র হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, "আর মহাশয়! জুতোর চোটে। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "না গো, শ্রীকৃষ্ণ বঙ্কিম হয়েছিলেন শ্রীমতীর প্রেমে। শ্রীরাধার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কালো কেন জানো? আবার, তিনি অত ছোট কেন? যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে, ততক্ষণ কালো দেখায়, যেমন সমুদ্রের জল দূর থেকে নীলবর্ণ দেখায়। সমুদ্রের জলের কাছে গেলে ও হাতে করে তুললে আর কালো ভাব থাকে না, তখন খুব পরিষ্কার, সাদা। সূর্য দূরে বলে খুব ছোট দেখায়; কাছে গেলে আর ছোট থাকে না। সে অনেক দূরের কথা সমাধিস্থ না হলে হয় না। যতক্ষণ আমি তুমি আছে, ততক্ষণ নাম-রূপও আছে। তাঁরই সব লীলা। আমি তুমি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তিনি নানারূপে প্রকাশ হন।" "শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, শ্রীমতী তাঁর শক্তি--আদ্যাশক্তি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যুগলমূর্তির মানে কি? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ, তাঁদের ভেদ নাই। পুরুষ, প্রকৃতি না হলে থাকতে পারে না; প্রকৃতিও পুরুষ না হলে থাকতে পারে না। একটি বললেই আর একটি তার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে। যেমন অগ্নি আর দাহিকাশক্তি। দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না। আর অগ্নি ছাড়া দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। তাই যুগলমূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে, ও শ্রীমতীর দৃষ্টি কৃষ্ণের দিকে। শ্রীমতীর গৌর বর্ণ বিদ্যুতের মতো, তাই কৃষ্ণ পীতাম্বর পরেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ নীল মেঘের মতো; তাই শ্রীমতী নীলাম্বর পরেছেন। আর শ্রীমতী নীলকান্ত মণি দিয়ে অঙ্গ সাজিয়েছেন। শ্রীমতীর পায়ে নূপুর, তাই

শ্রীকৃষ্ণ নূপুর পরেছেন; অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের অন্তরে-বাহিরে মিল।" *(উৎস; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত* -শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথোপকথন)

৭.৪.৭) ইহকাল, পরকাল ও পুনর্জন্ম সম্পর্কে ঠাকুরের ব্যাখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ এরপর বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, আপনি তো খুব পণ্ডিত, আর কত বই লিখেছেন; আপনি কি বলেন-মানুষের কর্তব্য কি? পরকাল তো আছে, কি সঙ্গে যাবে?" তখন বঙ্কিমচন্দ্র বললেন; "পরকাল! সে আবার কি?" বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "হাঁ, জ্ঞানের পর আর অন্যলোকে যেতে হয় না । পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয় এবং ঈশ্বরলাভ হয়, ততক্ষণ সংসারে বারে বারে ফিরে আসতে হয়। কোন মতেই পুনর্জন্মের নিস্তার নাই। ফলে ততক্ষণ পরকালও আছে। জ্ঞানলাভ হলে, ঈশ্বরদর্শন হলে মুক্তি হয়ে যায় – তখন আর এই পৃথিবীতে আসতে হয় না। সিধোনো-ধান পুঁতলে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ যদি কেহ হয়, তাকে নিয়ে আর সৃষ্টির খেলা হয় না। তাকে সংসার জীবনে ফিরে আসতে হয় না, তার তো কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি নাই। সিধোনো-ধান আর ক্ষেতে পুতলে কি হবে? সিদ্ধ পুরুষ হল সিধোনো-ধান। তাই তার আর পুনর্জন্ম নেই।" যে ঈশ্বরদর্শন করেছে, সে অমৃত ফল লাভ করেছে।তাই তার পুনর্জন্ম হয় না। পৃথিবী বল, সূর্যলোক বল, চন্দ্রলোক কোনও জায়গায় তাকে আসতে হয় না।

৭.৪.৮) ঈশ্বরলাভ করতে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে হবে;

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন নরেন্দ্রকে বলেলেন, "বাবা, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। গুরুর কথায় একমত হয়ে পরবর্তী সময় স্বামীজীও আমেরিকাবাসীদের বলেছিলেন; "যীশু কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী। তিনি জেনেছিলেন, আত্মা স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়। টাকা-কড়ি, মান-সম্ভ্রম, দেহসুখ, ইন্দ্রিয়সুখ অবতারপুরুষ কিছুই চান না। 'আমি' 'আমার' বলতে

কিছুই নাই। আমি কর্তা, আমার গৃহ, পরিবার ইত্যাদি সব অজ্ঞান থেকে হয়।”

শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্তলোক-যাত্রা

১৮৮৫ সালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গলার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কলকাতার সেরা চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে শ্যামপুকুরে এক ভক্তের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে শুরু করে এবং তখন কাশীপুরের এক বিরাট বাগানবাড়িতে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়। তার অবস্থা দিনের পর দিন আরও অবনতি ঘটে। অবশেষে ১৮৮৬ সালে ১৫ আগস্ট কাশীপুরে বাগান বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কাশীপুরে সরকারি ভাবে সংরক্ষিত প্রয়াণ-নথি অনুযায়ী; “রামকিষ্টো প্রমোহংশ; ৪৯ কাশিপুর রোড্, বয়স ৫২; মৃত্যু তারিখ- ১৫ আগস্ট ১৮৮৬; মৃত্যুর কারণ-গলায় আলসার (উৎসঃ আনন্দবাজার পত্রিকা; ১২.০১.২০২২)। আনন্দবাজার পত্রিকা শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধান সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আসন্ন দেহত্যাগের বিষয় অনেক আগেই বুঝে ছিলেন। তাই ঠিক ঐ সময় ঠাকুর তাঁর সহধর্মিণী সারদা মাকে বললেন, “তুমি কামারপুকুরে থাকবে, শাক বুনবে। শাকভাত খাবে আর হরিনাম করবে।... কারও কাছে একটি পয়সার জন্য চিতহাত করবে না, তোমার মোটা ভাতকাপড়ের অভাব হবে না।”

স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের শেষ মুহূর্তের বিস্তারিত বিবরণ রেখে গিয়েছেন—“একটা বাজিলে অকস্মাৎ তিনি একপাশে গড়াইয়া পড়েন। তাঁহার গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হইতে থাকে। নরেন তাড়াতাড়ি তাঁহার পা লেপে ঢাকিয়া ছুটিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া যান। এ দৃশ্য তিনি সহিতে পারিতেছিলেন না। নাড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আমরা সকলে ভাবিলাম, উহা সমাধি।’ সেই রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ভাইপো রামলালকে খবর দেওয়া হল। রামলাল এসে বলল, ‘ব্রহ্মতালু গরম আছে, তোমরা একবার কাপ্তেন উপাধ্যায়কে খবর দাও।’ তিনি তাড়াতাড়ি এসে বললেন, মেরুদণ্ডে

গব্যঘৃত মালিশ করলে চৈতন্যোদয় হবে। তিন ঘণ্টার বেশি মালিশ করেও কোনও ফল হল না।

১৬ অগস্ট সকালবেলায় ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের কাশীপুরে আবির্ভাব। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের রচনা অনুযায়ী, পরদিন প্রত্যুষে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সর্বপ্রথম উদ্যানে উপস্থিত হন। অভেদানন্দের বর্ণনা অনুযায়ী, ডা. সরকার "বেলা দশ ঘটিকায় এসে নাড়ি দেখে বলেন, ঠাকুরের প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছে।" 'ডাক্তার সরকার কাশীপুর পৌঁছান বেলা একটায়।' তিনি বলেন, রামকৃষ্ণদেব মৃত। গত রাত্রে একটার সময় তাঁর দেহাবসান হয়েছে...।"

এর পরে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল ছবি তোলার পরামর্শ দিলেন এবং নিজের চাঁদা হিসেবে দশ টাকা রেখে গেলেন। বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্সের ছবি তোলা সম্বন্ধে অভেদানন্দের বর্ণনা: 'রামবাবু নিজে খাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইতে বলিলেন। আমরা সকলে নির্বাক হইয়া সিঁড়ির ওপরে দাঁড়াইলাম। বেঙ্গল ফটোগ্রাফার কোম্পানি দুইখানা গ্রুপ ফটো তুলিয়া লইলেন।' কাশীপুর মহাশ্মশানের উদ্দেশ্যে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল বিকেল ছ'টার পর। ১৬ অগস্ট ১৮৮৬ তারিখে তোলা বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্সের দুটি গ্রুপ ফটোগ্রাফের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্সের তোলা আলোকচিত্র। (উৎস; আনন্দ বাজার অনলাইন (২৪,৫,২৪) । পত্রিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার)

১৩; বেদান্তের জীবন্ত প্রতীক- স্বামী বিবেকানন্দ

সূচনা;

এমন কোন ভারতীয় নেই যিনি স্বামী বিবেকানন্দকে জানেন না বা তাঁর নাম শুনেন না। "ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন জড়বিজ্ঞানের উত্তাল তরঙ্গ সারা বিশ্বকে প্লাবিত করেছিল, ঐ অবস্থায় ভারতবর্ষের শতসহস্র বছরের সঞ্চিত ব্রহ্মতত্ত্বকে অসাধারন ব্যাখ্যার সাহায্যে উপস্থাপিত করে পাশ্চাত্যের মনীষিদের কাছ থেকে অপরিমেয় প্রশংসা এবং শ্রদ্ধা অর্জন করেন বিবেকানন্দ। সেইসঙ্গে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের জন্মদাত্রী ভারতবর্ষের প্রতি বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভায় ভারতের বেদান্ত দর্শনের উপর তাঁর অভূতপূর্ব বক্তৃতার মাধ্যমে। এরপরে আমেরিকা ও ইউরোপে বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতের বেদান্ত দর্শন প্রচার করে তিনি ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে পরম গৌরবে ভূষিত করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, দার্শনিক, লেখক ও সংগীতজ্ঞ। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য। ১৮৯৩খ্রিষ্টাব্দে শিকাগোয়

বিশ্বধর্ম মহাসভায় অসাধারণ বক্তৃতার মাধ্যমেই তিনিই প্রথম খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী পাশ্চাত্য সমাজে হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেন। তাঁর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে তাঁর নিম্নোক্ত প্রেমের বানী যে বানী সমাজজীবনে এক অদ্‌ভুত সঞ্জীবনীধারা প্রবাহিত করে চলেছে।

"ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,

মন প্রান শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।

বহুরূপে সম্মুখে তমা ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"

তাঁর ঐ বাণী থেকে সুস্পষ্ট হয়, আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর মানবপ্রেম ও মানবসেবার ধর্ম। তাঁর দর্শনে আত্মা কখনই ব্রহ্ম থেকে আলাদা নয়। তিনি বলেন, ব্রহ্মকে অনুভব বা উপাসনা করতে হলে সর্বজীবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব ও উপাসনার প্রয়োজন। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" ঐ বানীটি দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছেন, "তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? ঈশ্বরের খোঁজে তোমরা কোথায় ঘুরছ? দরিদ্র, দুঃখী, পীড়িত, অভুক্ত এরা সকলেই কি আমাদের ঈশ্বর নয়? আগে এদের সকলকে আমাদের কে উপাসনা করতে হবে;ভালবাসতে হবে এবং সেবা করতে হবে।

প্রতিটি যুগের একজন যুগনায়ক আসেন। স্বামী বিবেকানন্দ হলেন আমাদের সেই যুগনায়ক- এক বিস্ময়কর মহাজীবণ। আজ থেকে প্রায় একশ ষাট বৎসর পূর্বে ঈশ্বরসরূপ এই মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও ধ্যানের একটি পরিপূর্ণ আদর্শরূপে এই মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অধর্ম, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা, পরাধীনতা ও দারিদ্র্যের ভয়ংকর ঘূর্ণাবাতে ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্যের প্রাণকেন্দ্র ভারত যখন তমসাচ্ছন্ন হয়ে অগ্রগতি ও সত্যের পথ হারিয়ে ফেলেছিল, সেই যুগসন্ধিক্ষণে ভবিষ্যৎ মানবজাতির অভ্রান্ত

পথনির্দেশকরূপে কালজয়ী মহাজীবন, স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর আবির্ভূাবে শুধু যে তমসাচ্ছন্ন ভারত কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ও ভক্তিযোগে, জেগে উঠেছে—তাহা নয়, রজোগুণে উন্মত্ত ইওরোপ-আমেরিকাও এই মহামানবের শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম ধ্যান-ধারনা ও জ্ঞানের নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে।তাহাঁর চিন্তন ও আদর্শে সমগ্র মানবজাতি ধর্মের কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে, আধ্যাত্মিকতার একটি শাশ্বতরূপ দেখতে আরম্ভ করেছে। তিনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক। আধ্যাত্মিক জগতে পণ্ডিতদের কাছে তিনি জীবন্ত বেদান্ত (Living Vedanta) নামে পরিচিত।

স্বামী বিবেকানন্দের বানী ও রচনাবলী স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বের করে আমাদেরকে মানবসেবা ও সমাজ সেবায় উদ্‌বুদ্ধ করে। এখানে মনে পড়ে তাঁর অমোঘ বাণী ও উপদেশ; "প্রত্যেক নারী-পুরুষকে ইশ্বরের দৃষ্টিতে দেখতে থাকো। তোমরা কাউকেই সাহায্য করতে পারো না, কেবল সেবা করতে পারো। নিজেদের খুব বড় কিছু ভেবো না; তোমরা ধন্য যে সেবা করার অধিকার পেয়েছ, অন্যরা পায়নি" তিনি সবসময় মানব সেবার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি বানী আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ;

"কেবল শারীরিক সাহায্য দ্বারা জগতের দুঃখ দূর করা যায় না। যতদিন না মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইতেছে, ততদিন এই শারীরিক অভাবগুলি সর্বদাই আসিবে এবং দুঃখ অনুভূত হইবেই হইবে। যতই শারীরিক সাহায্য কর না কেন, কোনমতেই দুঃখ একেবারে দূর হইবে না। জগতের এই দুঃখ-সমস্যার একমাত্র সমাধান মানবজাতিকে শুদ্ধ ও পবিত্র করা। আমরা জগতে যাহা কিছু দুঃখকষ্ট ও অশুভ দেখিতে পাই, সবই অজ্ঞান বা অবিদ্যা হইতে প্রসূত। মানুষকে জ্ঞানালোক দাও, সকল মানুষ পবিত্র আধ্যাত্মিক-বলসম্পন্ন ও শিক্ষিত হউক, কেবল তখনই জগৎ হইতে দুঃখ নিবৃত্ত হইবে, তাহার পূর্বে নয় । দেশে প্রত্যেকটি গৃহকে আমরা দাতব্য আশ্রমে পরিণত করিতে পারি, হাসপাতালে দেশ

ছাইয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু যতদিন না মানুষের স্বভাব বদলাইতেছে, ততদিন দুঃখ-কষ্ট থাকিবেই থাকিবে।"

স্বামী বিবেকানন্দের অবতারত্ব

পণ্ডিতেরা মনে করেন স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে পুণ্যভূমি ভারত আবার নূতন এক অবতারের আশীর্বাদ লাভ করেছে। তিনি প্রাচীন অদ্বৈতবাদীদের মতো ভারতীয় বৈদান্তিক চিন্তার উজ্জ্বলতা, আমাদের পুরাণ ও কিংবদন্তির তাৎপর্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ও আধ্যাত্মিকতার লক্ষ্য এই সকল জটিল বিষয়গুলি আমাদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার করে দিয়েছেন। শুধুমাত্র হিন্দু পণ্ডিতেরাই নয়, অন্য ধর্মের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ স্বীকার করেছেন- স্বামী বিবেকানন্দ একজন অবতার ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, ভগিনী নিবেদিতা যিনি স্বামীজীর সাথে কিছুদিন নৈনিতালে ছিলেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে অবতাররূপে বর্ণনা করেছেন। নৈনিতালের এক উদ্ঘাটনমূলক দিনগুলি ভগিনী নিবেদিতার কাছে বিশেষ স্মরণীয় ছিল। নৈনিতালে কাটানো সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন: "তাঁর নৈনিতাল যাত্রা তিনটি কারণে দ্বারা সুন্দর ও স্মরণীয়– এক, তাঁর গুরু স্বামীজীর বিশেষ আনন্দ- তাঁর শিষ্য, খেত্রীর রাজার সাথে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য; দুই, নাচের মেয়েরা যারা তার সাথে দেখা করে জিজ্ঞাসা করেছিল- তারা স্বামীজিকে কোথায় পাবে? অন্যদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্বামীজী তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন; এবং তৃতীয় কারণ হল, এক মোহামেডান ভদ্রলোক যিনি বলেছিলেন, "স্বামীজী, যদি পরে কেউ আপনাকে অবতার বা দেবতা বলে অভিবাদন করে - মনে রাখবেন যে আমি, একজন মোহামেডান, আমি হলাম সেই প্রথম ব্যক্তি!"

'Naini Tal was made beautiful by three things—the Master's pleasure in introducing to us his disciple the Raja of Khetri; the dancing girls who met us and asked us where to find him, and were received by him inspite of the remonstrances of others; and by the Mohammedan gentleman who said,

"Swamiji, if in after times any claim you as an Avatara, an especial incarnation of the Deity—remember that I, a Mohammedan, am the first!" Sister Nivedita

(Ref.Article. Swami Vivekananda: A Presence and a Power; https://www.swamivivekananda.guru.)

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, দর্শন এবং কর্মকাণ্ড ভারতবাসীর স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের জন্য তাদের ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা ও পথ নির্দেশ করে। স্বাধীনতার জন্য চারপাশে তাকানোর আগে তাদের নিজের শক্তি ও ক্ষমতার দিকে তাকানোর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে তাঁর দর্শন ও বাণী। স্বামীজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে, স্বামী চিদাত্মানন্দ বলেছেন: "বিরাজমান পরিস্থিতিতে, স্বামীজী বেদান্ত গুরু হয়েও মানুষের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা অর্জনের কথা মাথায় রেখে আপাত দৃষ্টিতে ধর্মবিদ্বেষী কথা উচ্চারণ করতেও দ্বিধা করেননি, 'গীতা অধ্যয়নের চেয়ে ফুটবলের মাধ্যমে আপনি স্বর্গের কাছাকাছি হবেন। এগুলি সাহসী শব্দ; কিন্তু তাদের আমায় বলতে হবে, " আমি তোমাকে ভালোবাসি এই জন্য. ... তাতে তোমার বাহুর পেশী হবে , তখন তোমরা গীতা আরও ভালভাবে বুঝতে পারবে।" স্বামী বিবেকানন্দকে প্রায়শই শক্তির ভাববাদী হিসাবে বর্ণনা করা হয়;, এটা সত্য. তাঁর দর্শন ছিল যে, আধ্যাত্মিক শক্তিতে ওঠার জন্য একজনকে কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে যেতে হবে; অন্যথায়, একজন অলসতায় পতিত হবে। সেই ব্যাধিতে ভারত ভুগেছিল। তাই তাঁর আবির্ভাবের আগে ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভের কথা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। তাই তিনি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সকলকে শক্তি অর্জন করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি দেশবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে " হিন্দুদের অবশ্যই আরও বেশি গতিশীল হতে হবে, জীবনের সমস্যাগুলির সমাধানের প্রতি তাদের নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে এবং তাদেরকে আরও আত্মবিশ্বাসী হতে হবে; কারণ তিনি সব সময় বলতেন- "সম্প্রসারণ হল জীবন, আর

সংকোচন হল মৃত্যু"। তিনি যা করতেন বা যা বলতেন তার মধ্যে এক বিশাল শক্তি, দর্শন ও অনুপ্রেরনা দৃশ্যমানভাবে প্রবাহিত হত।, শিকাগো মহাবিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে লক্ষ্য লক্ষ্য দর্শকের সামনে তাঁর প্রথম ভাষণে স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল ভাবে ইংরেজিতে যে কথা বলেছিলেন তাঁর বঙ্গানুবাদ হল;

" যে ধর্ম (হিন্দুধর্ম) বিশ্বকে সহনশীলতা এবং সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা উভয়ই শিক্ষা দিয়েছে, এইরূপ একটি ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরে আমি ভীষণ গর্বিত। আমরা শুধু বিশ্বজনীন সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করি না, সব ধর্মকেই সত্য বলে মেনে চলি । আমি গর্বিত যে এমন একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত যারা পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম ও সমস্ত জাতির নির্যাতিত এবং উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিয়েছে। আমি আপনাদেরকে বলতে গর্ব বোধ করছি যে আমরা আমাদের বুকে ইস্রায়েলীয়দের সবচেয়ে বিশুদ্ধ অবশিষ্টাংশকে জড়ো করেছি, যারা দক্ষিণ ভারতে এসে আমাদের সাথে আশ্রয় নিয়েছিল,যে বছরটিতে রোমান অত্যাচার দ্বারা তাদের পবিত্র মন্দিরটি টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরে গর্বিত যেটি গ্র্যান্ড জরথুস্ট্রিয়ান জাতির (*the grand Zoroastrian nation)* অবশিষ্টাংশকে আশ্রয় দিয়েছে এবং এখনও সযত্নে লালন-পালন করছে। "

মাতৃভূমি ভারতবর্ষের দরিদ্র, অসহায়, দৈন্য অবস্থার পরিবর্তন এবং সমগ্র দেশবাসীর উন্নতির জন্যই ভারত পুণ্যভূমিতে তাঁর আবির্ভাব।তাঁর স্বল্প অবতার জীবনে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করে আমাদের সকলকে স্বাধীনতা ও মুক্তির পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। বিগত শতাব্দীতে ভারত নিজের চারপাশে যে ধর্মের বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা এবং কুসংস্কারের প্রাচীর তৈরি হয়েছিল তা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অত্যাল্প পার্থিব জীবনে ভেঙে চুরমার করেছেন। মানুষকে তিনি সত্য, স্বাধীনতা ও মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। বিদেশে অনেক উল্লেখযোগ্য পণ্ডিতসহ অগণিত মানুষ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে যা দেখেছিলেন, তার উপর ভিত্তি করেই ভারত সম্পর্কে তাঁদের বিদ্বেষমূলক ভাব, নিম্ন ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন

করেছেন। পাশ্চাত্যের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর শিষ্য ও ভক্ত হয়েছেন। তাই বোধহয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার বলেছিলেন: "যদি ভারতকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে অধ্যয়ন কর।এই দুই অবতারের দর্শন, চিন্তন ও সাধন এবং কর্মক্যান্ডের যথাযথ মুল্যায়নের জন্য আরো অনেক বেশি জ্ঞানগর্ভ আলোচনার প্রয়োজন, যার জন্য এই স্থান নিতান্ত অপরিসর। যাইহোক এই দুই অবতারের দর্শন, চিন্তন ও সাধন এবং কর্মক্যান্ডের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য কিছু মনিষীর মন্তব্য ও মূল্যায়ন পরিশেষে সংক্ষিপ্ত আকারে এই বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। পাঠকসাধারণ যদি সেগুলো পড়েন তাহলে মনে হয় আমরা দুই অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে কিছুটা বুঝতে পারব।

১; জন্ম, পিতা-মাতার আদর্শ ও ছেলেবেলার কাহিনীঃ

জন্ম

১৮৬৩ সালে, ১২ই জানুয়ারি উত্তর কলকাতার শিমুলিয়া গ্রামের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম। তাঁর মা ভুবনেশ্বরী দেবী এবং পিতা বিশ্বনাথ দত্ত। ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন অতিশয় ভক্তিমতী রমণী। তাঁর প্রথম কয়েকটি সন্তানের মৃত্যু ও তারপর কন্যাসন্তানের জন্মের পর তিনি একটি পুত্র সন্তানের জন্য আকুল হয়ে ভগবান বিশ্বনাথের কাছে প্রার্থনা করেন। জানা যায় তাঁর এক কাশীবাসিনী আত্মীয়াকে দিয়ে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে পূজা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। 'Vedanta- Voice of Freedom' পড়ে জানা যায় যে, জন্মের অনেক আগে ভুবনেশ্বরী দেবী যখন দিনের পর দিন পুত্র সন্তান লাভের জন্য উপবাস ও শিবের ধ্যান করতেন, সপ্নের মধ্যে একদিন তিনি তাঁর পুত্র সন্তান জন্মের কথা জানতে পারেন। এরপরই বিবেকানন্দের জন্ম হওয়ায় ভুবনেশ্বরী দেবীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি শিবের কৃপায় নরেন্দ্রনাথকে পুত্র হিসেবে পেয়েছেন। তাই তিনি তাঁর স্বামীর সম্মতিতে পুত্রের নাম রাখলেন বীরেশ্বর যা হল ভগবান শিবের একটি নাম। বীরেশ্বরকে সংক্ষেপে তাঁর বাবা-মা বিলে বলে ডাকতেন। পরে তাঁকে নরেন্দ্রনাথ বা নরেন্দ্র বলেও অনেকে ডাকতেন। সেইজন্য তাঁর বন্ধুরা তাঁকে 'নরেন' বলে

ডাকতেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত আইনজীবি। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে তিনি অনেক মানবিক গুন ও আদর্শ তাঁর পিতা-মাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছিলেন।

মায়ের আদর্শ;

ছোটবেলা থেকে স্বামীজির মনে আধ্যাত্মিক চেতনার ভাব সর্বপ্রথম জাগিয়ে ছিলেন তাঁর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। তাঁর জীবন দর্শনে তাঁর মায়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল। তিনি খুব ধার্মিক ও স্নেহশীলা রমণী ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র, রামায়ণ ও মহাভারতের বিষয়ে অনেক জ্ঞান ছিল তাঁর। এছাড়াও তিনি সেই সময়কার মহিলা হয়েও ইংরাজী ভাষা ভালোই বুঝতেন । ত্যাগ ও সন্ন্যাসের প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বামীজী তাঁর মায়ের সম্পর্কে খুব চিন্তিত করে গেছেন কারন তিনি তাঁর মাকে ভীষণ ভাল বাসতেন। এই ক্ষেত্রে ত্যাগী সন্ন্যাসীদের অনুশাসনের কিছুটা তিনি ব্যতিক্রম ছিলেন। পিতা ও মাতার প্রতি তাঁর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা, প্রেম ও ভক্তি। বাবার চেয়ে মায়ের প্রতি তাঁর টান ও নিষ্ঠা ছিল অনেক বেশি। তিনি যখন সন্ন্যাসী হয়ে দেশ-বিদেশ বেদান্ত দর্শন প্রচারে মগ্ন থাকতেন, তখনও তিনি মায়ের জন্য সর্বদা দুশ্চিন্তা করতেন। জানা যায়, তাঁর এই মহাজীবনে গড়ে উঠার পিছনে ভুবনেশ্বরী দেবী ও বিশ্বনাথ দত্তের অবদান ছিলো অপরিসীম। এটা তাঁর বিভিন্ন চিঠি থেকে জানা যায়। “To my father, I owe my intellect and compassion.” “the love which my mother gave me has made me what I am and I owe a debt to debt to her that I can never repay.” ... (উৎস; Swami Vivekananda the Living Vedanta;)

ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন সিমলার নন্দলাল বসুর মেয়ে। তিনি প্রবল আত্মবিশ্বাস, বুদ্ধিমত্তা, ও অপরিসীম সরলতা নিয়ে রানীর মত একটি বড় পরিবার পরিচালনা করতেন। ভুবনেশ্বরী দেবী বাহিরে যতটা গাম্ভীর্যপূর্ণা, অন্তরে ততটাই কোমল ও দয়ালু ছিলেন। তিনি বিলাসিতা ও ধন উভয়ের থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন।জীবনে

যে মারাত্মক দারিদ্র্যের মুখোমুখি হয়েছিলেন তা তিনি আধ্যাত্মিক গুন ও অনাসক্তির দ্বারা সহজেই অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁর মায়ের একটি আদর্শের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেটা স্বামীজীর সমস্ত বিখ্যাত বাণীগুলির মধ্যে অতি মূল্যবান বাণী; "***সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোন কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা চলে না***"। তাঁর এই বাণী তাঁর জীবনের প্রকৃত পরিচয় বহন করে। কিন্তু এই কথাটি তিনি প্রথম শুনেন তাঁর মায়ের মুখ থেকে তাঁর ছোট বেলায় যখন তিনি সত্য কথা বলার জন্য স্কুলে শিক্ষকের হাতে নিগৃহীত হয়ে বাড়ী ফেরেন। ছেলের কাছে স্কুলের ঘটানা সব কিছু শুনার পর তিনি ছেলেকে বললেন, "বাছা, তোমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে এতে কি আসে যায়? ফল যা-ই হোক না কেন, সর্বদা যা সত্য বলে মণে করবে, তা-ই করে যাবে। অনেক সময় হয়ত এর জন্য অন্যায় ও অপ্রীতিকর ফল সহ্য করতে হবে, কিন্তু তবুও সত্য কখনো ছাড়বেনা"। তাঁর মায়ের পরম শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যখন তিনি তাঁর গুরুদেব, শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতে শুনতেন "সত্যই কলির তপস্যা" শুধু তাই নয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিটি আচরণে এই সত্যের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করতেন যে সত্যের আদর্শের কথা তাঁর মা প্রথম বলেছিলেন। (*উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ- ৭৬পৃ)*

পিতার আদর্শ;

তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত অত্যন্ত উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, ও আদব কায়দায় তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতি ও সভ্যতায় সমান অনুরাগী। সাতটি ভাষায় তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। যদিও তিনি পেশায় একজন বিখ্যাত আইনজীবী, ইতিহাস ও সংগীত চর্চাতে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বিশ্বনাথ দত্ত বাংলা, ফারসি, আরবি, উর্দু, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায় সমান পারদর্শী ছিলেন। সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ পাঠে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ধর্ম বিষয়ে তিনি উদার ছিলেন। বাইবেল ও দেওয়ান-*ই-হাফিজ* ছিল তার প্রিয় বই। তিনি '*সুলোচনা*' ও '*শিষ্টাচার-পদ্ধতি*' নামে দুইটি বই বাংলা ও হিন্দি ভাষায়, রচনা

করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রথা প্রবর্তনের সমর্থনে তিনি প্রকাশ্যে মতপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি অকাতরে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে দান করে যেতেন। আইনজীবী পেশায় তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন, কিন্তু সঞ্চয়ের প্রতি তাহাঁর মোটেই আগ্রহ ছিল না; বরং বহু আত্মীয় ও দরিদ্রকে তিনি প্রতিপালন করতেন। তাঁর উপার্জনের অধিকাংশটাই দান-ধানে ব্যয় করতেন। *(উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ- ৭৫পৃ)।*

স্বামীজীর ছেলেবেলার অলৌকিক কাহিনী

১) শিব ও রাম-সিতার পূজা ও সন্ন্যাসী সাজা;

ছেলেবেলা থেকেই নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতায় ভীষণ আগ্রহ ছিল। ঐ সময় তিনি শিব, রাম, সীতা ও মহাবীর হনুমানের মূর্তির সামনে ধ্যান ধ্যান খেলা করতেন। তিনি শৈশবকাল থেকেই মায়ের সাথে রামসিতা এবং শিব মূর্তির পূজা করতেন। মাঝে মধ্যে তিনি সন্ন্যাসী সাজতেন এবং মা কে গিয়ে বলতেন, " দেখ, মা আমি কেমন সন্ন্যাসী সেজেছি। এই দেখে তাঁর মা মাঝে মাঝে চিন্তায় পড়ে যেতেন। তিনি ভাবতেন- নরেন বড়ো হয়ে তার ঠাকুরদার মত সন্ন্যাসী হয়ে সংসার না তাগ করে ফেলে ? আসলে তিনি ছোটো থেকেই ধ্যান করতেন; কারণ, তিনি ছিলেন শিবের বরপুত্র। সাধুসন্ন্যাসীদের প্রতিও তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

২) ছোটবেলায় ধ্যান-ধ্যান খেলা

ছোটবেলায় স্বামীজীর নাম ছিল বিলে। বাড়ির সকলে তাঁকে বিলে বলে ডাকতেন। ছোটবেলা থেকেই বিলে প্রায় ধ্যান-ধ্যান খেলতে ভালবাসতেন। এই খেলার মধ্যেই মাঝে মাঝে ধ্যান করতে করতে তিনি এমন আত্মহারা হয়ে যেতেন যে তাঁর বাইরের জগৎ সম্পর্কে কোন হুঁশ থাকত না। একদিন তিনি বাড়ির এক কোণায় এমনভাবে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে বহুক্ষণ তাঁর কোন হুঁশ ছিল না। তাঁর বাড়ির লোকজন শেষ পর্যন্ত ঘরের দরজা ভেঙে তাঁকে অনেক ঝাঁকুনি দিয়ে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করে চেতনা ফিরিয়ে আনেন।

৩) ধ্যানে মগ্ন হয়ে কোবরার সামনে উদাসীন ছোট্ট বিলে;

বিলে তাঁর বন্ধুদের সাথে যে খেলা খেলতেন তার মধ্যে একটি ছিল চোখ বন্ধ করে ধ্যান করা। দেখা হত কে কত বেশি সময় ধরে ধ্যান করতে পারে। ঐ ধ্যানের মধ্যে প্রত্যেকে তার প্রিয় দেবতার কথা ভাবতে থাকত।একদিন যখন তারা ঐ খেলা খেলছিল, তখন তাদের একজন হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ শুনতে পায়। সে যখন চোখ খুলল, দেখতে পেল- একটি বড় সাপ (কোবরা) তাঁদের দিকে পিছলে আসছে। ঐ ছেলেটি তখন সাপ! সাপ!" বলে চিৎকার করতে লাগল। ঐ ছেলেটির চিরকার শুনে কেবলমাত্র বিলে ব্যতীত সকলেই উঠে দৌড়ে পালিয়ে যায়। দূর থেকে তারা চিৎকার করে বিলেকে সতর্ক করে বলতে লাগল, "নরেন, তাড়াতাড়ি দৌড়ে পালিয়ে যাও; একটা বড় কোবরা আসছে। এটা তোমাকে কামড়িয়ে দেবে, দৌড়াও! দৌড়াও!" কিন্তু নরেন তাদের চিৎকার শুনতে পেলেন না কারণ তখন ধ্যানের মধ্যে বসে তিনি শুধু ভগবানের কথাই ভাবছিলেন। তিনি তাঁর চারপাশের কোলাহল সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন থেকে ঈশ্বর-আনন্দ উপভোগ করছিলেন তখন।তাঁর বন্ধুরা দেখল, কোবরা শান্তভাবে তার ফণা তুলে কিছুক্ষণ নরেনকে দেখেছিল। তারপর ধীরে ধীরে নরেনকে প্রণাম করল এবং তাকে স্পর্শ না করেই সরে গেল। কোবরা নরেনকে অক্ষত রেখে ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনাটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যখন নরেন্দ্রের বন্ধুরা উৎকণ্ঠায় তাঁর বাবা-মা এবং তার প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করে। সেদিন নরেনের বন্ধুরা এবং বাড়ির সকলে তাঁর তীব্র একাগ্রতা ও ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার কথা জেনে হতবাক হয়েছিল।

৫) স্কুলে ক্লাসের মধ্যে ধ্যানমগ্ন হওয়া;

স্কুলে শিক্ষক মহাশয়রা যখন ক্লাসে পড়াতেন, তখন নরেন প্রায় ধ্যানস্থ হয়ে শিক্ষকের পড়া শুনতেন; এই দেখে শিক্ষক মহাশয়রা মনে করতেন যে নরেন ক্লাস এ ঘুমাচ্ছে। তাই এক শিক্ষক রেগে গিয়ে নরেনকে পড়া ধরলে নরেন শিক্ষক মহাশয়ের সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে দিতেন। শিক্ষক মহাশয় তখন খুব খুশি হতেন। এক কথায় ছোটবেলা থেকেই নরেন্দ্রনাথ ভীষণ চিন্তাশীল ছিলেন।

বড় হয়ে তিনি হলেন চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। এটাও জানা যায়,ছোটবেলা থেকেই স্বামীজীর মধ্যে নেতৃত্ব ভাব ছিল। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে সব বিষয়ে নেতা বলে মেনে চলত। তিনি তাঁর সমস্ত বন্ধুদেরকে সমান ভাবে ভাকবাসতেন। কখনো কাউকে তিনি ছোট করতেন না। তাঁর মন ছিল উদার এবং সহানুভূতিসম্পন্ন। যে কোন কঠিন কাজে তিনি সর্বদা এগিয়ে যেতেন অদম্য সহসিকতার সঙ্গে।

৬) সাহেবের সঙ্গে দেখা করে জাহাজ দেখতে গেট-পাশ;

তখন বিলের বয়স মাত্র ১১বৎসর। ঐ বয়সের বাচ্চারা সাধারনত ঐ সময় বাবা মায়ের বা বাড়ির বড়দের চোখে চোখে থাকত। কিন্তু বিলে ছিল ঐ বয়সে বড়দের ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে। একদিন তিনি তাঁর বন্ধুদেরকে বললেন; "কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে একটা বড় জাহাজ এসেছে। আমরা তো অনেক নৌকা, ডিঙ্গি বা পানসি দেখেছি। কিন্তু আমরা জাহাজ দেখি নি; চল, গঙ্গার ঘাটে গিয়ে আমরা জাহাজ দেখে আসি। যেই বলা, সেই কাজ। খুদে খুদে বাচ্চারা বিলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল জাহাজ দেখতে বাড়ির লোককে কোন কিছু না জানিয়ে।বাচ্চারা জাহাজ ঘাটের প্রবেশ পথে পৌঁছাল। গেটে সিকুরিটি বাচ্চাদেরকে আটকে দিল। তাদেরকে জাহাজ ঘাটের ভিতর প্রবেশ করতে দিল না।সিকুরিটি বলল; সাহেবের কাছ থেকে গেটে-পাশ না পেলে জাহাজ দেখা যাবে না। কিন্তু এত ছোট বাচ্চা সাহেবের কাছে যাবে কি করে? লালমুখো সাহেবের কাছে যেতে কেউ রাজী হল না। তাই নরেনের সব বন্ধুরা জাহাজ না দেখে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিধান্ত নিল। কিন্তু নরেন এসব শুনে ফিরে যাওয়ার পাত্র নয়। তিনি ঐ লালমুখো সাহেবের কাছে গিয়ে গেটে-পাশ নেওয়ার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। অনেক খোঁজার পর সাহেবের কাছে পৌঁছানোর একটা সরু সিড়ি পথ খুঁজে পেল।ঐ পথ দিয়ে গিয়ে, নরেন সেই লালমুখো সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন এবং জাহাজ দেখার জন্য গেটে-পাশ চাইলেন। সাহেব ঐ ১১বৎসরের সাহসিকতা দেখে মুগ্ধ হলেন এবং নরেন এবং তাঁর বন্ধুদেরকে জাহাজ দেখার অনুমতি দিয়ে দিলেন। সাহেবের অনুমতি পত্র নিয়ে মেন-গেট দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

দারওয়ান নরেনকে সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। নরেন কে জিজ্ঞাসা করল; "সাহেব কা পাস ক্যায়সে ঘুষা। নরেন উত্তর দিলেন, "হাম জাদু জানতে হ্যা"। এই হল সাহসী কিশোর নরেন্দ্রনাথ।

৭) পুষ্যি গরু, ছাগল, ময়ূর, পায়রা নিয়ে বাড়িতে খেলা করা

ছোট বেলায় ভীষণ দুষ্টু বিলে দিদি ও বোনেদের পেছনে খুব লাগতেন আর বাড়িতে পুষ্যি গরু, ছাগল, ময়ূর, পায়রা আর গিনিপিগের সাথে খেলা করতেন। তাঁর দুরন্তপনার জন্য দিদি ও বোনেরা তাঁকে তাড়া করলেই তিনি খোলা নর্দমায় নেমে পড়েতেন আর মুখ ভ্যাংচাতেন। কারণ তিনি জানতেন তাঁর দিদিরা কিছুতেই নর্দমায় নামবে না। ছোট থেকেই তিনি যেমনি ভীষণ বুদ্ধিমান ও সহজ-সরল ছিলেন আর তেমনি সকলকে ভীষণ ভালবাসতেন। বাড়ির কচোয়ানকেও খুব ভালবাসতেন। ছোট-বড় ভেদা-ভেদ কখনোই করতেন না। বাড়ির গরু আর তাঁর অনেক পুষ্যি যেমন একটা বাঁদর, একটা ছাগল, একটা ময়ূর, এক ঝাঁক পায়রা আর দুই-তিনটে গিনিপিগ ছিল বাড়িতে তাঁর খেলার সাথী। ছোট থেকেই তিনি জীব-জন্তুদের ভীষণ ভাল বাসতেন। তাই বড় হয়ে সহজে বলেছিলেন "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

8) পছন্দের খেলা- ক্লাসঘরের 'রাজার বিচারসভা'

নরেনের খেলাধূলায় ভীষণ উৎসাহ ছিল। স্কুলে টিফিনের ঘন্টা পড়লেই তিনি সব থেকে আগে খেয়ে নিয়ে সোজা খেলার মাঠে ছুটতেন। রোজ নিত্য নতুন খেলা খেলতে তাঁর ভীষণ ভাল লাগত। তাই তিনি বন্ধুদের নিয়ে প্রায় নতুন নতুন খেলা বানাতেন। বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া হলে, তারা নরেনের কাছে সমস্যার সুরাহা চাইতে আসত। তিনি তাঁর বন্ধুদের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর বন্ধুরা সবাই তাঁকে তাদের নেতা মেনে চলত। স্কুলে নরেনের সবচেয়ে পছন্দের খেলা ছিল 'রাজার বিচারসভা'। একটা ক্লাসঘরের সব থেকে উঁচু ধাপ হত তাঁর (বিচারকের) সিংহাসন। তিনি ছাড়া সেই ধাপে আর কেউ বসতে পারত না। সেখানে বসে তিনি তাঁর বন্ধুদের মধ্যে থেকে

মন্ত্রী, সেনাপতি, যুবরাজ, কোটাল বেছে নিয়ে নিচের ধাপগুলিতে বসাতেন। তারপরে তিনি তাঁর দরবার চালাতেন আর রাজার মত বিচার করতেন। কেউ তাঁর কথা না শুনলে তিনি তার দিকে কটমট করে তাকাতেন। বড় হয়ে তিনি রাজার মতই চলতেন। বিদেশ কিছু মানুষ তাঁকে রাজা বলে ডাকলে তিনি বলতেন "আমি রাজা নই, আমার চালটা রাজার মত।" তিনি ছিলেন সিংহ পুরুষ।

৯) বালক নরেনের একই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মনোনিবেশের প্রতিভা;

বালক নরেনের আর একটা বড় প্রতিভা ছিল- তিনি একসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মনোনিবেশের করতে পারতেন। ক্লাসে শিক্ষকেরা যখন পড়াতে থাকতেন, আর তার ফাঁকে ফাঁকেই তিনি তাঁর বন্ধুদেরকে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলতেন; যা তিনি তাঁর মায়ের কছে শুনতেন। একদিন ক্লাসে শিক্ষক মহাশয়ের পড়ানোর সময় নরেন আর তাঁর বন্ধুরা কথা বলছিল। মাস্টারমশাই হঠাৎ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- বলত আমরা কি নিয়ে পড়াশোনা করছি? অন্য ছেলেরা চুপ করে রইল। কিন্তু নরেন বলে দিলেন তখন ক্লাসে কি পড়া হচ্ছিল। কারণ, নরেনের সেই অদ্ভূত শক্তি ছিল যা দিয়ে তিনি এক সাথে একাধিক বিষয়ে মন দিতে পারতেন। তাই তাঁকে সেদিন যত প্রশ্ন করা হল, সব প্রশ্নের তিনি ঠিক ঠিক উত্তর দিলেন। তখন মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন - তোমাদের মধ্যে কে কথা বলছিল? সব ছেলেরা নরেনের দিকে দেখাল। মাস্টারমশাই তো বিশ্বাসই করতে চান না। তিনি ভেবেই পেলেন না এমন ছাত্রকে তিনি কি বলবেন। কিন্তু নরেন সত্যিটা স্বীকার করলেন। কারণ নরেন কখনো সত্যি ছাড়া অন্য কিছু বলতেন না।

১০) কুসংস্কারহীন বালক নরেনের ভুতের ভয় ছিল না;

বালক নরেনের নির্ভীক ও কুসংস্কারহীন চরিত্র নিয়ে একটা সুন্দর কাহিনী রয়েছে। নরেন তাঁর এক বন্ধুর বাড়ির বাগানে গাছে চড়তে খুব ভালবাসতেন এবং গাছে চড়ে তিনি ফল পাড়তেন আর বন্ধুদের দিতেন; শুধু তাইনয়, ঐ বাগানে তিনি গাছের ডাল থেকে পা ঝুলিয়ে

দিয়ে, মাথা নিচের দিকে করে দুলতে থাকতেন, আর তারপরে সোজা ডিগবাজি খেতন। এইসব নিয়ে হইচই হওয়ার ফলে সেই বাড়ির এক বুড়ো দাদু খুব বিরক্ত হচ্ছিলেন। তাই নরেনকে নিরস্ত করার জন্য তিনি বালক নরেনকে বললেন যে ঐ গাছে ভূত আছে, যে কিনা গাছে কেউ চড়লেই তার ঘাড় মটকে দেয়। বালক নরেন চুপচাপ কথাটা শুনলেন। কিন্তু সেই বৃদ্ধ যেই ফিরে গেলেন, তিনি অমনি আবার গাছে চড়তে লাগলেন। তাঁর বন্ধুরা তো বৃদ্ধের কথা শুনে খুব ভয় পেয়েগিয়েছিল। তারা তাই নরেনকে গাছে চড়তে বারণ করতে লাগল। কিন্তু নরেন হেসে হেসে বলল -'তোরা কি গাধা রে! আরে, এই বুড়ো দাদুর গল্প সত্যি হলে তো আমার ঘাড় অনেকদিন আগেই মটকে যেত রে!'।

২- নরেনের বাল্যকাল ও শিক্ষা-দীক্ষা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি

ছয় বছর বয়সে ছোট্ট বিলেকে বাড়ির নিকটে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হল। কিন্তু সেখানে নানারকমের বন্ধুবান্ধবের সাথে মিশে তিনি এমন সমস্ত নতুন নূতন অভব্য ও অভদ্র শব্দ বলতে লাগলেন, বাড়ির লোকেরা ভয় পেয়ে তাঁকে ঐ বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে এনে বাড়িতে শিক্ষক রেখে পড়ানোর ব্যবস্থা করলেন। এরপর নরেন দ্রুত নিজের পড়াশোনায় এগিয়ে যেতে লাগলেন। যখন অন্য ছেলেরা বর্ণমালা কি চিনতে পারে নি, ততদিনে তিনি লিখতে পড়তে শিখে গেছেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। স্কুলে যখন তাঁর শিক্ষক বই থেকে পড়ে যেতেন, আর সেটা শুনেই তার পড়া হয়ে যেত।মাত্র সাত বছর বয়সেই সংস্কৃত ব্যকরণ বই 'মুগ্ধবোধ', এবং রামায়ণ ও মহাভারতের অনেকটা করে অংশ তাঁর মুখস্থ হয়েগিয়েছিল।

মেট্রোপলিটান ইন্‌স্‌টিটিউশনে ভর্তি

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে, সাত বছর বয়সে, নরেন ভর্তি হলেন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠা করা মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন। সেখানে তাঁর শিক্ষকেরা সহজেই তার প্রখর বুদ্ধির আন্দাজ

পেলেন। জানা যায়, নরেন এত দুরন্ত ছিলেন যে তিনি বেশিরভাগ সময়েই তাঁকে তার ডেস্কে দেখতে পাওয়া যেত না। তিনি কোনভাবেই কোন খারাপ কাজ করতেন না। তার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল সত্যি কথা বলা। সারাদিন সে খেলাধুলো - হই-হুল্লোড়ে সময় কাটালেও,রাতের দিকে তিনি প্রায় ধ্যান করতেন। নরেন যত বড় হতে লাগলেন, তাঁর প্রকৃতিতে তত পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। তিনি নিয়মিত নানারকমের বই এবং খবরের কাগজ পড়তে শুরু করেন, আর নানারকমের আলোচনা সভায় যেতে শুরু করলেন। ফিরে এসে সে তার বন্ধুদের সাথে সেইসব বিষয়ে নিজের মত করে আলোচনা করতেন। তাঁর তর্ক-বিতর্ক করার ক্ষমতা দেখে তাঁর বন্ধুরা অবাক হয়ে যেত।

১৮৭৭ সালে বাড়ির সকলের সঙ্গে রায়পুরে গমন

১৮৭৭ সালে, নরেন যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়তেন, তাঁর বাবাকে কাজের জন্য মধ্য প্রদেশের রায়পুরে যেতে হয়। তখন পরিবারে সকলের সাথে নরেনকেও রায়পুর যেতে হয়। রায়পুরে কোন স্কুল ছিলনা। এর ফলে নরেন তাঁর বাবার সাথে অনেক বেশি করে সময় কাটাতেন। বাবার সাথে নরেনের নানা বিষয়ে আলোচনা হত। নরেনের বাবা মনে করতেন শিক্ষা মানে শুধু মাত্র অনেক তথ্য মাথায় রাখা নয়, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল স্বাধীন এবং উদার ভাবনাচিন্তা করতে শেখা। বিশ্বনাথ দত্তের সাথে অনেক পন্ডিত ব্যক্তি দেখা করতে আসতেন সেখানে। নরেন তাঁদের আলোচনা বসে শুনতেন, মাঝে মাঝে আলোচনায় যোগও দিতেন। এই সময়ে তিনি চাইতেন বড়রা সবাই তাঁর বিচার-বুদ্ধিকে যথেষ্ট সম্মান করুক। কেউ যদি তাঁর ভাবনা-চিন্তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দিতেন, তাহলে তিনি খুব রেগে যেতেন, আর সবার সামনে সেটা প্রকাশও করে ফেলতেন। যদিও তাঁর বাবা সেটা সবসময় পছন্দ করতেন না, কিন্তু ছেলের ঐ ধরনের আত্মসম্মান বোধ দেখে মনে মনে গর্ব অনুভব করতেন। সেই সময় থেকে নরেন্দ্রনাথ তাঁর বাবার আদর্শ প্রাপ্ত হন।

১৮৭৯ সালে পিতা বিশ্বনাথ দত্ত কলকাতায় ফিরে এলেন। নরেনকে আবার আগের স্কুলে ভর্তি করা হয়। এরপর নরেন পড়াশোনায় ভীষণ মন দিলেন, তিন বছরের পড়া এক বছরের মধ্যে শেষ করলেন। এরপর কলেজে ভর্তির পরীক্ষায় খুব ভালভাবে পাশ করলেন তিনি।

প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াশুনা

এরপর নরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনিই ছিলেন সেই বছর ঐ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া একমাত্র ছাত্র। প্রেসিডেন্সীতে পড়াকালীন বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রচুর বই পড়তেন। তাঁর পিতার মত দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্য বিষয়ে বই পড়ার তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। এছাড়া বেদ, উপনিষদ্, ভাগবদগীতা, রামায়ণ,মহাভারত,পুরাণ প্রভৃতি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ তিনি নিয়মিত পাঠ করতেন।পাশ্চাত্য দার্শনিকদের রচনাবলি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ ও বাংলা সাহিত্য নিয়েও নিয়মিত চর্চা করতেন। জেনারেল অ্যাসেম্বলি'জ ইনস্টিটিউশনের প্রিন্সিপাল উইলিয়াম হেস্টি তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, "নরেন্দ্র সত্যিকারের মেধাবী। আমি বহু দেশ দেখেছি, কিন্তু তার মতো প্রতিভা ও সম্ভাবনাময় ছাত্র দেখিনি; এমনকি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় গুলির দর্শন ছাত্রদের মধ্যেও না।" আমরা অনেকেই জানি, নরেন্দ্রনাথ 'শ্রুতিধর' অর্থাৎ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোনো জিনিস একবার দেখলে পরে যে কোন সময় হুবহুব বলে দিতে পারতেন। তিনি উচ্চাঙ্গ ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তালিম নিতেন এবং নিয়মিত অনুশীলনও করতেন।

নরেন্দ্রনাথ যখন জেনারেল অ্যাসেম্বলি'জ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা) পড়তেন তিনি নিয়মিত পাশ্চাত্য ইতিহাস, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, অর্থবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে গভীরভাবে পড়াশুনা করতেন। ১৮৮১খ্রিষ্টাব্দে তিনি চারুকলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ঐ সময় নরেন্দ্রনাথ ডেভিড হিউম, জর্জ ডব্লিউ. এফ. হেগেল,

আর্থার সোফেনহায়ার, ওগুস্ত কোঁত, জন স্টুয়ার্ট মিল ও চার্লস ডারউইনের রচনাবলি পাঠ করতেন। হারবার্ট স্পেনসারের বিবর্তনবাদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন ঐ সময়। সেই সময় স্পেনসারের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত চিঠিপত্র বিনিময় হত। *(উৎস: উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ)*

৩-গুরু ও শিষ্যের সাক্ষাৎ ও সম্পর্ক- কিছু কাহিনী

গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে ও আশীর্বাদে বিবেকানন্দেই প্রথম বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় ও সুসম্পর্ক স্থাপন করে বিশ্বের দরবারে হিন্দুধর্মকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি প্রথম জীবনে অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে, তিনি একজন নাস্তিক অর্থাৎ নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের সত্তা বা পরলোকের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু যখন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে এলেন, তিনি পরম ঈশ্বরবাদী হয়ে গেলেন। সারা বিশ্বে ভারতের বেদান্ত দর্শনের প্রচার করে তিনি তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসী হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিত হলেন। তাঁর এই আত্মিক রূপান্তর একদিনে বা হঠাত হয়ে যায় নি। বহু ঘাত-প্রতিঘাত, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উত্থান-পতন, ঘটনা ও বিচারের পর তিনি তাঁর আদর্শ পরিবর্তন করেন এবং তিনি নরেন্দ্রনাথ থেকে বেদান্তবাদী চিন্তানায়ক বিবেকানন্দে পরিণত হন।

৩-১) নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথের খৃস্টধর্মে পারম্ভিক বিশ্বাস;

১৮৮০সালে নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মনেতা, বক্তা ও বাঙালি হিন্দু সমাজের অন্যতম ধর্মসংস্কারক কেশবচন্দ্র সেনের নব বিধানের সদস্য হয়েছিলেন। তিনি কুড়ি বছর বয়সে কেশবচন্দ্র সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হন। নরেন্দ্রনাথ ঐ সময় প্রাশ্চাত্যের খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এসোটিরিসিজমের অর্থাৎ রহস্যবাদ সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেছিলেন। এইভাবে তাঁর প্রারম্ভিক ধর্মবিশ্বাস ব্রাহ্ম ধারণার আদলে গড়ে উঠেছিল।এই সময় তিনি নিরাকার

ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন এবং পৌত্তলিকতার ঘোর সমালোচক ছিলেন। সত্যানুসন্ধানী নরেন্দ্রনাথ ঐ সময় ব্রাহ্মনেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" তাঁর ঐ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন, "তোমার চোখদুটি যোগীর ন্যায়। প্রতিদিন তোমার ধ্যান করা উচিৎ"। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এইরূপ উত্তরে ভীষণ তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। সত্যকে জানার ইচ্ছা তাঁর অনেক বেড়ে গেল। এরপর তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে একই প্রশ্ন তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন বহু শিক্ষিত ব্যক্তিকে করেন। কিন্তু সকলের একটাই উত্তর ছিল- "না"। এরপর ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সত্যকে জানার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। হঠাৎ অধ্যাপক উইলিয়াম হেস্টির কথা তাঁর মনে পড়ল। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের পর ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তাঁর প্রশ্নের যথাযত উত্তর পেলেন এরপর তিনি খ্রিস্টান ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত হলেন। একদিন সাহিত্যের ক্লাসে William Wordsworth এর 'The Excursion' কবিতাটি পড়ানোর সময় অধ্যাপক উইলিয়াম হেস্টি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা উল্লেখ করেন। ঐ কবিতাটির মধ্যে উল্লিখিত 'trance' (ট্র্যান্স্) কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উইলিয়াম হেস্টি ছাত্রদেরকে বলেন, 'trance' অর্থ 'সমাধি অবস্থা' অথবা 'সম্মোহ অবস্থা'। কিন্তু বিষয়টির সত্যিকারের অর্থ বুঝতে হলে ছাত্রদের উচিত দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে দেখা। এই কথা শুনে নরেন্দ্রনাথ আরও কয়েকজন ছাত্র দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। (Swami Vivekananda পি ২০-২১)

৩-২) প্রথম অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরু বলে স্বীকার না করা

প্রথমদিকে নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে গুরু বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এমনকি তাঁর চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশও করেন। তাঁর প্রধান দুটি কারন হল –১) তিনি কুড়ি বছর

বয়সে কেশবচন্দ্র সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ছিলেন। ২) নরেন্দ্রনাথ ঐ সময় প্রাশ্চাত্যের খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। জেনেরাল অ্যাসেম্বলি'জ ইনস্টিটিউশনে (অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা) পড়ার সময় নরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা,ইউরোপীয় ইতিহাস অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি ডেভিড হিউম, জর্জ ডব্লিউ. এফ. হেগেল, আর্থার সোফেনহায়ার, ওগুস্ত কোঁত, জন স্টুয়ার্ট মিল ও চার্লস ডারউইনের মত বহু বিখাত্য পাশ্চাত্য দার্শনিকদের দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেতেন সেই সময়। হারবার্ট স্পেনসারের বিবর্তনবাদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। (Swami Vivekananda পি-১৯) সেই সময়ে স্পেনসারের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের আদান প্রদান হত। স্পেনসারের এডুকেশন বইটি তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। উল্লেখ্য, হারবার্ট স্পেন্সার (1820 - 1903) হলেন একজন ইংরেজী দার্শনিক, জীববিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ (anthropologist), এবং সমাজবিজ্ঞানী। সামাজিক ডারউইনবাদ (বিবর্তনবাদ) সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। এই ধরনের পাশ্চাত্য দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা, ইউরোপীয় ইতিহাস নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। এই দুই কারণের জন্যে প্রথমদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবস্থা ও দেবদেবীর সাক্ষাত দর্শনকে 'কাল্পনিক সৃষ্টি' বলে মনে করতেন নরেন্দ্রনাথ। ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হওয়ায় নরেন্দ্রনাথ সেই সময় মূর্তিপুজো,বহুদেবতাবাদ এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কালীপুজো এই সকল বিষয়গুলিকে তিনি মোটেই সমর্থন করতেন না। এমনকি 'অদ্বৈত বেদান্ত' মতবাদকেও তিনি ঈশ্বরদ্রোহিতা ও পাগলামি বলে উপহাস করতেন। নরেন্দ্রনাথ বিভিন্নভাবে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে পরীক্ষা করেছিলেন তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করার আগে। বিভিন্ন ঘটনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্পর্কে তাঁর অভিমত পরিবর্তন করতে তিনি বাধ্য হন এবং হিন্দুধর্মে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। রামকৃষ্ণদেবও সব সময় শান্তভাবে তাঁর সব যুক্তি শুনে বলতেন, "সত্যকে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করবি। কিন্তু সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সত্যকে আর অস্বীকার করবি না।" নরেন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ব্যক্তিত্বের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং তাঁর সকল বানী ও উপদেশকে সত্য বলে স্বীকার করেন। এর ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশবানী শুনতে তিনি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যেতে শুরু করেন।

৩-৩) শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে মা-কালীর কাছে নরেন্দ্রনাথের অদ্ভুত প্রার্থনা;

১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথের পিতা হঠাৎ মারা যান। এরপর তাঁর পরিবার তীব্র অর্থকষ্টের মধ্যে পড়ে। ঋণদাতারা ঋণ আদায়ের জন্য তাঁদের বাড়িতে তাগাদা দিতে শুরু করে এবং আত্মীয়স্বজনরা তাঁদেরকে পৈতৃক বাসস্থান থেকে উৎখাত করার চেষ্টা শুরু করে। একদা সচ্ছল পরিবারের সন্তান নরেন্দ্রনাথ চরম সঙ্কটে পড়েন। তিনি কলেজের দরিদ্রতম ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হয়ে গেলেন। তিনি তখন হন্যে হয়ে একটা চাকরির জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাতে তিনি আদৌ সফল হলেন না। তিনি তখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠেন।নরেন্দ্রনাথ এইসময় একদিন রামকৃষ্ণদেবের কাছে অনুরোধ করেন, তিনি যেন তাঁর পরিবারের আর্থিক কষ্ট মোচনের জন্য মা কালীর কাছে প্রার্থনা করেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁকেই মন্দিরে গিয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে পরামর্শ দেন। রামকৃষ্ণদেবের পরামর্শ অনুসারে, নরেন্দ্রনাথ তিনবার মায়ের কাছে যান। কিন্তু জাগতিক প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনার পরিবর্তে তিনি মা কালীর কাছে তাঁর জ্ঞান, বিবেক ও বৈরাগ্যের জন্য প্রার্থনা করেন।এরপর নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বর-উপলব্ধির জন্য সংসার ত্যাগ করতে মনস্থ করেন এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে গুরু বলে স্বীকার করেন। (উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে সংগৃহীত)।

৩-৫) গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ শিক্ষক। অনেকে বলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের হাতে স্বামী বিবেকানন্দকে গড়ে তুলেছিলেন। স্বামীজী স্বয়ং এ কথা স্বীকারও করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এমন একজন মানুষ চেয়েছিলেন যিনি রূপে, গুনে, জ্ঞানে, ভক্তিতে,তত্ত্বে, বিদ্যায়, শিক্ষায়, অভিজ্ঞতায়, চরিত্রে অদ্বিতীয় পুরুষ হবেন। যিনি বুদ্ধের হৃদয়, শঙ্করের মেধা, যীশুর প্রেম ও সেবা ধর্মের অধিকারী হয়ে মানব কল্যাণে আত্মনিবেদন করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমনটি চেয়েছিলেন, তেমনটি পেলেন যখন বিবেকানন্দ তাঁর কাছে এসে পৌঁছালেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র। তাঁর জন্মের অনেক আগে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ জেনে ছিলেন তাঁর কল্পনার মানুষ অর্থাৎ বিবেকানন্দ তাঁর কাছে আসবে এবং সারা বিশ্বে বেদান্তের বানী প্রচার করবে এবং লোকশিক্ষায় ব্রতী হবে। তাই তাঁর সব শক্তি দিয়ে বিবেকানন্দকে নিজের মত গড়ে ছিলেন। স্বামীজী প্রায় বলতেন, "আমি যা হয়েছি তা তাঁরই (শ্রীরামকৃষ্ণর)কল্যানে হয়েছে। আমাতে, আমার কথাতে যা-কিছু মঙ্গলময়, সত্য বা শাশ্বত আছে, তা আমি তাঁরই শ্রীবদন, তাঁরই হৃদয়, তাঁরই আত্মা থেকে পেয়েছি। যদি আমি জগতের কোথাও সত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে একটি কথাও বলিয়া থাকি, তাহা হল আমার গুরুদেবের- আর ভুলভ্রান্তি গুলি আমার"। *(উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ -৮০পৃ)।* এহেন গুরুভক্তি এবং গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার অবিশ্বাস্য মনে হলেও, এটা সম্পূর্ণ সত্য। গুরু যেমন তাঁকে তাঁর সব কিছু- সমস্ত শক্তি ও জ্ঞান উজাড় করে দিয়েছিলেন, স্বামীজীও তেমনি গুরুর প্রতি সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিবেদন করেছিলেন।

স্বামীজীর জীবন দর্শনের একটি বড় দিক হল- যা সত্য তা গ্রহণ করা, যা ভুল – সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করা। এই ভাবাদর্শে তিনি – ধর্ম, কর্ম, শিক্ষা, গুরু- সব কিছুই বিচার করতেন। তাই গুরু যা বলতেন, তিনি পরখ করে নিতেন। তাঁর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় স্বামীজীর গাজীপুরের পাওহারী বাবার কাছে যাতায়াতের ঘটনা থেকে। তিনি স্থির করে ছিলেন পাওহারী বাবা যদি বড় হন, তাহলে তিনিই হবেন তাঁর গুরু। কিন্তু স্বামীজী যখন দেখলেন পাওহারী বাবা শ্রীরামকৃষ্ণের সাহায্যপ্রার্থী, তখন তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তিনি স্থির সিধান্তে এলেন যে তাঁর গুরু

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অতুলনীয়। তাঁর সিধান্তের কিছুই ভুল হয়না। (উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ -৭৯পৃ) তিনি তাঁর গুরুদেবের কাছে যে শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করছিলেন তার মূল মন্ত্র ছিল – *জীব-ই* ব্রহ্ম। *জীব* ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নয়। তাই তাঁর জীবে প্রেম হল শিবপ্রেম। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন যেখান থেকে বোঝা যাবে, কি ভাবে স্বামীজী তাঁর গুরুদেবের মানবসেবা ও জীবপ্রেমের মূল মন্ত্র লাভ করেছিলেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে বৈষ্ণবদের 'জীবে দয়া' সমন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণেদেব সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি যখন অর্ধবাহ্য দশায় এলেন, তিনি বললেন, "জীবে দয়া -জীবে দয়া? দূর শালা! কী্টানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করার তুই কে? না না জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" (উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ -৮০পৃ)

সমস্ত উচ্চ চিন্তা, ভাব, ভাবনা ও আদর্শ সবই স্বামীজী পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক ছিল এই রূপ; শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন ভাব, আর স্বামীজী ছিলেন ভাষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন আত্মা, আর স্বামীজী ছিলেন দেহ। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজী – এই দুজন মহাজীবনের একই সত্তা ছিল। তাঁদের দুজনকে আলাদা আলাদা সত্তা হিসাবে ভাবা যায় না। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ একবার স্বামীজীকে বলেছিলেন, "তুই আমি কি আলাদা? এটাও আমি, সেটাও আমি"। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলতেন, "আমি দেহহীন এক কণ্ঠস্বর" কিন্তু সব সময় মনে করতেন তাঁর এই কণ্ঠস্বর ছিল শ্রীরামকৃষ্ণেদেবর। শ্রীরামকৃষ্ণেদেব স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন লোকশিক্ষার ও মানুষের মধ্যে চৈতন্য জাগিয়ে তুলতে। এবং সেই জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল বিবেকানন্দ যন্ত্র। স্বামীজী অনেকবার বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন যন্ত্রী আর তিনি হলেন যন্ত্র। স্বামীজী স্বীকার করেছেন, তিনি যা কিছু বলেছেন বা যা কিছু করেছেন, তা তাঁর নিজস্ব নয়, সবই শ্রীরামকৃষ্ণের দেওয়া। নরেনের প্রথম দেখার কিছুপরে একবার ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলেছিলেন, "নরেন লোক শিক্ষা দিবে"। এই কথা শুনে নরেন্দ্র বলেছিলেন

"আমি ওসব পারব না"। তখন ঠাকুর উত্তর দিলেন, "তুই পারবি না, তোর ঘাড় পারবে"। তাঁর পরবর্তী জীবন প্রমান দেয় কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সব শক্তি নরেনকে উজাড় করে দিয়ে নিজের মত করে গড়ে তুলেছিলেন স্বামীজীকে। গুরুভক্তির উচ্ছাসে এবং সত্যকে স্বীকার করে স্বামীজী প্রায় বলতেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয়, প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নেই। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনই তৈরী হতে পারে। তবে তিনি তা না করে ঈচ্ছা করে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র করে এরূপ করাচ্ছেন "। গুরু-শিষ্য এরূপ মহামিলন শুধু বিরল নয়, অকল্পনীয়ও বটে। তাঁদের এই মিলন যেন স্বর্গ ও মর্তের সেতুসংযোগ। কথিত আছে, তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে তাঁর ঘরে ডাকলেন। বিবেকানন্দ তাঁর আদেশ মত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে দাঁড়ালেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এরপর কোন কিছু কথা না বলে বিবেকানন্দের দিকে এক দৃষ্টে তাকাতে তাকাতে ধ্যানমগ্ন হয়ে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। স্বামীজী ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাহ্যজ্ঞান ফিরলে স্বামীজী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন তিনি ডেকেছিলেন।উত্তরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "আজ তোকে আমার যথাসর্বস্ব দিয়ে আমি ফকির হয়েছি। এই শক্তির সাহায্যে তুই জগতের অশেষ কল্যাণ করতে পারবি। কাজ শেষ হলে আবার তুই স্বস্থানে ফিরে যাবি।"

৩-৬) শ্রীরামকৃষ্ণদেব আহ্বানে বিবেকানন্দের আবির্ভাব;

বিবেকানন্দের জন্মের অনেক আগে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব জানতেন যে তাঁর কাছে এই অতিমানব আসবেন তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। 'Vedanta- Voice of Freedom' এই বইটিতে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ রয়েছে রামকৃষ্ণদেব কি ভাবে সমাধি অবস্থায় দেখেছিলেন যে এক মহান ঋষি (বিবেকানন্দ) ধরাধামে খুব শীঘ্র অবতীর্ণ হবেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। ওই বইটিতে উল্লেখ রয়েছে "শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন সমাধি অবস্থায় দেখতে পেলেন সাতজন ঋষি গভীর সমাধিতে বসে রয়েছেন। তাঁদের দেখে

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনে হল যে ঐ ঋষিগন জ্ঞান ও পবিত্রতায় দেবতাকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন। ঐ সাতজন ঋষির মধ্যে এক ঋষির যখন ধ্যান ভঙ্গ হল, এক শিশু এসে তাঁকে বলল, আমি পৃথিবীতে যাচ্ছি, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন না? সৌম্য দৃষ্টিতে প্রসন্ন হয়ে মৌন সম্মতি জানিয়ে, তিনি আবার সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। এর অনেকপরে নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) যখন দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবর সঙ্গে দেখা করলেন, দেখামাত্র রামকৃষ্ণদেব তাঁকে চিনতে পারলেন। নরেন্দ্র আর কেউ নয়, তিনি হলেন সেই ঋষি যাকে তিনি সমাধিস্থ অবস্থায় দেখেছিলেন এবং কিছু কথাও বলেছিলেন। পরবর্তী সময়, বহু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা জানতে পারে ঐ শিশু যিনি সমাধিস্থ ঋষির সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তিনি আর কেউ নয় – তিনি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর একবার তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে এক অদ্ভুত আলোর ঝলক ধারা আকাশে বারানসি হতে কলকাতায় পৌঁছাতে লক্ষ্য করেছিলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধীর ও উদ্দীপিত হয়ে বলে উঠেছিলেন, "আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে; আমার আকাঙ্ক্ষিত মানুষটি একদিন অবশ্যই আসবে।" এই কথাগুলি তিনি বলেছিলেন বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে তাঁর পৃথিবীতে আবির্ভাবের প্রাক্কালে। ['Vedanta- Voice of Freedom' পৃ-30]

৪- পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে বরাহনগরের রামকৃষ্ণমঠ ত্যাগ করে বিবেকানন্দ পরিব্রাজকরূপে হিন্দু সন্ন্যাসীর ধর্মীয় জীবন শুরু করেন। 'পরিব্রাজক' জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গী ছিল শুধু একটি কমণ্ডলু, একটি লাঠি এবং তার প্রিয় দুটি ধর্ম গ্রন্থ ভাগবদ্গীতা ও ইশানুসরণ। তিনি পাঁচ বছর ধরে সারা ভারত পায়ে হেঁটে সর্বত্র ভ্রমণ করেন। ঐ সময় তিনি অনেক শিক্ষাকেন্দ্র দর্শন করেন এবং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সুপরিচিত হন।যাত্রার সময় বিবেকানন্দ যেমন রাজার প্রাসাদে থাকতেন তেমনি দরিদ্রদের কুঁড়েঘরেও থাকতেন। তিনি ঐ সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে

এসেছিলেন এবং সমাজে ভারসাম্যহীনতা এবং জাতি ও ধর্মের নামে অত্যাচার লক্ষ্য করেচিলেন। দেশবাসীর দুরবস্থা ও শোষণ দেখে তিনি জাতীয় পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতেন এবং মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি তাঁর ভীষণ সহানুভূতি ছিল।তখনই তিনি জাতির উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। ভারত ভ্রমণের সময় তাঁকে 'নরেন্দ্রনাথ' থেকে 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাম নিতে হয় রাজা ক্ষেত্রীর অনুরোধে। কখনো-সখনো তার গুণমুগ্ধেরা তাকে ট্রেনের টিকিট কিনে দিতেন। ভারত পর্যটনের সময় তিনি যেমন হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সব ধর্মের সাধারন মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, তেমনি বিভিন্ন পণ্ডিত, রাজা, এবং সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গেও মেলামেশা করতেন। পণ্ডিত, রাজা, এবং সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে মেলামেশা করার তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল এই যে পণ্ডিত, রাজা, এবং সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে কিছুটা অনুপ্রাণিত করতে পারলে তারা সাধারণ মানুষ ও সমাজের নিম্ন ও অবহেলিত মানুষদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার বিশেষ ব্যবস্থা নেবে।

৪-১) ১৮৮৮ সালে উত্তর ভারত ভ্রমণ;

১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বারাণসী থেকে তার যাত্রা শুরু করেন। বারাণসীতে তার সঙ্গে সাক্ষাত হয় বিশিষ্ট বাঙালি লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ত্রৈলঙ্গস্বামীর। এইখানেই বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত প্রেমদাস মিত্রের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে, যাঁর সঙ্গে পরবর্তীকালে একাধিক পত্রালাপে তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।বারাণসীর পর তিনি অযোধ্যা, লখনউ, আগ্রা, বৃন্দাবন, হথরাস ও হৃষিকেশে যাত্রা করেন। হথরাসে তার সঙ্গে স্টেশন মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্তের সাক্ষাত হয়, যিনি পরে বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সদানন্দ নামে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন বিবেকানন্দের প্রথম শিষ্য। ১৮৮৮-৯০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি বৈদ্যনাথ ও এলাহাবাদ ভ্রমণ করেন। এলাহাবাদ থেকে

গাজিপুরে গিয়ে তিনি পওহারী বাবার দর্শন করেন। পওহারী বাবা ছিলেন এক অদ্বৈতবাদী সন্ত, যিনি অধিকাংশ সময়েই ধ্যানমগ্ন থাকতেন। ১৮৮৮-৯০ সময়কালে ভগ্নস্বাস্থ্য এবং বরাহনগর মঠের দুই আর্থিক সাহায্যদাতা বলরাম বসু ও সুরেশচন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর পর মঠের আর্থিক ব্যবস্থার সুরাহাকল্পে তিনি কয়েকবার বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

৪-২) ১৮৯০ সালে হিমালয় ভ্রমণ

১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে তিনি পুনরায় পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে দেশভ্রমণে বের হয়েছিলেন। নৈনিতাল, আলমোড়া, শ্রীনগর, দেরাদুন, ঋষিকেশ, হরিদ্বার এবং হিমালয় ভ্রমণ করেন। কথিত আছে,ঐ সময় এক দিব্যদর্শনে তিনি বহির্জগৎ ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন।পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যে তাঁর প্রদত্ত জ্ঞানযোগ বক্তৃতামালায় তিনি ঐ বহির্জগৎ ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা দিয়েছিলেন। ঐ **হিমালয়** ভ্রমণের সময় তাঁর অন্যান্য গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। ঐ সময় মীরাটে তাঁরা একসঙ্গে ধ্যান, যোগ, প্রার্থনা ও শাস্ত্রপাঠে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাবদের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে অন্যান্য গুরুভাইদের ছেড়ে তিনি একাকী দিল্লির পথে অগ্রসর হন।

৪-৩) রাজপুতানা পরিদর্শন, মহারাজ অজিত সিং এর পৃষ্ঠপোষকতা ও বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ;

দিল্লির ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখার পর তিনি চলে যান রাজপুতানার ঐতিহাসিক রাজ্য আলোয়ারে। পরে তিনি যান জয়পুরে। সেখানে এক সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে পাণিণির 'অষ্টাধ্যায়ী' অধ্যয়ন করেন (প্রাচীন ভারতে লৌহযুগের সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলীর স্রষ্টা। 'অষ্টাধ্যায়ী' ছিল পাণিণির উল্লেখযোগ্য রচনাবলী। তারপর তিনি গিয়েছিলেন আজমীর। সেখানকার

বিখ্যাত দরগা ও আকবরের প্রাসাদ দেখে তিনি চলে যান মাউন্ট আবুতে। মাউন্ট আবুতে ক্ষেত্রীর মহারাজা অজিত সিং বাহাদুরসঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। তাঁর আমন্ত্রণে বিবেকানন্দ ক্ষেত্রীতে এসেছিলেন। সেখানে রাজার সঙ্গে তাঁর নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। পরে মহারাজা অজিত সিংহ বিবেকানন্দের শিকাগো যাত্রার সব চেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জানা যায়, মহারাজা অজিত সিংহ স্বামী বিবেকানন্দকে রাজস্থানের ধূলিঝড় থেকে রক্ষা করার জন্য পাগড়ি পরতে বলেন। মহারাজা একটি জাফরান পোশাকও প্রদান করেছিলে; যা স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হয়ে ওঠে। মহারাজা অজিত সিং এবং স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে 1891, 1893 এবং 1897 এই তিন সালে তিনবার দেখা হয়েছিল। এর ফলে তাঁদের মধ্যে অটুট বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। 1893 সালে আমেরিকা যাওয়ার আগে বন্ধু মহারাজা অজিত সিং বাহাদুর তাকে 'বিবেকানন্দ' নাম দিয়েছিলেন। ১৮৯৫ সালের 4 মার্চ তারিখের একটি চিঠিতে সিং স্বামী বিবেকানন্দকে তার শিকাগো ভাষণের জন্য অভিনন্দন জানান এবং ঐ বিশ্ব মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সমগ্র রাজ্যের পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দকে একটি আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় সমাবেশ ধন্যবাদ জানান। মহারাজা ঐ চিঠিতে লিখেছিলেনঃ "As the head of this Durbar (a formal stately assemblage) held today for this special purpose, I have much pleasure in conveying to you, in my own name and that of my subjects, the heartfelt thanks of this State for your worthy representation of Hinduism at the Parliament of Religions, held at Chicago, in America.....The influence of your speech and behaviour in foreign lands has not only spread admiration among men of different countries and different religions but has also served to familiarise you with them, to help in the furtherance of your unselfish cause,"

1898 সালের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের মধ্যে, বিবেকানন্দ সিংয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তিনটি চিঠি লিখেছিলেন। ঐ

সময় বড় ধরনের অসুস্থতার কারণে স্বামীজীর স্বাস্থ্যও ভীষণ খারপ হয়েগিয়েছিল। স্বামীজীর কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল। তাই তিনি তখন তাঁর বন্ধু, মহারাজা অজিত সিংকে লিখলেন; "যদিও আমেরিকান বন্ধুরা আমাকে সাহায্য করার জন্য সব কিছুই করছে,তবুও আমি তাদের কাছে সব সময় ভিক্ষা করতে লজ্জা বোধ করি। ......পৃথিবীতে একজনের কাছে ভিক্ষা করতে আমার লজ্জা নেই এবং সে হল আপনি।" এই চিঠি পাওয়া মাত্র মহারাজা সিং তাঁর গুরু ও বন্ধু, স্বামীজীকে ৫০০টাকা মানি অর্ডার করে

৪-৪) ১৮৯২ সালে পশ্চিম ভারত ভ্রমণ

পশ্চিম ভারতের যাত্রাপথে তিনি ভ্রমণ করেন আহমেদাবাদ, ওয়াধওন ও লিম্বদি। আহমেদাবাদে তিনি ইসলামি ও জৈন সংস্কৃতির পাঠ সমাপ্ত করেন। লিম্বদিতে ঠাকুর সাহেব জসওয়ান্ত সিংহের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়, যিনি নিজে আমেরিকা ও ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেছিলেন। ঠাকুর সাহেবের কাছ থেকেই বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারে যাওয়ার ধারণাটি পেয়ে থাকেন। এরপর তিনি চলে যান কচ্ছ, জুনাগড়, গিরনার, পোরবন্দর, দ্বারকা, পালিতানা ও বরোদা । পোরবন্দরে সন্ন্যাসজীবনের নিয়ম ভেঙে তিনি নয় মাস অবস্থান করেন পণ্ডিতদের থেকে দর্শন ও সংস্কৃত গ্রন্থাবলি অধ্যয়নের জন্য। এই সময় সভাপণ্ডিতের সঙ্গে একযোগে বেদ অনুবাদের কাজও করেন।

এরপর তিনি ভ্রমণ করেন মহাবালেশ্বর এবং পুনা। পুণা থেকে ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাস নাগাদ তিনি খান্ডোয়া ও ইন্দোর ভ্রমণ করেন। কাথিয়াওয়াড়ে তিনি বিশ্বধর্ম মহাসভার কথা জানতে পারেন।তখন তাঁর অনুগামীরা তাঁকে সেই বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদানের জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন।খান্ডোয়া থেকে তিনি বোম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১৮৯২ সালের জুলাই মাসে তিনি বোম্বাই পৌঁছান। পুণার পথে ট্রেনে বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়। পুণায় কিছুদিন বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে অবস্থান করার পর ১৮৯২ সালের অক্টোবর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ বেলগাঁও যাত্রা করেন। বেলগাঁওতে তিনি অধ্যাপক জি এস ভাটি ও

সাব-ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার প্রবাসী বাঙালি হরিপদ মিত্রের আতিথ্য গ্রহণ করেন। বেলগাঁও থেকে তিনি যান গোয়ার পাঞ্জিম ও মারগাঁওয়ে। গোয়ার প্রাচীনতম ধর্মতত্ত্ব কনভেন্ট-কলেজ রাচোল সেমিনারিতে তিন দিন অবস্থান করেন। মারগাঁও থেকে বিবেকানন্দ রেলপথে যাত্রা করেন ধারওয়াড়ের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে আসেন মহীশূর রাজ্যের ব্যাঙ্গালোরে।

৪-৫) দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ

বেঙ্গালুরুতে স্বামীজি মাহীশুরের দেওয়ান স্যার কে শেষাদ্রি আইয়ারের সঙ্গে পরিচিত হন এবং পরে তিনি মহীশূরের মহারাজা শ্রী রামনাদ রাজেন্দ্র ওয়াদিয়ারের অতিথি হিসেবে রাজপ্রাসাদে অবস্থান করেন। বিবরণ অনুসারে স্যার শেষাদ্রী স্বামীজির পান্ডিত্য বিষয়ে মন্তব্য করেন, "এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং ঐশ্বরিক শক্তি যা তার দেশের ইতিহাসে তাদের চিহ্ন রেখে যেতে নিয়তি নির্ধারিত ছিল।" মহারাজা স্বামীজিকে কোচিনের দেওয়ানের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে একটি পত্র এবং একটি রেলওয়ে টিকিট দেন। বেঙ্গালুরু থেকে তিনি ভ্রমণ করেন ত্রিচুড়, কোদুনগ্যালোর, এর্নাকুলাম। তিনি এর্নাকুলামে ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরের প্রথমভাগে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি নারায়ণ গুরুর দেখা পান। (না***রায়ণ গুরু*** *(1856- --1928) হলেন ভারতের একজন দার্শনিক, আধ্যাত্মিক নেতা এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সামাজিক সাম্যকে উন্নীত করার জন্য কেরালায় জাত-পাতহীন সমাজে অবিচারের বিরুদ্ধে একটি সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কথা যা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল- "এক জাতি, এক ধর্ম, এবং সমস্ত মানুষের জন্য এক ঈশ্বর"।)*

এর্নাকুলাম থেকে তিনি ভ্রমণ করেন ত্রিবান্দ্রম, নাগেরকৈল এবং ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের বড়োদিনের প্রাক্কালে পায়ে হেঁটে কন্যাকুমারী পৌঁছান। লিখিত তথ্য অনুসারে ভারতের শেষ প্রান্তে অবস্থিত "কন্যাকুমারী রকে' স্বামীজি তিন দিন ধরে ধ্যান করেন যা পরে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।

কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ "এক নূতন ভারতের স্বপ্ন" দেখেন, যাকে সচরাচর বলা হয়ে থাকে "১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের কন্যাকুমারী সঙ্কল্প"। তিনি লিখেছিলেন, "ক্যামোরিন অন্তরীপে মা কুমারীর মন্দিরে বসে ভারতীয় পাহাড়ের শেষ প্রান্তে বসে - আমি এক পরিকল্পনা করি: আমরা এতগুলো সন্ন্যাসী ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং মানুষকে অধিবিদ্যা/দর্শনশাস্ত্র শেখাচ্ছি - এ সব কিছুই পাগলামি। আমাদের গুরুদেব কী বলতেন, 'খালি পেট ধর্মের জন্য ভালো নয়?' জাতি হিসেবে আমরা আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারিয়েছি এবং এটাই ভারতের সকল অনিষ্টের কারণ। আমাদের জনসাধারণকে জাগাতে হবে।"

কন্যাকুমারী থেকে তিনি চলে যান মাদুরাই। সেখানে রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সঙ্গে দেখা করেন তিনি। রাজা স্বামীজির শিষ্য হন এবং স্বামীজীকে শিকাগোতে ধর্ম সম্মেলনে যোগদান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। মাদুরাই থেকে তিনি যান পণ্ডিচেরির রামেশ্বরম। সেখান থেকে যান মাদ্রাজ এবং এখানে তিনি তার সবচেয়ে অনুগত শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন যারা স্বামীজির আমেরিকা ভ্রমণের এবং পরে মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার তহবিল সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেচিলেন। তার মাদ্রাজের শিষ্যদের এবং মহীশূর, রামনাদ, খেতরির রাজাদের, দেওয়ান এবং অন্যান্য অনুগামীদের সংগৃহীত অর্থের সাহায্য নিয়ে এবং খেতরির মহারাজার দেওয়া 'বিবেকানন্দ' নাম ধারণ করে তিনি ১৮৯৩ সালের ৩১সে মে বোম্বে থেকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন শিকাগোতে মহাবিশ্ব ধর্ম সভায় যোগদানের জন্য। আগেই বলেছি 1893 সালেই খেত্রি রাজ্যের মহারাজা অজিত সিংয়ের অনুরোধের পরে তিনি 'বিবেকানন্দ' নামটি গ্রহণ করেছিলেন।, মহারাজা অজিত সিংহের পরামর্শ অনুসারে দুটি সংস্কৃত শব্দ 'বিবেক' এবং 'আনন্দ' থেকে 'বিবেকানন্দ' যার অর্থ হল "বিচক্ষণ জ্ঞানের আনন্দ"। এর আগে বিবেকানন্দ কখন 'বিভীষানন্দ' কখন সচিদানন্দ' নামে তিনি ভারত ভ্রমণ করতেন। তিনি 'নরেন্দ্রনাথ' নামটি গোপন করতেন

যাতে তাঁর গুরু ভাইয়েরা জানতে না পারে তিনি কোথায় কখন যাচ্ছেন। স্বামীজী পরিব্রাজকের ভূমিকায় সমগ্র ভারত ভ্রমণ করে তিনি হিন্দুধর্মের প্রতি সকলের মধ্যে বিশাল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেইসঙ্গে হিন্দুধর্মের সংস্কারের উদ্দেশে সর্বজনীন ধর্ম বেদান্ত প্রচার করে এক বিশাল হিন্দুধর্ম আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। উল্লেখ্য, স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম প্রচারের পূর্বে, হিন্দুধর্মের যতগুলি আন্দোলন হয়েছিল সেগুলি সব স্থানীয় বা বিশেষ সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উদাহরণ-স্বরূপ, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, দেবসমাজ- এদের প্রত্যেকটি নিজস্বভাবে ও প্রাদেশিকক্ষেত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও, ঐ সকল ধর্মীয় আন্দোলনগুলির কোনোটাই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। সেটা পেরেছিল একমাত্র বিবেকানন্দের বিশ্বধর্ম তথা বেদান্তের প্রচারের ফলে। যেটা এর অনেক আগে দ্বাদশ শতাব্দীতে আদি শঙ্করাচার্য প্রথম করেছিলেন। এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে সারা ভারত যখন বিভিন্ন ভয়ংকর সঙ্কটের মধ্যে আসীন, সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের প্রচার করে হিন্দুধর্ম আন্দোলনে প্রথম জাতীয়তাবোধ এনেছিলেন।

৪-৬) পাশ্চাত্য ভ্রমণ

১৮৯৩ সালে তিনি প্রথমবার পাশ্চাত্য ভ্রমণ করেন। চিন, কানাডা হয়ে তিনি আমেরিকায় পৌঁছান শিকাগোতে মহাবিশ্ব ধর্ম সভায় যোগদানের জন্য। এরপর ১৮৯৯ সালে তিনি দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণ করেন ভারতের ধর্ম তথা বেদান্ত দর্শন প্রচার করার জন্য। ১৮৯৩-১৮৯৭ এবং ১৮৯৯ -১৯০২ সালের এর মধ্যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ সময়কালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বেদান্ত কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য, ১৮৯৩সালে তিনি শিকাগোতে মহাবিশ্ব ধর্ম সভায় যোগদানের করে তাঁর হিন্দুধর্মের উপর অসাধারণ বক্তৃতা দিয়ে বিশ্বধর্ম ও বিশ্বসংস্কৃতির মানদন্ডে হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ স্থান

নির্ধারণ করে দিইয়েছিলেন এবং সমগ্র জাতীকে গৌরবান্বিত করে ছিলেন। এই বিষয়ে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৫; স্বামী বিবেকানন্দের জীবন দর্শন

৫-১) স্বকীয় জীবন দর্শনের ভিত্তি;

স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে এমনি একজন মহামনস্বী ব্যক্তিত্ব যাঁর অভিনব ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রসূত স্বকীয় দর্শন এখনও দেশেবিদেশের অগণিত মানুষকে প্রভাবিত করে চলেছে। তাঁর দর্শন আমাদেরকে শ্রেয় থেকে শ্রেষ্ঠ জীবন ধারায় পরিচালিত করে চলেছে। তাঁর স্বকীয় দর্শনের ভিত্তি কি? তাঁর স্বকীয়তাই বা কোথায়? বর্তমান যুগে তার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে- এ সবকিছুই আমাদের বিশেষভাবে আলোচনা করার দরকার কারণ তা না হলে তাঁর জীবনদর্শনের প্রকৃত মুল্য বা তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারব না। প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করতে করতে তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হয়েছে। তাঁর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, সংকট ও প্রতিকূল অবস্থা সমুদ্রের ন্যায় যেমন অতলস্পর্শী ছিল, প্রচণ্ড সংগ্রামের পর তাঁর প্রতিষ্ঠা লাভও ছিল তেমনি গগনচুম্বী।

৫-২) জগৎ-কেন্দ্রিক ও মানব-কেন্দ্রিক জীবন দর্শন;

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন বিশেষত জগৎ-কেন্দ্রিক এবং মুখ্যতঃ মানব-কেন্দ্রিক। স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে সর্বদা উপনিষদের দৃষ্টিতে দেখতেন। মানুষের যে-কোন সমস্যা তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে তার সমাধানের চেষ্টা করতেন। নিরক্ষর, নিপীড়িত, নির্যাতিত, দলিত, উৎপীড়িত, অপমানিত বা ধর্মপ্রান মানুষ – যে কোন অবস্থা বা ক্ষেত্রের মানুষ হল তাঁর দৃষ্টিতে মানুষের মুখোশপরা নারায়ণ। তাঁর জীবনদর্শনের মূলাধার ছিল মানবিকতা। কিন্তু তাঁর জীবনদর্শনের মানবিকতা বহু প্রখ্যাত মনীষীর উপস্থাপিত মানবিকতা থেকে অনেকটা আলাদা – যেটা তাঁর কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের মধ্যদিয়ে প্রমানিত হয়। যেহেতু তিনি প্রতিটি মানুষকে উপনিষদের দৃষ্টিতে দেখতেন মানুষের মধ্যে

দেবত্বকে স্বীকার করা এবং শ্রদ্ধা করা তাঁর জীবনদর্শনের সবচেয়ে বড়দিক। তাই তিনি বলেছেন;

"বহুরূপে সম্মুখে তমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"

তাঁর জীবণদর্শনে সকল জীবই হল ব্রহ্মের অংশ। সবকিছুই ব্রহ্ম হতে সৃষ্টি হয়, আবার তাতেই সকলে প্রত্যাগমন বা প্রত্যাবর্তন করে।ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সকল প্রানিদেহে প্রত্যাগাত্মরূপে অবস্থানপূর্বক বিদ্যমান রয়েছেন। স্বামীজী বলেছেন- এই যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে বা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগে যে বিরাটের বিকাশ বা বিশ্বজগতের প্রকাশ- তাহা শুধু ধ্যানের বিষয় বা তত্ত্বের কথা নয়, জ্ঞান, ভক্তি, পুজা ও উপলব্ধির বিষয় হওয়া উচিৎ। তাই তিনি লিখেছিলেন;

“ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়

মন প্রান শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়”

তাঁর জীবন দর্শনে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম অবিচ্ছেদ্য বিষয় যা তাঁর উপরিউক্ত বানীমূর্তিতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে তিনি সর্বজীবকে চৈতন্যরূপী সাক্ষাৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশের কথা বলেছেন। *(উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ-১৩৬পৃ)*

উপনিষদের ভাষ্যে বিবেকানন্দ বলেছেন; ” আমি আত্মা, অন্য কিছু নয়। আমি ব্রহ্ম। আমি সৎ- চিৎ- আনন্দ সরূপ। আমি নিত্যমুক্ত প্রকৃতি। এভাবেই তিনি সহজ সরল ভাবে জীব-জগত-ব্রহ্মের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করে বেদান্তের মূল কথা দেশে ও বিদেশ প্রচার করেছেন। স্বামীজী বলতেন- মানুষের গভীরতম ও মহত্তম অনুভূতি অদ্বৈতের অভিমুখী। মানুষ যখন অনুভব করতে পারে যে, সে ব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন, তখন সে এক মহান অনুভূতি লাভ করে। সে তখন ঈশ্বর বা পরমাত্মার সঙ্গে ঐকতা উপলব্ধি করে।ঐ ঐকতার পরম অনুভুতি সকল মানুষের প্রতি প্রেম, প্রীতি ও করুণার ভাব অনেক বেশি করে জাগিয়ে তুলে।" তিনি বলেন,

"বেদান্ত আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে আমিই ব্রহ্ম। আমি অসীম, আমি অনন্ত, আমি অবিনশ্বর। আমি সর্বত্র বিরাজমান। আমাদের সকলকে এই অনুভূতি অর্জন করিতে হইবে। আমার যদি সেই অনুভূতি না আসে, আমি যদি নিজাকে অনন্ত বা অসীম বলে না অনুভব করতে পারি, আমাকে সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। যখন আমাতে সেই অসীমতার পূর্ণ হইবে, তখনই আমার পূর্ণতা প্রাপ্তিও ঘঠিবে। এটাই হল অদ্বৈতবাদ দর্শন।"

৫-৩) বিবেকানন্দ ও বেদান্ত দর্শন।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বেদান্ত দর্শনের প্রধান উদ্গাতা, ব্যাখ্যাকারী ও প্রচারক। বেদান্ত ও উপনিষদ হল স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি যখন সমগ্র ভারত ও পশ্চিমে এই দর্শন প্রচার করেছিলেন তখন তিনি যেন বেদান্ত জ্ঞান ও দর্শনের মধ্য দিয়েই শ্বাস গ্রহণ করে বেঁচে ছিলেন। 1893 সালে শিকাগোতে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দের যুগান্তকারী ভাষণ সারা বিশ্বকে বিস্মিত করেছিল এবং তাঁর সেই ভাষণ তাঁকে আধুনিক ভারতের মহান আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শন একজনকে উপাসনা গৃহের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করেন তার মনন ও চিন্তনে একটি অবিস্মরণীয় অন্তর্দৃষ্টি দান করে। যুগ যুগ ধরে যে ধর্মআচার্যেরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে আধ্যাত্মিকতার স্ব-আনুভূত উপলব্ধি বা দর্শন মানুষের কল্যাণে প্রকাশ ও প্রচার করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ হলেন তাদের মধ্যে এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র। বিশ্বের দরবারে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম পরিচয় ধর্ম-প্রচারক হিসাবে। আমরা জানি, অতীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব ধর্মের সার- জ্ঞান, ভক্তি, ও কর্ম যোগের উপদেশ বানী প্রচার করেছিলেন। এরপর এলেন যীশু যিনি মানবজাতীকে বলে গেলেন- আধ্যাত্মিক পরিত্রাণ এবং অনন্ত জীবনের সারকথা। তাঁর দর্শন শিক্ষার মধ্যে ছিল ন্যায়বিচার, নৈতিকতা, সকলকে ভালবাসা ও সেবা করার দর্শন, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, নিজের অন্যায় ও পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুতাপ করা এবং যারা অন্যায় করেছে তাদের ক্ষমা করা।

তাহলেই আসে মানব-জীবনে সকল দুঃখকষ্ট ও পুনঃজন্মের অবিরাম চক্র থেকে পরিত্রাণ। উল্লেখ্য, জীবনে দুঃখকষ্ট ও জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে নিস্তার লাভের জন্য গৌতম বুদ্ধের নির্দেশ হল - তিনটি সার্বজনীন সত্য; চারটি মহৎ সত্য। তারপর এলেন আদি শঙ্কর (৭৮৮– ৮২০ খ্রিস্টাব্দ)- একজন ভারতীয় দার্শনিক যিনি ভারতীয় দর্শনের অদ্বৈত বেদান্তের সুসংহত রূপ দেন। তাঁর শিক্ষার মূল কথা ছিল আত্ম ও ব্রহ্মের মিলন। উনিশ শতকের এই অতীন্দ্রিবাদী হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ হলেন বেদান্ত তথা উপনিষদের প্রধান উদ্গাতা ব্যাখ্যাকারী ও প্রচারক। তিনি হলেন প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসী যিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় বেদান্তের বাণী সাহস ও প্রত্যয়ের সাথে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন –ভারতের বেদান্ত দর্শন, বেদান্ত ধর্ম এবং বেদান্তের সার্বজনীনতা।

৫-৫) বিবেকানন্দের বেদান্তের শিক্ষা - নিষ্কাম কর্ম;

স্বামীজী লণ্ডনে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই নভেম্বর বেদান্তের কর্মযোগ ব্যাখ্যায় গীতার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন;

"Curiously enough the scene is laid on the battlefield where Krishna teaches the philosophy to Arjuna; and the doctrine which stands out luminously in every page of the Gita is intense activity, but in the midst of that, eternal calmness. And this idea is called the secret of work to attain which is the goal of the Vedanta." (London) — *Practical Vedanta*

এই বক্তৃতায় স্বামীজী কর্মের মধ্যে সন্ন্যাসীর ভাবের ('Calmness in the midst of activity') কথা উল্লেখ করেছেন। 'রাগ বিদ্বেষ, অহংকার, আসক্তি বিসর্জন দিয়ে তিনি সকলকে কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। স্বামীজী সর্বত্র অহংকার, আসক্তি 'রাগদ্বেষ, বিবর্জিত' হইয়া কর্ম করতেন। কেবলমাত্র তাঁর অসাধারণ তপস্যার গুণে এবং তাঁর অসামান্য ঈশ্বরানুভূতির বলে তিনি এইরুপ রাগ, বিদ্বেষ, অহংকার, আসক্তি বিসর্জন দিয়ে সর্বদা কাজ করতে পারতেন। তাঁর কর্মযোগ বিশ্ববিদিত। নিষ্কাম কর্ম এবং কর্মযোগ

বেদান্তের শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন;-" *আজকাল অনেকে নিষ্কাম কর্ম বলতে সেই কর্মকেই বোঝেন যাহাতে সুখ বা দুঃখ কোনটাই কর্মীর মন স্পর্শ করতে না পারে। কিন্তু শুধু সুখ বা দুঃখ স্পর্শ না করলেই কর্ম নিষ্কাম কর্ম হয় না। তাই যদি হতো অনেক ইতর প্রানীর কর্মও নিষ্কাম কর্ম বলে বিবেচিত হত। নিষ্কাম কর্মের অর্থ তাই যদি হত তবে কঠিনহৃদয় সম্পন্ন দুরাচারও নিষ্কাম কর্মী বলে বিবেচিত হত। সেক্ষেত্র দুষ্টলোকের হাতে নিষ্কাম কর্ম একটি শক্তি অস্ত্রে পরিণত হয়। তাহারা দুষ্কর্ম করতে থাকবে, কিন্তু মুখে বলবে, তাহারা নিষ্কাম কর্ম করছে।"*

'নিষ্কাম কর্ম' বোঝানর জন্য গীতার বানী প্রায় তুলে ধরে তিনি বলতেন, *" ভগবদ্গীতা কর্মযোগ এবং নিষ্কাম কর্ম সম্পর্কে শিক্ষা দেন। গীতার শিখা আনুসারে, যোগারূঢ় হইয়া আমাদেরকে কর্ম করতে হবে। এই যোগযুক্ত অবস্থায় কোন অহংবোধ বা আমিত্ব থাকবে না। আমিত্ব বোধ ত্যাগ করে যোগযুক্ত অবস্থায় কর্ম করিলে উহা অনন্তগুন সম্পন্ন এবং উৎকৃষ্টতর হইবে এবং প্রত্যেকেই নিজ জীবনে তা অনুভব করবে। যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্বতা অনুভব করেন এবং যোগযুক্ত হয়ে সকল কর্ম করেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখেন না – তখন সেটা হয় নিষ্কাম কর্ম যার দ্বারা শুধুই জগতের কল্যাণ হয়। ইহা হইতে কোন অমঙ্গল হয় না। যার এইরূপ কর্ম করে, তারা নিজের জন্য কখনো কিছুই করে না।"*

তিনি এই বিষয়ে কর্মের শুভাশুভ মিশ্রিত ফলের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন-" *এমন কোন কর্ম নাই, যাহাতে শুধু শুভ আছে কিন্তু কোন অশুভ নাই। উদাহরণ স্বরূপ দীপ জালিয়ে যখন আমরা গীতা পাঠ করি, কিছু পতঙ্গ দীপালোকে এসে পুড়ে মারা যায়; তাহলে কি আমরা গীতা পাঠ করবো না? এইরুপ বিচার করিলে কিছুই কাজ করা যাবে না। পৃথিবীতে এমন কোন কর্ম নেই যাতে শুধু শুভ আছে, কিন্তু কোন দোষ নাই। আমাদের কে সেই কর্ম করতে হবে যেখানে অধিক পরিমানে শুভ হইবে, অল্প পরিমাণ অশুভ হইবে। আমাদের যে কর্মের মধ্যে অহংকার থাকবে না, ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকবে না- তাহাই হবে নিষ্কাম কর্ম।"*

তিনি অর্থ ও মান, এ-সকলকে সন্ন্যাসীর ন্যায় কাকবিষ্ঠা জ্ঞান করতেন, অর্থাৎ নিজে কিছুই ভোগ করতেন না; কিন্তু তাহাদিগকে জীবসেবার্থে কিরূপে ব্যবহার করতে হয়, তাহা উপদেশ দিয়া ও নিজে কাজ করে দেখাইয়া গিয়াছেন। যে অর্থ বিলাত ও আমেরিকার বন্ধুবর্গের নিকট হতে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, সে সমস্ত অর্থ জীবের মঙ্গলকল্পে ব্যয় করে গিয়েছেন। স্থানে স্থানে, যথা বেলুড়ে, আলমোরার মায়াবতীতে, কাশীধামে ও মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানে মঠ স্থাপন করেছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে নানা স্থানে যথা, বৈদ্যনাথ, কিষেণগড়, দক্ষিণেশ্বর ও অন্যান্য বহু স্থানে নানা প্রকার সেবামূলক কর্ম করেছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য অনাথাশ্রম তৈরি করেছিলেন । রাজপুতনার অন্তর্গত কিষেণগড় নামক স্থানে অনাথাশ্রম স্থাপন করেছিলেন। মুর্শিদাবাদের সারগাছী গ্রামে তাঁর তৈরি অনাথাশ্রম এখনও চলছে। হরিদ্বারের কনখলে পীড়িত সাধুদিগের জন্য স্বামী সেবাশ্রম স্থাপন করেছিলেন। কলকাতায় প্লেগের সময় প্লেগব্যাধি-আক্রান্ত রোগীদিগকে অনেক অর্থব্যয় করে সেবা-শুশ্রূষা করার ব্যবস্থা করেছিলেন। দরিদ্র কাঙালদের দুঃখ-কষ্টে একাকী বসে অশ্রুপাত করতেন; আর বন্ধুদের সমক্ষে বলিতেন, "হায়! এদের এত কষ্ট, ঈশ্বরকে চিন্তা করার অবসর পর্যন্ত নাই। তাই তিনি বেদান্তের কর্মযোগের কথা শুধু প্রচার করে যান নি; সেই সঙ্গে তিনি যোগযুক্ত হয়ে অবিরাম নিষ্কাম কর্ম করে গেছেন। তিনি চাইলে অন্য এখন সাধু বা সংসারীদের মত নির্জনে কেবল ঈশ্বরের সাধনা করে জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে, ঈশ্বর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে শিব জ্ঞানে জীবের সেবা করে গিয়েছেন এবং সারা জীবন নিষ্কাম কর্ম করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন অনুধ্যান করলে, আমরা বুঝতে পারব 'নির্জনে সাধন' কাকে বলে ও লোকহিতার্থে নিষ্কাম কর্ম কাকে বলে।

৫-৬) স্বামীজীর জীবন দর্শনে মায়াবাদ;

স্বামীজী শঙ্করাচার্যের মতো মায়াবাদী ছিলেন। 'মায়া' কে তিনি প্রত্যক্ষ ঘটনাসমূহের উৎস বলিয়া ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর দর্শনে

মায়াবাদের কথা বলতে গেলে প্রথমে মনে আসে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেদান্তের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ নিয়ে সমগ্র বাংলাদেশে এক বিশাল ঝড় উঠেছিল।ইতিহাস পড়লে বোঝা জায়, ১৮২৩ থেকে১৮৮২ পর্যন্ত এই ৬০বছরে বাঙালীসমাজ বিশেষ করে শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারকগণ বেদান্তের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ নিয়ে ভীষণ দ্বিধা ও সংশয় এর মধ্যে পড়েছিলেন। তাঁরা এই বেদান্ত দর্শনকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। রাজা রামমোহন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত - সকলেই বেদান্ত দর্শন বিশেষকরে বেদান্তের মায়াবাদকে ভ্রমাত্মক বলে নিন্দা করেছেন।

ব্রহ্মসমাজের সকল ধর্মবিদগন বেদান্ত তত্ত্বকে অস্বীকার করেছিলেন। এমন কি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত সাহিত্যিকগণ গীতা তত্ত্বের অবলম্বনে তাঁর ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রয়াস করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে গীতায় বেদান্ততত্ত্বের কথাই বলেছেন সে ব্যাপারে প্রায় সেকাল জ্ঞানী ও পণ্ডিত হিন্দুস্মাজ সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। ফলে সাধারন মানুষ ভারতের বিজ্ঞান সম্মত বেদান্ত দর্শন বা ধর্মের কোন সন্ধান পায় নি। যখন স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাতে বিশ্বধর্ম মহাসভায় প্রমান করলেন ভারতের বেদান্ত ধর্ম পৃথিবীর প্রাচীনতম দর্শন বা ধর্ম এবং এরপরে তিনি যখন সারা ইউরোপ ও আমেরিকায় দীর্ঘকাল ধরে ভারতের প্রাচীন ঋষিদের পর্যবেক্ষণ, সত্যানুষন্ধান ও বিশ্লেষণে সৃষ্টি বেদান্ত বা উপনিষদের দর্শন প্রচার করলেন, তখনই আমাদের দেশবাসী উপনিষদ তথা বেদান্ত ধর্মের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হলেন; তবে এখনো বহু পণ্ডিত মানুষের মনে বিবেকানন্দের মায়াবাদ দর্শন বিষয়ে অনেক দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব রয়েছে। ঐ সকল পণ্ডিতগণ বাইবেল তত্ত্ব বিশ্বাস করেন; কিন্তু তাঁরা বেদান্ত ও উপনিষদ পড়তেন না; শুধু তাই নয়, সারা পৃথিবী স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শনের বাণী স্বীকার করেছে; আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা অনুরাগী ব্যাক্তি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় এবং অক্ষয়কুমার দত্ত স্বামীজীর মায়াবাদকে বিশ্বাস করতেন না, স্বামী বিবেকানন্দকে স্বীকার করা তো অনেক

দূরের কথা। সেই কারনে স্বামীজির মায়াবাদ দর্শন ও বাণী এখনকার যুব সমাজেরও হৃদিসের বাহিরে। তাই আজ চতুর্দিকে এত মারামারি, হানাহানি, কাটাকাটি, হলাহল, ভণ্ডামি, গুণ্ডামি, দুর্নীতি। সমাজ আজ একেবারে ধ্বংস হয়েগেছে। শিক্ষা দীক্ষা সব শেষ হয়ে গেছে। যে জাতীর মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা নেই এবং শিক্ষার মধ্যে এত দুর্নীতি, সে জাতির অবক্ষয় ও বিনাস অনিবার্য। এটা আমার কথা নয়; স্বামী বইবেকানন্দের কথা। তাই তিনি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বেদান্ত বিষয়ে তিনি আদি শঙ্করের মায়াবাদকে গ্রহণ করেছিলেন সম্পূর্ণ রূপে। বেদান্ত ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে স্বামীজী সর্বত্র শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের তত্ত্বকে তুলে ধরেছেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভা এবং পরবর্তীকালে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, এবং সমগ্র ভারতে বেদান্তের বানী প্রচার করে মানুষকে ধর্মের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সর্বত্র দ্বৈতবাদ ও বহুবাদের সঙ্কীর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা বিশ্লেষণ করে অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের মহিমা কীর্তন করেছেন।দ্বৈতবাদ সমন্ধে তিনি বলেছেন; "পৃথিবীর সকল দ্বৈতবাদী স্বভাবতই এমন এক সগুন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন যিনি একজন উচ্চশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যমাত্র এবং মানুষের যেমন কতকগুলি প্রিয়পাত্র থাকে আবার কতকগুলি অপ্রিয় ব্যক্তি থাকে, দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরেরও তেমনি আছে।---- আপনারা দ্বৈতবাদক এমন একটি ধর্ম দেখান, যাহার ভিতর এই সঙ্কীর্ণতা নাই। গভীর চিন্তায় অক্ষম সাধারন লোক সকল দেশেই দ্বৈতবাদী হইয়া থাকে।" *(উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ - ১৯৩পৃ)* । প্রসঙ্গত; 'অদ্বৈতবাদ' এর বিরুদ্ধে দুটি বড় অভিযোগ রয়েছে– এক, অদ্বৈতবাদে ভালমন্দের বিচার নাই। দুই, জ্ঞানসাধ্য অভেদ উপলব্ধিতে ভক্তি তত্ত্বের সন্ধান নাই। স্বামীজী এই দুটি অভিযোগ যুক্তি সহকারে খণ্ডন করেছেন। এখন আসি আমরা বেদান্তের মায়াবাদ তত্ত্বে যা নিয়ে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, এবং সেকালের জ্ঞানী ও পণ্ডিত হিন্দুস্মাজ, বেদান্তের মায়াবাদকে ভ্রমাত্মক বলে নিন্দা করেছেন। তাঁদের মতে 'বেদান্তের

মায়াবাদ' পার্থিব জীবনের প্রতি উদাসীনতা বা নিস্পৃহতা। তাঁদের এই প্রতীবাদের উত্তরে স্বামীজী বলেছেন; "বেদান্ত প্রকৃতপক্ষে জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চায় না। বেদান্তে যেমন চুড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, তেমনটি আর কোথাও নাই। কিন্তু ঐ বৈরাগ্যের অর্থ আত্মহত্যা নহে, নিজেকে শুকাইয়া ফেলা নহে। বেদান্তের 'বৈরাগ্যের' অর্থ 'জগতের ব্রহ্মভাব' – জগৎকে আমরা যেভাবে দেখি, উহাকে আমরা যেভাবে জানি, উহা যেভাবে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা ত্যাগ করা এবং উহার প্রকৃত সরূপ অবগত হওয়া। জগৎকে ব্রহ্মরূপে দেখ- বস্তুতঃ উহা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে।" *(উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ -১৯৩পৃ)*

৫-৭) স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত দর্শনে - মায়া ও মুক্তি

আচার্য শঙ্করের ন্যায় স্বামী বিবেকানন্দ সর্বত্র বেদান্তের ব্যাখ্যায় বলেছেন; "মুক্তি বা মোক্ষলাভ কেবল সঠিক আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আত্মাজ্ঞান দ্বারা স্বতন্ত্র আত্মা দেহ থেকে মুক্তি পায় বা মোক্ষলাভ করে। মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মা চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয় পরমাত্মার সাথে নিখুঁত ঐক্যে অবস্থান করে। আচার্য শঙ্করের ন্যায় তিনি বলেছেন, আধ্যাত্মিক মুক্তি উপায় হিসাবে কর্মের চেয়ে জ্ঞান বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য প্রস্তুতির পদ্ধতি হিসাবে প্রেম এবং ভক্তিযোগ সঠিক আচরণ এবং ভাল কর্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে জ্ঞানযোগ আত্মা এবং পরম ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। স্বামীজী বলেন ব্রহ্ম হলেন একটি সর্বজনীন বাস্তবতা যা সম্পূর্ণরূপে অবিভাজ্য। ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ। ব্রহ্ম আদি, অনন্ত ও অন্তহীন। সহজ ভাষায় তিনি বলেন; মন বা শরীর কোনটাই আত্মা নয়। মন বা শরীর কেবলমাত্র আত্মার একটি পরিবর্তনশীল প্রকাশ। তিনি বলেন মন বা শরীরকে আত্মা বলে বিশ্বাস করা হল অ-আত্মা বা আত্মাহীন বস্তুকে আত্মার উপর চাপানোর চেষ্টা করা মাত্র। ব্রহ্ম সম্পর্কে ভুল জ্ঞান বা অজ্ঞতার কারণে আত্মার উপর অনাত্মান আধিপত্য ঘটে। অবিদ্যা

সম্পর্কে আচার্য শঙ্কর ন্যায় স্বামীজী বলেন, আমাদের অবিদ্যা আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্যের উপর বহুত্বভাব আরোপ করার প্রবণতা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে; কিন্তু বিদ্যা বা সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা সর্বদা আত্মা ও ব্রহ্মের পরম ঐক্যের প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারি।

স্বামীজীর "মায়া ও মুক্তি" প্রবন্ধে থেকে কিছু কথা তুলে ধরা হল;

৭.১) "......... আমরা সকলেই যেন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। কাঁদিয়া আমাদিগকে এই জগতে প্রবেশ করিতে হইবে- যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া এই অনন্ত জীবন-সমুদ্রের মধ্যে পথ করিয়া লইতে হইবে- সম্মুখে আমরা অগ্রসর হই, পিছনে অনন্ত যুগ পড়িয়া রহিয়াছে, সম্মুখেও অনন্ত। এইরূপে আমরা চলিয়া থাকি। অবশেষে মৃত্যু আসিয়া আমাদিগকে এই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া দেয়- জয়ী হইলাম না পরাজিত হইলাম,-তাহাও আমরা জানিলাম না; - ইহাই মায়া।"

৭.২) "ইন্দ্রিয়গন মানুষকে টানিয়া লইয়া যায়, যেখানে কোনক্রমে সুখ পাওয়া যায় না; মানুষ সেখানে সুখের অন্বেষণ করিতেছে। অনন্ত যুগ ধরিয়া আমরা সকলেই উপদেশ শুনিতেছই –এসব বৃথা, কিন্তু আমরা শিখিতে পারি না। নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া শেখাও অসম্ভব। উপদেশ কাজে লাগাইতে হইবে- হয়ত তীব্র আঘাত পাইব. তাহাতেই কি আমরা শিখিব? না। তখনও না। পতঙ্গ যেমন পুনঃ পুনঃ অগ্নি অভিমুখে ধাবমান হয়। আমরাও তেমনি পুন পুনঃ বিষয়সমুহের দিকে বেগে পতিত হইতেছি- যদিও কিছু সুখ পাই। বার বার নূতন উৎসাহে ফিরিয়া যাইতেছি। এইরূপে চলিয়াছি, যতক্ষণ না দেহমন ভাঙিয়া যায়; শেষে প্রতারিত হইয়া মরিয়া যাই- ইহাই মায়া।"

৭.৩) "এমন জননী নাই, যিনি তাঁর সন্তানকে অসাধারণ শিশু বা প্রতিভাবান পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস না করেন। তিনি সেই ছেলেটিকে নিয়ে মাতিয়া থাকেন, সেই ছেলেটির উপর তাহাঁর সারা মনপ্রান পড়িয়া থাকে। ছেলেটি বড় হইল – হয়ত মাতাল, পশুতুল্য হইয়া

উঠিল। জননীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। যতই এই অসদ্ব্যবহার বাড়িতে থাকে, মায়ের ভালোবাসা ততই বাড়িতে থাকে। জগৎ উহাকে মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বলে খুব প্রশংসা করে। তাহারা স্বপ্নেও মনে করে না যে সেই জননী জন্মাবধি এক একটি ক্রীতদাস মাত্র- তিনি না ভালোবাসিয়া থাকিতে পারেন না। সহস্রবার তাঁর ইচ্ছা হয়- তিনি উহা ত্যাগ করিবেন। কিন্তু তিনি পারেন না। তিনি উহার উপর পুস্পরাশি ছড়াইয়া উহাকেই আশ্চর্য ভালোবাসা বলে ব্যাখ্যা করেন, - ইহাই মায়া।

স্বামী বিবেকানন্দের মায়া সম্পর্কে এই বিশ্লেষণ চিরন্তন সত্য। এইভাবে "মায়া ও মুক্তি" প্রবন্ধে স্বামীজী বিভিন্ন ভাবে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে মায়ার প্রভাব ব্যাখ্যা করেছেন। এরপর গীতা, উপনিষদ ও বাইবেলর নির্দেশ অনুসারে তিনি তাঁর প্রবন্ধে মায়া বা মোহ মুক্তির উপায়ের কথাও সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন;

"অতএব, একদিকে এই অভয়বানি, এই আশাপদ বাক্য যে এ-সব কিছুই নয়, এ-সবই মায়া- ইহাই উপলব্ধি কর, সেই সঙ্গে এই আশার বানী এই যে, মায়ার বাহিরে যাইবার পথ আছে। অপর দিকে সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যাক্তিগণ বলেন-'ধর্ম, দর্শন এ-সব বাজে জিনিস লইয়া মাথা ঘামাইও না। সংসারে বাস কর; এই সংসার নিতান্তই অশুভপূর্ণ বটে, কিন্তু যতদূর পারো ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া লও।' সাদা কথায় ইহার অর্থ এই, দিবারাত্রি, ভন্ডামি, মিথ্যাচার, প্রতারণার জীবন যাপন কর- তোমার ক্ষতগুলি যতদূর পারো, ঢাকিয়া রাখো। তালির উপর তালি দাও, শেষে প্রকৃত জিনিসটি যেন নষ্ট না হইয়া যায়, আর তুমি একটি কেবল জোড়া তালির সমষ্টিতে পরিনত হও—ইহাকেই বলে সংসার জীবন। যাহারা এইরূপ জোড়াতালি লইয়া সন্তুষ্ট, তাহারা কখন ধর্মলাভ করিতে পারিবে না। " /" স্বামীজী বলেছেনঃ *"...আমাদের সুখ-দুখ, বিপদ-কষ্টের অবস্থার মধ্যেই আমরা এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতে পাই যে, আমরা সকলেই ধীরে ধীরে সেই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি। প্রশ্ন হইল; এই জগৎটা বাস্তবিক কি? কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি, কোথায়ই বা ইহার লয়। উত্তর; মুক্তিতে ইহার উৎপত্তি, মুক্তিতে*

ইহার স্থিতি, এবং অবশেষ মুক্তিতে ইহার লয়। এই যে মুক্তির ভাব; আমরা যে বাস্তবিক ই মুক্ত- এই মহান ভাব ছাড়িয়া আমরা এক মুহূর্তও চলিতে পারিনা। এই ভাব ব্যতিত আমদের সকল কাজ, এমন কি আমাদের জীবন পর্যন্ত ব্যর্থ। প্রতি মুহূর্ত প্রকৃতি আমাদিগকে দাস বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই অপর ভাবও আমাদের মনে উদিত হইতেছে যে, তথাপি আমরা মুক্ত। প্রতি মুহূর্তে আমরা যেন, মায়া দ্বারা আহত হইয়া বদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি।কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি হইতেছে, আমরা মুক্ত। আমাদের ভিতর যেন কিছু বলিয়া দিতেছে- আমরা মুক্ত। কিন্তু এই মুক্তিকে প্রানে প্রানে উপলব্ধি করিতে, আমাদের মুক্ত স্বভাবকে প্রকাশ করিতে যে-সকল বাধা উপস্থিত হয়, তাহাও একরূপ অনতিক্রমনীয়। তথাপি, আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে কে যেন সর্বদাবলি্রব্দ- আমি মুক্ত, আমি মুক্ত। ...."

৫-৮) স্বামীজির বেদান্ত দর্শনে –পাপ, পুন্য ও পাপী;

স্বামীজীর জীবন দর্শনে পাপ বা পাপী বলতে কিছুই নাই। তিনি বলেন – সর্বভূতে সর্বক্ষেত্রে ব্রহ্মদর্শন হলে সেখানে পাপ ও পুন্যের বিভেদ থাকতে পারে না। অদ্বৈতবাদ দর্শন কখনো জীবনে পাপ ও পুন্যের গণ্ডি টেনে মানুষ হতে মানুষকে পৃথক করে না। অদ্বৈতবাদ ও ব্রহ্মবাদের নির্দেশ ও শিক্ষা হল - শুধু উৎকৃষ্ট হতে উৎকৃষ্টতরের দিকে। অপকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টের দিকে নহে। আমাদের এটা ভাবতে হবে সব মানুষ ভাল। কেউ কম ভাল আবার কেউ বেশি ভাল। কারুর মধ্যে ব্রহ্মের কম বিকাশ আবার কারুর মধ্যে ব্রহ্মের অধিক বিকাশ।যার মধ্যে ব্রহ্মের সল্প বিকাশ, তাকে পাপী বলে আলাদা করে দূরে রাখা উচিৎ নয়। বরং তার অজ্ঞানতাকে দূর করে সত্য ও ব্রহ্মের বিকাশের সুজোগ দিতে হবে তাকে। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেকের মধ্যে এক দিন না একদিন পূর্ণব্রহ্মের বিকাশ ঘটবে। বর্তমানে একজনের সঙ্গে অন্য জনের বিকাশের পার্থক্য। স্বামীজী দর্শন বলে- এই পার্থক্য সমূলে বিনাশ করে সকল মানুষ তার পূর্ণব্রহ্মাতে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর জীবনদর্শনের মূল কথা হল-কখনো

কাউকে ঘৃণা নয়; সকলের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা। শিব জ্ঞানে সকলের সেবা করা। *(উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ -১৩৯পৃ)*

৫-৯) স্বামীজীর সাম্যবাদ দর্শন;

ব্রহ্মবাদ ও অদ্বৈতবাদ হতে স্বামীজী সাম্যবাদে উপনীত হয়ে তিনি উদাত্ত কন্ঠে বলেছেন- *"বল ভারতবাসী আমার ভাই, বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই-তুমিও একটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া স্বদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী, আর বল দিনরাত হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমার কাপুরুষতা, দুর্বলতা দূর কর আমায় মানুষ কর"*। তাঁর এই আদর্শ ও দর্শনকে গ্রহণ করে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মত বহু বিপ্লবী ভরতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়েছেন। শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামী বা বিপ্লবী নয়, দেস বিদেশের বহু মনীষী তাঁর জীবণ দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছেন এবং ভারতের মন্ত্র বেদান্ত দর্শনকে স্বীকার করেছেন এবং তাঁর আদর্শে তাঁদের জীবন ধাঁরা স্থির করেছেন। তিনি সাম্যবাদ সম্বন্ধে বলেছেন – "ব্রহ্মবাদ ও অদ্বৈতবাদ উপর প্রতিষ্ঠিত মানবসমাজে অসাম্য থাকতে পারে না। বর্তমান সমাজে যাহা এবং যেরূপেই হউক না কেন, বেদান্ততত্ত্বের প্রয়োগের ফলে তাকে বর্তমানের সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠিতেই হবে। আর বেদান্তের তথ্যগুলি শুধু মনে রাখার জন্য ণয়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐ তথ্যগুলিকে প্রয়োগ করতেই হবে। ভারতের অবনতির কারন আদর্শের ন্যূনতা ণয়, প্রত্যুত আদর্শকে কাজে পরিণত করার ঐকান্তিকতার অভাব। তিনি বলেছেনঃ "যিনি সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি নিজে আত্মাকে বিনষ্ট করিতে পারে না। এবং সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা পরম গতি (মোক্ষ) লাভ করে থাকে।" তাঁর সাম্যবাদের যুক্তি বেদান্তদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত।... (উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ -১৪০)

৫-১০) বিবেকানন্দের দর্শনে ধর্মের স্থান;

ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বলেছেনঃ ধর্ম মানে নিষ্ক্রিয়তা নয়। শুধু গিরিগুহায় জীবনবিমুখ তপশচরণ বা তপস্যা করা নয়- ধর্ম মানে ঈশ্বরবিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস, গতিশীলতা। মানবসেবা ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় ধর্ম যেটা তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে। এই সম্বন্ধে একটা মর্মস্পর্শী ঘটনার কথা না বললে নয়। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভয়ঙ্কর এক অসুখে আক্রান্ত হয়ে স্বামিজী যখন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দার্জিলিং গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি সংবাদ পেলেন – কলকাতায় প্লেগ দেখা দিয়েছে যেটা শীঘ্রই মহামারীর রূপ ধারন করতে পারে। এটা শুনে তিনি আতঙ্কিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর শিষ্যা, ম্যাকলাউডকে লিখলেন(২৯ সে এপ্রিল, ১৮৯৮); "I am determined to make myself a sacrifice.. and that I am sure is a 'Dam sight, better way to Nirvana' than pouring oblations to all that ever twinkled.." [চি ৮৯৪]. ঐ অবস্থায় এই কথা লেখা বা বলা, একমাত্র বিবেকানন্দের মত সন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব, কারন তিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শকে মেনে চলতেন। তিনি ১৮৯৮ সালে প্লেগ-মহামারীরিতে ক্লিষ্ট কলকাতার পথে বস্তিতে সদলবলে মানব সেবায় নেমেছিলেন পরিত্রাতার ভূমিকায়। এটা আমাদের সকলের কাছে আশ্চর্য লাগে, একজন সন্ন্যাসী কিভাবে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন যে প্লেগ-রোগীদের সেবা তাঁর কাছে নির্বাণ লাভের প্রকৃষ্টতর উপায়। তিনি শুধু বাণীময় ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক বাণীমূর্তি। তাই তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধারকে দূরে সরিয়ে রেখে কলকাতায় তাঁর গুরুভাই ও শিষ্যদের নিয়ে নেমে পড়লেন প্লেগ-রোগীদের সেবায়। ঐ কাজের জন্য শুধু দৈহিক পরিশ্রম ণয় প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন ছিল। সেই জন্য তাঁর এক গুরুভাই যখন তাঁকে ঐ সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন; "সেবাকার্যে শ্রম তাঁরা দেবেন কিন্তু অর্থ আসবে কোথা থেকে?" তিনি তখন উত্তর দিয়েছিলেন; "কেন? দরকার হলে নূতন মঠের সব জমি-জায়গা সব বিক্রি করব। আমরা ফকির, মুষ্টি ভিক্ষা করে দিন কাটাতে পারি। যদি জায়গা-জমি বিক্রি করলে হাজার হাজার

লোকের প্রান বাঁচাতে পারা যায় তো কিসের জায়গা আর কিসের জমি?" (চি-৮৯৪)

৫-১১) স্বামীজীর জীবন দর্শনে পৌরহিত্য ও ধর্ম;

স্বামীজী বলেছেন যে ভারতে অতি প্রাচীনকালে তথা বৌদ্ধ ধর্মের আগে থেকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সঙঘর্ষ খুব প্রবল ছিল।তারপর ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের জুটির সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের জুটির সঙ্গে বৈশ্যশ্রেণীর আধিপত্য আসে সমাজে। কিন্তু বিবেকানন্দের জীবন দর্শন অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর বিশেষ বা অধিকারের ব্যাপারটাকে একেবারে অস্বীকার করা হয়েছে। এখনে সকল মানুষের সমান অধিকারের কথাই বারে বারে বলা হয়েছে। বেদান্ত দর্শন হল সাম্যবাদের ধর্ম। প্রকৃত ধর্ম কখনই শ্রেণীবিভাগ ও শোষণের সহায়ক বা অস্ত্র হয়না। তাই বেদান্ত দর্শন সর্বদাই সমাজে শ্রেণি বিভাগ এবং তার ফল সরূপ শোষণের উপর আঘাত হেনেছে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে মানুষের মধ্যে শ্রেণী-বিভাজন এবং ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর আধিপত্য সমাজে পুরোহিত চক্রের সহায়ক। আর পুরোহিত চক্র সমাজ শোষণের হাতিয়ার। স্বামীজী সর্বত্র প্রচার করেছেন যে পৌরহিত্য কোন ধর্ম নয়। ধর্মের নামে বিশেষ সুবিধাতন্ত্র। পৌরহিত্য প্রথায় ধর্মের অভাব। তিনি প্রচার করেছেন যে – আমাদেরকে অধিকারের ভাব ছাড়িয়া দিতে হবে, ইহা ছাড়িলেই ধর্ম আসিবে। বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত, পৌরহিত্য শোষণের হাতিয়ার। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে প্রমান দেখিয়েছেন যে গৌতমবুদ্ধ, মাহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, গুরুনানক, দাদু দায়াল, কবীর, রামানুজ – এই সকাল ধর্মনেতাদের সকলকেই সমাজের স্বার্থে পুরোহিত চক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সমাজের সকল মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার দিতে সবোত্তম উপায়ে প্রয়াস করেছিলেন তাঁরা। এক কথায়, স্বামী বিবেকানন্দ পুরোহিত তন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। গ্রামের দরিদ্র ও অসহায় মানুষ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে সাধারন ও অশিক্ষিত গরীব মানুষ প্রতিনিয়ত পুরোহিত-শোষণের বলী হচ্ছে। পুরোহিত সম্প্রদায় ছলে বলে কৌশলে গরীব মানুষদের কাছ থেকে রক্ত

চোষার মত গরীবদের শেষ সম্বল টুকু কেড়ে নেয় ঈশ্বরের নাম করে, যদিও তাদের অধিকাংশই জানেন না ঈশ্বর কি বা ঈশ্বরকে কি ভাবে পেতে হয়। তাঁরা জন্ম সুত্রে নিজদেরকে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত বলে দাবী করে, যদিও তাদের অধিকাংশই কখনো গীতা ও উপনিষদ পড়েন নি। তাই স্বামীজী বলেছেন যে পুরোহিতচক্র শোষণের বিশেষ সহায়ক। "পুরৌহিত- প্রথা স্বাভাবতই নিষ্ঠুর ও নিস্করণ। সেইজন্যই যেখানে পুরৌহিত-প্রথার উদ্ভব হয়, সেখানে ধর্মের পতন বা গ্লানি হয়। আমাদিগকে অধিকারের ভাব ছাড়িয়া দিতে হইবে, ইহা ছাড়িলে ধর্ম আসিবে"।

৫-১২) বিবেকানন্দের সমাজ দর্শনঃ

তৎকালীন (উনবিংশ শতাব্দী) ভারত ভয়াবহ দারিদ্রের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।বিবেকানন্দের মতে ভারতের এই ভয়াবহ দারিদ্রের প্রধান দুটি কারন হল- অবহেলিত সমাজব্যাবস্থা ও শোষিত অর্থনৈতিকব্যাবস্থা। তাঁর কথায়, সমাজের অব্যবস্থাপনা ও অসমীচীন রীতিনীতির ফলে অভিজাত সম্প্রদায়, জমিদার, ও পুরোহিত গোষ্ঠীর অকথ্য শোষণ ও অত্যাচার সাধারণ ও অসহায় মানুষকে চরম দারিদ্র ও দুর্দশায় ঠেলে দিইয়েছিল। এর উপর ব্রিটিশ সরকারের নির্মম শোষণ, অত্যাচার ও জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন; ফলে দেশের দারিদ্য অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তিনি বলতেন, ভারতবর্ষের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের বড় কারণ হল ইংরেজ অনুসৃত শোষণ ও সম্পদ লুঠ নীতি ও শাসন ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, তদানীন্তন অর্থনীতিবিদগণও ভারতের ভয়াবহ দারিব্র্য ও মানুষের দুঃখ দুর্দশার জন্য অসমীচীন সমাজব্যাবস্থা ও শোষিত অর্থনৈতিকব্যাবস্থা-এই দুইটি কারনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত দাদাভাই নওরোজিও ভারতের ভয়াবহ দারিদ্র ও দুর্বিষহ অর্থনৈতিকব্যাবস্থার জন্য তিনি ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক ভারতের জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠনকে বিশেষভাবে দায়ী করেছেন।

৫-১৩) বিবেকানন্দের অর্থনীতি দর্শনঃ

ভারতের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বামীজীর গভীর জ্ঞান ও উপলব্ধি ছিল। তাঁর অর্থনীতিতে অগ্রাধিকার ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সমাজের দরিদ্র ও দরিদ্র শ্রেণীর উন্নয়ন। তিনি চেয়েছিলেন দেশের সব শ্রেণীর উন্নতি হোক; তবে তাঁর বেশি জোর ছিল দুর্বল শ্রেণী ও নারীদের ওপর। তিনি ভারতের ভয়াবহ দারিদ্র অবসানের জন্য বেশকয়েকটি পথ নির্দেশ করেছেন। যেমন;

১) আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতির উপর জোর দেওয়ার কথা তিনি সর্বত্র বলেছেন। তাঁর কথায় "ভারতের আধ্যাত্মিক' সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিলেও ভারতে একলক্ষ মানুষের অধিক যথার্থ ধার্মিক লোক নাই। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং না খাইয়া মরিতে হইবে? কেন একজন লোকও না খাইয়া মরিবে? ... বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাই নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।" এইভাবে স্বামীজী আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের থেকে সাধারন ও দরিদ্র মানুষের স্বার্থকে অনেক বড় করে দেখেছেন। এটা স্বামীজীর মত একজন প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব এধরনের চিন্তা ভাবনা করা। তিনি কহনও চান নি মুষ্টিমেয় কয়েকজন মোক্ষলাভের পথ প্রশস্ত করার জন্য দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আজীবন অনাহার ও দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটাক। তাই তিনি শিল্পোনয়নের সাহায্যে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলেছেন, যাতে সকলের জন্য কাজ সৃষ্টি হয় এবং জিনিষের ভোগ ও ব্যবহার বৃদ্ধি হয়।

২) দেশের দারিদ্য মোচনের জন্য, তিনি পৌরহিত্যে প্রথার অবসান ও সমাজের উচ্চশ্রেণীর বিশেষ অধিকার খর্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখছিলেন *"আমাদের পূর্বপুরুষগণ ধর্মচিন্তার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তাই আমরা অপূর্ব ধর্ম পাইয়াছি। কিন্তু তাহাঁরা সমাজের পায়ে অতি কঠিন শৃঙ্খল*

পরিয়েছেন। আমাদের সমাজ তাই ভয়াবহ দারিদ্র ও শোষণের আবর্তে নিমজ্জিত। এখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই সমাজের উন্নতির প্রধান শর্ত। ভারতকে আবার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংক্রান্ত বিষয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। এর জন্য *পৌরহিত্য প্রথার অবসান ও সমাজের উচ্চশ্রেণীর বিশেষ অধিকার খর্ব করতে হবে।"* তাঁর মতে সমাজের অভিজাত ও পুরহিত সম্প্রদায়, উচ্চশ্রেণীর মানুষ যারা ক্ষমতা ও পতিপত্তির পাহাড় নির্মাণ করেছে তারাই লক্ষ লক্ষ দুঃখ, দারিদ্র ও দীনতার জন্য দায়ী। তাই তিনি বলেছেন, *"যাহারা দরিদ্রের রক্ত শোষণ করিয়াছে, উহাদের (দরিদ্রদের) অর্জিত অর্থে নিজেরা শিক্ষালাভ করিয়াছে, এমনকি, যাহাদের ক্ষমতা-পতিপত্তির সৌধ দরিদ্রের দুঃখদৈন্যের উপরেই নির্মিত।"* সমাজের ঐ সকল অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীর মানুষদেরকে তিনি তীব্র সুরে বলেছেন, *"তোমরা হচ্চ দশ হাজার বছরের মমি, তোমরা শূন্যে বিলীন হও"*। (চি-৪১৯) তিনি সবসময় চাইতেন সেই ধরনের সমাজব্যবস্থা যেখানে সকলের সমান অধিকার ও সমান সম্মান থাকবে।

৫-১৪) বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শনঃ

আগেই বলেছি স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ভারতের ধর্ম, শিক্ষা, চরিত্র গঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। স্বামীজীর শিক্ষা দর্শন মানুষের ইতিবাচক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কারণ তিনি মনে করতেন, নেতিবাচক চিন্তাগুলি মানুষকে দুর্বল করে দেয়। তিনি বলেছিলেন, যদি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের সবসময় দোষারোপ না করে উৎসাহিত করা হয়, তবে তারা এক সময় উন্নতি করবেই।

তিনি মনে করতেন, "শিক্ষা পরিপূর্ণতার এক প্রকাশ; যা মানুষের মধ্যেই থাকে। তিনি বলতেন, "সমসাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থা যে মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে না, বা মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে না, তা খুব বেদনার বিষয়।" বিবেকানন্দ শিক্ষাকে তথ্যের সমষ্টি মনে করতেন না। তার কাছে শিক্ষা ছিল আরও বেশি কিছু। তিনি শিক্ষাকে মানুষ তৈরি করা ও চরিত্র গঠনের মাধ্যম বলে মনে

করতেন। তিনি শিক্ষাকে মহান চিন্তার সমষ্টি মনে করতেন। দেশে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য তিনি শিক্ষা বিস্তারের উপর বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। এখানে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর একটি মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেনঃ *"জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন গঠনের পন্থা। ...... দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকটে পৌঁছাতে না পারে, (অর্থাৎ দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষালাভে তৎপর না হয়) তবে শিক্ষাকেই চাসীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরদের কারখানায়, এবং অন্যত্র সব স্থানে যাইতে হইবে।"* (চি; ৪১৮)

৫-১৫) বিবেকানন্দের জীবন দর্শন- ধর্ম ও বিজ্ঞান;

আমাদের মধ্যে অনেকেই ধর্মকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বিশ্লেষণী চিন্তার বিরোধী বা পরিপন্থী বলে মনে করেন। অনেকেই মনে করেন ধর্ম হল চিরাচরিত প্রথা বা যুক্তিহীন কিছু তত্ত্ব বা উপদেশ বাণী। আমরা অনেকে ধর্ম বলতে তথা কথিত আচার, অনুষ্ঠান, পূজাপার্বণের রীতি-নীতিকে বুঝে থাকি। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনে ধর্মের স্থান ও ব্যাখ্যা এই সকল আচার-অনুষ্ঠানের অনেক উপরে- যা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এক যুগন্ধর পুরুষ যিনি লোকোত্তর প্রতিভা নিয়ে পৃথিবীতে এসে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেছিলেন। একাধারে অসাধারন মেধা, ধীশক্তি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার যে এক অদ্ভুত সমন্বয় তাঁর মধ্যে ঘটেছিল তা অতি বিরল এবং সচরাচর এই রূপ দেখা যায় নি। ঊনবিংশ শতকে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে- সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি – প্রায় সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব আলোড়ন এসেছিল।এহেন জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ মনীষীর মধ্যে বিজ্ঞানও যে বিশেষ স্থান পাবে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। বিবেকানন্দের জীবন দর্শনে ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলার আগে, আমার মনে হয় তাঁর বিজ্ঞান-চিন্তা সম্পর্কে দু একটা কথা অবশ্যই বলা দরকার। স্বামীজী ছিলেন আশৈশব ভীষণ যুক্তিবাদী। সত্যাসত্য যাচাই না করে তিনি কিছুই গ্রহণ করতেন না বা বলতেন না। তিনি প্রায়ই তাঁর শ্রোতৃবৃন্দকে

বলতেনঃ "কোন কথা পুস্তকে লেখা আছে, অথবা কেহ বলিয়াছে বলিয়াই বিশ্বাস করিও না। নিজে সত্য আবিষ্কার কর ..."। এই সত্যানুসন্ধানের স্পৃহা বা প্রবৃত্তি বিবেকানন্দের শৈশবথেকেই অতি প্রবল ছিল। এখান থেকেই আমরা বুঝতে পারি, বিবেকানন্দের বিজ্ঞানচেতনা বিজ্ঞানীদের মত স্বাভাবিক ও সহজাত। প্রমান ছাড়া বিজ্ঞানীরা যেমন কোন কিছুই বিশ্বাস করেন না, স্বামীজীও তেমনি কোন কিছুই বিশ্বাস করতেন না। এটাই ছিল স্বামীজীর মৌলিক চরিত্র। এই বিষয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে একটি ঘটনার কথা উদাহরণসরূপ উল্লেখ করা যাক।

ঘটনার সময়; ১৮৮৫ সালের ৯ মে, স্থান; বলরাম বসুর বাড়ি; ভক্তদের সঙ্গে সেখানে বিভিন্ন ঈশ্বর কথা হচ্ছে। হঠাৎ বিষয় এল- শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার কিনা নরেন্দ্রনাথের বিচার; শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃততে শ্রী'ম লিখছেন; স্বামীজী তখন প্রায় বাইশ বছরের এক যুবক। প্রমাণ না পেলে নরেন্দ্র কেমন করে বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন। গিরিশ ঘোসের বিশ্বাস ছিল যে ঐ বিষয়ে sufficient proof (যথেষ্ট প্রমান) রয়েছে। তাই তিনি বললেন এই জিনিসটা এখানে আছে, এর প্রমান কি? বিশ্বাসই প্রমান। কিন্তু নরেন্দ্র বিশ্বাস করেন না। তাই নরেন্দ্র-বললেন; "তার প্রমান কই?

গিরিশ – তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বাস কেরবে না;

নরেন্দ্র- অমর, past-ages-তে ছিল, প্রুফ চাই" ।

(উৎস; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত; দ্বিতীয় পিরিচ্ছেদ)

এই কথোপোকথন আমরা সহজেই বুঝতে পারি প্রমান ছাড়া স্বামীজী কিছুই বিশ্বাস করতেন না।কোন কিছু গ্রহণ করার আগে, তিনি ভালভাবে তার সত্যতা বিচার করতেন। বিজ্ঞানের উপর তাঁর ছিল অগাধ আকর্ষণ। সেই জন্য তিনি এক সময় তাঁর বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে বলেছিলেন – "আমাদের চাই কি জিনিস? - স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি আর বিজ্ঞান পড়ানো। চাই কারিগরি শিক্ষা (technical education), চাই যাতে শিল্প

(industry)বাড়ে; লোকে চাকরি না করে দু-পয়্সা করে খেতে পারে"
।

স্বামীজী এই প্রসঙ্গে তাঁর বন্ধুকে আরও বলেছিলেন: "এখন তোদের করতে হবে কি জানিস? প্রতি গ্রামে প্রতি শহরে মঠ খুলতে হবে। পারিস কিছু করতে? কিছু কর। কলকাতায় একটা বড় করে মঠ কর। একটা করে সুশিক্ষিত সাধু থাকবে সেখনে, ব্যবহারিক বিজ্ঞান (practical science) ও সব রকম কলাকৌশল (art) শেখাবার জন্য প্রত্যেক বিভাগে বিশেষজ্ঞ সন্ন্যাসী থাকবে" । *[উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ -8৭০পৃ]*

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন ধর্ম ও বিজ্ঞান কে অভিন্ন বলে ব্যাখ্যা করেছে। তাঁর সত্যানুসন্ধানে তিনি দেখেছেন যে ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ের মধ্যে যৌক্তিকতাকে ভারতের বেদান্তদর্শনে স্বীকৃতি দিয়েছে। স্বামীজী বলেছেন ভারতীয় ঋষিরা ধর্ম ও বিজ্ঞান – এই দুয়ের মধ্যে কোন বিভেদ বা ভিন্নতা দেখেননি। ধর্ম সম্পর্কে তাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই ধর্ম ও বিজ্ঞান এই দুয়ের মধ্যে তারা ভিন্নতা উপলব্ধি করেছে। যাইহোক বিভিন্ন বিচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের অনেক আধুনিক চিন্তাবিদ, ধর্মবিদ ও বিজ্ঞানীরা এই বিভেদ দূর করার চেষ্টা করেছেন । স্বামীজি বলেছেন, সাধারন মানুষত দূরের কথা, বিজ্ঞানের বহু ছাত্রের বিজ্ঞান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেই। আমার মনে হয়, স্বামীজির এরূপ মন্তব যথেষ্ট যুক্তিসম্পন্ন। আমরা দেখি- সাধারন মানুষ বিজ্ঞানের ভূমিকা বলতে বুঝেন কেবলমাত্র রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, Artificial Intelligence বা কিছু ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রোনিক জিনিস পত্র যা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য ব্যবহৃত জিনিস পত্রের আবিষ্কার ও সৃষ্টি। আর বিজ্ঞানের ছাত্ররা এগুলিকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ইঙ্গিনিয়ারিং, মেডিকেল সায়েন্স, মহাকাশ-বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে ভাগ পাঠ, পড়াশুনা এবং গবেষণা। স্বামীজী বলেছেন বিজ্ঞান বলতে কি বোঝায় সেটা জানতে গেলে আমাদের উচিত বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর পরীক্ষা, নিরীক্ষা, গবেষণা ও

আবিষ্কারে কথা জানা। *ঐ* সকল বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন জিনিস বা বিষয় সম্বন্ধে সত্যের অনুসন্ধান করেন। স্বামীজী বলেন, বেদান্ত দর্শনও পরীক্ষা, নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিবেকানন্দের ভাষায় – *"ভারতের ঋষিগণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত ভূমিতে নির্ভীকভাবে আত্মানুসন্ধান করিয়াছেন। চেতনা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সীমাবদ্ধ।আধ্যাত্মিক জগতের সত্য লাভ করিতে হইলে মানুষকে ইন্দ্রিয়ের বাহিরে যাইতেই হইবে। আর এখনও এমন সব লোক আছেন, যাঁহারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাহিরে যাইতে সমর্থ। ইঁহাদিগকেই ঋষি বলে। কারন, ইঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন"*। [উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ -৪৯৮পৃ] তিনি বলেছেন; যে কোন বিষয়ে যদি পর্যবেক্ষণ ও যথাযথ বিশ্লেষণ –এই দুই প্রধান উপাদান বিদ্যমান থাকে তখন সে বিজ্ঞান বলে পরিগণিত হবে, তবে সে বিষয়টি যাই হোক না কেন। যেহেতু বেদান্ত দর্শন বা ধর্মে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সত্য-অনুসন্ধান – এই সকল বৈশিষ্টগুলি বিদ্যমান, এই ধর্ম বিজ্ঞানপদ্ধতির উপর তিনি বিশ্বাস করতেন এবং প্রমান করেছেন যে ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত।

জার্মান পদার্থবিদ ওয়ার্নার ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে মন্তব্য;

1920 -এর দশকে, জার্মান পদার্থবিদ ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ যিনি বিখ্যাত অনিশ্চয়তা প্রিন্সিপাল (uncertainty principal) প্রণয়ন করেছিলেন এবং ১৯৩২ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন, তিনি ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন;- "Quantum theory will not look ridiculous to people who have read Vedanta....*after the conversations about Indian philosophy, some of the ideas of quantum physics that had seemed so crazy suddenly made much sense."* অর্থাৎ তিনি ববলেছেন যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব তাদের কাছে হাস্যকর বা অসম্ভব লাগবে না যারা বেদান্ত পড়েছেন।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে মন্তব্য;

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন যিনি নিয়মিত ভগবদ গীতা পড়তেন ভারতের দর্শন সম্পর্কে বলেছেন; "When I read the Bhagavad-gita and reflect about how God created this universe everything else seems so superfluous... I maintain that the cosmic religious feeling is the strongest and noblest motive for scientific research."। অর্থাৎ যখন তিনি ভগবদ গীতা পডতেন এবং চিন্তা করতেন কিভাবে ঈশ্বর এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তখন তাঁর কাছে অন্য সব কিছু ভীষণ অপ্রয়োজনীয় মনে হত। তিনি মনে করতেন মহাজাগতিক ধর্মীয় অনুভূতি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী এবং মহৎ প্রেরণা।

রবার্ট অপেনহেইমারের ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে মন্তব্য

পারমাণবিক বোমার জনক জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহেইমার ভগবদ গীতা, মহাভারত এবং উপনিষদ পড়ে অনেকভাবে প্রভাবিত হতেন। তাই তিনি বলেছেন "Access to the Vedas is the greatest privilege this century may claim over all previous centuries।।" আবার আসা যাক ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বামীজীর দর্শনে ও কথায়। তিনি বলেন, *" বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য –'এককের অন্বেষণ মাত্র'। বেদান্তধর্মেরও উদ্দেশ্য এককের সন্ধান- যিনি এই মৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবনস্বরূপ, যিনি নিত্যপরিবর্তনশীল জগতে একমাত্র অচল ও অটল ভিত্তি, যিনি একমাত্র পরমাত্মা – অন্যান্য সকল আত্মা যাঁহার থেকে প্রকাশ মাত্র। এইরূপ বহুবাদ, দ্বৈতবাদ ভিতর দিয়া অদ্বৈতবাদে উপনীত বেদান্ত দর্শনের লক্ষ্য। ইহাই সর্বপ্রকার জ্ঞান বা বিজ্ঞানের লক্ষ্য।"* তাঁর এই বিশ্লেষণে এটাই সুস্পষ্ট হয়- বেদান্ত ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য এক – বহুর মধ্যে এককের অন্বেষণ। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী আরও বলেন- *"আমি একটিমাত্র সত্তায় বিশ্বাস করি। আধুনিক জড়বআদীও এইরূপ বিশ্বাস করিতে বলেন, তবে তিনি শুধু উহাকে 'জড়' আখ্যা দেন,আর আমি উহাকে 'ব্রহ্ম' বলি। জড়বাদী বলেন–এই জড় হইতেই মানুষের আশা ভরসা ধর্ম সবই আসিয়াছে। আমি বলি –ব্রহ্ম হইতে সমুদয় হইয়াছে'*।[চিন্তানায়ক

বিবেকানন্দ –৪৭৮পৃ] তিনি বলেন; *উপনিষদ পড়লে দেখা যায় প্রাচীন ভারতবর্ষে ঋষিগণ ধর্মকে পর্যবেক্ষণশীল ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিতেই গ্রহণ করে ছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল সত্যের অনুসন্ধান করা। তাদের দর্শনে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা।স্বামীজী বারে বারে সর্বত্র প্রচার করেছেন – "আদিম অন্ধ কুসংস্কার ও অলীক কল্পনা আঁকড়ে ধরে থাকা ধর্ম নয়*। [চি-৫০০]

৬; বিবেকানন্দের অমৃত বাণী ও উপদেশ

স্বামী বিবেকানন্দ শুধু ভারতবাসীকে নয়, প্রায় সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে জ্ঞানের আলোর সন্ধান দিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও অসংখ্য রচনা, প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি মানবজাতির অবিদ্যা, অজ্ঞান ও অজ্ঞতা কে বিনাশ করে অন্তরের জ্ঞানালোককে বিকশিত করে চলেছে। উল্লেখ্য, নয়টি খন্ডে প্রকাশিত The Complete Works Of Swami Vivekananda, The Swami Vivekananda-The Living Vedanta, Swami Vivekananda-Vedanta; Voice of Freedom, Reflections – Swami Vivekananda, স্বামী বিবেকানন্দের বানী- সঞ্চয়ন, ভারতে বিবেকানন্দ, চিন্তনায়ক বিবেকানন্দের ন্যায় অসংখ্য মুল্যমান পুস্তক রচিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দে অলৌকিক জীবন, দর্শন, বাণী ও শিক্ষা নিয়ে। তিনি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে লোকশিক্ষার দায়িত্ব মস্তকে নিয়েছিলেন। তিনি সেই গুরুদায়িত্ব সর্বোত্তম ভাবে পালন করে গেছেন। আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, সত্য, শিক্ষা, দর্শন, ধর্ম, চরিত্র গঠন, সমাজ গঠন ও মানবসেবা উপর স্বামী বিবেকানন্দের অসংখ্য প্রবন্ধ ও বানী রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষামূলক, অনুপ্রেরণামূলক বাণী ও উক্তি আজও ভীষণভাবে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। আমাদের অনেকেরই সেই সকল প্রবন্ধ, রচনা ও বাণী ভালভাবে জানা রয়েছে। যেমন তিনি জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য আমাদেরকে অনেক অমৃত বানী ও উপদেশ দান করে গিয়েছেন; সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল; ১) 'ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না"। ২)"দুনিয়া আপনার

সম্বন্ধে কি ভাবছে সেটা তাদের ভাবতে দিন| আপনি আপনার লক্ষ্যগুলিতে দৃঢ় থাকুন, দুনিয়া আপনার একদিন পায়ের সম্মুখে হবে"। ৩) "সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল দাঁড়ান এবং আপনার মধ্যেকার দৈবত্বকে চিনতে শিখুন"। ৪) "শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু"। ৫) "হে ভারত, ভুলিও না- নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল- আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।" আমরা প্রত্যেকেই প্রায় শৈশব থেকেই বিবেকানন্দের এই সকল অমৃত বাণীগুলি পড়ে আসছি ও মেনে আসছি। এগুলো নূতন কিছুই নয়। তবুও এখানে তাঁর কিছু অমৃতবাণী তুলে ধরলাম। মনে রাখতে হবে এগুলি শুধু শুষ্ক বাণী নয়; এগুলি এই মহামানবের অভিজ্ঞতা লব্ধ জীবন দর্শন ও শিক্ষা।

৬.১) সত্য সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের মর্মস্পর্শী বানী;

- "সত্যের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোনো কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা চলে না।"
- "জগতে যদি কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতায় সেই পাপ। সকল প্রকার দুর্বলতা ত্যাগ করো – দুর্বলতায় মৃত্যু, দুর্বলতায় পাপ।"
- "যদি সত্যিই মন থেকে কিছু করতে চাও তাহলে পথ পাবে, আর যদি না চাও তাহলে অজুহাত পাবে।"
- **৬.২) 'কর্ম' সম্পর্কে বিবেকানন্দের মর্মস্পর্শী বানী**;
- "কোনো বড় কাজই কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার ছাড়া হয় নি।",
- "সারাদিন চলার পথে যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হও, তাহলে বুঝবে তুমি ভুল পথে চলেছ।"
- "এমন কাজ করে চলো যে তুমি হাসতে হাসতে মরবে আর জগৎ তোমার জন্য কাঁদবে।"

- "যখন আমাদের মধ্যে অহংকার থাকে না, তখনই আমরা সব থেকে ভালো কাজ করতে পারি, অপরকে আমাদের ভাবে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করতে পারি।",
- উঁচুতে উঠতে হলে তোমার ভেতরের অহংকারকে বাহিরে টেনে বের করে আনো, এবং হালকা হও ... কারণ তারাই ওপরে উঠতে পারে যারা হালকা হয়।",
- "মস্তিস্ককে উচ্চ মানের চিন্তা-ভাবনা দিয়ে পূর্ণ করো, দিবারাত্র এগুলোকে তোমার সামনে রেখে চলো, এগুলোর থেকে মহান কাজ বেরিয়ে আসবে।",
- "সাহসী লোকেরাই বড় বড় কাজ করতে পারে।"
- "মনের মতো কাজ পেলে অতি মূর্খও করতে পারে। যে সকল কাজকেই মনের মতো করে নিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান। কোনো কাজই ছোট নয়।"
- "যা পারো নিজে করে যাও, কারও ওপর আশা বা ভরসা কোনোটাই কোরো না।",
- "যে রকম বীজ আমরা বুনি, সে রকমই ফসল আমরা পাই। আমরাই আমাদের ভাগ্য তৈরী করি, তার জন্য কাউকে দোষারোপ করার কিছু নেই, কাউকে প্রশংসা করারও কিছু নেই। "
- **৬.৩) সমাজ গঠন ও চরিত্র গঠনের উপর মূল্যমান বানী**
- "হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নহে। আমাদের কার্যকলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে ঐ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল নিদ্রিত ছিলেন মাত্র। উঠ, তাহাকে জাগাও— আর নূতন জাগরনে নূতন প্রাণে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে তাঁহার শাশ্বত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর।"
- "আমাদের প্রথম কর্তব্য হল নিজেকে ঘৃণা না করা। উন্নত হইতে হইলে প্রথম নিজের উপর, তারপরে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আবশ্যক। যাহার নিজের উপর বিশ্বাস নাই, তাহার

কখনই ঈশ্বরে বিশ্বাস আসিতে পারে না। কর্মযোগী জানেন, অপ্রতিকারই সর্বোচ্চ আদর্শ – তিনি আরও জানেন যে উহাই শক্তির উচ্চতম বিকাশ এবং অন্যায়ের প্রতিকার" ।

- "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা-এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না-তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুকের-নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মূচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; ...." (স্বদেশ মন্ত্র; স্বামী বিবেকানন্দ)
- "সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রবল অধ্যবসায়, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই। অধ্যবসায়শীল সাধক বলেন,' আমি গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিব। আমার ইচ্ছামাত্র পর্বত চূর্ণ হইয়া যাইবে।' এইরূপ তেজ, এইরূপ সংকল্প আশ্রয় করিয়া খুব দৃঢ়ভাবে সাধন কর। নিশ্চয়ই লক্ষে উপনীত হইবে।"
- "তোমরা কাজ করে চল। দেশবাসীর জন্য কিছু কর, তাহলে তারাও তোমাদের সাহায্য করবে, সমগ্র জাতি তোমার পিছনে থাকবে। সাহসী হও, সাহসী হও! মানুষ একবারই

মরে। আমার শিষ্যেরা যেন কখনো কোনমতে কাপুরুষ না হয়।"

- "যারা তোমায় সাহায্য করেছে, তাঁদের কখনও ভুলে যেও না। যারা তোমাকে ভালোবাসে, তাদের কোনওদিন ঘৃণা করো না। আর যারা তোমাকে বিশ্বাস করে, তাদের কখনও ঠকিয়ো না।"
- "তুমি খ্রিষ্টের মতো ভাবলে তুমি একজন খ্রিষ্টান, তুমি বুদ্ধের মতো ভাবলে তুমি একজন বৌদ্ধ। তোমার ভাবনা, অনুভূতিই তোমার জীবন, শক্তি, জীবনীশক্তি। যতই বুদ্ধি দিয়ে কাজ করো, এগুলি ছাড়া ভগবানের কাছে পৌঁছনো সম্ভব নয়।"
- "দর্শনবর্জিত ধর্ম কুসংস্কারে গিয়ে দাঁড়ায়, আবার ধর্মবর্জিত দর্শন শুধু নাস্তিকতায় পরিণত হয়। আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা "
- "ওরে, কেউ কাকেও শেখাতে পারে না। 'শেখাচ্ছি' মনে করেই শিক্ষক সব মাটি করে । কি জানিস, বেদান্ত বলে-এই মানুষের ভেতরেই সব আছে । একটা ছেলের ভেতরেও সব আছে । কেবল সেইগুলি জাগিয়ে দিতে হবে, এইমাত্র শিক্ষকের কাজ । ছেলেগুলো যাতে নিজ নিজ হাত-পা নাক-কান মুখ-চোখ ব্যবহার করে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শেখে, এইটুকু করে দিতে হবে । তাহলেই আখেরে সবই সহজ হয়ে পড়বে । " (উৎস; বিবেকাবানী)

৬.৪) শিক্ষা-বিষয়ক বাণী;

- "ব্রাহ্মণের ছেলেদের শিক্ষার জন্য যদি একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, তবে শূদ্রের ছেলেদের শিক্ষার জন্য অন্ততঃপক্ষে চারজন শিক্ষকের প্রয়োজন। অজ্ঞতার অন্ধকারে যারা নিমজ্জিত তাদের সেবা না করলে পৃথিবীর মঙ্গল হবে না।"
- "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অর্ন্তঃনিহিত সত্ত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ।"

আমরা দেখেছি স্বামীজী তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে, কর্মযজ্ঞে এবং বাণীর মাধ্যমে ভারতের পুনঃরুত্থানের জন্য অপরিহার্য শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতি নির্ধারণ করে গিয়েছেন। স্বামীজির মতে প্রকৃতি শিক্ষা উদ্দেশ্য হল- মানুষ গড়া। তাঁর মতে, প্রকৃতি শিক্ষা তথ্য ভিত্তিক, যন্ত্রবৎ এবং অনুকরণশীল হতে পারে না। তিনি বলেছেন, তথ্য ভিত্তিক, যন্ত্রবৎ এবং অনুকরণশীল শিক্ষা ব্যবস্থা কেরানিকুল তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু কোনকিছু মহৎ বা বৃহৎ কল্যাণকর কাজ হতে পারে না। তাঁর মতে, প্রকৃতি শিক্ষার উদ্দেশ্য হল; মানুষ গঠন, চরিত্র গঠন, আধ্‌মাতিক চেতনা বৃদ্ধি।

শিক্ষার উপর ২৩জুন১৮৯৪ তারিখে চিকাগো থেকে মহীশূরের মহারাজাকে লেখা স্বামীজীর পত্র; " আমাদের দেশে সহস্র দৃঢ়চিত্ত নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা এখন গ্রামে গ্রামে যাইয়া লোককে ধর্ম শিখাইতেছেন। যদি তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলিকে সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিদ্যাসমূহের শিক্ষকরূপে সংগঠন করা যায়, তবে তাঁহারা এখন যেমন এক স্থান হইতে অপর স্থানে, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ধর্মশিক্ষা দিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক বিদ্যাও শিখাইবেন। মনে করুন, এইরূপ দুইজন লোক একখানি ক্যামেরা, একটি গোলক ও কতকগুলি ম্যাপ প্রভৃতি লইয়া কোন গ্রামে গেলেন। এই ক্যামেরা ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্যে তাঁহারা অজ্ঞ লোকদিগকে জ্যোতিষ ও ভূগোলের অনেক তত্ত্ব শিখাইতে পারেন! তারপর যদি বিভিন্ন জাতির— জগতের প্রত্যেক দেশের লোকের বিবরণ গল্পচ্ছলে তাঁহাদের নিকট বলা যায়, তবে সমস্ত জীবন বই পড়িয়া তাহারা যাহা না শিখিতে পারে, তদপেক্ষা শতগুণে অধিক এইভাবে মুখে মুখে শিখিতে পারে। ইহা করিতে হইলে একটি সঙঘ গঠনের আবশ্যক হয়, তাহাতে আবার টাকার দরকার। ভারতে এইজন্য কাজ করিবার যথেষ্ট লোক আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় টাকা নাই। একটি চাকা গতিশীল করিতে প্রথমে অনেক কষ্ট; একবার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে উহা উত্তরোত্তর অধিকতর বেগে ঘুরিতে থাকে। আমি

আমার স্বদেশে এই বিষয়ের জন্য যথেষ্ট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি; কিন্তু ধনিগণের নিকট আমি এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সহানুভূতি পাই নাই। মহামান্য মহারাজের সাহায্যে আমি এখানে আসিয়াছি। ভারতের দরিদ্রেরা মরুক বাঁচুক, আমেরিকানদের সে বিষয়ে খেয়াল নাই। আর আমাদের দেশের লোকেই যখন নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু ভাবে না, তখন ইহারাই বা ভাবিবে কেন?

হে মহামান্য রাজন্! এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর, জগতের ধন মান ঐশ্বর্য—সকলই ক্ষণস্থায়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে। মহারাজের ন্যায় মহামনা একজন রাজবংশধর ইচ্ছা করিলে ভারতকে আবার নিজের পায়ে দাঁড় করাইয়া দিতে পারেন, তাহাতে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ শ্রদ্ধার সহিত আপনার নাম স্মরণ করিবে। ঈশ্বর করুন, যেন আপনার মহৎ অন্তঃকরণ অজ্ঞতায় নিমগ্ন লক্ষ লক্ষ আর্ত ভারতবাসীর জন্য গভীরভাবে অনুভব করে। ইহাই প্রার্থনা।"(উৎস; ২৩জুন,১৮৯৪ তারিখে চিকাগো থেকে মহীশূরের মহারাজাকে লেখা স্বামীজীর পত্র)

৫.৫) 'চরিত্র গঠন' সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ বাণী;

- "নিজের উপর বিশ্বাস রাখো। নিজের উপর বিশ্বাস না এলে ... ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আসে না।"
- "জগতে এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র; জগত এখন তাদের চায়– যাদের জীবন প্রেমদীপ্ত ও স্বার্থ শূন্য।"
- "শুধু বড়ো লোক হয়ো না ... বড় মানুষ হও।"
- "যারা তোমাকে সাহায্য করেছে, তাদের কখনও ভুলে যেও না। যারা তোমাকে ভালোবাসে, তাদের কখনও ঘৃণা কোরো না। যারা তোমাকে বিশ্বাস করে, তাদের কখনও ঠকিয়ো না।",
- "সেবা করো তাৎপরতার সাথে। দান করো নির্লিপ্ত ভাবে। ভালোবাসো নিঃস্বার্থভাবে। ব্যয় করো বিবেচনার সাথে। তর্ক করো যুক্তির সাথে। কথা বলো সংক্ষেপে।"
- "প্রবিত্র ও নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা কোরো, তার মধ্যেই রয়েছে সমস্ত ধর্ম।"

- "কাপুরুষরাই পাপ কাজ করে, মিথ্যা কথা বলে। বীর কখনও পাপ করে না। হে বীর হৃদয় যুবকবৃন্দ –এগিয়ে যাও। লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্রমশ ডুবছে, তাদের উদ্ধার করো। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত –এটাই আমাদের মূলমন্ত্র" ।

৭; শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভা যোগদান ও বিশ্বের হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা

আগেই বলা হয়েছে ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভায় যুগান্তকারী সাফল্য এবং পাশ্চাত্যে তাঁর ভারতের 'বেদান্ত' দর্শনের প্রচার ভারতবর্ষকে পরম গৌরবে ভূষিত করেছে। সে কথা এখানে বারে বারে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।এখন আমরা আলোচনা করব- তিনি শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভায় কিভাবে পৌঁছেছিলেন এবং কিভাবে বিশ্বের দরবারে ভারতের ধর্মকে উপস্থাপন করে হিন্দুধর্মকে পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ভারতের হিন্দুধর্ম তথা বেদান্ত দর্শন প্রচার করে মুমূর্ষু এক জাতী ও তার ধর্মের বিস্ববাপী গৌরব ও গতি ফিরিয়ে আনলেন তিনি। এই বিশ্বধর্ম মহাসভার পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্যের দেশগুলি হিন্দুধর্মকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত; যেমন তারা ভারতীয়দেরকে ভীষণ ঘৃণা করত। তারা মনে করত, হিন্দুধর্ম কুসংস্কার, দুরাচার ও নীতিহীন লোকাচারের সমষ্টি মাত্র। তাই বিবেকানন্দের বেদান্ত বানী প্রচারের পূর্বে প্রগতিশীল জগতে হিন্দুধর্মের কোন স্থান ছিল না। বিশ্বধর্ম মহাসভার বেদান্ত দর্শনের সুউচ্চ ও প্রাচীনতম তত্ত্বের উপর বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ ও জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা শুনে, পাশ্চাত্যের সভ্য দেশগুলি হিন্দুধর্মকে আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন করে এবং বেদান্ত দর্শনকে তারা বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উচ্চ আসন প্রদান করে। শুধু তাই নয়, বিশ্বধর্ম মহাসভার সমাপ্তি পরে কয়েক বছরধরে ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে তিনি ভারতের বেদান্ত দর্শন প্রচার করেন। বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে তিনি সেখানে প্রমান করেছিলেন যে আধ্যাত্মিকতাই হল হিন্দুধর্মের ভিত্তিপ্রস্তর। *[উৎস;চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ.২১পৃ]*

৭-২) বিশ্বধর্ম মহাসভায় স্বামীজীর যোগদানের জন্য শ্রী রামকৃষ্ণের সপ্নাদেশ লাভ;

শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভায় স্বামীজীর যোগদান সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই মণে আসে কিভাবে তিনি ঐ বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদানের জন্য তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সপ্নাদেশ লাভ করেছিলেন।এই প্রসঙ্গে মারি লুইস বার্ক এর লেখা "ঊনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় পশ্চাত্যে বিবেকবানীর তাৎপর্য" নামে একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। 'উদ্বোধন পত্রিকা'(৭৫ বর্ষ)থেকে সংগৃহীত- মারি লুইস বার্ক তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, ১৮৯৩ সালের এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভায় তাঁর যোগদান ব্যাপারে স্বামীজী মনস্থির করে উঠতে পারেন নি। ঐ সময় শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে আদেশ করলেন পাশ্চাত্যে যেতে। স্বামীজী বলেছেনঃ "আমার শিকাগো ধর্মমহাসভায় যাবার ইচ্ছা ছিল না, মনে মণে না যাওয়ার সিধান্ত করেছিলাম। কিন্তু ঠাকুর আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বার বার বলতে লাগলেন-'আমার কাজের জন্য এসেছিস।; তোকে যেতেই হবে। তোর জন্যই ঐ সভার আয়োজন জানবি।" এই প্রসঙ্গে মারি লুইস বার্ক আরও লিখেছেন যে, আমেরিকা যাবার কয়েক মাস আগে, স্বামীজী তাঁর গুরুভাই তুরীয়ানন্দকে আবু পাহাড়ে বলেছিলেনঃ *"হরি ভাই, ঐ ধর্ম মহাসভা-টভা যা হতে চলেছে তা এর জন্যই (নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে)। আমার মন তাই-ই বলছে। দেখবে শিগগির এটি ফলে যাবে।"* [উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ -৯৮-৯৯পৃ]

৭-৩) বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর শিকাগো যাত্রা;

মহীশূরের মহারাজা, খেত্রীর মহারাজা অজিত সিং এবং অন্যান্য অনুগামীদের দ্বারা সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে "বিবেকানন্দ" নাম গ্রহণ করে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে বোম্বে থেকে শিকাগোয় যাত্রা শুরু করেছিলেন। ১৮৯৩ সালের মে মাসে শিকাগো যাত্রা পূর্বে খেত্রীর মহারাজের অনুরোধে ২১শে এপ্রিল স্বামীজী 'স্বামী

সচ্চিদানন্দ’ নামের পরিবর্তে ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ নাম গ্রহণ করেন। আমেরিকার শিকাগো শহরে এই বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল এবং ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলেছিল। এটি ছিল বিশ্বের প্রথম ধর্মীয় মহাসম্মেলন। সমগ্র বিশ্ব থেকে ধর্মীয় প্রতিনিধিরা এই মহাসম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর মাদ্রাজ শিষ্য, মহীশূরের রাজা, খেত্রীর মহারাজা অজিত সিং এর বিশেষ অনুপ্রেরণায় এবং অনুরোধে শিকাগো শহরে এই বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন যোগদান করতে রাজী হয়েছিলেন। ১৮৯২ সাল; ১৮ই অক্টোবর; স্বামীজী হরিপদ মিত্রকে তাঁর শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদানের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন।

৭-৪) মহাসভায় স্বামীজীর অংশগ্রহণের জন্য অর্থসংগ্রহ;

২২ সে ডিসেম্বর ১৮৯২; পদব্রজে রামেশ্বর যাওয়ার পথে মাদুরায় রামনাদের রাজা, ভাস্কর সেতুপতি সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। রাজা ভাস্কর সেতুপতিও ঐ সময় স্বামীজীকে বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদান করতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন এবং তাঁকে ঐ ব্যাপারে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

১৮৯৩ সালে জানুয়ারী মাসে মাদ্রাজ ট্রিপলিকেন লিটারারী সোসাইটিতে বক্তৃতা প্রদানের সময় স্বামীজী মদ্রাজের শিক্ষিত যুবকদের কাছে তাঁর পাশ্চাত্যগমনে পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তখন যুবকগন স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার পাথেয় হিসাবে পাঁচশ টাকা সংগ্রহ করে দেন।

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩, হায়দরাধিপতি শ্যালক নবাব বাহাদুর স্যার খুরশিদের সঙ্গে স্বামীজী সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সঙ্গে বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদানের জন্য পাশ্চাত্যগমন সম্পর্কে আলোচনা করেন। নবাব বাহাদুর স্বামীজীকে তাঁর পাশ্চাত্যযাত্রার জন্য একহাজার টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ হায়দারবাদে বেগম বাজারের বনিকরা সম্মিলিত হন এবং স্বামীজীর পাশ্চাত্যযাত্রার জন্য অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারি১৮৯৩, হায়দারবাদ থেকে তিনি মদ্রাজে আসেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন সভায় ধর্মালোচনা ও বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সেখানে অনেক মানুষ স্বামীজীর ভক্ত হয়ে পড়েন। ১৮৯৩ সালে মার্চ ও এপ্রিল মাসে মদ্রাজে স্বামীজীর ভক্ত ও শিষ্যগণ স্বামীজীর পাশ্চাত্যযাত্রার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। তাঁর একান্ত ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমলের নেতৃত্বে শিষ্যদের দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করা হয়। এই প্রসঙ্গে অর্থ সংগ্রহকারীদের প্রতি স্বামীজীর একটি নির্দেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য; তাঁর শিষ্যদেরকে তিনি বলেছিলেন; "মায়ের ইচ্ছায় যদি আমার পাশ্চাত্যযাত্রা হয়, তাহলে সেই জন্য জনসাধারণের কাছ্ থেকে অর্থসংগ্রহ করতে হবে কারন আমি জনসাধারণ ও দরিদ্রের জন্যই পাশ্চাত্যে যাচ্ছি।" [উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ ১০৯৩-১০১৫পৃ]

৭.৫) যাত্রা পথ ও সময়

বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে বোম্বে (মুম্বাই) থেকে পেনিনসুলা জাহাজে করে আমেরিকার পথে যাত্রা শুরু করেন। আমেরিকা যাত্রাকালে তিনি চীন, জাপান, ও কানাডা ভ্রমন করেছিলেন।চীনে ক্যান্টনে (কুয়াংচৌ)-তে তিনি কিছু বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন। এরপর তিনি জাপান পৌঁছে সেখানে প্রথমে নাগাসাকিতে যান। এরপর তিনি জাপানে আরো তিনটি বড় বড় শহর যেমন ওসাকা, কিয়োটা এবং টোকিও পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি ইয়োকোহামা থেকে ভারতের R M S Express of India নামে একটি জাহাজে কানাডা যাত্রা শুরু করেন। ঐ এক্সপ্রেস জাহাজে ইয়োকোহামা থেকে কানাডা যাওয়ার পথে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ঘটনাক্রমে জামসেদজি টাটার দেখা হয়ে যায়। তিনিও শিকাগো যাচ্ছিলেন। এরপর তিনি ভারতের প্রথম টেক্সটাইল মিল শুরু করেছিলেন। তিনি নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা জন্য সেই সময় শিকাগো

যাচ্ছিলেন।জাহাজে বিবেকানন্দ একটি আলোচনায় টাটাকে ভারতে একটি গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এরপর তাঁরা দুজন ভারতে স্টিল কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা করেছিলেন। ঐ আলোচনা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।তাঁদের ঐ গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যাইহোক বিবেকানন্দ ২৫ জুলাই ভ্যানকুভার পৌঁছান এবং সেখান থেকে তিনি ট্রেনে শিকাগো যাত্রা শুরু করেন। ৩০ জুলাই রবিবার রাত্রি সাড়ে দশটায় তিনি শিকাগোতে পৌঁছান।

৭-৬) শিকাগোতে বিবেকানন্দ এবং তাঁর বস্টন যাত্রা

কিন্তু শিকাগো শহরে পৌঁছে উনি দুটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হন — এক, মহাসভা শুরু হতে তখনো প্রায় দেড় মাস বাকি। তাই তাঁকে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে।কিন্তু তার জন্য তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না। দুই, তাঁর কাছে তখন কোনো নামকরা প্রতিষ্ঠানের প্রশংসাপত্র বা পরিচিতিপত্র ছিল না। প্রশংসাপত্র বা পরিচিতিপত্র ছাড়া কোন দেশের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদানের জন্য কোন ব্যক্তি অনুমতি পাবে না। তাই শিকাগো মহাসভায় অংশগ্রহণ ব্যাপারে স্বামীজীকে নানাবিধ অনিশ্চিয়তা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অর্থাভাবের জন্যে এবং মহাসভায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিয়তার কারনে তাঁকে অতি কষ্টে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে হয়েছিল। সুলভে জীবন কাটানোর জন্য তিনি ট্রেনে বোস্টন শহরে চলে যান। সেই সময় ট্রেনে শ্রীমতী ক্যাথেরিন এবট স্যানবর্ণের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়। এরপর ২৫সে আগস্ট শ্রীমতী ক্যাথেরিন এবট স্যানবর্ণের ভ্রাতা এফ বি স্যানবর্ণের সঙ্গে স্বামীজী প্রশংসাপত্রের জন্য বোস্টনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

৭-৮) জন হেনরি রাইটের সাথে সাক্ষাৎ

বোস্টনে বিবেকানন্দ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের (J H Write) সঙ্গে যখন দেখা করেন তিনি, অধ্যাপক রাইট বিবেকানন্দকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। বিবেকানন্দের জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর, অধ্যাপক রাইট তাঁকে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আহ্বান করলেন। তার আগে তিনি জানতেন না যে বিবেকানন্দ বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় গিয়েছেন। যখন রাইট জানতে পারলেন যে বিবেকানন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে অংশগ্রহণের জন্য স্বীকৃত নন এবং সংসদে যোগদানের জন্য তাঁর কোনো প্রশংসাপত্র নেই, তখন তিনি বিবেকানন্দকে সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ করে দেন এবং একটি প্রশংসাপত্র দেন। ঐ প্রশংসাপত্রে লেখেন- *"এই তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্য আমাদের সমস্ত অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্যের সমষ্টির চেয়ে বেশি।* "Here is a man who is more learned than all our learned professors put together."

প্রশংসাপত্র দেওয়ার সময় অধ্যাপক জে.এইচ রাইট স্বামীজীর উদ্দেশ্যে যে উদ্ধৃতিটি করে ছিলেন, এখানে সেটি বিশেষ উল্লেখজোগ্য। অধ্যাপক জে.এইচ রাইট বলেছিলেন, "To ask you, Swami, for your credentials, is like asking the sun to state its right to shine." অর্থাৎ তিনি লিখলেন; "আপনার কাছে প্রশংসাপত্র চাওয়াটা হচ্ছে স্বর্গে সূর্যের আলো দেওয়ার অধিকার চাওয়ার মতো অবস্থা।" জানা যায় ঐ প্রফেসর রাইট বিশ্বধর্ম মহাসভা ডেলিগেট বাছাইয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

তৎকালীন আমেরিকার সংবাদপত্র বিবেকানন্দকে বিশ্বধর্ম মহাসভায় "সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব" এবং 'সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি' বলে বর্ণনা করেছিল। 'স্টান ইভিনিং' পত্রিকা লিখেছিল যে স্বামী বিবেকানন্দ "মহাসভায় বিবেকানন্দ ছিলেন খুব জনপ্রিয় ... তিনি যখনই মহাসভায় প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করতেন

তখন তাঁকে সকলে সাধুবাদ দিতেন"। (The Complete Works of Swami Vivekananda/Volume3

৭-৯) শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভায় বিবেকানন্দের বত্তৃতায়

১১ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় স্বামীজি প্রথম ভাষণ। দীর্ঘ বিলম্বের পর ঐদিন বিকেলের দিকে তিনি বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পান। প্রাথমিকভাবে বিচলিত হলেও পরবর্তীতে দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করে তিনি তাঁর বত্তৃতা শুরু করেছিলেন। যদিও সেখানে ভাষণ দিতে বারবার ভয় পাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু শেষবার তাঁকে না জানিয়েই তাঁর নাম ডাকা হয় ভাষণ দেওয়ার জন্য। এরপর বলতে উঠেই প্রথমে সকলকে 'ভাই বোন' বলে আন্তরিক ভাবে সম্ভাষণ করেন । এই সম্ভাষণ শুনেই উদ্বেলিত হয়েছিল হাজার হাজার মার্কিনবাসী। তাঁর এই আন্তরিক সম্ভাষণের জন্য বিবেকানন্দ সেখানে করতালির অভিবাদন পেয়েছিলেন দুই মিনিট ধরে। বিশ্বের সর্ব প্রাচীন সভ্যতার দেশ ভারতের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি তাঁর ভাষণ শুরু করেছিলেন সেদিন। বিশ্বধর্ম মহাসভায় স্বামীজি উদ্বোধনী ভাষণে যা বলেছিলেন তাঁর বঙ্গানুবাদ হল – *"হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ আপনারা যে আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা করেছেন, তার উত্তর দেওয়ার জন্য আমার হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসী-সমাজের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। সর্বধর্মের যিনি প্রসূতি-স্বরূপ,তাঁর নামে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর তরফে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। এই সভামঞ্চে সেই কয়েকজন বক্তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলেন যে, অতি দূরদেশবাসী জাতিসমূহের মধ্য থেকে যাঁরা এখানে এসেছেন, তাঁরাও বিভিন্ন দেশে পরধর্মসহিষ্ণুতার ভাব প্রচারের গৌরব দাবি করতে পারেন। যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্বাধিক মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়েও আসছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে নিজেকে*

গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকেই সহ্য করিনা, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে গর্ব অনুভব করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়ে আসছে, আমি সেই জাতির অর্ন্তভুক্ত বলে নিজেকে গর্বিত মনে করি।" (সংগ্রহীত)

স্বামীজী আরও বলেন – *"কোটি কোটি নরনারী যে স্তোত্রটি প্রতিদিন পাঠ করেন, যে স্তবটি আমি শৈশব থেকে আবৃত্তি করে আসছি, তাঁরই কয়েকটি পঙক্তি উদ্‌ধৃত করে আমি আপনাদের বলছি - বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলে যেমন এক সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢেলে মিলিয়ে যায়, তেমনি হে ভগবান, নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সরল ও কুটিল নানা পথে যারা চলছে, তুমিই তাঁদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য। পৃথিবীতে এযাবৎ অনুষ্ঠিত সন্মেলনগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাসন্মেলন এই ধর্ম-মহাসভা গীতা-প্রচারিত সেই অপূর্ব মতেরেই সত্যতা প্রতিপন্ন করছি, সেই বাণীই ঘোষণা করছি -যে যেভাবে আশ্রয় করে আসুক না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথেই চলিয়া থাকে।"* (সংগ্রহীত)

ঐ ধর্মমহাসভায় তাঁর বিরামহীন সতেরদিন বত্‌তৃতার পর তিনি ঐ যুগের একজন বিদগ্ধবাগ্মী, জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু, অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন বিশ্ববিদিত এক মহাপুরুষ রূপে প্রসিদ্ধ হলেন। উল্লেখ্য, 'নিউইয়র্ক ক্রিটিক' স্বামী বিবেকানন্দকে দৈবিশক্তিসম্পন্ন বক্তারূপে বর্ণনা করেছিল। ঐ ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ মহিলা কবি, মিস হ্যারিয়য়েট। তিনি ধর্মমহাসভা ও স্বামী বিবেকানন্দ যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তা আমাদের কাছে চির-স্মরণীয়। তিনি লিখেছিলেন; *". It was the last of these, Swami Vivekananda, the magnificent, who stole the whole show and captured the town. Others of the foreign groups spoke well—the Greek, the Russian, the Armenian, Mazoomdar of Kolkata, Dharmapala of Sri Lanka—leaning,*

some of these upon interpreters. Shibata, the Shintu, bowed his wired white headdress to the ground, spread his delicate hands in suave gestures, and uttered gravely with serene politeness his incomprehensible words. But the handsome monk in the orange robe gave us in perfect English a masterpiece; His personality, dominant, magnetic; his voice. Rich as a bronze bell; the controlled fervor of his feeling; the beauty of his message to the Western world he was facing for the first time –these combined to give us a rare and perfect moment of supreme emotion. It was human at his highest pitch"। [উৎস ***Harriet Monroe; New Discoveries &*** চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ & **Reminiscences of Swami Vivekananda**]

স্বামীজীর বত্তৃতা সম্পর্কে আমেরিকার ডেলি হেরাল্ড পত্রিকা লিখেছিল; "—At the Parliament of Religions, Vivekananda was not allowed to speak until the close of the Programme, the purpose being to make the people stay until the end of the session. On a warm day when some prosy professor talked too long and people would leave the hall by hundreds, it only needed the announcement that Vivekananda would give a short address before the benediction was pronounced to hold the vast audience intact and thousands would wait for hours to hear a fifteen minutes talk from the remarkable man"

এখনে আর একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখজোগ্য, শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভায় তাঁর নির্ভীক ব্যক্তিতের এতটাই প্রকাশ ঘটেছিল যে আমেরিকার সাংবাদিকরা তাঁকে Cyclonic Hindu Monk বলে আখ্যা দিইয়েছিল। সম্মেলনে তাঁর অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা পর, শিকাগোর রাস্তায় রাস্তায় তাঁর বড় বড় পোস্টার-ছবি টাঙানো হয়েছিল। সেই ছবি ছিল তাঁর বীরমূর্তির চিত্র; নির্ভীক ও প্রাজ্ঞ হিন্দু

সন্ন্যাসীর চিত্র। শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভায় স্বামীজীর ভাষণ শুনে স্যার হিরাম স্টিভেনস ম্যাক্সিম এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি লিখেছিলেন যে "......বিবেকানন্দের প্রথম ভাষণ কোন দৈববাণী আপ্তবাক্য প্রকাশের চেয়ে কম ছিল না।....".

শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভায় বিবেকানন্দের বক্তৃতা উপর স্যার হিরাম ম্যাক্সিমের যে মন্তব্য ছিল, তার কিছুটা অংশ তুলে ধরছি;

"When, however, Viva Kananda (*Vivekananda)* spoke, they saw that they had a Napoleon to deal with. His first speech was no less than a revelation. Every word was eagerly taken down by the reporters, and telegraphed all over the country, where it appeared in thousands of papers. Viva Kananda became the lion of the day. He soon had an immense following. No hall could hold the people who flocked to hear him lecture. They had been sending silly girls and half educated simpletons of men, and millions of dollars, to Asia for years to convert the poor benighted heathen and save his alleged soul; and here was a specimen of the unsaved who knew more of philosophy and religion than all the parsons and missionaries in the whole country. Religion was presented in an agreeable light for the first time to them. There was more in it than they had ever dreamed; argument was impossible. He played with the parsons as a cat plays with a mouse. They were in a state of consternation. What could they do? What did they do? What they always do-they denounced him as an agent of the devil. But the deed was done; he had sown the seed, and the Americans commenced to think. They said to themselves: "Shall we waste our money in sending mis- sionaries who know nothing of religion, as compared with this man, to teach such men as he? No!" And

the missionary income fell off more than a million dollars a year in consequence. ..." (*http://www.vivekananda.net)*

উল্লেখ্য, স্যার হিরাম স্টিভেনস ম্যাক্সিম (Sir Hiram Stevens Maxim) হলেন প্রাশ্চাতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন আমেরিকান-ব্রিটিশ যিনি প্রথম স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান, ম্যাক্সিম বন্দুকের আবিষ্কারক হিসেবে পরিচিত। ম্যাক্সিম অসংখ্য যান্ত্রিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন। তিনি ম্যাক্সিম লাইট বাল্ব উদ্ভাবনেরও দাবি করেন। ঐ সকল বিদগ্ধ ব্যাক্তিদের মন্তব্য স্বামীজীর বিশ্ববিজয়ের অসাধারণ শক্তির প্রমান দেয়। নিঃসহায়, নিঃসম্বল একজন হিন্দু সন্ন্যাসী যিনি ছিলেন একদিন কলকাতার এক সহায়-সম্বলহীন বি এ পাস করা বেকার যুবক শুধু মাত্র তাঁর নির্ভীক, জ্ঞানগর্ভ বত্তৃতা, বাগ্মিতা, ঈশ্বরের প্রতি পরম বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসের সাহায্যে তিনি সেদিন বিশ্বজয় করে ভারতে ফিরেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর অসাধারণ জ্ঞানগর্ভ বত্তৃতা ও সেখানে তিন বছরের বেশি সময় দিয়ে বেদান্ত ধর্ম প্রচারের মধ্যমে তিনি পরাধীন ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে এক ঐতিহ্যবাহী এবং প্রাচীনতম ধর্মের দেশ বলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরাধীন ভারতবাসীর মধ্যে হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিলেন তিনি। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখালেন বহু বীর ভারতবাসীকে।

উল্লেখ্য, ১সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ সালের অমৃত বাজার পত্রিকার স্মপাদকীয়তে লেখা হল; "He has done much more to elevate our nation in the estimation of people of the West than what has hitherto been done by our political leaders put together."

৬) বিশ্বধর্ম মহাসভার স্বামীজীর বত্তৃতার কিছু অংশ;

আগেই বলা হয়েছে যে ১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটে ধর্মসভা উদ্বোধন হয় । বিবেকানন্দ সেখানে ভারত এবং হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। ঐ দিন বিবেকানন্দ তাঁর প্রথম সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে হাজার হাজার শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিমোহিত করেছিলেন। প্রথমদিকে কিছুটা

বিচলিত থাকলেও, কিন্তু মঞ্চে উঠে তিনি বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনা করে নির্ভীকভাবে তিনি তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন। তাঁর এ সম্ভাষণে প্রায় সাত হাজার শ্রোতৃমণ্ডলী দর্শক-শ্রোতা দুই মিনিট দাঁড়িয়ে আন্তরিকভাবে ও অতি শ্রদ্ধা সঙ্গে তাঁকে স্বামীজীকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে Mrs. S K. Blodget, এক বিশিষ্ট আমেরিকান ভদ্রমহিলা পরে বলেছিলেন; "I was at the Parliament of Religions at Chicago in 1893 and when the young man (Vivekananda) got up and said, "Sisters and Brothers of America", seven thousand people rose to their feet over as a tribute to something, they knew not what and when it was over and I saw scores of women walking over the benches to get near him, I said to myself, "Well, my lad, if you can resist that onslaught, you are indeed a God." ... (Vedanta: Voice of Freedom.40P)

❖ সভার সভাপতি ও নিউইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকার মন্তব্য

সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা হওয়া সত্ত্বেও এটি সভার আত্মা এবং এর বিশ্বজনীন চেতনা ধ্বনিত করে। সভার সভাপতি, ডঃ ব্যারোজ বলেন, " সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মসমূহের মাতা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং তিনি শ্রোতাদের উপর বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করেছেন ।" নিউ ইয়র্ক ক্রিটিক লিখেছিল, "ঐশ্বরিক অধিকারবলে তিনি একজন বক্তা এবং হলুদ ও কমলার চিত্রবৎ আধানে তাঁর শক্তিশালী, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার চেয়ে কম আগ্রহোদ্দীপক ছিল না ঐসকল সমৃদ্ধ ও ছন্দোময়ভাবে উচ্চারিত শব্দসমূহ। নিউইয়র্ক হেরাল্ড লিখেছিল, "বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে ধর্মসভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর বক্তৃতা শুনে আমরা অনুভব করি এ শিক্ষিত জাতির নিকট মিশনারি পাঠানো কি পরিমাণ বোকামি ।" আমেরিকার পত্রিকাসমূহ স্বামী বিবেকানন্দকে "ধর্মসভার সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব" এবং "সভার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি" হিসেবে প্রতিবেদন করেছিল। তিনি সভায় আরো অনেকবার হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম

সম্পর্কিত বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ ও তথ্য প্রদান করেন। ধর্ম সম্মেলন ১৮৯৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর সমাপ্ত হয়। সভায় তাঁর সকল বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি হল- ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্ম পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম এবং ধর্মের সর্বজনীনতা এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা।

বিশ্বধর্ম মহাসভায় বেদান্ত দর্শনের উৎপত্তি ও বিশালতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন; ভারতের বেদান্ত দর্শন বিশ্বের সমস্ত দর্শনের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এবং বৃহত্তম দর্শন। পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সাথে আত্মার অমরত্ব এবং আত্মার একত্ব নিয়ে আলোচনায় তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন, –"সকল মানুষই হল ঐশ্বরিক ও অমরাত্মা। তাদের আসল প্রকৃতি হল আত্মা, যা অসীম, চিরন্তন, আনন্দময় এবং ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন। আত্মা সর্বদা শক্তিশালী এবং সকল বন্ধন থেকে মুক্ত। তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা জীবনে কষ্ট ভোগ করে, কিন্তু তারা পাপী নয়। অন্তর্নিহিত শক্তি বা পরাক্রমতা হল পুণ্য ও নৈতিক উত্কর্ষ। দুর্বলতা বা ক্ষীণতা হল পাপ। আমাদের দুর্বলতা বা পাপকে ঘৃণা করা উচিত। আলো আসার পর যেমন অন্ধকার অদৃশ্য হয়ে যায়, তেমনি জ্ঞান অর্জিত হলে অজ্ঞানতা বন্ধ হয়ে যায়। অজ্ঞতা সমস্ত দুর্বলতা এবং ভয়ের জন্ম দেয়, যখন প্রকৃত জ্ঞান শক্তি এবং স্বাধীনতা এনে দেয় আমাদের জীবনে।আত্মা কখনো দুর্বল বা অক্ষম হতে পারে না কারন আত্মা সবসময় শক্তিশালী, চিরন্তন ঐশ্বরিক ও অমর। শক্তি এবং স্বাধীনতা বা দুর্বলতা এবং বন্ধন সবই মানুষের মনের ধারনা বা চিন্তাধারা, কারণ কেউ যদি নিজেকে দুর্বল এবং বন্ধনযুক্ত মনে করে বা চিন্তা করে,তবে সে দুর্বল এবং আবদ্ধ বা নিবদ্ধ হয়ে পড়ে।আবার কেউ যখন শক্তি এবং স্বাধীনতার কথা চিন্তা করে সে তখন শক্তিশালী এবং মুক্ত হয়ে যায়।" He said, "Soul can never be weak, but always strong, because it is eternal and divine. Strength and freedom or weakness and bondage are all in mind, because one becomes weak and bound if one thinks of weakness and bondage. (Ref. Vedanta- Voice of Freedom.)

এর অর্থ হল - আত্মা সর্বদা মুক্ত এবং শক্তিশালী। প্রকৃত আনন্দ এবং সুখ আসে শক্তি, ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা থেকে। আমাদের জীবনের লক্ষ্য হল আত্মার শক্তি, দেবত্ব, বা ঐশ্বরিকতার উপলব্ধি এবং বেদান্ত আমাদের ভিতরে দেবত্ব বা ঐশ্বরিকতার প্রকাশ ঘটায় এবং পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সাথে আত্মার একত্বের উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

❖ **মানুষের প্রকৃত স্বরূপের ব্যাখ্যা;**

বিশ্বধর্ম মহাসভায় মানুষের প্রকৃত স্বরূপ এবং আত্মা সম্বন্ধে তিনি বলেন; "আত্মা হল স্বয়ং ব্রহ্ম - প্রভুর মতোই। এই আত্মাই সব; এটাই একমাত্র বাস্তব ও সত্য। মায়া ও ভ্রান্তি, আমাদের একে অন্যরকম দেখতে বাধ্য করে। একটি মাত্র আত্মা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, অনেক নয়। সেই একটি মাত্র আত্মা বিভিন্ন রূপে জ্বলজ্বল করে। মানুষ মানুষের ভাই কারণ সব মানুষ এক-একটি মাত্র আত্মা থেকে সৃষ্টি। বেদ বলে, একজন মানুষ আমার ভাই- শুধু এটাই নয়, ঐ মানুষটি হল আমি নিজেই। মহাবিশ্বের যে কোন অংশে আঘাত করার অর্থ হল, আমি শুধু নিজেকে আঘাত করি। আমি মহাবিশ্ব। এটা একটা ভ্রান্তি বা মায়া যখন আমি মনে করি আমি উমুক; আমি তুমুক; আমি জনাব এই; আমি জনাব সেই। এ সবকিছুই মায়া বা ভ্রান্ত ধারনা। যতই তুমি তোমার আসল আত্মার কাছে যাবে ততই তোমার মায়া বা বিভ্রান্তি বা ভ্রম দূর হয়ে যাবে।" "*It is a delusion that I think I am Mr. So-and-so—that is the delusion... The more you approach your real Self, the more this delusion vanishes". (Ref.;* Swami Vivekananda- Vedanta of Voice Freedom.339p)

স্বামীজী আরও বলেন - "যত বেশি বিভেদ এবং বিভাজন অদৃশ্য হয়ে যাবে, ততই আপনি সকলকে এক দেবত্ব বা স্বর্গীয় জীবরূপে উপলব্ধি করবেন। ঈশ্বর আছেন; কিন্তু তিনি মেঘের উপর বসে থাকা মানুষ নন। তিনি বিশুদ্ধ আত্মা। তিনি কোথায় থাকেন জানেন? আপনার নিজের থেকেও আপনার কাছেই। তিনি আত্মা। কিভাবে ঈশ্বরকে আপনি নিজের থেকে আলাদা এবং আলাদা

হিসেবে উপলব্ধি করতে পারেন? যখন আপনি তাঁকে নিজের থেকে আলাদা কেউ মনে করবেন, তখন আপনি তাকে চিনতে বা জানতে পারবেন না। কারন তিনি আপনি। নিজেই আপনি" (Ref.; Swami Vivekananda- Vedanta of Voice Freedom.339p)

❖ সর্বধর্ম সমন্বয় নিয়ে ভাষণ

ঐ বিশ্বধর্মে পার্লামেন্টে তিনি সর্বধর্ম সমন্বয় সমন্ধে বলেন; খ্রিস্টান থেকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হবে এটা তাঁর অভিপ্রায় নয়। হিন্দু বা বৌদ্ধ খ্রিস্টান হওয়ার জন্য নয়। কিন্তু প্রত্যেককে অবশ্যই অন্য ধর্মের আত্ম বা অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে একীভূত বা একীকরণ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে তার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করতে হবে এবং তার নিজের বৃদ্ধির নিয়ম অনুসারে তাকে অগ্রসর হতে হবে। যদি এই ধর্মের পার্লামেন্ট বিশ্বকে কিছু দেখায়, তা হল:এটি বিশ্বকে প্রমাণ দিয়েছে যে পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, দান, দয়া এবং দাক্ষিণ্য পৃথিবীর কোনো গির্জার একচেটিয়া সম্পদ নয় এবং প্রতিটি ব্যবস্থাই পুরুষ ও মহিলাদের তৈরি করেছে সবচেয়ে উন্নত ও মহিমান্বিত চরিত্র। *"The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist, nor a Hindu or a Buddhist to become a Christian. But each must assimilate the spirit of the others and yet preserve his individuality and grow according to his own law of growth... If the Parliament of Religions has shown anything to the world, it is this: It has proved to the world that holiness, purity and charity are not the exclusive possessions of any church in the world, and that every system has produced men and women of the most exalted character...."*

ঐ ধর্মমহাসভায় তাঁর সমস্ত বত্তৃতার মূল ভিত্তি ছিল বেদান্তের সার্বভৌম একত্ব অথবা অদ্বৈতবাদ। ঐ সময় পাশ্চাত্যজগত দাঁড়িয়েছিল দ্বৈতবাদের উপর ভিত্তি করে। বিষয় ও বিষয়ীর পার্থক্য, চেতনার আধার হিসাবে –স্বতন্ত্র বিষয় বা পদার্থের অস্তিত্ব –তা সেই স্বতন্ত্র পদার্থটি জড়, মন, বা আত্মা যাই হোক না কেন।[উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ—পৃ ১০৮]

❖ মূর্তিপূজার উপর বক্তৃতা

শিকাগো ধর্মসভায় নবম দিনে হিন্দুধর্মের উপর দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন তিনি। সেখনে বিবেকানন্দ বাহ্যপূজা বা মূর্তিপুজা উপর বত্তৃতা প্রদান করেছিলেন, কারন অ-হিন্দু ধর্মের লোকেরা, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের মানুষ মূর্তি পুজাকে পৌত্তলিকতার নামে ভীষণ ভাবে ঘৃণা করে। তাই তিনি সেখানে বলেছিলেন; বাহ্যপূজা বা মূর্তিপুজা হল ঈশ্বর উপলব্ধির প্রথমাবস্থা। উপলব্ধি কিঞ্চিৎ উন্নত হলে আসে পরবর্তী স্তর অর্থাৎ মানসিক প্রার্থনা। কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হল উচ্চতম স্তর। প্রাকৃত মানুষের মধ্যে খুব কম জনেরই কল্পনা ও বুদ্ধি পৌঁছাতে পারে সেই উচ্চতম স্তরে বা অতীন্দ্রিয় জগতে প্রার্থনার অবস্থাতে থাকে। খুব কমজনের উপলব্ধিতে আসে সেই আশ্চার্য চেতনা যার দ্বারা তারা উচ্চতম স্তরে পৌঁছাতে পারে। তাই অধিকাংশ হিন্দুগন মূর্তিপুজা করেন। (বানী ও রচনা ও *[উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ—পৃ ৫৮৩]*

৭) আমেরিকা ও ইউরোপে স্বামীজীর বেদান্তের প্রচার;

শিকাগোতে বিশ্বধর্ম মহাসভা শেষ হওয়ার পর বিবেকানন্দ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে ভক্ত ও শিষ্যদের অতিথি হিসেবে ভ্রমণ করেন এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির অনুরোধে সেখানে বেদান্তের উপর অনেক বক্তৃতা প্রদান করেন প্রায় তিন বৎসর। ব্রুকলিন এথিক্যাল সোসাইটির একটি প্রশ্ন-উত্তর পর্বের সময়, তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "প্রাশ্চাত্যের প্রতি আমার একটি বার্তা রয়েছে, যেমনটা বুদ্ধের ছিল প্রাচ্যের প্রতি।" প্রায় তিন বছর ধরে প্রশ্চাত্যজগতের মানুষের কাছে ভারতের সুপ্রাচীন বেদান্ত বানী প্রচার ও বিশ্লেষণ করে প্রকৃত ধর্মের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাদের সমাজের বহু জটিল সমস্যার সমাধানের পথ দেখিয়ে ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বরে ধর্মসভা শেষ হওয়ার পর পুরো দু-বছর পূর্ব ও কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করে চিকাগো, ডেট্রয়েট, বোস্টন এবং নিউইয়র্কে বিবেকানন্দ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিউইয়র্কে বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি

সময়ে তাঁর বিরামহীন পরিশ্রমের কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে যায়। তিনি তাঁর বক্তৃতাদানের সফর স্থগিত রেখে সেখানে বেদান্ত ও যোগের উপর ব্যক্তি পর্যায়ে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের জুন থেকে দুই মাসব্যাপী তিনি থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে তাঁর বহু শিষ্যকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বেদান্তের শিক্ষা দিতে লাগলেন। [The Complete works of Vivekananda]

১৮৯৫ ও ১৮৯৬ সালে বিবেকানন্দের ইংল্যান্ড ভ্রমণ

প্রাশ্চাত্যে তাঁর প্রথম পরিদর্শনের সময় ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দু-বার ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেন এবং সেখানে বেদান্তের উপর অনেক বক্তৃতা প্রদান। সেখানেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল এক আইরিশ মহিলা মিস মার্গারেট নোবলের সাথে, যিনি পরে ভগিনী নিবেদিতা নামে আমাদের দেশে বিশেষ ভাবে পরিচিত। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে তাঁর দ্বিতীয় ইংল্যান্ড ভ্রমণের সময় পিমলিকোতে এক গৃহে অবস্থানকালে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিখ্যাত দার্শনিক ও ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্স মুলারের সঙ্গে, যিনি পরে পাশ্চাত্যে প্রথম শ্রী রামকৃষ্ণের আত্মজীবনী লেখেন। এরপর স্বামীজী ইংল্যান্ড থেকে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশেও ভ্রমণ করেন। জার্মানিতে তিনি আরও একজন ভারততত্ত্ববিদ ও বিখ্যাত দার্শনিক পল ডিউসেনের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।সেখানে তিনি দুটি বড় শিক্ষায়তনে যোগদানের প্রস্তাবও পেয়েছিলেন- হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য দর্শনের চেয়ার এবং কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ধরনের প্রস্তাব। তিনি প্রস্তাব দুটি প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, পরিভ্রমণকারী সন্ন্যাসী হিসেবে তিনি এই ধরনের কাজে নিযুক্ত হতে পারবেন না। [The Complete works of Vivekananda]

৮) ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকায় দ্বিতীয় সফর;

১৮৯৯ সালে আমেরিকায় দ্বিতীয় সফরের সময় বিবেকানন্দ ক্যালিফোর্নিয়া ভ্রমণ করেছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল

জোসেফাইন ম্যাকলাওড, মিস স্পেন্সারের। তারা প্রত্যেকেই বিবেকানন্দের শিষ্যা হয়েছিলেন।পরে মিস জোসেফাইন ম্যাকলিওড বন্ধুর মত স্বামীজীকে অনেক অর্থ সাহায্য করেন। ১৮৯৯এর ৩রা ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ১৯০০ সালের ৩০শে মে পর্যন্ত তিনি শিকাগো ও ক্যালিফোর্নিয়াতে ধারাবাহিক ভাবে বেদান্ত দর্শন ও বিভিন্ন দর্শনের উপর বহু বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর অসংখ্য আমেরিকান শিষ্য ও শিষ্যারা তাঁর ঐ সকল বক্তৃতার আয়োজক বা সংগঠক ছিলেন। তাঁর আমেরিকান শিষ্য ও শিষ্যাদের মধ্যে লস এঞ্জেলেসে মিস স্পেন্সার, রক্সি ব্লডগেট, স্টিমসন এবং এমিলিন বোলার; মাউন্ট লোয়ে জে ম্যাকলিওড; সাউথ পাসাদেনায় মিড সিস্টারস, ওকল্যান্ড এবং আলমেডায় এ. হ্যান্সব্রো; স্যান ফ্রান্সিসকো এবং ক্যাম্প টাইলোরে Dr. এম লোগান এবং মাউন্ট শাষ্টায় Dr.অ্যালবার্ট হিলার হলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জানা যায়, ক্যালিফোর্নিয়াতে স্বামীজীর প্রায় ছয় মাস অবস্থানের সময় তিনি 62২ টি বক্তৃতা প্রদান করেন, ১২ টি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর বক্তৃতা প্রধান বিষয় ছিল "বেদান্ত দর্শন" বা "হিন্দুধর্ম"

ক্যালিফোর্নিয়াতে স্বামীজী "The way to the Realization of the Universalization of a Universal Religion" and on "Christ, the Messenger" এই নিয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার 'হোম অব ট্রুথ" এ মাস কাটিয়েছিলেন যেখানে তিনি এক সময় বলেছিলেন, যে সমস্ত আমেরিকানদের মধ্যে, "ক্যালিফোর্নিয়ানরা স্বজ্ঞাত ধ্যানের রাজ-যোগ বোঝার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত, যেটাকে তিনি 'প্রযুক্ত বা ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান' লেবেল বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ যখন লস এঞ্জেলেসে থাকাতেন তাঁর ভক্তেরা তাঁকে একটি বিরাট জমি দান করেছিলেন বেদান্ত হাউস বা বেদান্ত ছত্রাবাস নির্মাণের জন্য। সেই জমিটা ছিল উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার লিক অবজারভেটরি থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ১৬০ একরের একটি বনাঞ্চলপূর্ণ পাহাড়ি ভূখণ্ড। ওখানে নির্মিত ভবনটি শান্তি ভবন বা

শান্তি আশ্রম বলে পরিচিত।সান ফ্রান্সিসকোতে কেন্দ্রটির বিকাশ ঘটে ছিল। এরপর তিনি ওখানে পরবর্তী দুই বছর ধরে বেদান্ত শিক্ষার্থীদের "ভারতীয় ধ্যান ও কঠোর সন্ন্যাস- জীবন" এর উপর প্রশিক্ষণ দেন। লসএঞ্জেলেসে বক্তৃতা দেওয়ার পর বিবেকানন্দ চলে জান সান ফ্রান্সিসকো। এরপর তিনি সান ফ্রান্সিসকো, ওকল্যান্ড এবং আলমেডায় তিন মাস ধরে শিক্ষার্থীদের বক্তৃতা দেন। সান ফ্রান্সিসকো উপসাগরের আশেপাশের এলাকার শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে বিবেকানন্দকে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনুরোধ করা হয় যাতে করে বিবেকানন্দের আমেরিকা ত্যাগের পরেও শিক্ষার্থীরা বেদান্ত অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে পারে। ১৪ই এপ্রিল ১৯০০ সালে ফ্রান্সিসকোতে বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতে তাঁর কাজে সহায়তা এবং আমেরিকায় বেদান্ত দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের উদ্দেশে ঐ বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 1900 সালে দক্ষিণ পাসাদেনায় বিবেকানন্দ বেদান্তের উপর অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এখানে তাঁর শিষ্যা Meade sisters তথা কারি, হেলেন এবং অ্যালিসের– বাড়িতে ৮ সপ্তাহের জন্য অতিথি হিসাবে ছিলেন।1900 সালের ৮ডিসেম্বরে বেদান্তের উপর বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনে, এলিস মেড হান্সব্রো ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি পরবর্তী কালে বিবেকানন্দকে পাসাদেনা এবং লস এঞ্জেলেসে বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিলেন। এমনকি ঐ বাড়িটি বিবেকানন্দ হাউস" নামে বিখ্যাত হয়েছে এবং বিবেকানন্দের স্মৃতিসৌধ হিসেবে যেখানে বিবেকানন্দের ব্যবহৃত শয়নকক্ষটি এখন একটি ধ্যান কক্ষ। এটি হল দক্ষিণ পাসাদেনার বেদান্ত সোসাইটি। (Ref. Article; "What motivated Swami Vivekananda to come to America? ".. By Swami Yogeshananda)

৮; বিবেকানন্দের সমাজ দর্শন ও আদর্শ জাতিয়তাবাদ

বিবেকানন্দের সমাজ দর্শন- ও রাজনৈতিক দর্শনে মৌলিক মতবাদ; বিবেকানন্দের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা তাঁর জীবন দর্শনের একটা মস্ত বড় দিক যেটা সাধারণত সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীদের

মধ্যে দেখা জায় না। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা কেবলমাত্র তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তন ও আদর্শ থেকে প্রসূত। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তনের মধ্যে কোন অবাস্তব আদর্শ বা তত্ত্ব স্থান পায়নি। মানব-কল্যাণ ও জনজাগরণ হল তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার মূল আদর্শ।এবিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র বাস্তব ও ইতিহাস ভিত্তিক নয়, সেইসঙ্গে অত্যন্ত দূরদর্শী বা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। রাষ্ট্র ও সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতির পদ্ধতিকে সুস্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য রাষ্ট্র ও সমাজকে তিনি অদ্‌ভুতভাবে জীব দেহের সঙ্গে তুলনা করছেন। তাঁর মতে জীবদেহের মত রাস্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, যার মস্তিষ্ক হল সরকার। জীবন্ত মানুষের তৈরি রাস্ট্র ও সমাজ জীবন্ত দেহের মত তার নিজস্ব কারনে বিকাশের নিয়ম ও পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু তা বলে রাষ্ট্র বা সমাজ স্বতন্ত্র জীব দেহ নয়। বিশেষ উল্লেখ্য, বিবেকানন্দের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা, দর্শন বা ধ্যান-ধারনা শুধু রাস্ট্রের আদর্শ, উদ্দেশ্য, গঠন, উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রনৈতিক শাস্ত্রে অন্যান্য অনেক বিষয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব মৌলিক মতবাদ রেখে গেছেন।

"যদি এই পৃথিবীতে এমন কোন দেশ থাকে, যাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যেতে পারে, যদি এমন কোন স্থান থাকে.....যেখানে মানুষের ভেতর ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সদ্‌ গুণের বিকাশ সবচেয়ে অধিক পরিমাণে হয়েছে, যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয়েছে, তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সে হল আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষ।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা,৫ম খণ্ড) [Ref. Article; স্বামী বিবেকানন্দ ও দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রের হিন্দুত্ববাদী স্বদেশচেতনা]

এই কথাগুলির দ্বারা তিনি যে আদর্শ আমাদের সামনে ধরতে চেষ্টা করেছেন; সেট আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারব যদি আমরা জানি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর এই কথাগুলি; "বিবেকানন্দের আদর্শকে যে সময়ে জীবনে গ্রহণ করলাম তখন আমার বয়স বছর পনেরও হবে কি না সন্দেহ। বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল

পরিবর্তন এনে দিল। চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে আমার কাছে বিবেকানন্দ ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তাঁর মধ্যে আমার মনের অসংখ্য জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম।"

স্বামী বিবেকানন্দ কেবলমাত্র বেদান্ত দর্শনের প্রভাবশালী ব্যাখ্যাকারী ও প্রচারক ছিলেন না, সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন ত্যাগের জীবন্ত মূর্ত প্রতীক। দেশের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। অসহায়, নিপীড়িত, শোষিত এবং দরিদ্রদের উন্নতির জন্য সর্বদা সচেতন ও ব্যাকুল ছিলেন। সমগ্র ভারতবাসী যখন ব্রিটিশ শাসনেরর অত্যাচার, উৎপীড়ন, ও শোষণে তাদের দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল ঠিক সেই সময় তিনি তাঁর ত্যাগ, সেবা, ও প্রেরণার বানীমূর্তি হয়ে সমগ্র জাতিকে আলোর বাতিঘর দেখিয়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনি আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিলন যে তারা কারোর থেকে কম নয়। তাঁর ধ্বনিত বেদান্তের বাণী ও প্রাণবন্ত বক্তৃতা ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলেছিল। অত্যাচারি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে ভারতের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর বেদান্তের বাণী ও জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা।

প্রখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন:"বাংলাদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে অরবিন্দ এবং বিপিনচন্দ্র বিপ্লবাত্মক স্বাদেশিকতার প্রবর্তন করেছিলেন,কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার উৎস ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক স্বদেশভাবনা সেযুগের শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়কে একেবারে উদ্বেল করে তুলেছিল,তাদের অন্তরে স্বদেশপ্রেমের তীব্র বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করেছিল। "স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশচেতনা কখনোই ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা বা হিন্দু,সনাতনী ভারতীয় আদর্শকে বাদ দিয়ে ছিল না। স্বামীজী বলেছিলেন-"ভারতের চিরন্তন সনাতনী ঐতিহ্যই হল ভারতের প্রাণের রসদ এবং তার ভিত্তিপ্রস্তর নির্মিত হয়েছে ত্যাগ,ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ওপর। যুগে যুগে বিদেশী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত,লুণ্ঠিত হয়েও যে ভারত সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে,তার কারণ এই জীবনদায়ী শক্তি ও দর্শন। এক

পরাধীন ভারতবর্ষে তখন প্রয়োজন ছিল এক নবজীবনের উদ্দীপনা। উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে গোটা বিশ্বের বুকে হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজা স্থাপন করেছিলেন বীর তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর হিন্দুধর্মের প্রচার, প্রসার ও পুনরুজ্জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পরাধীন ভারতবাসীর ভাবের দৈন্যতাকে সরিয়ে স্মরণ-মননে গৌরবময় অতীতকে আনা এবং দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশপ্রেমের তীব্র বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করা।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন – "*বিবেকানন্দের সম্বন্ধে তাঁর গুরু বলেছিলেন, তিনি জগতকে দুহাতে ধরে বদলে দেবার মতো শক্তিমান পুরুষ, সেই বিবেকানন্দের যাত্রা জগতের সামনে প্রথম প্রকাশ্যে দেখিয়ে দিল, ভারত জেগেছে- শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয়- জয় করার জন্য সে জেগেছে।*" [Sri Aurobino Vol.2/ চি ৯৭৬]

২) সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্র সম্পর্কে বিবেকানন্দের দর্শন;

রাস্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক এইদুই শাস্ত্র ও দর্শনে স্বামীজীর সম্যক ধারণা ছিল। স্বামীজী তাঁর ছাত্র জীবনে ডেভিড হিউম, জর্জ ডব্লিউ. এফ. হেগেল, আর্থার সোফেনহায়ার, জন স্টুয়ার্ট মিল ও চার্লস ডারউইনের রচনাবলি ভীষণ গুরুত্ব সহকারে নিয়মিত অধ্যয়ন করতেন। তিনি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন হারবার্ট স্পেনসারের বিবর্তনবাদ তত্ত্বে। সেই সময় হারবার্ট স্পেনসারের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্র বিনিময় হত। এই সকল কারনে দর্শন শাস্ত্রের ন্যায় রাস্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক শাস্ত্রেও তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্য ছিল। বিবেকানন্দের মতে গণতন্ত্র হল সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা। তিনি লিখেছেন;গণতন্ত্র হল শাসিতগণের শাসনকার্যে অনুমতি- যাহা আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র এবং যাহার শেষ বানী আমেরিকার শাসনপদ্ধতি-পত্রে অতি উচ্চস্বরে ঘোষিত হয়েছে। "এ দেশে প্রজাদিগের শাসন প্রজাদিগের দ্বারা এবং প্রজাদিগের কল্যাণে নিমিত্ত হবে"। (উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ -৩৬৮পৃ)

ধনতান্ত্রিক দেশে যে গণতন্ত্র বিশেষ সফল হতে পারে না, সে সম্পর্কে ও তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তাই তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্' গ্রন্থে

তিনি লিখেছেন, *"ও তোমার পার্লামেন্ট দেখলুম, সেনেট দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, সব দেশেই এক কথা। শক্তিমান পুরুষরা যেদিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাছে, বাকীগুলো ভেড়ারদল"*। (চি-৩৬৮/ তদেব) তিনি ঐ গ্রন্থে আরও বলেছেনঃ *"ধনতন্ত্র-ভিত্তিক গণতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়ে যায়, ফলে গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য তথা জনসাধারণর কল্যাণসাধন- সেটা হারিয়ে যায়। যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসনকে নিজেদের মুঠোর মধ্যে রেখে প্রজাদের লুঠতে ও শোষন করতে থাকে।"* জানা গেছে, তিনি ধনতন্ত্র-ভিত্তিক গণতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদে স্মবন্ধে এইসব কথাগুলো বলেছিলেন লেনিনের 'Imperialism' বইটি প্রকাশের অনেক আগে। *(Ref. স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে রাস্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা)*

৩) সমাজতন্ত্রবাদ ও বিবেকানন্দের দর্শন;

স্বামী বিবেকানন্দ একজন সমাজতন্ত্রী ছিলেন। তাঁর সমাজতন্ত্রিক চিন্তন ও দর্শনে এক নূতন দিগন্তের নির্দেশ দেয়। তিনিই আমাদের প্রথম মনে করিয়ে দিয়েছেন যে বিধবা-বিবাহ বা ধর্ম-সংস্কারের চেয়ে আমাদের অনেক বড় জাতীয় সমস্যা হল-দারিদ্র ও অশিক্ষা। তাই এইদুই সমস্যার প্রতি আমাদের অনেক বেশী দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি বলেছেনঃ *" তোমরা কি প্রানে প্রানে বুঝিতেছ যে কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রানে প্রানে অনুভব করিতেছ-কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শত-শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রানে প্রানে বুঝিতেছ অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারত-গগন আচ্ছন্ন করিয়াছে?"* তাঁর এই বানী প্রমান করিয়ে দেয় যে তিনি একজন সমাজতন্ত্রী (socialist)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মঝামঝি পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক সমালোচক, যথা লুই ব্ল্যাঙ্ক, চার্লস ফুরিয়ার, চার্লস হল, রবার্ট ওয়েন, পিয়েরে-জোসেফ প্রৌধন এবং সেন্ট-সাইমন ছিলেন প্রথম আধুনিক সমাজতন্ত্রী। তাঁরা প্রথম শিল্প বিপ্লবের দারিদ্র্য এবং অসমতার সমালোচনা করেছিলেন। ভারতের পক্ষ থেকে স্বামী

বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রবাদের অভ্যুদয়কে স্বাগত জানিয়ে ১৮৯৬ সালে লিখছেন *"আমি একজন সমাজতন্ত্রী"*। [উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ ৩৭০পৃ এবং বানী ও রচনা] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য; তিনি পাশ্চাত্যের সমাজতন্ত্রবাদের অভ্যুদয়কে সমর্থন করলেও, তিনি ওই সমাজতন্ত্রবাদের ত্রুটি সম্পর্কেও যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন; *"আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী, তার কারন এই নয় যে, আমি এই মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি, কেবল 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'- এই হিসেবে"*। স্বামিজীর সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতাভিত্তিক। তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সর্বদা সকল ক্ষেত্রে সবার উপরে রাখতেন। তাই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে দূরে সরিয়ে কহনও সমাজতন্ত্রর কথা ভাবতে পারেননি। স্বামিজীর চিন্তনে ও দর্শনশাস্ত্রে সব সময় সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদের সমন্বয় চূড়ান্ত স্থান পেয়েছে।তাঁর কথায় সমাজতন্ত্রবাদ উদ্দেশ্য বৈচিত্রের অবসান ঘটানো নয়, এর আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত বিশেষ সুবিধার অবসান। যেহেতু তিনি একজন অদ্বৈতবাদী, তাই ছোটো-বড় সমস্ত প্রানীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।তাই তিনি সকল বিশেষ সুবিধা ও সুযোগের অবসান ঘটিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।তাই তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সর্বদা প্রাধান্য দিয়েছেন। আজ আমাদের দেশে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদের উপর ভিত্তি করে, যে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কাঠামো তৈরী হয়েছে, আমার মনে হয়, এটা স্বামীজীর দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে।এক কথায়, স্বামী বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে অত্যন্ত উচ্চস্থান দিয়েছেন।

রাষ্ট্র-শাসনতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার পর যে বিষয়ের বা বৈশিষ্টের উপর বেশী জোর দিয়েছেন তিনি সেটা হল সাম্য। তিনি বলতেনঃ "সৃষ্টির মূলকথা বৈচিত্র। যতদিন পর্যন্ত সৃষ্টিতে প্রানের ক্রিয়া চলবে, ততদিন পর্যন্ত প্রানীকূলের মধ্যে ভেদ বিভেদের বিলোপ বা বিলয় অসম্ভব। কিন্ত তার মানে এটা নয় যে রাষ্ট্র- শাসনতন্ত্রে সাম্যের প্রতিশ্রুতি বা প্রচেষ্টা থাকবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেনঃ "আমরা যতই চেস্টা করি না কেন, সকল মানুষ একরূপ হউক –

ইহা কহনই সম্ভব নয়। মানুষ পরস্পর পৃথক হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। কেহ কেহ অন্য লোকের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী, কেহ কেহ স্বভাবতই ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে, কেহ কেহ হইবে না। আমরা কহনই এই পার্থক্য বন্ধ করিতে পারি না। একথা এত সত্য যে প্রমানের প্রয়োজন নেই। আমরা সকলেই একথা জানি। সৃষ্টির মূলকথা হল বৈচিত্রের উদ্ভব"। সেইজন্য বেদান্ত-দর্শন অনুসারে তিনি বলেছেন, "একই শক্তি সুপ্তকারে সবার মধ্যে রয়েছে। তাই কেউ ছোট বা তুচ্ছ নয়। সকলেরই বড় হওয়ার সম্ভাবন রয়েছে।তাই বেদান্তে সকলকে বড় হওয়ার জন্য সকলকে সমান অধিকার দেওয়ার উপর নির্দেশ দিয়েছে। বেদান্তের নির্দেশ অনুসারে এটা বোঝা যায়, জন্মগত বৈচিত্র বা পার্থক্য দূর করা যায়না, কিন্তু অধিকারের তারতম্য বা বিশেষ অধিকার দূর করা যায়। বেদান্ত অধিকারের তারতম্য বা বিশেষ অধিকার স্বীকার করে না"।এটাই হল সাম্যবাদ যার উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন রাস্ট্র-শাসনতন্ত্রে ক্ষেত্রে। [[উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ -]

৫) **রাজনৈতিক দর্শন ও বৈপ্লবিক চেতনাঃ**

স্বামীজির ছিল তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক চেতনা ও বৈপ্লবিক প্রয়াস। তাঁর রাজনৈতিক চেতনার জ্বলন্ত প্রতীক হল তাঁর মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা যিনি স্বামীজীর তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক চেতনা ও বৈপ্লবিক চিন্তনের অধিকারী হয়েছিলেন স্বামীজীর অনুপ্রেরণায়। আমরা জানি, স্বামীজীর জীবনকালেই সিস্টার নিবেদিতা ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে রাজনীতির মধ্যে বিশেষ যুক্ত হন। স্বামীজী সকলকে বলতেন যে কেবলমাত্র ধ্যানধারণা ও তপস্যার জীবন নিবেদিতার জন্য নয়- ভারতের জন্য নিবেদিতা প্রান ও কর্মী। তিনি নিবেদিতাকে শক্তি-মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন এবং তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, স্বামীজীর ভ্রাতা প্রখ্যাত বিপ্লবী ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামীজীর রাজনৈতিক চেতনা ও বৈপ্লবিক প্রয়াস সম্পর্কে বিশেষ মন্তব্য প্রদান করেছেন।বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে; "স্বামীজী তাঁর অন্যতম শিষ্যা, সিস্টার ক্রিস্টিনকে বলেছিলেন যে দেশীয় রাজন্যবর্গের

সাহায্যে বৈপ্লবিক পথে তিনি বৈদেশিক শাসনকে উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই কারনেই তিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারীকা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন এবং বন্দুক-নির্মাতা, হিরাম ম্যাক্সিমের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী দেখলেন যে দেশ প্রস্তুত নয় সেই বিপ্লবের জন্য- তাই তিনি জাতি-গঠনের কাজে হাত দিলেন..." ঐ যুগে স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কাছে স্বামীজী সর্বদা বিপ্লবের অনুপ্রেরণা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাই শ্রী অরবিন্দ ঘোষ বলেছেনঃ "... সন্ন্যাসী হয়েও তিনি দেশের স্বাধীনতার কথা অবিরত চিন্তা করতেন। এমনও বলা যায় যে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও ভাবতেন।... প্রত্যক্ষভাবে যে কাজ তিনি নিজে করেননি, তাঁর শিষ্যাকে তিনি সেকাজের ভার দিয়ে যান। (Ref. জীবন মুখপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম') [চি-২৭১]

৬) জাতীর জাগরণে স্বামীজীর শিক্ষা, চিন্তন ওদর্শন;

ভারতের পুনরুত্থানের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাননেত্র ও চিন্তাক্ষেত্রে যে দুটি সামাজিক দিক বিশেষভাবে উদ্ভাসিত হয়েছিল, সে দুটি হল শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নারী জাগরণ। তাঁর চিন্তা ভাবনা এবং বাণীগুলির পর্যালোচনায় এটা পরিস্ফুট হয় যে যথার্থ শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া কোন জাতীর উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বামীজী কেবল মাত্র সেই শিক্ষা চাইতেন যে শিক্ষার দ্বারা চরিত্র গঠন, শরীরচর্চা, শিল্প ও সংস্কৃতির অনুসীলন ও অগ্রগতি, কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রসারণ সম্ভব হয়। তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। কারন তিনি ভালভাবেই বুঝেছিলেন তৎকালে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য তথা চরিত্র গঠন, শরীরচর্চা, শিল্প ও সংস্কৃতির অনুসীলন কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রসারণ ইত্যাদি সম্পন্ন করতে সহায়ক ছিল না। তাই তিনি তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থাকে নিন্দা করতেন। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর অনেক বাণী রয়েছে, যা আমাদেরকে সকল সময় সঠিক পথে পরিচালনা করে। সেই বাণীগুলীরমধ্যে কয়েকটি আগেই তুলে ধরেছি।

১) তিনি বলেছেন-শিক্ষার লক্ষ্য হল মানুষ গড়া; যেমনি ধর্মের লক্ষ্য মানুষ গড়া। তাই কোন শিক্ষা বা কোন ধর্ম যদি মানুষ গড়তে না পারে, সেটা কখনো প্রকৃত শিক্ষা বা ধর্ম হতে পারেনা। স্বামীজী শিক্ষা ও ধর্মের উপর এক অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেনঃ শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা বিদ্যমান, তারই প্রকাশ সাধন। ধর্ম হচ্ছে, মানুষের মধ্যে যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ। তবে শিক্ষার প্রকাশের বিষয়ে তিনি অনুশীলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যে অনুশীলন দ্বারা ইচ্ছাশক্তির প্রবাহ ও অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে ও ফলপ্রসূ হয়, তাকেই বলা হয় প্রকৃত শিক্ষা।

২)শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ বানী হলঃ "মানবজাতির সেবা এবং আত্মার মুক্তিই হল শিক্ষার একমাত্র লক্ষ" । স্বামীজীর দর্শনে শিক্ষা ও জ্ঞান হল মুক্তি লাভের সঠিক উপায়। স্বামীজী শিক্ষাকে শুধুমাত্র পরীক্ষায় পাশ ও পয়সা উপার্জনের মাধ্যমের সংকীর্ণতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন- তখনই শিক্ষার প্রকৃত স্বার্থকতা আসে যখন শিক্ষার দ্বারা মানব জাতির উন্নতি হয় এবং দেশের তথা দশের উন্নতি ঘটে।

৩)শিক্ষা উপর তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ বানী যেটা আমাদেরকে সর্বদা অনুপ্রানিত করে, সেটা হলঃ "শিক্ষার অন্যতম লক্ষ হল মনুষ্যত্বপূর্ণ ও চরিত্রবান মানুষ তৈরি"।

৭) **নারী জাগরণের জন্য নারীশিক্ষার উন্নয়নকে** দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটা গুরুত্ব অংশ হিসেবে তিনি বিবেচনা করেছেন।সমাজে নারীর স্থান অবমূল্যায়নের জন্য তিনি অসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকেই দায়ী করেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নারী সুশিক্ষা পেলে জগতের আদর্শ নারী হয়ে উঠতে পারবে। আদর্শ নারী জাতীর উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তিপস্তর। তিনি এটাও বলতেনঃ নারীশিক্ষার না ঘটলে কহনই 'আদর্শ নারী' সমাজে আসতে পারে না।তাই তিনি নারীশিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নির্দিষ্ট করেছেন। তিনি মহিলামঠের কথাও পরিকল্পনা করেছিলেন; যে মঠের শিক্ষাসূচীতে ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা, সংস্কৃতি ও

ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষা, সেলাই-শিক্ষা, রন্ধনবিদ্যা, সন্তান-প্রতিপালন, ইত্যাদি বিশেষভাবে স্থান পাবে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্য ছিল- **ভারতের দুই মহাপাপ বিদ্যমান –এক; মেয়েদের পায়ে দলানো। দুই; 'জাতি জাতি' করে গরীবদেরকে পিষে মেরে ফেলা।** নারীদের প্রতি অন্যায় ও অবিচার দেখলে, তিনি দুঃখে ক্ষোভে অস্থির হয়ে যেতেন এবং অনেক সময় সর্ব সমক্ষে রাগে ফেটে পড়তেন। একবার তিনি বলেছিলেন; "*আমরা মহাপাপী, স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে আমাদের অধোগতি হয়েছে"। সেইজন্যে তিনি বলতেন; "মেয়েদেরকে আগে তুলতে হবে, জনসাধারন কে জাগাতে হবে, তবেই দেশের কল্যাণ- ভারতের কল্যাণ"*। (উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ -৩৭পৃ) তিনি এই বিষয়ে একথাও বলেছেন; "যে দেশে বা যে জাতি নারীকে শ্রদ্ধা করে না সে জাতি বড় হতে পারে না।" এই বিশ্বজয়ী সন্ন্যাসী, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সুপ্রাচীন প্রাজ্ঞের সাহায্যে অতি সচেতনভাবে আদর্শ নারীর গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন। কারণ তিনি সর্বদা বলেছেন "যে নারী ও পুরুষ উভয়েরই জীবন যদি সমানভাবে উন্নত না হয়, তবে দেশের বা জগতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়, যেমন "... এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। (উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ-.২৮৬পৃ),

জাতীর জাগরণে স্বামীজীর শিক্ষা চিন্তন ও দর্শন সমন্ধে কিছু লিখতে গেলে, তাঁর একটি বিশেষ উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; "......... জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা। আমাদের সমাজসংস্কারকগণ খুঁজিয়া পান না—ক্ষতটি কোথায়। বিধবা-বিবাহের প্রচলন দ্বারা তাঁহারা জাতিকে উদ্ধার করিতে চাহেন। আপনি কি মনে করেন যে, বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপর কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে? আমাদের ধর্মের কোন অপরাধ নাই, কারণ মূর্তিপূজায় বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি—যাহারা কুটীরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট

হইতে হইতে তাহাদের (নারীজাতির) মনে এখন এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হইবার জন্যই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে। মূর্তিপূজা থাকিবে কি থাকিবে না, কতজন বিধবার পুনর্বার বিবাহ হইবে, জাতিভেদ-প্রথা ভাল কি মন্দ, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার আমার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেককেই তাহার নিজের মুক্তির পথ করিয়া লইতে হইবে। ----------------------- আসুন, আমরা তাহাদের মাথায় ভাব প্রবেশ করাইয়া দিই—বাকীটুকু তাহারাই নিজেরাই করিবে। ইহার অর্থ, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতেও অসুবিধা আছে। দেউলিয়া গভর্ণমেণ্ট কোন সহায়তা করিবে না, করিতে সক্ষমও নহে; সুতরাং সেদিক হইতে সহায়তার কোন আশা নাই। ...." (উৎস';২০ জুন,১৮৯৪ তারিখে চিকাগো থেকে শ্রীযুত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে স্বামীজীর লেখা পত্র

৮) সমাজ সংস্কারে স্বামীজির দর্শন;

সমাজ সংস্কারে স্বামীজির দর্শন বুঝতে হলে প্রথমেই আমদের পড়তে হয় তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা ও প্রবন্ধ। তাঁর লেখা বিভিন্ন রচনা ও পত্রবলী এবং তাঁর অবিস্মরণীয় কর্মযোগ থেকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে মানবসেবা ছিল তাঁর পরম ধর্ম এবং সমাজ সংস্কার ছিল তাঁর জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য । সমাজের আর্ত, পীড়িত, ক্ষুধার্ত, অসহায় মানুষের জন্য সেবার মন্ত্রে সমগ্র জাতিকে, বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজ কে তিনি অনুপ্রনিত করেছেন। তাঁর আদর্শ ছিল- আর্ত মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে সহজে পৌঁছানো যায় এবং প্রকৃত ধর্ম পালন করা যায়।

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভ্রমণে একজন সন্ন্যাসী হিসাবে তাঁর জীবন যাত্রায়, সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সাথে মিশে এবং তাদের জীবন যাত্রা অনুধাবন করে এবং ভালবাসার সাথে তাদের সাথে মিশে ও আচরণ করে, তাদের হৃদয়ে তিনি একটি দুর্দান্ত স্থান তৈরি করে নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে বহু সমাজ-কল্যাণ ও সংস্কার

মূলক কাজ করতে অনুপ্রানিত করেছিলেন। এখন আমরা বর্তমান তাঁর বাণী, দর্শন ও রচনা থেকে প্রতিনিয়ত সমাজ সেবা ও সংস্কারমূলক অনুপ্রাণিত হচ্ছি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিক্ষায়, আদর্শে ও অনুপ্রেরণায়, তরুণ জ্ঞানী সন্ন্যাসী ও দার্শনিক, স্বামী বিবেকানন্দ, সারা জীবন মানবজাতি এবং মানবতার জন্য নিঃস্বার্থ কাজ করে গেছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি সামাজিক সংস্কার এনেছেন।

বিবেকানন্দ একজন মহান সমাজ সংস্কারক ছিলেন এবং ভারতীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তাঁর বাণী ও সামাজিক কর্মকাণ্ড অবিস্মরণীয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তিনটি সমস্যা আমাদের দেশের অগ্রগতিকে ব্যহত করে, সেগুলো হলো শিক্ষা, দারিদ্র্য ও জাতিভেদ। আধুনিক ভারতে তিনিই হলেন প্রথম নেতা যিনি দরিদ্র ও নিপীড়িত জনগণের অনেক কাজ করেছেন, অনেক লিখেছেন এবং সংস্কারের অনেক পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি দরিদ্র ভারতীয়দের জন্য খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের মতো জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তার কথা পরিষ্কারকে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে বলেছিলেন। একজন মহান দেশপ্রেমিক হিসেবে তিনি মাতৃভূমির সেবায় তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সে তো আমরা সবাই জানি।

৯; বিবেকানন্দের অসাধারণ সঙ্গীত সাধনা

সঙ্গীত সাধনা- স্বামীজীর আঠারো শক্তির মধ্যে একটি। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সর্বতোমুখী প্রতিভাশীল সত্য-সন্ধানী মহামানব। তাঁর কর্মযোগ ও জ্ঞানানুসন্ধানী জীবন তাঁকে সকল শাস্ত্র ও বিষয়ে অভূতপূর্ব সর্বতোমুখী প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত থেকে শুরু করে সঙ্গীত সাধনা, নাটক-অভিনয়, ক্রীড়াকৌতুক, মুষ্টিযুদ্ধ, নৌকাচালানো, অসিচালানা, দাবাখেলা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অপরিসীম দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রচন্ড মেধাবী, সাহসী, তেজস্বী, প্রত্যুৎপন্নমতি ও সহৃদয়। তাঁর ঐ সকল প্রতিভা লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার বলেছিলেন; “নরেনের মধ্যে

আঠারোটা শক্তি খেলা করছে। একাধারে কত গুন –গাইতে, বজাতে, লিখতে, পড়তে"। তাঁর সঙ্গীতবিদ্যা সম্পর্কে কিছুকথা উল্লেখ করছি। সঙ্গীতের ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও ঔপপত্তিক বিষয়বস্তুর উপর স্বামীজীর গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি ধ্রুপদের বিশেষ অনুরাগী হয়ে তিনি বিদগ্ধ শিল্পীদের গান গেয়েছেন এবং বহু সঙ্গীত রচনা করেছেন। 'সঙ্গীত কল্পতরু' নামে একটি সঙ্গীত গ্রন্থও রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যেমন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বিদগ্ধ হিন্দু ও মুসলমান শিল্পী, কলাবিদ বা ওস্তাদদের নিয়ে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের পরিবেশে বড় হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি শিমুলিয়ার দত্তবাড়িতেও প্রতি সপ্তাহে শনিবার ও রবিবার –এই দুদিন কলাবতী সঙ্গীতের জমজমাট আসর বসত। বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত এবং পিতামহ দুরগাপ্রসাদ দত্ত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ও রসগ্রাহী ছিলেন। তাঁরা দুজনেই সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং ভাল গাইতেও পারতেন। জানা যায়, বিশ্বনাথ দত্ত একসময় বড় ওস্তাদ রেখে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অভ্যাস করতেন। কর্মোপলক্ষে মাঝে মাঝে উত্তর ভারতের দিল্লী, লাহোর, লখনৌ, রাজপুতানা, ইন্দোর, রায়পুর, বিলাসপুর প্রভৃতি অঞ্চলে থাকার সময়, পিতা বিশ্বনাথ সেই সকল স্থানে খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, গজল প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখার এবং গাওয়ার সুজোগ পেতেন। ফলে পরিবারে সঙ্গীত সংস্কারের অধিকারী হয়ে প্রধানত তাঁর পিতা ও পিতামহের কাছ থেকে বিবেকানন্দ সঙ্গীতজ্ঞান, ও সঙ্গীতপ্রবণতা অর্জন করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর ছিল উদাত্ত, সুমধুর ও গম্ভীর। তিনি ধ্রুপদ,, ধামার এবং ব্রহ্ম সঙ্গীতে বিশেষ ভাবে পারদর্শী ছিলেন। তাছাড়া, কীর্তনগান, শ্যামাসঙ্গীত, বৈঠকি-বাংলা-টপখেয়াল, রবীন্দ্রসঙ্গীত–প্রভৃতি গানে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি কবীর ও সুরদাস প্রভৃতি সাধকদের হিন্দী ভজন গানও ভালভাবে গাইতেন। তিনি ছেলেবেলায় তাঁর পিতার কাছে খেয়াল,ঠুংরি, টপ্পা, গজল প্রভৃতি গানের উপর উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পরে অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবু), সুরেন্দ্রনাথ দত্ত (তমুবাবু), বেনী ওস্তাদ,

আহম্মদ খাঁ মত বিখ্যাত সঙ্গীত শিখক ও ওস্তাদের শিক্ষা, দীক্ষা তাঁর সঙ্গীত সাধনা ও সঙ্গীতচর্চাকে আরও বেশী প্রানবন্ত করেছিলন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রথমে তাঁর গান শুনেই বলেছিলেন, নরেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের লোক। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সর্বপ্রথম যে দুটি গান শুনিয়ে ছিলেন সেগুলি হল; (১) "মন চল নিজ নিকেতনে—" ও(২)'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে---" এরপর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বহু গান শুনিয়েছেন।

২) নরেন্দ্রনাথ গান গাইতেন আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাবাবেশে নিত্য করতেন;

এ বিষয়ে একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা বলি । ডাক্তার মহেন্দ্র লালা সরকার যিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলেছিলেন যে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) দুরারোগ্য অসুখে ভুগছেন, তাই তাঁর লোকের সঙ্গে বেশী কথা বলা উচিৎ নয়। কিন্তু তিনি মানতেন না। একদিন ডাক্তার সরকার শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসে দেখলেন, রোগীর ঘরের মধ্যে গান হচ্ছে। নরেন্দ্রনাথ গান করেছেন; ঐ সময় তাঁর ভয়ংকর অসুখের সব যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের গান শূনে বিভোর হয়ে ভাবাবেশে নিত্য করছেন।পরে তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধি অবস্থা থেকে কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে, ডাক্তার মহেন্দ্র লালা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তাঁর অসুখের কথা, কষ্টের সমন্ধে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন বিশেষ কিছুই বললেন না। ডাক্তার জানতে পারলেন ঐধরনের গানের আসার ওখানে প্রায়ই ঘটে। পরে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন ঐ দিন আরও কোন গান হবে কিনা? সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে গান গাইতে বললেন। তখন নরেন্দ্রনাথ আবার গাইতে শুরু করলেন;

"আমায় দে মা পাগল করে, ব্রহ্মময়ী,

দে মা পাগল করে।

আমার কাজ কি মা জ্ঞান বিচারে,

দে মা পাগল করে।,...................."

এই গান শুনে সমস্ত ভক্তদের মধ্যে একটা অদ্‌ভুত রূপান্তর ঘটল। এমনকি বিজয় গোস্বামীর মত পণ্ডিত ভক্তরাও তাদের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার ভুলে গিয়ে স্বর্গীয় উন্মাদনায় ভেসে গেলন এবং তাঁরাও নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে গাইতে লাগলেন; *দে মা পাগল করে। আমার কাজে কি মা জ্ঞান বিচারে।* তাঁর ভয়ংকর অসুখ ও শরীরের কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব উঠে দাঁড়ালেন। ডাক্তার সরকার যিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব পাশে বসে ছিলেন তিনিও উঠে দাঁড়ালেন। নরেন্দ্রনাথের গানের জাদুমন্ত্রে ডাক্তার ও রোগী উভয়েই দুজনেই আত্মহারা হয়ে গেলেন। (SV.76- 77প)

বিবেকানন্দের সঙ্গীত রচনা; বিবেকানন্দ যেমন ভাল গাইতেন তেমনি গানও রচনা করতেন। অতুলনীয় তাঁর গানের ভাষা ও সাহিত্যসৌন্দর্য। তাঁর রচিত নিম্নলিখিত গানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১) নাহি সূর্য, নাহি জ্যৌতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর –

২) তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা, বম বব বাজে গাল –

৩) হর হর হর ভুতনাথ পশুপতি

৪) মুঝে বারি বনোয়ারী, সেঁইয়া, যানেকো দে --

৫)খন্ডন ভব বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়। নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুনময়।।

৬)একরূপ, অ-রূপ নাম বরন, অতীত-আগামীকাল—

শিবরাত্রির সময় তিনি তাঁর 'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা, বম বব বাজে গাল' এই গানটি গাইতেন।

এই গানের কথাগুলি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, নরেন্দ্রনাথ শিব ধ্যানে আবিষ্ট হয়ে তিনি এই গান রচনা করেছিলেন এবং ভাবাবেশে বিভোর হয়ে তিনি ঐ গান গাইতেন। প্রসঙ্গত, বিবেকানন্দ এই ধরনের আরও একটি গান রচনা করেন. সেই

গানটির একটি পংক্তি হল –"হর, হর, হর পশুপতি যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনকপানি--" এই গানটিতে শ্মশানচারী শিবের মহিমার কথা প্রকাশ করেছেন।

বিবেকানন্দ শুধু যে ভাল গাইতেন এবং ভাবগম্ভীর গান ও ভজন রচনা করেছেন – এমনটি নয়। তিনি তাঁর সঙ্গীত সাধনার সাফল্যের আরও একটি বলিষ্ঠ প্রমান রেখে গেছেন। তাঁর রচিত সঙ্গীতগ্রন্থ- “সঙ্গীত কল্পতরু”। (উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ -৫৭১পৃ)

১০; বিবেকানন্দের জীবনে কিছু অবিস্মরণীয় ঘটনা

ঘটনা ১; মায়াবাদের আলোচনায় মন্মথনাথের কাছে স্বামীজীর শিবস্বরূপ প্রকাশ; এলাহাবাদের মন্মথনাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে স্বামীজীর মায়াবাদ’ নিয়ে আলোচনার সময় এক বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটে ছিল।

মন্মথনাথ গাঙ্গুলী বেলুড় মঠে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে স্বামীজীকে একদিন বললেন, "আমি মায়ার উপর আপনার বক্‌তৃতা শুনেছি। সেই বক্‌তৃতাগুলি আমার কাছে ভীষণ মর্মস্পর্শী ছিল, কিন্তু আমি তা বুঝতে পারি নি। ‘মায়া কি’ দয়া করে আমাকে বুঝিয়ে দিলে আমি ভীষণ উপকৃত হব।” মন্মথনাথের এই অনুরোধ শুনে স্বামীজী কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। তারপর স্বামীজী বললেন " যদি তোমার অন্য কিছু জানার থাকে, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পার।" মন্মথনাথ বললেন,"মহাশয়, আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করার নেই। আপনার মতো ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপ্রান যদি আমাকে এ বিষয়ে আলোকিত না করেন তাহলে আমার এই জীবনকালে এটি একটি বন্ধ বই হয়ে থাকবে"।

এই কথা শুনে স্বামীজী মায়ার উপর কথা বলতে শুরু করেন। শুনতে শুনতে তাঁর মন ইন্দ্রিয়-অঙ্গগুলির যোগাযোগ হারিয়ে ফেলল। মন্মথনাথ তাঁর চারপাশে একটি সূক্ষ্ম জগতের অভিজ্ঞতা আস্তে আস্তে লাভ করতে লাগলেন।যে সূক্ষ্ম জগত তাঁর কাছে স্থূল পৃথিবীর চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম মণে হতে লাগল।এই ব্যাপারে মন্মথনাথ তাঁর লেখাতে উল্লেখ করেছেন; " আমি তখন আমার

খোলা চোখে গণিত, গাছপালা, এবং সবকিছুকে আমার সামনে স্পন্দিত হতে দেখলাম। যেমন আপনি যদি একটি বড় আগুনের উপরে তাকান তবে আপনি একটি কম্পন দেখতে পাবেন। আমার চারপাশে সব বস্তুগুলো আমার চোখের সামনে দুলছিল এবং স্পন্দিত হচ্ছিল ঠিক সেভাবেই। আমি আমার অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতার ব্যাপারে সচেতন ছিলাম এবং নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, "এটা আমি কি দেখছি?"

মন্মথনাথ আরও লিখছেনঃ "আমি আমার চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম সর্বত্র সব কিছুর মধ্যে একটা কম্পন রয়েছে। আস্তে আস্তে স্বামীজি আমার চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপরও আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, কিন্তু আমি এর অর্থ অনুসরণ করিনি। তারপর হঠাৎ আমি আমার মস্তিষ্কের মধ্যে একটি কম্পন উপলব্ধি করলাম এবং সেখানে কেবল শূন্যতা বিরাজ করছিল। আবার আমি স্বামীজীকে আস্তে আস্তে দেখতে ও শুনতে পেলাম। এবং তারপর এর অর্থও অনুসরণ করতে পারলাম। কিন্তু আমার মন আগে যে অহং (ego) সম্পর্কে সচেতন ছিল এখন সেই অহং আর আগের মতো আমার মনের মধ্যে স্থান পেল না। তখন আমি বুঝলাম যে আমি মায়ার অর্থ বুঝতে পেরেছি"।

তারপর মন্মথনাথ বর্ণনা করছেন যে, এর আগে কখনও স্বামীজীর সামনে তিনি কথা বলার কোন সাহস পেতেন না, কিন্তু সেই মুহূর্তে মন্মথনাথ মায়ার সাগরে নিজেকে বুদবুদ বা বিম্ব মনে করতে লাগলেন এবং সেই মায়ার সাগরে স্বামীজীকেও আর একটি বুদবুদ বা বিম্ব মণে হতে লাগল। মুহূর্তের জন্য স্বামীজী ও তাঁর নিজের মধ্যে পার্থক্যটি তাঁর কাছে হারিয়ে গেল। এই সময় মন্মথনাথ উপলব্ধি করলেন যে স্বামীজির বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর মহান আধ্যাত্মিক শক্তি এবং সবকিছুই সাগরের মধ্যে একটি কাকতালীয় বা পরস্পর কার্যকারন সম্বন্ধযুক্ত। মন্মথনাথের মণে হতে লাগল যাকে স্বামীজি 'মায়া' বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন; মন্মথনাথের কাছে এটি একটি অবিভক্ত চিৎ (চিত্ত) বা চেতনা ছাড়া আর কিছুই না – সে যেন এক মহাজাগতিক চেতনা।

এরপর মন্মথনাথ বললেন, "স্বামীজী, আপনিও মায়ায় মধ্যে রয়েছেন। আপনার মঠ, স্কুল, দরিদ্র-নারায়ণসেবা, হাসপাতাল, মিশন-সব কিছুইত মায়া। এই সব কিসের প্রয়োজন?তার মানে, আপনি নিজেই মায়ার জালে জড়িয়ে আছেন। "

মন্মথনাথের এই কথা শুনে স্বামীজী একটু হাসলেন এবং কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। স্বামীজির কৃপা ও অনুগ্রহের মাধ্যমে মন্মথনাথ মায়ার মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ বলে নিজেকে বিবেচনা করতে লাগলেন। এরপর মন্মথনাথ বর্ণনা করছেন, "এখন আবার আমি আমার নিজের স্বল্প ক্ষুদ্র খোলসে প্রবেশ করলাম। মঠ, স্বামীজী, এবং সবকিছুকে আবার আমি তার আসল দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে লাগলাম, যেমনটি আমি এই অভিজ্ঞতার আগে দেখতাম বা ভাবতাম। একটু আগে আমি একটু উচ্চস্বরে ও তীক্ষ্ণভাবে কথা বলেছিলাম এবং এটা মণে করে আমি খুব লজ্জিত ছিলাম কারন স্বামীজি এবং আমি এক নয় এবং তাঁর ও আমার মধ্যে ছিল বিশাল পার্থক্য।

তারপর স্বামীজী যখন বুঝতে পারলেন মন্মথনাথ আগের মত আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ মন্মথ, তুমি ঠিকই বলেছ। আমি মায়ার সাথে খেলছি। যদি তুমি আমার এই মায়ার খেলাটি পছন্দ না কর, তাহলে তুমি হিমালয়ের একটি গভীর গুহায় যেতে পার। সেখানে তুমি তাপস্যা ও যোগের মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে পার।" এরপর স্বামীজী উঠে দাঁড়ালেন। মন্মথনাথ বুঝতে পারলেন, স্বামীজীর জীবন দর্শনে মায়াবাদ কি। তিনি মনে মণে ভাবতে লাগলেন যে স্বামীজী হলেন শিবসরূপ। স্বামীজীর জীবনদর্শনে মায়াবাদের প্রকাশ ও অনুভূতিতে বিস্মিত হয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে তিনি স্বামীজীকে প্রনাম করলেন। (Ref. 'Reminiscences of Swami Vivekananda')

ঘটনা ২; স্বামীজীর আদর্শের অনুপ্রাণিত জন ডি রকফেলার-

1893 খৃস্টাব্দে স্বামীজি যখন শিকাগোতে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি আমেরিকার এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী, জন ডি

রকফেলারের এক বন্ধুর বাড়িতে থাকতেন। ঐ সময় জন ডি তাঁর বন্ধুদেরকে অসাধারণ এবং বিস্ময়কর এক তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসীর কথা বহুবার বলতে শুনেছেন। তাঁর ঐ বন্ধুরা স্বামীজির একরকম ভক্ত ছিলেন।ঐ বন্ধুরা জন ডি কে অনেকবার স্বামীজীর সাথে দেখা করার জন্য পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন অজুহাতে জন ডি সব সময় তাদের ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলন। সেই সময়ে রকফেলার আমেরিকাতে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী ব্যবসায়ী ছিলেন। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিতের এক কঠিন মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর সিদ্ধান্তের বিরদ্ধে তাঁকে পরিচালিত করা অনেকের পক্ষে খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। তাই তিনি সহজেই রাজী ছিলেন না বন্ধুদের পরামর্শে স্বামীজীর সাথে দেখা করতে। কিন্তু একদিন হটাৎ কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সরাসরি তার বন্ধুর বাড়িতে গেলেন ঐতরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে দারোয়ানকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন যে তিনি হিন্দু সন্ন্যাসীর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ দেখা করতে চান। দারোয়ান তাঁকে স্বামীজীর ঘরে নিয়ে গেল। বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে, স্বামীজী যখন অধ্যয়নরত ছিলেন রকফেলার তাঁর অধ্যয়ন কক্ষে সোজা ঢুকে পড়লেন। রকফেলার খুব আশ্চর্য হলেন এই দেখে যে স্বামীজী এতটাই গভীরভাবে অধ্যয়নে মগ্ন ছিলেন যে তিনি তাঁর অধ্যয়ন থেকে চোখ তুলেন না এবং তাঁর লেখার টেবিলের পিছন থেকে দেখতে পেলেন না যে কে তাঁর ঘরে ঢুকেছে। কিছুক্ষণ পরে, ম্যাডাম ক্যালভেকে যেমন আগে বলেছিলেন, স্বামীজী তেমনি ভাবে রকফেলারকে তাঁর অতীত সংক্রান্ত অনেক কিছু কথা বলতে লাগলেন যা রকফেলার নিজেও জানতেন না ভালভাবে। স্বামীজি রকফেলারকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে –ইতিমধ্যে তিনি যে বিশাল অর্থ ভাণ্ডার তৈরি করেছেন, সেই জমানো বিশাল অর্থ তাঁর নিজের নয়। রকফেলার কেবলমাত্র ঐ অর্থ ভাণ্ডার তৈরির একটি মাধ্যম (চ্যানেল)। তিনি রকফেলারকে বুঝিয়ে দিলেন ঐ বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়ে তাঁর দায়িত্ব ছিল পৃথিবীর জন্য ভাল কিছু করা কারণ, ঈশ্বর তাঁকে যে সমস্ত সম্পদ দিয়েছেন সেই সম্পদ দিয়ে মানুষের ভাল কাজ করাই হল ঈশ্বরের অভিপ্রায়। ঈশ্বর তাঁকে

সম্পদ দিয়েছেন যাতে তিনি মানুষের সাহায্য এবং ভাল কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন। "---- that the money he had already accumulated was not his, that he was only a channel and that his duty was to do good to the world — that God had given him all his wealth in order that he might have an opportunity to help and do good to people."

এই সব কথা শুনে রকফেলার ভীষণ বিরক্ত হলেন এর আগে কেউ তাঁর সাথে এইভাবে কথা বলা এবং তাঁকে কী করতে হবে তা উপদেশ দেওয়ার সাহস পায় নি। কিন্তু কী ভাবে এই তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসী তাঁকে এসব বলার সাহস পেল। রকফেলার বিরক্ত হয়ে কোন কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।এর প্রায় এক সপ্তাহ পর, আবারও কোন কিছু না বলে রকফেলার স্বামীজীর অধ্যয়নের ঘরে প্রবেশ করেন এবং তিনি আগের মতোই স্বামীজীকে দেখে তাঁর ডেস্কে একটি কাগজ ছুঁড়ে দেন যে কাগজটির মধ্যে ছিল জনসাধারণের কাল্যানার্থে একটি পাবলিক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের জন্য রকফেলারের প্রচুর অর্থদান করার একটি পরিকল্পনা। তাঁর পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে রকফেলার স্বামীজীকে বলতে লাগলেন, "আমার এই প্রচুর অর্থদান করার পরিকল্পনাতে আপনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং সেই জন্য আপনি অবশ্যই আমাকে ধন্যবাদ জানাবেন!"এই কথা শুনে স্বামীজি চোখও তুললেন না, একটুকুও নড়লেন না। কাগজটি নিয়ে, স্বামীজী চুপচাপ সেটি পড়ে বললেন: "এটার জন্য আপনি ধন্যবাদ দেবেন আমাকে; কারণ এত বড় জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য আপনি আমার দ্বারা অনুপ্রানিত হয়েছেন…"। পরে জন ডি রকফেলার স্বামীজির আদর্শে, চিন্তনে, বানী, বক্তিতা ও জীবন দর্শনে অনেক বেশি আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

এই ঘটনা থেকে স্বামীজীর জীবন দর্শনের অনেক গুলি দিক বেরিয়ে আসে- তাঁর অসীম সাহসিকতা ও নির্ভীকতা, সকল পরিস্থিতিতে কঠিন সত্যকে বলার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। (Ref. REFLECTIONS- Swami Vivekananda)

ঘটনা ৩; স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ম্যাডাম এমা কালভে;

স্বামী বিবেকানন্দ যখন চিকাগোতে আন্তর্জাতিক ধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ম্যাডাম এমা কালভে সেখানে ছিলেন। ঐ সময় ম্যাডাম এমা কালভে কোন বিশেষ কারনে ভীষণ মানসিক কষ্টে ভুগছিলেন। তাঁর মন এবং দেহে ছিল ভীষণ হতাশা। সেইজন্য পরে ম্যাডাম এমা কালভে স্বামীজীর কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বলার সিদ্ধান্ত নেন। বন্ধুদের সাহায্যে তিনি স্বামীজীর সঙ্গে আলাদা করে তাঁর মানসিক সমস্যা নিয়ে কথা বলার সুযোগ পেলেন। এমা কালভে যখন স্বামীজীর ঘরে ঢুকলেন, তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে স্বামীজীর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমা কালভে দেখলেন, স্বামীজী ধ্যানে মধ্যে বসে রয়েছেন। তাঁর জাফরান হলুদ রঙের পোশাকটি মেঝেতে পড়ে রয়েছে, তাঁর মাথায় পাগড়ি বাঁধা। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকার পর স্বামীজী মুখ উপরে না তুলে কথা বলতে লাগলেন; "ওহে আমার পুত্রী! নিজেক নিয়ে তোমার এ কি অস্থির অবস্থা। তুমি শান্ত হও। এই মুহূর্তে তোমার শান্ত হওয়া অপরিহার্য"।

তারপর শান্ত কণ্ঠে, সমাহিত এবং একান্তে স্থিত ঐ সন্ন্যাসী যিনি কালভের নামও জানতেন না তিনি তাঁর গোপন সমস্যা এবং উদ্বেগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বললেন। তখন এমা কালভের মনে হয়েছিল, "ঐ সন্ন্যাসী তার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলেছিলেন যে কথাগুলো এমনকি তাঁর নিকটতম বন্ধুদের কাছেও অজানা। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা কালভের কাছে অলৌকিক,এবং আধিদৈবিক মনে হয়েছিল। এমা কালভে এরপর স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করলেন "আপনি কিভাবে এই সব জানলেন?" "কে আপনাকে আমার কথা বলেছে?" এমা কালভের এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী তাঁর দিকে তাকিয়ে একটি শান্ত হাসি দিয়ে কালভকে বুঝিয়ে দিলেন যে কালভ একটি শিশু এবং সে একটি বোকা প্রশ্ন করেছে। তিনি ধীরে উত্তর দিলেন "কেউ আমার সাথে তোমার সম্পর্কে কথা বলেনি"। "তুমি কি মনে কর আমার জন্য এটি প্রয়োজন? আমি তোমার মধ্যে যা কিছু দেখছি সেটা যেন একটি খোলা বইয়ের মতো পড়ছি।" অবশেষে এমা কালভের চলে যাওয়ার সময় এল। তার উঠার সাথে

সাথে স্বামীজী বললেন, "তোমাকে তোমার কষ্টের কথা ভুলে যেতে হবে। "আবার আনন্দোচ্ছল হও এবং সুখী হও। তোমার স্বাস্থ্যকে গড়ে তুলো। তোমার দুঃখ-শোকের মধ্যে তুমি সব সময় ডুবে থেকো না। তোমার আবেগকে কিছু বাহ্যিক অভিব্যক্তিতে রূপান্তরিত করো। তোমার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের খুব প্রয়োজন। তোমার বিদ্যা ও কলা এটাই দাবি করে।"

স্বামীজীর কথা ও অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব এমা কালভেকে গভীরভাবে মুগ্ধ করল। স্বামীজীর দর্শন ও কথা তৎক্ষণাৎ কালভের মন ও মস্তিষ্ককে তাঁর সমস্ত দুশ্চিন্তা, জটিলতা থেকে মুক্ত করে দিল। পরিবর্তে এমা কালভের মধ্যে এক পরিষ্কার এবং শান্ত চিন্তাধারা চলে এল। এমা কালভে আবার প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন। এরপর এমা কালভে বলেছিলেন, "... I left him deeply impressed by his words and his personality. He seemed to have emptied my brain of all its feverish complexities and placed there instead his clear and calming thoughts. I became once again vivacious and cheerful, thanks to the effect of his powerful will. He did not use any of the hypnotic or mesmeric influences. It was the strength of his character, the purity and intensity of his purpose that carried conviction. It seemed to me, when I came to know him better, that he lulled one's chaotic thoughts into a state of peaceful acquiescence, so that one could give complete and undivided attention to his words."

এই ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রমান করে, তাঁর চরিত্রের অদ্ভুত শক্তি, তাঁর পবিত্রতা, প্রত্যয় এবং তপস্যার তীব্রতা এমা কালভের মনকে সমস্ত দুশ্চিন্তা, জটিলতা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তার মধ্যে এক পরিষ্কার ও শান্ত চিন্তাধারা এনে দিয়েছিল।

শুধু এমা কালভে নয়, এমা কালভের মত দেশে বিদেশে তাঁর হাজার হাজার শিষ্য, শিষ্যা ও অনুগামিগণ তাঁর আদর্শে, চিন্তনে, বানী, বক্তিতা ও জীবন দর্শনে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত হয়ে সত্য,

ন্যায়, নিষ্ঠা ও প্রকৃত আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবন দর্শনে আর একটা কথা না বললেই ণয়। তাঁর অদ্‌ভূত ধ্যান বা যোগাভ্যাস। এই প্রসঙ্গে শিকাগোর মিস মেরী হেলকে লেখা তাঁর একটি চিঠির কথা আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় তাঁর কাছে ঈশ্বরে প্রকৃত স্থান কোথায়। তিনি মিস মেরী হেলকে লিখে ছিলেন; "নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান- একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি।; আর সর্বোপরি আমার পাপী-নারায়ন, তাপী নারায়ন, সর্বজাতির দরিদ্রনারায়ন-এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য"। *[উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ -১৬৮পৃ এবং* REFLECTIONS- Swami Vivekananda]

ঘটনা ৪; স্বামীজীর দর্শনে ত্যাগের একটি অসাধারণ ঘটনা;

একদিন বিকেলে প্রায় দশবারো জন কলেজের ছাত্র বেলুড়ে স্বামীজীকে দেখতে এসেছিল। তারা স্বামীজির ঘরের সামনে গঙ্গার মুখোমুখি বারান্দায় জড়ো হয়েছিল। স্বামীজী কিছুক্ষণ পর তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তাদের সাথে নির্দ্বিধায় অতি উৎসাহে এবং খোশ-মেজাজে কথা বলতে লাগলেন। তিনি ঐ সময় এতটাই হাসিখুশি ছিলেন যে ঐসকল কলেজের ছাত্রদের মত তাঁকেও বেশ তরুণ এবং উত্‌সাহী দেখতে লাগছিল। তখন তাঁর মধ্যে না ছিল সন্ন্যাসীর গাম্ভীর্যভাব বা মৌনভাব। অতি উৎসাহ ও প্রফুল্লতায় তিনি একজনের সাথে কথা বলতে বলতে অন্য ছাত্রদের পিঠে হাত রেখে তাদের সাথে খোশ-মজাজে কথা বলতে লাগলেন। কথা বলতে বলতে আবার কখনো কারুর কাঁধে মৃদু চড় মারছেন। এই দৃশ্যের প্রত্যক্ষ দর্শী মন্মথনাথ গাঙ্গুলী লিখেছেন, He was so jovial that he himself looked like them — quite young and enthusiastic. He talked to one, touched another on his back. or mildly slapped some other at the shoulder. It was a pleasing sight to see him in this mood for most often that I had seen him

he was full of gravity and seriousness.” অর্থাৎ স্বামীজীর ঐ আনন্দদায়ক দৃশ্য অতি বিরল ঘটনা ছিল।

ঐ সময় স্বামীজীর গলায় ছিল একটি শক্ত সোনার হার। ঐ সোনার হারটি তাঁর পকেটে একটি সোনার ঘড়ির সাথে যুক্ত ছিল।তাঁর ঐ সোনার হার ও সোনার ঘড়ির তাঁর ফর্সা দেহের সাথে খুব সুন্দর মানাত; তাছাড়া তিনি এটা ব্যবহারও করতেন। খোশ-মেজাজে কথোপকথনের মধ্যে এক যুবক ছাত্র আঙ্গুল দিয়ে হারটি স্পর্শ করে বলল, “এটা খুব সুন্দর”। সাথে সাথে স্বামীজী তাঁর পকেট থেকে ঘড়িটা বের করলেন এবং সোনার হার সহ সোনার ঘড়িটি সেই যুবকের হাতে তুলে দিলেন। ঐ যুবকটি তখন বিস্ময়ে তার হাতের তালু কাটতে লাগল। এই দেখে স্বামীজি বললেন, "তোমার এটা খুব ভালো লেগেছে! সুতরাং আজ থেকে এটা তোমার। কিন্তু আমার পুত্র! এটা তুমি বিক্রি করো না। এটা তোমার কাছে একটি স্মারক হিসেবে রেখো" বলার অপেক্ষা রাখে না, সেই যুবকটি অত্যন্ত খুশি হয়েছিল। স্বামীজির অতি মূল্যবান এবং তাঁর ব্যবহার্য জিনিসটি স্বাচ্ছন্দ্যে এক কথায় দিয়ে দিতে দেখে বাকীরা সকলে হতবাক হয়েগিয়েছিল। প্রত্যক্ষ দর্শী এবং বিবৃতিকারী মন্মথনাথ গাঙ্গুলীও অত্যন্ত অবাক হয়েছিলেন এবং এই ব্যাপারে তিনি যখন স্বামীজীকে পরে জিজ্ঞাসা করেন, কি করে অতি মূল্যবান এবং ব্যবহার্য জিনিসটি নির্দ্বিধায় ছাত্রের একিটি মাত্র কথা শুনে দিয়ে দিলেন? তাঁর উত্তরে মন্মথনাথ গাঙ্গুলীকে স্বামীজী বলেছিলেন, "বলিদান বা ত্যাগ মানে আপনার কাছে থাকা কোন কিছুর ত্যাগ। একজন মানুষ যার কাছে সবকিছু আছে এবং তবুও সেগুলোর প্রতি উদাসীন সেই হল একজন সত্যিকারের ত্যাগী এবং সেই বলতে পারে অবিচ্ছিন্ন আত্মার কথা। যার কাছে কিছুই নেই সে কেবল দরিদ্র - সে কি দিতে পারে“?

এই ঘটনা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় তাঁর বিখ্যাত বানীটি “তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস কিন্তু এই ইন্দ্রিয়ের ভোগ স্থায়ী নয়, বিনাশই এর পরিনাম। এই তিনদিনের ক্ষনস্থায়ী বিলাসের ফল সর্বনাশ। অতএব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সৃষ্ট সুখকে ত্যাগ করো, এটাই ঈশ্বর লাভের

উপায়।ত্যাগই আমাদের চরম লক্ষ্য ও মুক্তির পথ। কিন্তু ভোগ আমাদের লক্ষ্য নয়" । তিনি একবার বলেছিলেনঃ "ত্যাগ এত সহজ নয়। তুমি যদি ত্যাগ করতে চাও, তবে তোপের মুখে যাও।" (Ref. 'Reminiscences of Swami Vivekananda') I

ঘটনা-৫; স্বামীজীর ফরাসি ভাষাতে বক্তৃতা;

এলাহাবাদের মন্মথনাথ গাঙ্গুলী লিখেছেন, স্বামীজী একদিন বেলুড়ে তাঁর তিন গুরুভাইদের সঙ্গে আমেরিকায় তাঁর বেদান্ত প্রচারের কিছু অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করছিলেন। সেই সময় তিনি বলেছিলেন; শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসভায় তিনি যখন প্রমাণ করলেন যে হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেখানকার পাদ্রীরা তাঁর উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে গেল। তারা ফ্রান্সে আর একটি ধর্ম সম্মেলনের প্রস্তাব রাখল। যেহেতু স্বামীজী তখন ফরাসি ভাষা জানতেন না, স্বামীজীকে বিপদে ফেলার উদ্দেশে তারা বক্তাদের ফরাসি ভাষায় বক্তৃতা প্রদান বাধ্যতামূলক করে।পাদ্রীরা ভেবেছিল ফরাসি ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা জন্য স্বামীজীকে ফ্রান্সের ঐ ধর্ম সম্মেলন থেকে বাদ দিয়ে দেবে। কিন্তু স্বামীজী ফ্রান্সে গিয়ে প্রায় ছয় মাসের মধ্যে ফরাসি ভাষাটি ভালভাবে শিখে নিলেন এবং তারপর সেখানে তিনি ফরাসি ভাষায় বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। স্বামীজীর ফরাসি ভাষায় বক্তৃতা প্রদান মিশনারিদের তাঁকে হেনস্থা করার উৎসাহক ম্লান করে দিল। এই ঘটনা স্বামীজীর বিশ্বজয়ী বহুমুখী প্রতিভা প্রতিভাত হয়েছে। (Ref. 'Reminiscences of Swami Vivekananda')

ঘটনা ৬; অ্যামেরিকার মেয়েদের বিয়ের প্রস্তাব নস্যাৎ করা;

তাঁর তিন গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দের স্বামীজীর সঙ্গে ঐ আলোচনা চক্রে অ্যামেরিকায় তাঁর আরও কিছু অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছিলেন; "আমেরিকায়, আমার ঘরের বাইরে একটি ব্যক্তিগত Letter Box ছিল। আমি এটা চাবি দিয়ে রাখতাম। মাঝে মাঝে দিনের বেলায় আমি নিজেই এটি খুলতাম। ওর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চিঠি আসত।

আমি সব ধরনের মানুষের কাছ থেকে চিঠি পেতাম। তাদের মধ্যে ছিল অনেক অজ্ঞাত ব্যক্তিদের হুমকি। তারা আমাকে হিন্দু ধর্ম প্রচার বন্ধ করতে হুমকি দিত। কিছু প্রভাবশালী মহিলা আমাকে ধনী মহিলার সাথে বিয়ে করে তার সাথে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আমাকে তাদের বোঝাতে হয়েছিল যে ভারতীয় সন্ন্যাসীরা বিয়ে করেন না। "

ঘটনা ৭; গুরুদেবের মৃত্যুর পর তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ লাভ;

মন্মথনাথ গাঙ্গুলী আর একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। গুরু ভাইদের সঙ্গে কথোপকথনে ঐ দিন স্বামীজী বললেন; "উনি (স্বামীজী) তখন বেদান্ত দর্শনের জন্য আমেরিকারএক শহর থেকে অন্য শহরে ঘন ঘন ভ্রমণ করতেন এবং এমন কি এক দিনে অনেক সমাবেশে তিনি ভাষণ দিতেন। একদিন হঠাৎ তাঁর মনে এল যে, তিনি যে সমস্ত বিষয়ে জানতেন তাঁর সব বলা হয়ে গিয়েছে। বরং তাঁর জানার থেকে তিনি অনেক বেশি বলে ফেলেছেন। পরের দিন তাঁর একটি সভায় ভাষণ দেওয়ার ছিল। তিনি ভাবতে লাগলেন, এবার সভায় তিনি যা কিছু বলবেন, সে সবকিছুই তাঁর আগের বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। তাই তিনি গভীর ভাবে ভাবতে লাগলেন তিনি কি ভাবে তাঁর বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি এড়াবেন। ভাবতে ভাবতে অনেক রাত হয়ে গেল। তিনি একটা ইজি চেয়ারে বসে ভাবছিলেন আর মনে মনে তিনি তাঁর ঐ দুরবস্থার জন্য তাঁর গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দায়ী করছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনলেন তাঁর সঙ্গে যেন কেউ কথা বলছে। সেই মুহুর্তে তিনি তাঁর চোখ বন্ধ করেলেন এবং তিনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ কথা বলতে লাগলেন এবং বললেন- “তোমার (স্বামীজীর) এই সকল বিষয়ে ভাষণ দেওয়া উচিত এবং তুমি মোটেও চিন্তা করো না”। স্বামীজী তখন খুব অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু স্বামীজী তাঁর পরবর্তী বক্তৃতার বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পেরে তিনিই খুবই আনন্দিত হলেন। তাঁর কাছে আরও বিস্ময় লেগেছিল পরের দিন সকালে তাঁর পাশের রুমে বসবাসকারী এক ভদ্রলোক যখন তাঁকে

জিজ্ঞাসা করলেন- 'তোমার সাথে গতকাল অনেক রাতে কে কথা বলছিল? আমি কিছুই বুঝতে পারিনি কারণ তার ভাষাটি আমার কাছে অজানা।" স্বামিজী আগের রাতে যে ভাষায় কথা শুনেছিলেন সেটা ছিল বাংলা ভাষা। তাই ঐ ভদ্রলোকের পক্ষে ঐ ভাষা বোঝা সম্ভব ছিল না। কিন্তু স্বামীজি ভাবতে লাগলেন কিভাবে এই লোকটিও গুরুদেবের কথা শুনতে পারে? তিনি নিশ্চিত হলেন তাঁর গুরুদেব গত রাতে তাঁর কাছে এসে সব কিছু বলে দিয়ে গেছেন।

ঘটনা ৮. জামসেদজী টাটাকে শিল্পের উন্নতির জন্য পরামর্শ;

পাঁচ বৎসর পরিব্রাজক রূপে ভারত-ভ্রমণ কালে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জনজীবন, ভারতের ইতিহাস, অর্থনৈতিক-কাঠামো, শিল্প-বানিজ্য, অর্থনৈতিক সমস্যা ও বাস্তব অর্থব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ভারতের অর্থনৈতিক-কাঠামো ও অর্থব্যবস্থার মহাশঙ্কট তিনি ঐ সময় বুঝেছিলেন। উদাহরণসরূপ, ইংরেজ শাসকদের জমিদারি প্রথা, ভূমিস্বত্ব ও খাজনা আইন, ভারত থেকে কাঁচামাল রপ্তানি ও বিদেশ থেকে চড়াদামে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী আমদানি ভারতের অর্থনৈতিক-কাঠামো ও অর্থব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর শঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষককে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে ও অনাহারে প্রান হারাতে হত। যখন স্বামীজী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন তখন তিনি ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র, দুর্দশা, অনাহার, অবিচার, অত্যাচার এবং তার প্রকৃত কারণ নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেন এবংদুসচিন্তায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করতেন। তাই ভারতের ইতিহাস, অর্থনৈতিক-কাঠামো, বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যা, ও অর্থব্যবস্থা উপর স্বামী বিবেকানন্দের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও বিশ্লেষণ ছিল। ঐ সময় ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল এবং কেনই বা জামসেদজী টাটা দেশে শিল্প স্থাপন করবেন এবং সেই জন্য বিদেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানি করবেন- এইসকল বিষয়ে জামসেদজী টাটাকে কিভাবে সুপরামর্শ দিতে পেরেছিলেন সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। দেশের ভয়ঙ্কর দারিদ্র দূরীকরণের জন্য বিবেকানন্দ ভারতে আধুনিক

প্রযুক্তিবিদ্যা উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তিনি বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের উন্নতির কথা বলতেন। ভারতে জাপানের মত শিল্প-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি জামসেদজী টাটাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

১৮৯৩ খৃস্টাব্দে সামীজী যখন আমেরিকা যান, যাত্রাপথে জাহাজে শিল্পপতি জামসেদজী টাটার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। যাত্রা পথে জামসেদজী টাটার সঙ্গে স্বামীজির অনেক কথা হয়। জাহাজে বহু যাত্রীর মধ্যে ছিল দুই বিখ্যাত ভারতীয়- একজন মধ্যবয়স্ক পার্সী ব্যবসায়ী জামসেদজী টাটা, আর একজন হলেন মাথায় পাগড়িওলা গেরুয়া পোশাকের তরুণ বাঙালী সন্ন্যাসী, স্বামী বিবেকানন্দ। ঐ মধ্যবয়স্ক পার্সী ব্যবসায়ী সঙ্গে তরুণ সন্ন্যাসীর পরিচয় হল। সেদিনে জাহাজে ঐ দুই ভারতীয়র আলাপ-আলোচনা বেশ জমে উঠল। স্বামী বিবেকানন্দ চলেছেন শিকাগো বিশ্ব মহাধর্ম সম্মেলনে যোগ দিতে আর জামশেদজি টাটা আমেরিকায় যাচ্ছেন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। সেদিনের দুই ভারতীয়ের আলোচনায় উঠে এসেছিল এদেশের ভবিষ্যত শিল্প, অর্থনীতি ও বাণিজ্যের প্রসঙ্গ। স্বদেশি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে টাটাকে স্বামীজী পরামর্শ দেন- জিনিস কেনা বেচায় কমিশন আছে ঠিকই, কিন্তু নিজের দেশে কারখানা গড়তে পারলে তুলনায় মুনাফা অনেক বেশি। আবার কারখানা গড়লে কর্মসংস্থানও হবে। তিনি জানিয়েছিলেন, আরো ভাল হয় যদি পশ্চিমের প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা যায় ভারতের ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যে। ভারতের শিল্প সম্পর্কে তাঁদের গভীর ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ছিল সত্যি অভূতপূর্ব। ২৩ বা 24 বছরের তরুণ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে ভারতের শিল্প সম্পর্কে যে অসাধারণ পরামর্শ পেয়েছিলেন ঐ মধ্যবয়স্ক পার্সী ব্যবসায়ী জামসেদজী টাটা; তাতে ঐ মধ্যবয়স্ক পার্সী ব্যবসায়ী সত্যি বিস্ময়ে বেশ অভিভূত হয়েছিলেন।

জামশেদজি টাটা আলোচনার অনুপ্রাণিত হয়ে, ভারতে তাঁর ইস্পাত শিল্প স্থাপনের কথা দিয়েছিলেন বিবেকানন্দকে। সেকথা শুনে বিবেকানন্দ তাঁকে সহজ ভাবে বোঝান, ইস্পাতের প্রযুক্তির দুটি অংশ- একটা হল ইস্পাত বিজ্ঞান; অন্যটি হল উৎপাদনের প্রযুক্তি।

স্বামীজী টাটাকে জিজ্ঞাসা করলেন- কোনটা তিনি দেশে নিয়ে আসতে চান? স্বামীজীর এই কঠিন প্রশ্ন জামদেশজিকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলল। জামদেশজি টাটা ভাবতে থাকেন এবং তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে যায়- এর আগে যখন তিনি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন তখন ভারতে প্রযুক্তি নেওয়ার কথা উঠেছিল।এমন কি তাঁকে সেখানে আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল যে তাদের প্রযুক্তি নিয়ে ভারতে ইস্পাত উৎপাদন শুরু করলে উৎপাদিত ইস্পাত ব্রিটিশরা কিনে নেবে। ফলে স্বামীজীর কথার গুরুত্ব জামদেশজি অনুভব করতে পারলেন। তিনি চিন্তা করলেন ইস্পাত কারখানা গড়লে তাঁর লাভের পাশাপাশি দেশের জনগণের মঙ্গলসাধন হবে। টাটা চাইলেন ইস্পাত কারাখানা গড়তে।

শিকাগো ধর্ম মহাসভায় বক্তৃতা দিয়ে ভারতের এক ঐতিহাসিক অধ্যায় সৃষ্টি করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল গোটা দুনিয়ায়। তারপর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে ভারতে ফেরেন তিনি। 1897 সালে কলকাতায় আসার পর স্বামী বিবেকানন্দকে নাগরিক সংবর্ধনা দিতে মেতে ওঠে গোটা শহর। ভারতীয় সন্ন্যাসীর এই বিশ্বব্যাপী সাফল্যে ভীষণ খুশি হলেন বোম্বাই এর শিল্পপতি জামশেদজি টাটা। জাহাজযাত্রার সময়ের স্বামী বিবেকানন্দের সাথে তাঁর আলাপ -আলোচনা কথাগুলি ঐ সময় জামশেদজি হৃদয়ে যেন জ্বল জ্বল করতে লাগল। 1898 সালের 23 নভেম্বর বিবেকানন্দকে চিঠি লিখলেন জামশেদজি টাট। জাহাজে তাদের আলোচনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি স্বামীজীকে অনুরোধ জানালেন ভারতীয়দের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রচারপত্র লিখে দিতে। কারণ তিনি এদেশে বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার ভাবনা চিন্তা করছেন। কিন্তু তখন রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ভীষণব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ওই পরিস্থিতিতে জামশেদজির অনুরোধ রক্ষা করতে না পারলেও ঐ বিষয়ে কিছু করতে তৎপর হয়ে ওঠেন স্বামীজী। টাটার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি সেখানে পাঠালেন ভগিনী নিবেদিতাকে। নিবেদিতা দেখা করেছিলেন জামশেদজির সঙ্গে এবং বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে

তিনি বিস্তারিত পরিকল্পনা করেছিলেন। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জনের কাছে এই প্রস্তাব তোলা হলে তা বাতিল হয়ে যায়। তথাপি সেই পরিকল্পনা অনুসারে ঐ বিষয়ে এগোতে থাকেন জামেশেদজি টাটা। কারণ, স্বামীজী এবং তাঁর প্রতিনিধি ভগিনী নিবেদিতার উপর টাটার ছিল অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা।

৯) জামসেদজীকে দেশালাই কারখানা স্থাপনের পরামর্শ;

এরপর সামীজী জামসেদজীকে একটি পত্র লিখে বলেনঃ "জাপান থেকে দেশালাই নিয়ে এসে দেশে বিক্রি করে জাপানকে টাটা দিচ্ছেন কেন? আপনি তো সামান্য কিছু দস্তুরী (commission) পান। এর চেয়ে দেশে দেশালাই কারখানা করলে আপনার অনেক লাভ হবে এবং দেশের টাকা দেশে থাকবে। প্রসঙ্গত যদিও মহেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লিখিত জামসেদজীকে ঐ পত্রটি স্বামীজীর পত্রাবলীতে নেই, কিন্তু স্বামীজীকে লেখা জামসেদজী টাটার একটি চিঠিতে ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপনের উদ্দ্যোগ করার সময় জামসেদজী টাটা ভারতে শিল্পোন্ন্যনে স্বামীজীর চিন্তা ও ভাবরাশিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই পত্রে জামসেদজী টাটা আরও লিখছিলেনঃ "আমার বিবেচনায়, যদি ধর্মভাবে উদ্‌বুদ্ধ মানুষেরা আশ্রম-জাতীয় আবাসিক স্থানে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে মানসিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চায় জীবন উৎসর্গ করে, তাহলে তার অপেক্ষা ত্যাগ ও ধর্মাদেশের উৎকৃষ্টতর প্রয়োগ আর কিছু হতে পারে না।*(উৎস; চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ –৪১১পৃ)* উল্লেখ্য, বিবেকানন্দের মৃত্যু হয় 1902 সালে আর জামশেদজি টাটা তার দু'বছর বাদে মারা যান। কিন্তু টাটার পরবর্তী প্রজন্ম যথার্থ মর্যাদা দিয়েছিলেন ঐ দুই বিশ্ব বিখ্যাত মানুষের জাহাজে ঐতিহাসিক আলোচনায়। সেই আলোচনার সময় ভারতে ইস্পাত কারখানা স্থাপনের বীজ বপন হয়েছিল; যা বাস্তবে আত্মপ্রকাশ করেছিল আরও কয়েক বছর বাদ। 1907 সালে জামশেদপুরে টাটা গোষ্ঠীর পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরে গড়ে উঠল টাটা স্টিল ইন্ডাস্ট্রি। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কারখানাটি বিশ্বমানে পৌঁছিয়েছে এবং একটি বহুজাতিক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। এই শিল্পগোষ্ঠীর

ডালপালা ছড়িয়ে দেশে বিদেশে পড়েছে। ঠিক তেমনই টাটাদের উদ্যোগে বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠানটি শেষমেশ বাস্তবায়িত হয়েছিল বিবেকানন্দ এবং টাটার মৃত্যুর পর। 1909 সালে। গড়ে ওঠে টাটাদের উদ্যোগে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স যা আজ দেশের গর্ব। পরবর্তীকালে শিক্ষাক্ষেত্রে টাটা গোষ্ঠীর উদ্যোগে টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স (1930) এবং টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (1940)-এর মতো গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান পেয়েছে আমাদের দেশ।

ঘটনা ১০; স্বামী বিবেকানন্দ ও জোসেফিন ম্যাকলাউড

বিবেকানন্দের একজন একনিষ্ঠা মার্কিন শিষ্যা এবং বন্ধু জোসেফিন ম্যাকলাউড। ভারতবর্ষের প্রতি ম্যাকলাউডের ছিল প্রঘাঢ় ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। ১৮৯৫ সালের ২৯ জানুয়ারি জোসেফিন ও তার বোন ব্রেটি নিউইয়র্কে সর্বপ্রথম স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শনের উপর ভাষণ শোনেন। স্বামীজীর প্রথম ভাষণ তাঁদেরকে এতটাই মুগ্ধ করে যে বেদান্ত দর্শন সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ খুব বেড়ে যায়।জোসেফিন এরপর বেদান্ত সোসাইটির একজন সদস্য এবং বিবেকানন্দের পরম শিষ্যা হয়ে যান। ম্যাকলাউড জোসেফিন স্বামী বিবেকানন্দকে নিজের বন্ধু হিসেবে স্বীকার করে স্বামীজীকে অনেক আর্থিক সাহায্য করতেন। বিবেকানন্দ তাঁকে 'তন্তিনি' ও 'জো জো' নামে ডাকতেন। বিবেকানন্দ জোসেফিনের সম্পর্কে বলেছেন, "I simply adore Joe (Josephine MacLeod) in her tact and quiet way. She is a feminine statesman or woman. She can wield a kingdom. I have seldom seen such strong yet good common sense in a human being."

ম্যাকলাউড জোসেফিনের বয়স যখন ৩৫বছর তখন বিবেকানন্দের সাথে তার পরিচয় হয়।সে দিনটি ছিল ১৮৯৫ সালের ২৯ জানুয়ারি যে তারিখটিকে জোসেফিন তাঁর জীবনের 'আধ্যাত্মিক জন্মদিন' হিসেবে অভিহিত করেন। স্বামীজীর বেদান্ত দর্শন শিক্ষা তাঁর জীবনে এত গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল যে তিনি বিবেকানন্দকে 'নতুন বুদ্ধ' হিসেবে বিবেচনা করতেন।তিনি

বিবেকানন্দের সমস্ত ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে কাজ করতেন। তিনি যখন ভারতে আসতেন তিনি বলতেন যে " বেদান্ত দর্শনশাস্ত্রের উপর আলোচনা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে স্বামীজী আমাদেরকে সর্বদা খ্রিস্টের মিশন ও উপদেশ অস্বীকার করার পরিবর্তে; সেগুলিকেকে আরও গভীরভাবে গ্রহণ করতে এবং খ্রিস্টানদেরকে আরও ভাল খ্রিস্টান হতে সাহায্য করতেন..." স্বামীজীর বেদান্ত প্রচারে জোসেফিনের ভূমিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্যে এতটাই ছিল যে, স্বামীজী তাঁকে বিবেকানন্দের প্রচারিত রামকৃষ্ণ আদেশের একজন "মহিলা মিশনারি" নাম দিয়েছিলেন। স্বামীজীর আমেরিকায় থাকালিন জোসেফিন স্বামীজীর উপর জাপানের ওকাকুরা কাকুজুর অভিমতের কথা উল্লেখ করেন। ওকাকুরা কাকুজু (1863-1913) হলেন একজন জাপানি পণ্ডিত যিনি জাপানে শিল্পের বিকাশে অবদান রেখে গিয়েহেন। সারা বিশ্বে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য বুক অফ টি' -এর লেখক হিসেবে পরিচিত।

ম্যাকলাউড জোসেফিন স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন' যেটা অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত "Reminiscences of Swami Vivekananda' গ্রন্থটি থেকে জানা যায়। ম্যাকলাউড একবার স্বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-"স্বামীজী, কিভাবে আমি আপনাকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারি? উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন; "ভারতবর্ষকে ভালবেসে"। স্বামীজীর কি অসাধারণ উত্তর এবং কি অসাধারণ দেশপ্রেম? এরপর জোসেফিন স্বমী বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি তাঁর সাথে ভারতে আসবেন কিনা? তার উত্তরে স্বামীজী উত্তরে লিখছিলেন, "হ্যাঁ, আসতে পার- যদি তুমি নোংরা-আবর্জনা, অবক্ষয় এবং দারিদ্র্যের ছবি দেখতে প্রস্তুত থাক। যদি প্রস্তুত থাক এমন কোটি কোটি মানুষকে দেখতে যাদের পরিধেয় বলতে কোমরে একফালি টুকরো কাপড় অথচ তারা ধর্মকথা বলছে।তুমি অন্য কিছু চাইলে এখানে আসবে না। আর সামান্যতম সমালোচনা আমরা সহ্য করতে পারব না।" তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং বিবেকানন্দের কথামত ভারত ও

ভারতবাসীকে ভীষণভাবে ভালবেসেছিলেন। জোসেফিন ম্যাকলাউড ১৯০২সালের এপ্রিল মাসে হিমালয় ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং তারপর তিনি বিশেষ কারনে ইউরোপে চলে গিয়েছিলেন। তাই যাওয়ার সময় স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁর। বিদায় নেওয়ার জন্য তিনি স্বামীজীকে লিখেছিলেনঃ "ডুবি আর বাঁচি- আপনার সঙ্গে থাকব" ঐ চিঠিটি ছিল স্বামীজীর প্রতি জোসেফিনের শেষ চিঠি। ১৯০২সালের ৪জুলাই স্বামীজী দেহত্যাগ করেন। তার ১৪ বছর পরে জোসেফিন অধ্যাপক গেডেস এবং মিসেস গেডেসের সঙ্গে ভারতে আসেন, তিনি আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন এই দেখে যে সারা ভারত স্বামীজীর ভাব ও আদর্শে প্রানবন্ত হয়ে উঠেছে। *(উৎস: চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ – ৯৫৫পৃ)।*

উল্লেখ্য, সিস্টার নিবেদিতা বা সিস্টার ক্রিস্টিনের মত যদিও ম্যাকলাউড জোসেফিন সন্ন্যাসীনি ছিলেন না, তবুও পাশ্চ্যাতে বিবেকানন্দের বেদান্ত প্রচারে জোসেফিনের অবদান ছিল অসামান্য। ১৯০২ সালে বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর, ম্যাকলাউড জোসেফিন দুই বছরের জন্য বিষণ্নতা ও হতাশার অবস্থার মধ্যে চলে যান, এরপর তিনি পরবর্তী চার দশক স্বামীজির বেদান্তিক তত্ত্ব প্রচারে নিজেকে উৎসর্গ করেন। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরও জোসেফাইন রামকৃষ্ণ অর্ডার অর্থাৎ নির্দেশাবলীর সাথে সংযুক্ত ছিলেন। ম্যাকলাউড জোসেফিন রামকৃষ্ণ মিশন 'উদবোধন প্রেস' প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক ৮00 ডলার প্রদান করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনার রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলায় ম্যাকলাউড জোসেফিন প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে বাংলার তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর লর্ড কারমাইকেল রামকৃষ্ণ মিশনের উপর কুত্সা মূলক একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় অনুশীলন সমিতির সাথে জড়িত জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডে রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু সন্ন্যাসীর জড়িত আছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই কারণে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সবসময় সরকারের নজরদারিতে থাকত। তাছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের অগ্নিময় বক্তৃতা এবং আদর্শ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র

বসু, অরবিন্দ ঘোষের মত অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। যাইহোক, ব্রিটিশ সরকারের উচ্চ স্তরের সামনে রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে ম্যাকলাউড জোসেফিনের অনুকূল মতামত সেই সময় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনার রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

ম্যাকলাউড জোসেফিনকে স্বামীজী বলেছিলেন; "তুমি যে একজন আমেরিকাবাসী, একজন স্ত্রীলোক- এগুলো আকস্মিক ঘটনা। আসলে চিরকালই তুমি ভগবানের সন্তান। দিনরাত নিজেকে বল- কে তুমি, নিজের স্বরূপ কখনও ভুলে যেও না"। তাঁর স্মৃতিকথায় জোসেফিন লিখেছেন; "একদিন বেলুড় ভগিণী নিবেদিতা কয়েকজন ব্যায়ামবীরদের পুরষ্কার দিচ্ছিলেন। আমি দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম। স্বামীজী তখন আমায় বলেছিলেনঃ 'আমি চল্লিস বছর অবধি বাঁচব না"। আমি জানতাম, তাঁর বয়স তখন উনচল্লিশ। আমি বললামঃ 'কিন্তু স্বামীজী, বুদ্ধ তো তাঁর বড়বড় কাজগুলো চল্লিশ আর আশির মধ্যেই করেছেন।' তিনি বললেন; আমি আমার কথা দিয়েছি। আমাকে যেতে হবেই।' জিজ্ঞাসা করলামঃ 'কেন স্বামীজী?' তিনি বললেন, 'বড় গাছের তলায় থাকলে অপেক্ষাকৃত ছোট গাছগুলো বড় হয়ে উঠতে পারে না। অন্যকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য আমাকে যেতে হবে।" (*উৎসঃ Reminiscences of Swami Vivekananda; Josephine Macleod's Letters – Wikipedia*)।

ঘটনা১১; মিসেস ব্লজেট ও- স্বামী বিবেকানন্দ;

মিসেস ব্লজেট একবার স্বামীজী সম্বন্ধে বলেছিলেন "পৃথিবীতে যদি কোন ভগবান থাকেন, তবে ইনিই (স্বামী বিবেকানন্দ)"। ম্যাকলাউড জোসেফিন সংক্ষেপে লিখেছেন কেন মিসেস ব্লজেট স্বামীজীকে ভগবান বলে অভিহিত করেছিলেন। জোসেফিন একদিন লস এঞ্জেলসের এক অপরিচিত মহিলার চিঠি পেলেন। চিঠিতে ঐ অপরিচিত ভদ্রমহিলা জানালেন- সেখানে জোসেফিনের একমাত্র ভাই গুরুতর অসুস্থ। ভদ্রমহিলা ধারনা, তাঁর ভাই আর বেশিদিন বাঁচবেন না। সেই সময় স্বামীজী রিজলী

ম্যানরে বেদান্তের উপর ক্লাস নিচ্ছিলেন। চিঠিটা পাওয়ার দু ঘণ্টার মধ্যে লস এঞ্জেলসে জাওয়ার জন্য জোসেফিন প্রস্তুত হয়ে গেলেন। রওনা হবার সময় স্বামীজী জোসেফিনকে বললেন ওখানে গিয়ে লস এঞ্জেলসে একটা ক্লাসের বন্দোবস্ত করতে। জোসেফিন লস এঞ্জেলসে চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে দেখলেন, মৃতপ্রায় অবস্থায় বিছানে শুয়ে তাঁর ভাই এবং তার বিছানার উপর স্বামীজীর একটা পূর্ণ বয়ব প্রতিকৃতি।জোসেফিন প্রায় দশ বছর তাঁর ভাইকে দেখেনি। ভাইয়ের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার পর জোসেফিন গেলেন গৃহকর্ত্রী, মিসেস ব্লজেটের সঙ্গে দেখা করতে। অন্যান্য কথার সঙ্গে, জোসেফিন মিসেস ব্লজেটেকে বললেন, যেহেতু তার ভাই খুব অসুস্থ এবং হয়ত তিনি বেশি দিন বাঁচবেন না, তাই সে চায়, শেষ কয়েকটা দিন সে ভাইয়ের পাশে থাকবে। মিসেস ব্লজেটে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। তারপর জোসেফিন মিসেস ব্লজেটেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তার ভাইয়ের বিছানার উপর যে ছবিটা রয়েছে, ছবিটা কার?" অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মিসেস ব্লজেট উত্তর দিলেনঃ 'পৃথিবীতে যদি কোন ভগবান থাকেন, তবে ইনিই'। জোসেফিন তখন মিসেস ব্লজেটেকে জিজ্ঞাসা করলেন উনি ঐ সন্ন্যাসী সম্বন্ধে কি কিছু জানেন? মিসেস ব্লজেট উত্তরে বললেনঃ "১৮৯৩খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। যখন ঐ তরুণ সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে বললেন; "আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতৃগন, তখন ঐ বিশ্বধর্ম মহাসভায় উপস্থিত সাত হাজার মানুষ অজ্ঞাত কোন কিছুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সবিনয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁর বক্তৃতা শেষ হতে না হতে, দলে দলে মেয়েরা বেন্‌চ ডিঙিয়ে তাঁর কাছে যাওয়ার চেস্টা করতে লাগল। সে এক ভয়ংকর আক্রমণ ছিল। এই দেখে আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, 'বাছা, তুমি যদি এই আক্রমণ সহ্য করতে পার, তবে আমি বুঝব-তুমি সত্যিই ভগবান। এই কথা শুনে, জোসেফিন বিস্মিত হলেন এবং বললেনঃ"আমি ঐ তরুণ সন্ন্যাসীকে চিনি। নিউইয়র্কের ক্যাটসকিল পর্বতের পাশে ছোট্ট গ্রাম স্টোনরিজ থেকে আমি এসেছি। আর ঐ তরুণ সন্ন্যাসী, স্বামী বিবেকানন্দ এখন সেইখানেই আছেন। আপনি তাঁকে এখানে

আসতে অনুরোধ করলে, তিনি এখনে আসতে পারেন।" অবাক হয়ে ব্লজেট বললেনঃ "আমি বললে, তিনি এখানে আসবেন!" জোসেফিন: নিশ্চই আসবেন" । জোসেফিন স্বামীজীকে সেখানে আসতে বললেন। স্বামীজী তিন সপ্তাহের মধ্যে ওখানে পৌঁছালেন। সেখানে গিয়ে তিনি ক্লাস আরম্ভ করলেন।

ফহটনা১২; স্বামী বিবেকানন্দ ও সিস্টার ক্রিস্টিন;

সিস্টার ক্রিস্টিন একজন শিক্ষিকা, ও সমাজসেবী। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শিষ্যা। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ সালে ক্রিস্টিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট শহরে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা প্রথম শোনেন যা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৮৯৫ সালে বিবেকানন্দ তাঁকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দেন। সিস্টার ক্রিস্টিনের আসল নাম ক্রিস্টিনা গ্রিনস্টাইডেল। তাঁর জন্ম জার্মানির নুরেমবার্গে। তাঁর আরও পাঁচটি ছোট বোন ছিল। তাঁর বয়স যখন তিন বছর তাঁদের পরিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন এবং মিচিগানের ডেট্রয়েটে বসাবাস শুরু করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন জার্মানের বিদ্বান ব্যক্তি। ক্রিস্টিনের বয়স যখন ১৭ তখন তাঁর বাবা মারা যান। পুরো পরিবারের দায়িত্ব ক্রিস্টিনকে নিতে হয়। ক্রিস্টিন ১৮৮৩ সালে ডেট্রয়েট পাবলিক স্কুল সিস্টেমে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে ক্রিস্টিন ও তাঁর বন্ধু ম্যারি ফাঙ্কির ডেট্রয়েটে স্বামীজীর বেদান্ত দর্শনের উপর বেশকিছু বক্তৃতা শোনার সুযোগ হয়েছিল। ক্রিস্টিন স্বামীজীর ঐ বক্তৃতা শোনার পর এতটাই মোহিত হয়ে যান যে তিনি পরে স্বামীজীর অনেক বক্তৃতা শোনেন এবং তিনি পরে স্বামীজির শিষ্যা হয়ে যান। পরে যখন স্বামীজী তাঁর বেদান্ত প্রচারের উদ্দেশে ডেট্রয়েট থেকে থাউজ্যাণ্ড আইল্যান্ড পার্কে চলে যান ক্রিস্টিন ও তাঁর বন্ধু ম্যারি ফাঙ্কও সেখানে আসেন স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার জন্য। থাউজ্যাণ্ড আইল্যান্ড পার্কে বিবেকানন্দের বক্তৃতা দেওয়ার সময় ক্রিস্টিন বিবেকানন্দের প্রিয় শিক্ষার্থী হয়ে ওঠেন। সেখানে স্বামীজী যে পাঁচজনকে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দিয়েছিলেন ক্রিস্টিন তাদের মধ্যে অন্যতম।

ক্রিস্টিন তাঁর স্মৃতিকথা “Swami Vivekananda As I Saw Him” পুস্তিকাটিতে লিখেছেনঃ "*১৮৯৪সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এক শীতের সন্ধ্যায়* শুধুমাত্র আমার বন্ধু মিসেস মেরি সি *ফাঙ্কির অনুরোধে আমি* অতি অনিচ্ছায় *গিয়েছিলাম ডেট্রয়েটর ইউনিটেরিয়ান চার্চে বিবেকানন্দ নামে* ভারতের এক সন্ন্যাসীর *কিছু বক্তৃতা শুনব বলে।কিন্তু তখন আমি বিন্দুমাত্র বুঝতে পারিনি যে, আমি এমন একটা কিছু করতে যাচ্ছি যা আমার সমগ্র জীবনের ধারাটাই পাল্টে দেবে।* ওখানে গিয়ে ভারতের ঐ তরুণ সন্ন্যাসীর প্রথম *বক্তৃতা শুনে আমাদের মনে হয়েছিল যে বিগত বহু জন্মে আমরা কখনো এত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেইনি। কারন মাত্র পাঁচ মিনিটের বক্তৃতা শুনার পর আমাদের মণে হতে লাগল, আমরা এতকালধরে যে পরশমণির সন্ধান করে আসেছি, আমরা সেই পরশমনির সন্ধান এখনে পেয়েগেছি। আমরা দুজনেই বলতে লাগলাম আমরা যদি এই সুযোগ হারাতাম, তাহলে আমাদের অনেক ভুল হয়েযেত*"। ক্রিস্টিন তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেনঃ "তাঁর *বক্তৃতার মধ্যে ভারতের সুপ্রাচীন দর্শনের বানীগুলি আমাদের মণে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করত। তিনি বলতেন- 'অমৃতের পুত্র তোমরা, শোন, ঊর্ধ্বলোকবাসীগন, তোমরাও শোন, আমি সেই সনাতন পুরুষকে দেখছি, যাঁকে জানলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়'। তাঁর ঐসকল বানীগুলি আমাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত আত্মার উপলব্ধি জাগরিত করেছিল*"। ক্রিস্টিন আরও উল্লেখ করেছেন; *"স্বামীজীর দর্শন কোন অনুমানের উপর ভিত্তি ণয়; তা ছিল জিবন্ত ও সম্পূর্ণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর নিজের উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত।"* স্বামীজীর বলা সিংহশিশু ও ভেড়ার গল্পটি ক্রিস্টিনর মনে বিশেষ দাগ কেটেছিল। স্বামীজী বলতেন; *"মেষের মত তোমার কান্না, তোমার ভীরুতা- এ সবকিছু সত্ত্বেও, তুমি কখনই মেষ নও। সর্বদা তুমি সিংহ। সিংহই ছিলে সর্বদা। তাই তুমি সর্বদা পশুরাজ সিংহের মত শক্তিমান ও নির্ভীক। ভ্রান্তি ও ভুলের আবরণটা দূর করতে হবে"*। স্বামীজীর এই কথাগুলি স্মরণ করে ক্রিস্টিন বলেছেন যে তাঁর এই সকল বাণীর মধ্য থেকে এমন শক্তি বা তড়িৎ প্রবাহ নির্গত হয়েছিল যা তাদেরকে পবিত্রতর ও ঊর্ধ্বতর পরিমণ্ডলে

পৌঁছে দিইয়েছিল। ক্রিস্টিন তাঁর স্মৃতিকথায় আরও উল্লেখ করেছেন; স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কাছে ছিলেন এক কালজয়ী তরুণ সন্ন্যাসী যিনি সুপ্রাচীন প্রজ্ঞায় অতি প্রবীণ যিনি ভারতের বেদান্তের বানী প্রচার করে আত্মা ও ব্রহ্ম সম্পর্কে সারা বিশ্বকে শিক্ষাদান করেছেন। এরপর ক্রিস্টিন নারী-*শিক্ষা উপর স্বামীজীর চিন্তা ও দর্শন প্রসঙ্গে ক্রিস্টিন বলেছেন, "তাদের অনেকের বিশ্বাস যে নারী-শিক্ষা উপর স্বামীজীর চিন্তা ভাবনাগুলি যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে এমন এক নারীজাতী গড়ে উঠবে বিশ্বের ইতিহাসে যারা বিরল হয়ে উঠবে।"* ১৯০২ সালের ৭ এপ্রিলে ক্রিস্টিন প্রথম কলকাতায় আসেন। পরেরদিন সকালে তিনি বেলুড়মঠে এসে বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।সেদিন পুরো দিন তিনি বেলুড় মঠে ছিলেন। জানা যায়, পরবর্তী সময় ক্রিস্টিন মাঝে মাঝেই বেলুড় মঠে আসতেন এবং বেলুড় মঠে এলে তিনি পুরো দিন সেখানে থাকতেন।

১৩) বিবেকানন্দে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি;

স্বামী বিবেকানন্দের নতুন নতুন বই পড়ার খুব শখ ছিল| শিকাগোতে থাকাকালীন স্বামী বিবেকানন্দ সেখানকার এক লাইব্রেরীতে যেতেন ও প্রতিদিন একটি করে নতুন বই নিয়ে আসতেন ও পরের দিন সেই বই ফেরত দিতেন। ঐ দেখে বিবেকানন্দের বই পড়ার ব্যাপারে লাইব্রেরিয়ানের একটু সন্দেহ হল। তিনি ভাবলেন- স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিদিন লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে যান, কিন্তু বই না পড়েই ফেরত দিয়ে যান। মনে ঐ সন্দেহ নিয়ে লাইব্রেরিয়ান একদিন স্বামী বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন;" আপনি যখন বইগুলো পড়তে চান না তাহলে কেন নিয়ে যান?" তখন স্বামী বিবেকানন্দ বললেন আমার এই বইগুলো পড়া হয়ে গিয়েছে, তখন লাইব্রেরিয়ান আরো বিরক্তি হয়ে বললেন-"এটা সম্ভব নয়"। তখন স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, "আপনি এই বইগুলোর মধ্যে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমাকে।" লাইব্রেরিয়ান ভীষণ বিরক্ত হয়ে স্বামীজীকে বেশ কিছু প্রশ্ন করলেন।স্বামী বিবেকানন্দ তার সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে

দিলেন। ঐ দেখে লাইব্রেরিয়ান অবাক হয়ে গেলেন এবং বলেছিলেন যে এইরকম মানুষ এর আগে কখনো দেখেনি।

১৪) বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকারে নিউ ইয়র্কের সাংবাদিক।

সাংবাদিক – "স্যার, আপনার বক্তৃতায় আপনি আমাদের **যোগাযোগ এবং সংযোগ** সম্পর্কে বললেন। এটা সত্যিই বিভ্রান্তিকর। আপনি কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন?"

স্বামী বিবেকানন্দ হাসলেন এবং স্পষ্টতই প্রশ্ন থেকে সরে এসে সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা করলেন:

"তুমি কি নিউ ইয়র্ক থেকে?" সাংবাদিক: "হ্যাঁ..."

বিবেকানন্দ: "ঘরে কে কে আছেন?"

সাংবাদিকের মনে হলো সন্ন্যাসী তার প্রশ্নের উত্তর এড়াতে চাইছেন কারণ এটি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ছিল।

তবুও সাংবাদিক বললেন: "মা মারা গেছেন। বাবা আছেন। তিন ভাই এবং এক বোন। সবাই বিবাহিত..."

স্বামী বিবেকানন্দ, মুখে হাসি নিয়ে, আবার জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি তোমার বাবার সাথে কথা বলো?"

সাংবাদিককে স্পষ্টতই বিরক্ত দেখাচ্ছিল...

স্বামী বিবেকানন্দ, "আপনি শেষ কবে তার সাথে কথা বলেছিলেন?"

সাংবাদিক তার বিরক্তি চেপে বললেন: "হয়তো এক মাস আগে।"

স্বামী বিবেকানন্দ: "তোমরা কি ভাইবোনেরা প্রায়ই দেখা করো? শেষ কবে পারিবারিকভাবে দেখা করেছো?"

এই মুহূর্তে সাংবাদিকের কপালে ঘাম ফুটে উঠল। এখন সাক্ষাৎকারটি কে নিচ্ছে, সন্ন্যাসী নাকি সাংবাদিক? মনে হচ্ছিল সন্ন্যাসী সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাংবাদিক বললেন: "আমরা শেষবার দুই বছর আগে বড়দিনে দেখা করেছিলাম।"

স্বামী বিবেকানন্দ: "তোমরা সবাই কত দিন একসাথে ছিলে?"

সাংবাদিক (কপালের ঘাম মুছতে মুছতে) বললেন: "তিন দিন..."

স্বামী বিবেকানন্দ: "তুমি তোমার বাবার পাশে বসে কতটা সময় কাটিয়েছ?"

সাংবাদিকটি বিভ্রান্ত ও বিব্রত দেখাচ্ছিল এবং একটি কাগজে কিছু লিখতে শুরু করল...

স্বামী বিবেকানন্দ: "তোমরা কি একসাথে নাস্তা, দুপুরের খাবার বা রাতের খাবার খেয়েছ? তুমি কি জিজ্ঞেস করেছিলে সে কেমন আছে? তুমি কি জিজ্ঞেস করেছিলে তোমার মায়ের মৃত্যুর পর তার দিনগুলো কেমন যাচ্ছে?" সাংবাদিকের চোখ থেকে অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

স্বামী বিবেকানন্দ সাংবাদিকের হাত ধরে বললেন: "লজ্জিত, বিচলিত বা দুঃখিত হবেন না। যদি আমি আপনাকে অজান্তে আঘাত করে থাকি তবে আমি দুঃখিত... তবে এটি মূলত "যোগাযোগ এবং সংযোগ" সম্পর্কে আপনার প্রশ্নের উত্তর।" তোমার বাবার সাথে 'যোগাযোগ' আছে কিন্তু তার সাথে তোমার 'সংযোগ ' নেই। তুমি তার সাথে সংযুক্ত নও। তোমাদের ভাইবোনদের মধ্যে 'যোগাযোগ' আছে কিন্তু তোমাদের একে অপরের সাথে সংযুক্ত নও। সাংবাদিক চোখ মুছে বললেন: "আমাকে একটি চমৎকার এবং অবিস্মরণীয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।"

বিবেকানন্দের মহাপ্রায়ন

১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ দেহ অবসান ঘটে। ঐ ভোরে বিবেকানন্দ ঘুম থেকে ওঠে বেলুড় মঠের প্রার্থনাগৃহে তিন ঘণ্টা ধরে ধ্যান করেন। এরপর তিনি শিষ্যদের সঙ্গে যোগ-দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। ঐ দিন বেলুড় ঘাটে জেলেদের ইলিশ-ভর্তি

নৌকা লেগেছিল। স্বামীজী বহু উৎসাহে অনেক ইলিশ মাছ কিনিয়েছিলেন। দুপুরে সবার সঙ্গে ইলিশের নানা পদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করলেন।পরে সহকর্মীদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠের বৈদিক কলেজ পরিকল্পনার আলোচনা করেন। এরপর তিনি স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে হাঁটতে বের হলেন। ঐসময় তিনি রামকৃষ্ণ মঠের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ স্বামীজী তাঁর ঘরে চলে যান এবং কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে সকলকে সেই নির্দেশ দেন। এরপর তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যান। এই অবস্থায় প্রায় দু ঘণ্টা থাকার পর রাত প্রায় ৯টা ১০ মিনিটে ধ্যানরত অবস্থায় তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর শিষ্যদের মতে, বিবেকানন্দের মহাসমাধি ঘটেছিল।

চিকিৎসকের প্রতিবেদনে বলা হয়-তাঁর মৃত্যু হয়েছে তাঁর মস্তিষ্কে একটি রক্তনালী ফেটে যাবার কারণে। কিন্তু তারা মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্ধার করতে পারেনি। বিবেকানন্দ চল্লিশ বছর জীবৎকাল পূর্ণ করার আগেই তাঁর ভাববাণী সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বেলুড়ে গঙ্গা নদীর তীরে একটি চন্দনকাঠের চিতায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, যার বিপরীত পাশে ষোল বছর আগে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মরদেহ দাহ করা হয়েছিল। নিজের মৃত্যুর ইঙ্গিত অনেক আগেই পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মৃত্যুর মাত্র তিন দিন আগে বেলুড় মঠে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা জায়গাতে তাঁর চোখ যায়।ঐ জায়গাটিকে নির্দেশ করে তিনি তাঁর এক শিষ্যকে বলেছিলেন,"আমার দেহ অবসান হলে, ঐ জায়গাতে আমার শবদাহ করবি।" স্বয়ং বিবেকানন্দ অনেকের কাছে অনেক আগেই বলেছিলেন যে ৪০বৎসর বয়সের আগেই তিনি চলে যাবেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল-৩৯বৎসর ৫মাস ২৫দিন। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বলেছিলেন, নরেন যেদিন বুঝতে পারবে, তার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে সে নিজেই চলে যাবে। তিনি হাঁপানি, ডায়াবেটিস ও অন্যান্য শারীরিক অসুখে ভুগছিলেন। তাঁর দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে পঞ্জিকা পড়তে দেখা যায়। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার তিন দিন পূর্বে তিনি তাঁর

মরদেহ দাহ করার স্থান দেখিয়ে দেন -যে স্থানে বর্তমানে তার স্মৃতিতে একটি মন্দির দাঁড়িয়ে আছে।এই ব্যাপারে আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা না বললেই নয়। তাঁর দেহাবসানের তিন দিন আগে তাঁর প্রিয় ভক্ত সিস্টার নিবেদিতাকে তিনি তাঁর মৃত্যুর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।১৯০২ সালের ২জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ ভগ্নী নিবেদিতাকে নেমন্তন্ন করে নিজের হাতে রান্না করে খাইয়েছিলেন এবং সেই সময় ভগ্নী নিবেদিতাকে নানা ভাবে তাঁর মহাপ্রয়াণের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।কিন্তু ভগ্নী নিবেদিতা গুরুর সেই ইঙ্গিত তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেন নি যে তাঁর গুরু নিজের মহাপ্রয়াণের কথা বলছিলেন। স্বামীজীর মৃত্যুর পর, গুরুর সেই কথাগুলি স্মরণ করে ভগ্নী নিবেদিতা বুঝতে পারেন, ঐ সময় তাঁর গুরু তাঁর নিজের দেহাবসানের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বৎসর আগে, তিনি তাঁর অনুগামী স্বামী অভেদানন্দকে বলেছিলেন, "বুঝলে অভেদানন্দ, আমি হয়ত আর পাঁচ বৎসর বাঁচব। আমার আত্মা দিনে দিনে বড় হয়ে যাচ্ছে। এত বড় হয়ে যাচ্ছে যে শরীরের মধ্যে তাকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। সে বারে বারে শরীর ছেড়ে পালাতে চাইছে।" ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই এ তাই ঘটল।

14. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কয়েকদিন আগে ৯ই মে ২০২৫ অর্থাৎ ২৫শে বৈশাখ ১৪৩২ তারিখে আমাদের প্রানের ঠাকুর, গানের ঠাকুর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪তম জন্মজয়ন্তী আমরা বাঙালি মহাসমারোহে উদযাপন করেছি। রবীন্দ্র জয়ন্তী আমাদের অন্যতম বড় উৎসব। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের সৃজনে, চিন্তনে, মননে, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এতটাই ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে আছেন যে তাঁর জন্মদিন এক আনন্দময় উৎসবে পরিণত হয়েছে জাতির জীবনে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য সৃষ্টি যেন সমুদ্রের ন্যায় অতলস্পর্শী। তাঁর সৃষ্টি কাব্য, উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাট্যসাহিত্য, প্রবন্ধ, চিত্রকলা ও সঙ্গীত বাংলাসাহিত্যকে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ করেছে। তাই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এ পর্যন্ত যত কিছু লেখা হয়েছে, তার এক দশমাংশ অন্য কোনো কবি বা সাহিত্যিককে নিয়ে নিঃসন্দেহে লেখা হয়নি বলে আমার অনুমান। তাঁর কাব্য, উপন্যাস, ছোট গল্প এবং গানের গুণগ্রাহীরও অন্ত নেই। দেশ-বিদেশের শিক্ষক, অধ্যাপক, স্কুল কলেজের, ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও অনুবাদক, অসংখ্য সংগীত শিল্পী এবং দেশবিদেশের আপামর জনসাধারণ

সকলেই তাঁর ভক্ত ও গুণগ্রাহী। ব্যক্তিগতভাবে আমিও রবীন্দ্রনাথের বড় ভক্ত এবং গুণগ্রাহী। তাই তাঁর জীবনের কিছু কথা আমার লেখার মধ্যে তুলে ধরে তাঁর প্রতি আমার অপার শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করতে চাই। তাঁর সম্পর্কে আমার লেখাটি নিজের মত করে কয়েকটি বিষয়ে সাজিয়েছি;

1) **জন্ম ও শৈশব**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ১২৬৮ সালের ২৫ বৈশাখ তথা ইংরেজি ১৮৬১ সালের 9ই মে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি এক ধনাঢ্য ও সংস্কৃতিবান ব্রাহ্ম পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবার। উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ তথ্য অনুসারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃপুরুষদের আদি আবাস ছিল বাংলাদেশের খুলনা জেলায় পিঠাভোগ গ্রামে। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত ব্রাহ্ম ধর্মগুরু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা ছিলেন সারদাসুন্দরী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পিতামাতার চতুর্দশ সন্তান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিল ব্রাহ্ম আদিধর্ম মতবাদের প্রবক্তা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক এবং এক দার্শনিক। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতার নাম ছিল প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। রবি ঠাকুরের শৈশব জীবনের কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ে যায় তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা। তিনিই হলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা।

বংশপরিচয়

উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সমকালীন সমুদ্রে বাণিজ্যকারী ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন। শুধু তাই নয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইউরোপীয় বণিকদের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বাঙালায় শিল্প-বাণিজ্যের উদ্যোক্তা ও সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মযোগী ছিলেন। কলকাতার বিখ্যাত ম্যাকিনটশ অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে রপ্তানি ও অন্যান্য বাণিজ্যে তিনি মূলধন বিনিয়োগ করতেন। ম্যাকিনটশ অ্যান্ড

কোম্পানি তখন ম্যাকিনটশ বার্ন লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল। ১৮২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ও তিনি অংশীদার হয়েছিলেন। জমিদারি পরিচালনাসহ দ্বারকানাথের এসব ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ড কোম্পানির অধীনে চাকরি করার পাশাপাশি চলতে থাকে। তাঁর জীবন দর্শন ছিল Work is Life অর্থাৎ কর্মই জীবন যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের কাছে পূজিত Works of Rabindranth অর্থাৎ তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি ও সম্ভারের জন্য। ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে দ্বারকানাথকে সম্মানসূচক 'জাস্টিস অব দি পীস' পদ প্রদান করা হয়। এর কিছুদিন পর দ্বারকানাথ তাঁর মূলধনি ব্যবসায়ের সাফল্যের শিখরে উপনীত হন। জাহাজ ব্যবসা (Shipping Business) রপ্তানি বাণিজ্য (Export Business) , বীমা ও ব্যাংকিং (Insurance & Banking Business) , কয়লা খনি (Coal Mining), নীলচাষ, শহরের গৃহায়ণ প্রকল্প (Housing Projects). তিনি এই সকল বড় বড় মূলধনি ব্যবসায়ে জমিদারি তালুকে অর্জিত অর্থ বিনিয়োগ করতেন। তাঁর এই বিশাল বানিজ্য সাম্রাজ্য তদারকি করত বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় ম্যানেজার। এছাড়া তাঁর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা ছিল- সংবাদপত্রের ব্যবসা। এ দেশে সংবাদমাধ্যম স্থাপন এবং তার উন্নতির জন্য দ্বারকানাথের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। ১৮২১-এ রামমোহন প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক সংবাদ কৌমুদীর তিনি সম্পাদক ছিলেন। ইংরেজি সাপ্তাহিক তাঁর হাতে 'বেঙ্গল হেরল্ড' এবং বাংলা 'বঙ্গদূত' কাগজের সূচনাও তিনি করেছিলেন। এ ছাড়া তার অর্থ সাহায্যে চলত 'বেঙ্গল হরকরা', 'ইন্ডিয়া গেজেট', 'ইংলিশম্যান' প্রভৃতি সংবাদপত্র।

ইউরোপীয় ও স্বদেশী বন্ধুদের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর বন্ধু রাজা রামমোহন রায়ের মতো ইংল্যান্ড যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৮৪২ সালের প্রথম দিকে তিনি তাঁর নিজস্ব স্টিমার 'দি ইন্ডিয়া' সহযোগে সুয়েজের পথে যাত্রা করেন। তার সফরসঙ্গী ছিলেন ইউরোপীয় চিকিৎসক ডাঃ ম্যাকগাওয়ান, ব্যক্তিগত সহকারী চন্দ্রমোহন চ্যাটার্জী ও পরমানন্দ মৈত্র এবং

তিন জন হিন্দু ভৃত্য ও একজন মুসলমান বাবুর্চি। বিলেতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরাট পীল, বোর্ড অব কন্ট্রোল প্রেসিডেন্ট লর্ড ফিটজার, প্রিন্স এলবার্ট এবং রানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ১৮৪২ সালের ২৩ জুন তিনি রানীর সঙ্গে রাজকীয় সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করেন। ঐ বৎসর ৮ই জুলাই রানী তাকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করেছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ সম্পর্কে রানী তার ডায়রিতে লেখেন: ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বেশ ভাল ইংরেজি বলেন এবং তিনি একজন বুদ্ধিমান ও চমৎকার মানুষ। ১৮৪২ সালে ১৫ই অক্টোবর দ্বারকানাথ ইংল্যান্ড থেকে প্যারিসে যান। ২৮ অক্টোবর ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ তাঁকে সেন্ট ক্লাউডে এক সংবর্ধনা দেন। ১৮৪২ সালের ডিসেম্বরে তিনি কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকের তাঁর ব্যবসায়ে বিশাল মন্দা আসে। ব্যবসায়িক মহামন্দা এবং তাঁর ভয়ঙ্কর আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন- এ দুয়ের ফলে তিনি বহু ব্যক্তি ও কোম্পানির কাছে ঋণী হয়ে পড়েন। ঐ ঋণের পরিমাণ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে বাড়তেই থাকে। পরিণামে তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে পিতার ঋণের দায় বহন করতে হয় এবং গোটা পরিবারকে দায়মুক্ত করতে দেবেন্দ্রনাথের সারাজীবন কেটে যায়। ঠাকুর পরিবারে চরম বিপর্যয় নেমে আসে। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ১ লা আগস্ট, মাত্র ৫১বছর বয়সে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়। তাঁর দেহ লন্ডনের 'কেনসাল গ্রিন' সামাধিক্ষেত্রে রাজকীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ করা হয়েছিল। জানা যায় মৃত্যু সংবাদ কলকাতা পৌঁছেছিল প্রায় দেড় মাস পরে। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীর কথা লিখতে গিয়ে তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হয়ে গেল। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত বিস্ময়কর ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের ও জ্ঞানের জন্য বিশ্ব বরেণ্য ছিলেন আর তাঁর পিতামহ ব্যবসা, ধনসম্পদ, আড়ম্বরপূর্ণ জীবন এবং শেষ পরিণাম আসমুদ্র ঋণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

যাইহোক প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবন ছেড়ে আবার আসি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শৈশব জীবনে। ১৮৭৫ সালে রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র চোদ্দ বছর তখন তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। পিতা দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ কারণে বছরের অধিকাংশ সময় কলকাতার বাইরে থাকতেন। তাই কলকাতার বিশেষ ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান হয়েও রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছিল ভৃত্যদের অনুশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণে। ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "পিতা দেবেন্দ্রনাথ দেশভ্রমণের নেশায় বছরের অধিকাংশ সময় কলকাতার বাইরে অতিবাহিত করতেন।" ভৃত্যের তত্ত্বাবধানে কাটানো শৈশবকালে শিক্ষা, জীবনযাপন ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যিক কর্মে প্রভাব ফেলেছিল। ছেলেবেলায় ঠাকুরবাড়ির রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, সভ্যতা আর প্রাকৃতিক পরিবেশে তিনি গড়ে ওঠেন। ছেলেবেলায় প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে প্রাকৃতিক পরিবেশ, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করতেন। যদিও পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বছরের অধিকাংশ সময় কলকাতার বাইরে থাকতেন, তবুও রবীন্দ্রনাথ পিতার আদর্শে বড় হয়েছিলেন।

শৈশবে পড়াশোনা

তাঁর জীবন-চরিত পড়ে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় দাদা হেমেন্দ্রনাথের কাছে। বিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা শিক্ষাব্যবস্থা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাই তিনি শৈশবে কলকাতার কোনো নির্দিষ্ট স্কুলে দীর্ঘ সময় ধরে পড়াশোনা করেননি। প্রথমদিকে তিনি নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গল অ্যাকাদেমি, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও শেষে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি বিদ্যালয়ে যেতে অস্বীকার করেন। যেহেতু শৈশবে বিদ্যালয়ে পড়াশোনাতে তাঁর উৎসাহ ছিল না, গৃহশিক্ষক রেখে তাঁর পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। বাড়িতে তিনি বাংলা ভাষা, ইংরেজি ভাষা, অঙ্কন, ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, গণিত ও সংস্কৃত গৃহ শিক্ষকদের কাছে ভালভাবে চর্চা করতেন।

তিনি বিদ্যালয়ের নিষ্প্রাণ ও বাঁধাধরা শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন তিনি শৈশবে মেনে নিতে পারেন নি সে বিষয়ে পরবর্তীকালে তিনি ভালভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর **জীবনস্মৃতি** গ্রন্থটিতে। তিনি সেখানে লিখেছেনঃ

"ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে যখন পড়িতেছিলাম তখন কেবলমাত্র ছাত্র হইয়া থাকিবার যে হীনতা তাহা মিটাইবার একটা উপায় বাহির করিয়াছিলাম। আমাদের বারান্দার একটি বিশেষ কোণে আমিও একটি ক্লাস খুলিয়াছিলাম। রেলিংগুলা ছিল আমার ছাত্র। একটা কাঠি হাতে করিয়া চৌকি লইয়া তাহাদের সামনে বসিয়া মাস্টারি করিতাম। রেলিংগুলার মধ্যে কে ভালো ছেলে এবং কে মন্দ ছেলে তাহা একেবারে স্থির করা ছিল। এমন কি ভালোমানুষ রেলিং ও দুষ্ট রেলিং, বুদ্ধিমান রেলিং ও বোকা রেলিঙের মুখশ্রীর প্রভেদ আমি যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতাম। দুষ্ট রেলিংগুলার উপর ক্রমাগত আমার লাঠি পড়িয়া পড়িয়া তাহাদের এমনি দুর্দশা ঘটিয়াছিল যে প্রাণ থাকিলে তাহারা প্রাণ বিসর্জন করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিত। লাঠির চোটে যতই তাহাদের বিকৃতি ঘটিত ততই তাহাদের উপর রাগ কেবলই বাড়িয়া উঠিত; কী করিলে তাহাদের যে যথেষ্ট শাস্তি হইতে পারে তাহা যেন ভাবিয়া কুলাইতে পারিতাম না। আমার সেই নীরব ক্লাসটির উপর কি ভয়ংকর মাস্টারি যে করিয়াছি তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্য আজ কেহই বর্তমান নাই। আমার সেই সেকালের দারুনির্মিত ছাত্রগণের স্থলে সম্প্রতি লৌহনিমিত রেলিং ভরতি হইয়াছে—আমাদের উত্তরবর্তিগণ ইহাদের শিক্ষকতার ভার আজও কেহ গ্রহণ করে নাই; করিলেও তখনকার শাসন প্রণালীতে এখন কোনো ফল হইত না। ইহা বেশ দেখিয়াছি শিক্ষকের প্রদত্ত বিদ্যাটুকু শিখিতে শিশুরা অনেক বিলম্ব করে, কিন্তু শিক্ষকের ভাবখানা শিখিয়া লইতে তাহাদিগকে কোনো দুঃখ পাইতে হয় না। শিক্ষাদান-ব্যাপারের মধ্যে যে-সমস্ত অবিচার,অধৈর্য, ক্রোধ, পক্ষপাত-পরতা ছিল অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের চেয়ে সেটা অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলাম। সুখের বিষয় এই যে, কাঠের রেলিঙের মতো নিতান্ত নির্বাক ও অচল পদার্থ ছাড়া আর কিছুর

উপরে সেই সমস্ত বর্বরতা প্রয়োগ করিবার উপায় সেই দুর্বল বয়সে আমার হাতে ছিল না। কিন্তু যদিচ রেলিং- শ্রেণীর সঙ্গে ছাত্রের শ্রেণীতে পার্থক্য যথেষ্ট ছিল তবু আমার সঙ্গে আর সংকীর্ণচিত্ত শিক্ষকের মনস্তত্ত্বের লেশমাত্র প্রভেদ ছিল না'। উতস; **জীবনস্মৃতি**- নর্মাল স্কুল)

তিনি যে বিদ্যালয়ের নিষ্প্রাণ ও বাঁধাধরা শিক্ষাব্যবস্থাকে মোটেই পছন্দ করতেন না তার প্রমাণ পাওয়া তাঁর লেখা **জীবনস্মৃতি**'র প্রত্যাবর্তন রচনা থেকে। তিনি সেখানে লিখেছেন;

" পৃথিবীসুদ্ধ লোকে কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ পড়িয়া জীবন কাটায় আর আমি পিতার কাছে স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি এই খবরটাতে মাকে সকলের চেয়ে বেশি বিচলিত করিতে পারিয়াছিলাম। তিনি অত্যন্ত খুশি হইয়া বলিলেন "আচ্ছা, বাছা, সেই রামায়ণ আমাদের একটু পড়িয়া শোনা দেখি।"

" মা মনে করিলেন আমার দ্বারা অসাধ্যসাধন হইয়াছে, তাই আর সকলকে বিস্মিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তিনি কহিলেন "একবার দ্বিজেন্দ্রকে শোনা দেখি।"... বড়দাদা আসিতেই কহিলেন "রবি কেমন বাল্মীকির রামায়ণ পড়িতে শিখিয়াছে একবার শোন না।"... বড়দাদা বোধ হয় কোনো একটা রচনায় নিযুক্ত ছিলেন—বাংলা ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য তিনি কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। গুটি কয়েক শ্লোক শুনিয়াই "বেশ হইয়াছে" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।......"

" ইহার পর ইস্কুলে যাওয়া আমার পক্ষে পূর্বের চেয়ে আরও অনেক কঠিন হইয়া উঠিল। নানা ছল করিয়া বেঙ্গল অ্যাকাডেমি হইতে পলাইতে শুরু করিলাম। সেণ্টজেবিয়ার্সে আমাদের ভরতি করিয়া দেওয়া হইল, সেখানেও কোনো ফল হইল না।

দাদারা মাঝে মাঝে এক-আধবার চেষ্টা করিয়া আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। আমাকে ভর্ৎসনা করাও ছাড়িয়া দিলেন। একদিন বড়দিদি কহিলেন, আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম

বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো হইবে কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল। আমি বেশ বুঝিতাম ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে কিন্তু তবু যে-বিদ্যালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাসপাতালজাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা, তাহার নিত্যআবর্তিত ঘানির সঙ্গে কোনোমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।" ....(উৎস; **জীবনস্মৃতি।,প্রত্যাবর্তন)**

২ রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা আমাদের থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল। তাঁর লেখা '**ছেলেবেলা**' প্রবন্ধ পড়ে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। তাঁর প্রবন্ধ থেকে একটু অংশ উদ্‌ধৃত করলাম তাঁর ছেলেবালার একটা ছবি তুলে ধরতে।

"......আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাকরাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়্‌ছড়্ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটরগাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁসফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে, কেউ বা পালকি চ'ড়ে কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা, চামড়ার আধঘোমটাওয়ালা, কোচবাক্সে কোচমান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারি লজ্জা। রোদবৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের গায়ে সেমিজ, পায়ে জুতো, দেখলে সেটাকে বলত মেমসাহেবি; তার মানে, লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া। কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পরপুরুষের সামনে, ফস্ করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরবার পালকিতেও; বড়োমানুষের ঝিবউদের পালকির উপরে আরও

একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘেটাটোপের, দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগলানো, দাড়ি চোমরানো, ব্যাঙ্কে টাকা আর কুটুমবাড়িতে মেয়েদের পৌঁছিয়ে দেওয়া, আর পার্বণের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পালকি-সুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা। দরজায় ফেরিওয়ালা আসত বাক্স সাজিয়ে, তাতে শিউনন্দনেরও কিছু মুনাফা থাকত। আর ছিল ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ান, বখরা নিয়ে বনিয়ে থাকতে যে নারাজ হত সে দেউড়ির সামনে বাধিয়ে দিত বিষম ঝগড়া। আমাদের পালোয়ান জমাদার সোভারাম থেকে থেকে বাঁও কষত, মুগুর ভাঁজত মস্ত ওজনের, বসে বসে সিদ্ধি ঘুঁটত, কখনো বা কাঁচা শাক-সুদ্ধ মুলো খেত আরামে আর আমরা তার কানের কাছে চীৎকার করে উঠতুম "রাধাকৃষ্ণ'; সে যতই হাঁ হাঁ করে দু হাত তুলত আমাদের জেদ ততই বেড়ে উঠত। ইষ্টদেবতার নাম শোনবার জন্যে ঐ ছিল তার ফন্দি।

তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি; কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই সলতের একটা সেজ।

মাস্টারমশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্‌স্‌ট্‌বুক। প্রথমে উঠত হাই, তার পর আসত ঘুম, তার পর চলত চোখ-রগড়ানি। বারবার শুনতে হত, মাস্টারমশায়ের অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা ব'লে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মুর্খু হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না। রাত্রি ন'টা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলু ঢুলু চোখে ছুটি পেতুম। বাহিরমহল থেকে বাড়ির ভিতর যাবার সরু পথ ছিল খড়্‌খড়ির আব্রু-দেওয়া, উপর থেকে ঝুলত মিটমিটে আলোর লণ্ঠন। চলতুম আর মন বলত কী জানি কিসে বুঝি পিছু ধরেছে। পিঠ উঠত শিউরে। তখন ভূত প্রেত ছিল গল্পে-গুজবে, ছিল মানুষের মনের আনাচে-কানাচে। কোন্‌ দাসী কখন হঠাৎ শুনতে

পেত শাঁকচুন্নির নাকি সুর, দড়াম করে পড়ত আছাড় খেয়ে। ঐ মেয়ে-ভূতটা সবচেয়ে ছিল বদমেজাজি, তার লোভ ছিল মাছের 'পরে। বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘন-পাতা-ওয়ালা বাদামগাছ, তারই ডালে এক পা আর অন্য পা'টা তেতালার কার্নিসের 'পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন্ মূর্তি--তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না। দাদার এক বন্ধু যখন গল্পটা হেসে উড়িয়ে দিতেন তখন চাকররা মনে করত লোকটার ধর্মজ্ঞান একটুও নেই, দেবে একদিন ঘাড় মটকিয়ে, তখন বিদ্যে যাবে বেরিয়ে। সে সময়টাতে হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলে ছিল যে, টেবিলের নীচে পা রাখলে পা সুড়সুড় করে উঠত। ...."

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেবেলা সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে তাঁর লেখা '**ছেলেবেলা**' প্রবন্ধটি পড়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ছেলেবেলা" একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ, যেখানে তিনি তাঁর শৈশব ও কৈশোরের বিভিন্ন পরিস্থিতি, অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই প্রবন্ধে যে বিষয়গুলি মূলত প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলি হল; পরিবার, শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ, মানসিক ও শারীরিক পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতা। এই সকল বিষয়ে তাঁর ছেলেবেলার বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন যা স্কুল কলজের ছাত্রছাত্রী এবং সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে আজও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রবন্ধ পড়ে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মায়ের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং পিতার কঠোর শাসনের কথা উল্লেখ করেছেন। শৈশবের শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিভিন্ন শিক্ষকের প্রতি তাঁর অনুভূতি, শৈশবের প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিশেষ করে জোড়াসাঁকো এবং বোলপুরের বাগানবাড়ির স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধে তিনি তাঁর পরিবার এবং সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। শৈশবে তাঁর বিভিন্ন খেলাধুলা, ভ্রমণ, এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতার কথাও নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন। এই

রচনায় রবীন্দ্রনাথ সহজ ও সাবলীল বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা সব ধরণের পাঠকদের জন্য সত্যি আকর্ষণীয়। তাই বিশেষজ্ঞদের মতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ছেলেবেলা" রচনাটি একটি তাঁর মূল্যবান সাহিত্য সৃষ্টি, যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে।

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'জীবনস্মৃতি'** থেকে তাঁর ছেলেবেলার জীবন সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। যেখানে তিনি তাঁর শৈশব, কৈশোর এবং জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর শিক্ষারম্ভ, পরিবার, স্কুল, পিতামাতা, শিক্ষা, হিমালয়-যাত্রা, কাব্যরচনা, সাহিত্যচর্চা, গীতচর্চা, বিলাতযাত্রা এবং আরো অনেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাগুলি বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেছেন।

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'জীবনস্মৃতি'** থেকে সামান্য একটু অংশ উদ্‌ধৃত করলাম তাঁর ছেলেবালার আরো কিছু কথা এখানে তুলে ধরতে।

"আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটের উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখিলে এখনকার কাল লজ্জায় তাহার সঙ্গে সকলপ্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চাহিবে। এই তো তখনকার কালের বিশেষত্ব, তাহার পরে আবার বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই ছিল না। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্য, ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নাই।

আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্তব্যকে সরল করিয়া লইবার জন্য তাহারা আমাদের নড়াচড়া একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেদিকে বন্ধন যতই কঠিন থাক্‌ অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা-সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল।

খাওয়ানো-পরানো সাজানো- গোছানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারিদিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।

আহারে আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়-চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর-একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। কেবল আমাদের বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ বোধ করিতাম—কারণ, এমন বালক কোনো অকিঞ্চনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই পকেটে রাখিবার মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছু-মাত্র নাই; বিধাতার কৃপায় শিশুর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্ধনের ঘরে বেশি কিছু তারতম্য দেখা যায় না। আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতিপদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম—তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতাচালনা এত বাহুল্য পরিমাণে হইত যে পাদুকাসৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

আমাদের চেয়ে যাঁহারা বড়ো তাঁহাদের গতিবিধি,বেশভূষা, আহারবিহার, আরাম-আমোদ, আলাপ-আলোচনা সমস্তই আমাদের কাছ হইতে বহুদূরে ছিল। তাহার আভাস পাইতাম কিন্তু নাগাল পাইতাম না। এখনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লঘু করিয়া লইয়াছে; কোথাও তাহাদের কোনো বাধা নাই এবং না চাহিতেই তাহারা সমস্ত পায়। আমরা এত সহজে কিছুই পাই নাই। কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল; বড়ো হইলে কোনো এক সময়ে পাওয়া যাইবে এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের জিম্মায় সমর্পণ করিয়া বসিয়া ছিলাম। তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্য যাহা কিছু পাইতাম তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খা ে সা হইতে আঁঠি পর্যন্ত কিছুই

ফেলা যাইত না। এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি তাহারা সহজেই সব জিনিস পায় বলিয়া তাহার বারো আনাকেই আধখানা কামড় দিয়া বিসর্জন করে—তাহাদের পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়েই নষ্ট হয়। ..." (উতস; **জীবনস্মৃতি**- ঘর ও বাহির)

ছেলেবেলায় তিনি ভীষণ প্রকৃতি প্রমিক ছিলেন এবং পৃথিবীর গূঢ়তম রহস্য সম্পর্কে ভীষণ কৌতূহলী ছিলেন। তাই তিনি তাঁর '**জীবনস্মৃতি**' বইএর 'ঘর ও বাহির' প্রবন্ধে লিখেছেন;

" তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিল সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ সমস্তই তখন কথা কহিত—মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কী করিলে পৃথিবীর উপরকার এই মেটে রঙের মলাটটাকে খুলিয়া ফেলা যাইতে পারে তাহার কতই প্ল্যান ঠাওরাইয়াছি। মনে ভাবিতাম, একটার পর আর-একটা বাঁশ যদি ঠুকিয়া ঠুকিয়া পোঁতা যায়; এমনি করিয়া অনেক বাঁশ পোঁতা হইয়া গেলে পৃথিবীর খুব গভীরতম তলাটাকে হয়তো একরকম করিয়া নাগাল পাওয়া যাইতে পারে।..। মনে হইত বড়োরা তো ইচ্ছা করিলেই সব করাইতে পারেন তবে তাহারা কেন এমন অগভীরের মধ্যে থামিয়া বসিয়া আছেন—আমাদের মতো শিশুর আজ্ঞা যদি খাটিত তাহা হইলে পৃথিবীর গূঢ়তম সংবাদটি এমন উদাসীনভাবে মাটিচাপা পড়িয়া থাকিত না। আর যেখানে আকাশের নীলিমা তাহারই পশ্চাতে আকাশের সমস্ত রহস্য, সে চিন্তাও মনকে ঠেলা দিত। যেদিন বোধোদয় পড়াইবার উপলক্ষ্যে পণ্ডিত-মহাশয় বলিলেন, আকাশের ঐ নীল গোলকটি কোনো একটা বাধামাত্রই নহে তখন সেটা কী অসম্ভব আশ্চর্যই মনে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, সিঁড়ির উপর সিঁড়ি লাগাইয়া উপরে উঠিয়া যাও না, কোথাও মাথা ঠেকিবে না। আমি ভাবিলাম সিঁড়ি

সম্বন্ধে বুঝি তিনি অনাবশ্যক কার্পণ্য করিতেছেন। আমি কেবলি সুর চড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি; শেষকালে যখন বুঝা গেল সিঁড়ির সংখ্যা বাড়াইয়া কোনো লাভ নাই তখন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এবং মনে করিলাম এটা এমন একটা আশ্চর্য খবর যে পৃথিবীতে যাহারা মাস্টার-মশায় তাহারাই কেবল এটা জানেন আর কেহ নয়।..." (উতস; **জীবনস্মৃতি**- ঘর ও বাহির)

"জীবনস্মৃতি"-র "ঘর ও বাহির" অধ্যায় থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলায় প্রকৃতিকে ভীষণ ভালোবাসতেন। তাঁর গ্রন্থের এই অংশে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটবেলার নানা স্মৃতি, যেমন – আতার বিচি পুঁতিয়া তাতে জল দেওয়া, বিচি হইতে যে গাছ হইতেও পারে সে কথা মনে করিয়া বিস্ময় ও ঔৎসুক্য বোধ; গুণদাদার বাগানের ক্রীড়াশৈল হইতে পাথর চুরি করে এনে তাঁদের পড়ার ঘরের এক কোণে নকল পাহাড় তৈরি করা; মাঝে মাঝে সেখানে ফুলগাছের চারা পুঁতে তাহাদের অতিশয় সেবা করা , নকল পাহাড় থেকে অতিশয় আনন্দ লাভ। তাদের সেই সৃষ্টিকে গুরুজনের যখন তাদের গৃহকোণের পাহাড় তাহার গাছপালা-সমেত অন্তর্ধান করে দেন, সেখান থেকে প্রভুত দুঃখী হওয়া – এসব কিছুই বাল্যকাল ও শৈশবে তাঁর অসামান্য প্রকৃতি প্রমের সুস্পষ্ট প্রকাশ। এই সব লেখা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতির সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং প্রকৃতির প্রতি তাঁর ভালোবাসার গভীরতা ছিল।

জীবনস্মৃতি গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি, পরিবার, শিক্ষা এবং বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাগুলি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু থেকে বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের সৃষ্টি এবং লেখার অভিজ্ঞতা নিয়েও তিনি নিখুঁত আলোচনা করেছেন। এখানে তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কিছু কথা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন;

" আমার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই আমার পিতা প্রায় দেশভ্রমণেই নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে তিনি কখনো হঠাৎ বাড়ি আসিতেন; সঙ্গে বিদেশী চাকর লইয়া আসিতেন; তাহাদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার জন্য আমার মনে ভারি ঔৎসুক্য হইত। .... যাহা হউক, পিতা যখন আসিতেন আমরা কেবল আশ-পাশ হইতে দূরে তাঁহার চাকরবাকরদের মহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৌতূহল মিটাইতাম। তাহার কাছে পৌঁছানো ঘটিয়া উঠিত না। .... বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া পিতা অল্প কয়েক দিনের জন্য যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন তাহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ি ভরিয়া উঠিয়া গম গম করিতে থাকিত। দেখিতাম গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরিয়া, সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাহার কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রন্ধনের পাছে কোনো ক্রুটি হয় এই জন্য মা নিজে রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিছু হরকরা তাহার তকমাওঅলা পাগড়ি ও শুভ্র চাপকান পরিয়া দ্বারে হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় গোলমাল দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাহার বিরাম ভঙ্গ করি এজন্য পূর্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না ।............।"

ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অথবা বোলপুর ও পানিহাটির বাগানবাড়িতে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করতেন রবীন্দ্রনাথ। জানা যায় রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে এই পানিহাটির বাগানবাড়িটি ছিল বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। তাঁর কাব্য, উপন্যাস ও গান – অধিকাংশই প্রকৃতি ও ঈশ্বরমুখী। এর প্রধান কারণ হল তিনি বাল্যকাল থেকেই প্রকৃতিকে ভীষণ ভালোবাসতেন।

৩; ছেলেবেলায় বাড়িতে বিদ্যা-শিক্ষা;

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের স্কুলের পরিবর্তে বাড়িতেই বিদ্যা-শিক্ষা খুব ভালভাবেই চলত- সে কথা আমরা প্রায় সকলেই জানি। কিন্তু

অনেকেই হয়তো জানে না কিভাবে তাঁর বাড়িতে পড়াশোনা হত। সে কথা জানতে হলে আমাদেরকে পড়তে হয় তাঁর **জীবনস্মৃতি** গ্রন্থে 'ঘরের পড়া' লেখাটি। রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে একাধিক গৃহশিক্ষক রাখা হয়েছিল, যারা তাঁকে বিভিন্ন বিষয় যেমন বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস ইত্যাদি প্রায় সব বিষয়ে পড়াতেন। ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অথবা বোলপুর ও পানিহাটির বাগানবাড়িতে প্রাকৃতিক পরিবেশে তিনি যখন ঘুরে বেড়াতেন, সেখানেও তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষা অর্জন করতেন। রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে মাঝে মাঝে নাটক এবং গানের অনুষ্ঠান হতো, যা তাঁর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক শিক্ষায় সাহায্য করত। এটা ঠিক বাল্যকাল থেকে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পছন্দ করতেন, যেমন প্রাকৃতিক শিক্ষা যা তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা এবং আত্মজ্ঞান অর্জনে সাহায্য করেছে; মানুষের শরীরী বিদ্যা, যা তাঁকে মানুষের সম্পর্কে জানতে সাহায্য করেছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। .রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ছিল অনেকটাই তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভর করত যেখানে তিনি তাঁর নিজস্ব আগ্রহ ও কৌতূহল অনুসরণ করতেন এবং পরিবার তাঁকে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষায় উৎসাহিত করত, কিন্তু তাঁকে কোনো নির্দিষ্ট পথে বাধ্য করত না। এবার আসি এই বিষয়ে তিনি তাঁর **জীবনস্মৃতি** গ্রন্থে 'ঘরের পড়া' রচনাটিতে কি বলেছেন।

জীবনস্মৃতি গ্রন্থে 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমেই তাঁর বাল্যকালের শিক্ষক আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। জীবনস্মৃতি অনুযায়ী বাড়িতে শিক্ষক হিসেবে জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে ইংরেজি এবং সংস্কৃত শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তাতে খুব মন ছিল না। **তখন** জ্ঞানচন্দ্র মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে অন্য পথে পড়াতে শুরু করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বাংলায় অর্থ করে কুমারসম্ভব পড়ান এবং ম্যাকবেথের বাংলা অনুবাদ করতে বলেন। জ্ঞানচন্দ্র মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজি বা সংস্কৃতের ভাষা শিক্ষার বাইরে অন্য

ধরনের শিক্ষায় উৎসাহিত করেন। এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শিক্ষার প্রতি একটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়। তিনি সেখানে লিখেছেন – " *আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না,তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব' পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা' না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন।"*

এরপর *তিনি* রামসর্বস্ব ভট্টাচার্যের সংস্কৃত শেখানোর কথা উল্লেখ করেছেন **জীবনস্মৃতি** গ্রন্থের 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে। উল্লেখ্য রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য ছিলেন মেট্রোপলিটান ইন্‌স্‌টিটিউশনের হেড্‌পণ্ডিত। তিনি লিখেছেন; *"রামসর্বস্ব পণ্ডিতমশায়ের প্রতি আমাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিয়া করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন। তিনি একদিন আমার ম্যাকবেথের তর্জমা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন। তখন তাঁহার কাছে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বসিয়া ছিলেন। পুস্তকে-ভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে আমার বুক দুরুদুরু করিতেছিল— তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহস বৃদ্ধি হইল তাহা বলিতে পারি না। ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই— অতএব, এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম। ..."*

'জীবনস্মৃতি' পড়ে জানা যায় ছেলেবেলায় বাংলা শিক্ষার প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর অনুভূতি ও আবেগ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে শৈশবকালে বাড়িতে শিক্ষক দ্বারা বাঙলা শিক্ষা গ্রহণ এবং বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের

শৈশবে বাড়িতে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষার ওপর জোর না দিয়ে, বাংলা ভাষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি শিক্ষক হিসেবে traditional পদ্ধতি অনুসরণ না করে, রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহী করে তোলেন এবং তাঁর মধ্যে সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করেছিলেন। তিনিই রবীন্দ্রনাথের তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্যিক জীবনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। সে কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' পড়ে জানা যায়, বাংলা ভাষা হলো তাঁর আত্মার ভাষা, যা তাঁর মধ্যে একটি বিশেষ অনুভূতি তৈরি করেছিল তাঁর শৈশবকালে। তিনি **জীবনস্মৃতি** গ্রন্থে 'ঘরের পড়া অধ্যায়ে লিখেছেন;

" আমার বাল্যকালে বাংলাসাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধ করি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম। তখন ছেলেদের এবং বড়োদের বইয়ের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য ঘটে নাই। আমাদের পক্ষে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে-সকল ছেলে-ভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ছেলেরা যে বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না, এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম— যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত। সংসারটাও ছেলেদের উপর ঠিক তেমনি করিয়া কাজ করে। ইহার যতটুকু তাহারা বোঝে ততটুকু তাহারা পায়, যাহা বোঝে না তাহাও তাহাদিগকে সামনের দিকে ঠেলে।"

৪; ছেলেবেলায় বঙ্কিম সাহিত্য ও অন্যান্য সাহিত্য পাঠঃ

ছেলেবেলায় বাঙলা সাহিত্য নিয়ে তিনি রীতিমত পড়াশুনা করতেন। এমন কি তখন থেকে তিনি বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বা বঙ্কিম সাহিত্য এবং সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের

প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ পড়তে শুরু করে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য পাঠে ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক ঔপন্যাসিক। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার প্রথম আধুনিক ঔপন্যাসিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। তাঁর রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা ছিল। বিভিন্ন লেখা থেকে আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের একজন গুরু হিসেবে মনে করতেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থেও বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যের একজন প্রবক্তা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, নাটক এবং প্রবন্ধের প্রতি গভীর আগ্রহের কথা সেখানে জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যকে একটি নতুন দিগন্তের দিকে চালিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিশেষ করে "কপালকুন্ডলা", "চন্দ্রমুখী", বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর এবং "দুর্গেশনন্দিনী" পাঠের অভিজ্ঞতা তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি **জীবনস্মৃতি** গ্রন্থে ‘এই বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁর শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি তাঁর মধ্যে কল্পনাবিলাসের জগৎ তৈরি করে, এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ভাষা, শব্দ এবং বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি তাঁর মধ্যে ইতিহাস এবং কল্পনার মিশ্রণ তৈরি করে, যা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। রবীন্দ্রনাথের "ছেলেবেলা" স্মৃতিচারণ গ্রন্থেও বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের পথপ্রদর্শক এবং অনুপ্রেরণা। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে যে দেশপ্রেম, মানবতা, এবং সমাজের প্রতি গভীর অনুভূতির প্রকাশ

ছিল, তা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক কর্মে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, কবিতা, নাটক, এবং প্রবন্ধগুলোতে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক চিন্তাভাবনার ছাপ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবনস্মৃতি গ্রন্থের 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে লিখেছেন যে;

" অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশি দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, এখন যে-খুশি সেই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া, তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর-কেহ পাইবে না'।

বঙ্কিম সাহিত্য ছাড়াও সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ পাঠে রবীন্দ্রনাথের প্রবল আগ্রহ ছিল। সেই সঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ-সংগ্রহ নিয়ে তিনি যথেষ্ট পড়াশুনা করেছেন ছেলেবেলায়। বিবিধার্থ-সংগ্রহ হল প্রাণিবিদ্যা, বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান পুরাতত্ত্ব, শিল্পসাহিত্যাদি নিয়ে 'মাসিকপত্র'। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবনস্মৃতি গ্রন্থের 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে লিখেছেন যে;

" শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ সে-সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা[৩] ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতাং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ

কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিললাম।"

এরপর তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ-সংগ্রহ এর প্রতি তাঁর আকর্ষণ নিয়ে লিখেছেন;

*"রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় '**বিবিধার্থ-সংগ্রহ**' বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমিমৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে। "*

৫-এগারো বছর বয়সে দেশভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেবেলা দেশ ভ্রমণের চেয়ে বেশি ছিল একটি পারিবারিক ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা। তিনি শৈশবে কলকাতার বাইরে বিভিন্ন স্থানে পিতার সঙ্গে ভ্রমণ করেছেন, যা তার শৈশবে নতুন অভিজ্ঞতা এনেছিল। ১৮৭৩ সালে এগারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর তিনি কয়েক মাসের জন্য পিতার সঙ্গে দেশভ্রমণে বের হন। প্রথমে তাঁরা আসেন শান্তিনিকেতনে। **জীবনস্মৃতি** গ্রন্থে 'হিমালয়যাত্রা' অধ্যায় পড়ে জানা যায় ঐ ভ্রমণের সময়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার সাথে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন, যেমন: শান্তিনিকেতন, বোলপুর, সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, অমৃতসর ইত্যাদি। পিতার সাথে হিমালয় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল, যা তাঁর সাহিত্যিক ও দার্শনিক চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। উপনয়ন অনুষ্ঠানের পর

তিনি কিছু সময় শান্তিনিকেতনে কাটান। এরপর পাঞ্জাবের অমৃতসরে কিছুকাল কাটিয়ে শিখদের উপাসনা পদ্ধতি পরিদর্শন করেন। এই ভ্রমণের সময় বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেন এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। এই ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল, যা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। পুত্রকে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঞ্জাবেরই ডালহৌসি শৈলশহরের নিকট বক্রোটায় যান। বর্তমানে ডালহৌসি শৈলশহর ভারতের হিমাচল প্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত। জানা যায় এখানকার বক্রোটার বাংলোয় বসে রবীন্দ্রনাথ পিতার কাছ থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইংরেজি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের নিয়মিত পাঠ নিতে শুরু করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবনী, কালিদাস রচিত ধ্রুপদি সংস্কৃত কাব্য ও নাটক এবং উপনিষদ্ পাঠেও উৎসাহিত করতেন। এই ভ্রমণের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, রবীন্দ্রনাথের পিতার সাথে তাঁর প্রথম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং পরিবেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। পিতার সাথে হিমালয় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল, যা তাঁর সাহিত্যিক ও দার্শনিক চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

জীবনস্মৃতি গ্রন্থে 'হিমালয়যাত্রা' অধ্যায়ে তাঁর এই ভ্রমণ কাহিনী নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ঐ ভ্রমণ কাহিনীর কিছু কিছু অংশ এখানে তুলতে বাধ্য হলাম পাঠকদের ভালভাবে বোঝারজন্য। তিনি লিখেছেন;

"বোলপুর হইতে বাহির হইয়া সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অবশেষে অমৃতসরে গিয়া পৌঁছিলাম।

পথের মধ্যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যেটা এখনো আমার মনে স্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। কোনো একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে। টিকিটপরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল।

একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। কী একটা সন্দেহ করিল কিন্তু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে আর একজন আসিল— উভয়ে আমাদের গাড়ির দরজার কাছে উসখুস করিয়া আবার চলিয়া গেল। তৃতীয়বারে বোধ হয় স্বয়ং স্টেশনমাস্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাফটিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই ছেলেটির বয়স কি বারো বছরের অধিক নহে। পিতা কহিলেন "না।" তখন আমার বয়স এগারো বয়সের চেয়ে নিশ্চয়ই আমার বৃদ্ধি কিছু বেশি হইয়াছিল। স্টেশনমাস্টার কহিল ইহার জন্য পুরা ভাড়া দিতে হইবে। আমার পিতার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বাক্স হইতে তখনই নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল তিনি সে টাকা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহা প্লাটফর্মের পাথরের মেজের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া ঝন ঝন করিয়া বাজিয়া উঠিল। স্টেশনমাস্টার অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া চলিয়া গেল— টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতা যে মিথ্যাকথা বলিবেন এ সন্দেহের ক্ষুদ্রতা তাহার মাথা হেঁট করিয়া দিল।

অমৃতসরে গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। অনেক দিন সকালবেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখমন্দিরে গিয়াছি। সেখানে নিয়তই ভজনা চলিতেছে। আমার পিতা সেই শিখ উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া সহসা একসময় সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন—বিদেশীর মুখে তাহাদের এই বন্দনাগান শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিত। ফিরিবার সময় মিছরির খণ্ড ও হালুয়া লইয়া আসিতেন।

একবার পিতা গুরুদরবারের একজন গায়ককে বাসায় আনাইয়া তাহার কাছ হইতে ভজনাগান শুনিয়াছিলেন। বোধ করি তাহাকে যে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল তাহার চেয়ে কম দিলেও সে খুশি হইত। ইহার ফল হইল এই, আমাদের বাসায় গান শোনাইবার উমেদারের আমদানি এত বেশি হইতে লাগিল যে তাহাদের পথরোধের জন্য শক্ত বন্দোবস্তের প্রয়োজন হইল।"

এরপর তিনি এই অধ্যায়ে আর এক জায়গায় লিখছেন;

"পিতা আমাকে ইংরেজি পড়াইবেন বলিয়া Peter Parley's Tales পর্যায়ের অনেকগুলি বই লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনবৃত্তান্ত তিনি আমার পাঠ্যরূপে বাছিয়া লইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন জীবনী অনেকটা গল্পের মতো লাগিবে এবং তাহা পড়িয়া আমার উপকার হইবে। কিন্তু পড়াইতে গিয়া তাঁহার ভুল ভাঙিল। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নিতান্তই সুবুদ্ধি মানুষ ছিলেন। তাঁহার হিসাবকরা কেজো ধর্মনীতির সংকীর্ণতা আমার পিতাকে পীড়িত করিত। তিনি এক-এক জায়গা পড়াইতে পড়াইতে ফ্র্যাঙ্কলিনের ঘোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে ও উপদেশবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

ইহার পূর্বে মুগ্ধবোধে মুখস্থ করা ছাড়া সংস্কৃত পড়ার আর কোনো চর্চা হয় নাই। পিতা আমাকে একেবারেই ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করিতে দিলেন। বাংলা আমাদিগকে এমন করিয়া পড়িতে হইয়াছিল যে, তাহাতেই আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। একেবারে গাড়ো হইতেই যথাসাধ্য সংস্কৃত রচনাকার্যে তিনি আমাকে উৎসাহিত করিতেন। আমি যাহা পড়িতাম তাহারই শব্দগুলা উলটপালট করিয়া লম্বা লম্বা সমাস গাঁথিয়া যেখানে-সেখানে যথেচ্ছ অনুস্বার যোগ করিয়া দেবভাষাকে অপদেবের যোগ্য করিয়া তুলিতাম। কিন্তু পিতা আমার এই অদ্‌ভুত দুঃসাহসকে একদিনও উপহাস করেন নাই।

ইহা ছাড়া তিনি প্রক্‌টরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন; আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।

তাহার নিজের পড়ার জন্য তিনি যে-বইগুলি সঙ্গে লইয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটা আমার চোখে খুব ঠেকিত। দশ বারো খণ্ডে বাঁধানাে বৃহদাকার গিবনের রোম। দেখিয়া মনে হইত না ইহার

মধ্যে কিছুমাত্র রস আছে। আমি মনে ভাবিতাম—আমাকে দায়ে পড়িয়া অনেক জিনিস পড়িতে হয়, কারণ আমি বালক, আমার উপায় নাই—কিন্তু ইনি তো ইচ্ছা করিলেই না পড়িলেই পারিতেন, তবে এ দুঃখ কেন? অমৃতসরে মাসখানেক ছিলাম। সেখান হইতে চৈত্র-মাসের শেষে ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করা গেল। অমৃতসরে মাস আর কাটিতেছিল না। হিমালয়ের আহ্বান আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল।"

৫-১; হিমালয় যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিজ্ঞতা;

তাঁর লেখা জীবনস্মৃতি পড়ে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিমালয় যাত্রার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলি হলো- প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর এক গভীর সম্পর্ক স্থাপন, পিতার সান্নিধ্য ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ। এই ভ্রমণ তাঁর সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। তাছাড়া ঐ ভ্রমণ তাঁর মধ্যে এক অদ্‌ভুত অনুভূতি তথা মুক্তির অনুভূতি জাগিয়ে ছিল।

হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মহিমায় তাঁকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছিল; তাই তিনি হিমালয়য়ের এক চূড়া থেকে অন্য চূড়ায় অবাধে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং প্রকৃতির সাথে তিনি এক গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেহেতু ভ্রমণের সময় তিনি এক নতুন মুক্তির অনুভূতি অনুভব করেন, ঐ সময় তাঁর মধ্যে এক আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটিয়ে ছিল। হিমালয় ভ্রমণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও চিন্তা-চেতনা আরও গভীর হয়। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মহিমায় এক নতুন জীবনদর্শন খুঁজে পান। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর সৃজনশীলতাকে অনেকগুণ উন্নত করেছিল। ঐ ভ্রমণের স্মৃতি তাঁর কবিতা ও গল্পে অসাধারণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

"**At the Himalayas** "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ইংরেজি গল্প; এটি বাবার সাথে শৈশবে তাঁর হিমালয়ে ভ্রমণের একটি স্মৃতিরোমন্থন যা তাঁর লেখা স্মৃতিকথা **"My Reminiscences,"**-এর

একটি অধ্যায়। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে 'হিমালয়যাত্রা' অধ্যায়ের ন্যায় "অ্যাট দ্য হিমালয়"এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর হিমালয় ভ্রমণের মহিমময় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। পর্বতমালাকে চিরন্তন সৌন্দর্য, শান্তি এবং শক্তির প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করেছেন তাঁর রচনায়। তাঁর রচনায় ভূদৃশ্যের প্রশান্তি এবং স্থিরতার প্রতিফলিত হয়েছে যা দৈনন্দিন জীবনের বিশৃঙ্খলা এবং কোলাহল থেকে একেবারে মুক্ত। হিমালয়ের সুউচ্চ চূড়া এবং বিশাল বিস্তার লেখকের মধ্যে এক গভীর প্রেম নম্রতা এবং শ্রদ্ধার অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে।

জীবনস্মৃতি গ্রন্থে 'হিমালয়যাত্রা' অধ্যায় এবং My Reminiscences গ্রন্থে 'At the Himalayas' অধ্যায় –এই দুটিতেই রবীন্দ্রনাথ হিমালয়ের আধ্যাত্মিক অন্বেষণ করেছেন। এই দুই রচনায় তিনি হিমালয় পর্বতকে সাধারণ বস্তুজগতের অনেক উপরে ঐশ্বরিকতার সাথে সংযোগ স্থাপন করেছেন। তাঁর অসাধারণ বর্ণনা ও বিশ্লেষণে হিমালয়ের শান্ত পরিবেশ যেন পাঠকদের মধ্যেও এক গভীর আত্মদর্শন এবং মহাবিশ্বের সাথে একাত্মতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এই দুই রচনায় পর্বতমালা এবং সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক জগতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতির আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তুলে ধরেছেন। তাঁর কাছে হিমালয় এক অতুলনীয় সৌন্দর্য এবং আধ্যাত্মিক জাগরণের স্থান, যেখানে যে কেউ সান্ত্বনা ও পরম শান্তি খুঁজে পেতে পারে। **"At the Himalayas"**এর কিছু অংশ উদ্‌ধৃতি করলাম;

An extract of "At the Himalayas"

"My father was not at all nervous about allowing me to wander about freely even here. Some way below our house there stretched a spur thickly wooded with Deodars. Into this wilderness I would venture alone with my iron-spiked staff. These lordly forest trees, with their huge shadows, towering there like so many giants—what immense lives had they lived through the centuries! And yet this boy of only the other day

was crawling round about their trunks unchallenged. I seemed to feel a presence, the moment I stepped into their shade, as of the solid coolness of some old-world saurian, and the checkered light and shade on the leafy mould seemed like its scales." ....

ঐ গল্পে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে হিমালয় ভ্রমণে তাঁর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রকাশ পেয়েছে;

"Staff in hand I would often wander away from one peak to another, but my father did not object. To the end of his life, I have observed, he never stood in the way of our independence. Many a time have I said or done things repugnant alike to his taste and his judgment; with a word he could have stopped me; but he preferred to wait till the prompting to refrain came from within. A passive acceptance by us of the correct and the proper did not satisfy him; he wanted us to love truth with our whole hearts; he knew that mere acquiescence without love is empty. He also knew that truth, if strayed from, can be found again, but a forced or blind acceptance of it from the outside effectually bars the way in."

হিমালয় যাত্রায় এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা

জীবনস্মৃতি গ্রন্থ; 'হিমালয়যাত্রা' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু আকর্ষণীয় ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন। এখানে দু একটি ঘটনা সংক্ষেপে তুলে ধরছি যেগুলি পাঠকদের নিশ্চয়ই আমার মত ভাল লাগবে;

ট্রেনের টিকিট পরীক্ষকের টিকিট পরীক্ষা

হিমালয় যাত্রা পথে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। সেটা হল একটি বড় স্টেশনে ট্রেনের টিকিট পরীক্ষকের রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পিতার

টিকিট পরীক্ষা। বালক রবীন্দ্রের বয়স অনুযায়ী হাফ টিকিট কাটা হয়েছিল। কিন্তু টিকিট পরীক্ষকের সন্দেহ হল যে রবীন্দ্রনাথের বয়স হাফ টিকিটে ভ্রমণের বয়সের চেয়ে বেশি। সন্দেহ বশতঃ টিকিট পরীক্ষক স্টেশনমাস্টারকে ডেকে আনল। স্টেশনমাস্টার রবীন্দ্রের হাফ টিকিট পরীক্ষা করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করল রবীন্দ্রের বয়স কি বারো বছরের বেশি নয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বললেন, রবীন্দ্রের বয়স বারো হয়নি। সে কথায় কর্ণপাত না করে স্টেশনমাস্টার বললেন যে রবীন্দ্রের পুরো টিকিট ভাড়া লাগবে। এই কথা শুনে রাগে মহর্ষির চোখ মুখ জ্বলতে লাগল। বাক্স থেকে টাকা বার করে স্টেশনমাস্টারকে তিনি টাকা দিলেন। ভাড়ার টাকা কেটে বাকি অংশ যখন স্টেশনমাস্টার মহর্ষিকে ফিরিয়ে দিলেন, সে-টাকা মহর্ষি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। প্ল্যাটফর্মে ঝনঝন করে সে টাকা ছড়িয়ে পড়ল। স্টেশনমাস্টার অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে চলে গেল। সামান্য টাকা বাঁচাবার জন্য মহর্ষি হয়ে মিথ্যা বলতে পারেন স্টেশনমাস্টার ও টিকিট পরীক্ষকের এই সন্দেহ তাঁকে অত্যন্ত ব্যথা দিয়েছিল। (উৎস; জীবনস্মৃতি গ্রন্থ; 'হিমালয়যাত্রা' অধ্যায়)

অমৃতসরে গুরুদরবারে পিতার ভজন গাওয়া;

অমৃতসরে গুরুদরবার বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বপ্নের মতো মনে লেগেছিল। তিনি সেখানে অনেক দিন সকালবেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখমন্দিরে গিয়েছেন। সেখানে নিয়তই ভজন গান চলত যেমন আজও চলে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই শিখ উপাসকদের মাঝখানে বসে সহসা একসময় সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন। বাঙালির মুখে তাদের ঐ বন্দনাগান শুনে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে তাঁরা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমাদর করতেন। সেখান থেকে ফেরার সময় রবীন্দ্রনাথ মিছরির খণ্ড ও হালুয়া নিয়ে আসতেন।

অমৃতসরে বালক রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত গাওয়া;

একবার তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ গুরুদরবারের একজন গায়ককে তাঁদের বাসায় এনে তার কাছ্ ভজনগান শুনেছিলেন। সেই জন্য

তিনি তাকে অনেক পুরস্কার দিলেন। এর ফলে তাঁদের বাসায় গান শোনাবার উমেদারের আমদানি অনেক বেশি হতে লাগল। প্রতিদিন সকাল বেলায় পিতৃদেব বালক রবিকে সঙ্গে করে বেড়াতে বাহিরে যেতেন। ঐ সময়ে ক্ষণে ক্ষণে হঠাৎ সম্মুখে তানপুরাঘাড়ে অনেক গায়কের আবির্ভাব হত। তাঁরা সকলে যদি গান (ভজন) শোনাতে বাসায় হাজির হয়, বালক রবীন্দ্রনাথ সব সময় সেই ভয় পেতেন।

সে যাইহোক যখন সন্ধ্যা হয়ে আসত তাঁর পিতৃদেব বাগানের সম্মুখে বারান্দায় এসে বসতেন। তখন ব্রহ্মসংগীত শোনাবার জন্য বালক রবির ডাক পড়ত। চাঁদ উঠেছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর এসে পড়েছে—এই রকম একটা পরিবেষে বালক রবীন্দ্রনাথ বেহাগে গান গাইতেন— "তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে কে সহায় ভব-অন্ধকারে"—

পিতা নিস্তব্ধ হয়ে নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করে একমনে পুত্র রবির গান শুনতেন।—সেই সন্ধ্যাবেলার ছবি জীবনস্মৃতিতে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন কবি। এই রকম আরো অনেক বিচিত্র ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি তাঁর হিমালয় যাত্রা প্রবন্ধে।

৬; রবীন্দ্রনাথের কবিতা-রচনার শুভারম্ভঃ

রবীন্দ্রনাথের কবিতা-রচনা শুরু হয় তাঁর কৈশোরে। তাঁর জীবন স্মৃতি গ্রন্থ হতে জানা যায়, তাঁর কবিতা-রচনা শুরু হয় সাত-আট বছর বয়সে। তাঁর তের বৎসর বয়সে ১৮৭৪ সালে "অভিলাষ" নামে তার প্রথম কবিতা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-এ প্রকাশিত হয়েছিল।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "জীবন স্মৃতি" বইটিতে "কবিতা-রচনারম্ভ" নামে একটি অধ্যায় রয়েছে। সেই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম কবিতা লেখার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন যে তাঁর প্রথম কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা এসেছিল তাঁর ভাগিনেয় জ্যোতিপ্রকাশের কাছ থেকে। জ্যোতিপ্রকাশ মহাশয় ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি খুবই উৎসাহী ছিলেন। জ্যোতিপ্রকাশের উৎসাহে

রবীন্দ্রনাথও কবিতা লেখার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রথম কবিতা রচনা করেন, যা ছিল পদ্ম ফুল নিয়ে। তাঁর 'বন স্মৃতি' গ্রন্থের "কবিতা-রচনারম্ভ" কিছুটা অংশ তুলে ধরছি;

"আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়ো। তিনি তখন ইংরেজি সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে হ্যামলেটের স্বগত উক্তি আওড়াইতেছেন। আমার মতো শিশুকে কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলতে পারি না। একদিন দুপুরবেলা তাহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে। বলিয়া পয়ার ছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।"

"পদ্য জিনিসটিকে এ-পর্যন্ত কেবল ছাপার বহিতেই দেখিয়াছি। কাটাকুটি নাই, ভাবচিন্তা নাই, কোনোখানে মর্ত্যজনোচিত দুর্বলতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে এ-কথা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না। একদিন আমাদের বাড়িতে চোর ধরা পড়িয়াছিল। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে অথচ নিরতিশয় কৌতূহলের সঙ্গে তাহাকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম নিতান্তই সে সাধারণ মানুষের মতো। এমন অবস্থায় দরাোয়ান যখন তাহাকে মারিতে শুরু করিল আমার মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল। পদ্যসম্বন্ধেও আমার সেই দশা হইল। গোটাকয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল তখন পদ্যরচনার মহিমাসম্বন্ধে মোহ আর টিকিল না। এখন দেখিতেছি পদ্য বেচারার উপরেও মার সয় না। অনেক সময় দয়াও হয়, কিন্তু মারও ঠেকানো যায় না, হাত নিসপিস করে। চোরের পিঠেও এত লোকের এত বাড়ি পড়ে নাই।" (উৎস; জীবন-স্মৃতি গ্রন্থ, কবিতা-রচনারম্ভ অধ্যায়)

এরপর তাঁর জীবন-স্মৃতি গ্রন্থের কাব্যরচনাচর্চা অধ্যায় পড়ে জানতে পারি, তিনি যখন স্কুলে পড়তেন সাতকড়ি দত্ত মহাশয় তাঁদের স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। যদিও তিনি তাঁর ক্লাসের

শিক্ষক ছিলেন না তবুও বালক রবীর প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহ ছিল। তিনি "প্রাণীবৃত্তান্ত" নামে একখানা বই লিখেছিলেন। তিনি একদিন বালক রবীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি নাকি কবিতা লিখে থাক। বালক রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা লিখতেন সে কথা গোপন করলেন না। এরপর হতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে দুই এক পদ কবিতা দিয়ে সেগুলো পূরণ করে আনতে ছাত্র রবীন্দ্রনাথকে বলতেন। উদাহরণ স্বরূপ কবি এই অধ্যায়ে নীচের দুটো লাইন উল্লেখ করেছেন;—

'রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।'

বালক রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে পদ্য জুড়ে লিখেছিলেন—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

তাঁর ছোটবেলায় কবিত লেখারচর্চা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তুলে ধরলাম বালক কবির কবিতার চার লাইন;

" আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।"

এই লাইনগুলি পড়লে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারব তিনি ছোটবেলায় কি সহজ এবং প্রাঞ্জল ভাষা ও ভাব দিয়ে কবিতা লিখতেন। তাঁর ছোটবেলায় কবিত লেখায় আর একজন যিনি বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন, তিনি হলেন বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গোবিন্দবাবু। গোবিন্দবাবুই ছিলেন বিদ্যালয়ের দণ্ডধারী বিচারক। গোবিন্দবাবু রবীন্দ্রনাথকে স্নেহ ও করুণার চক্ষে দেখতেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে জানা যায়- একদিন ছুটির সময় তাঁর ঘরে রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ ডাক পড়ল। বালক রবীন্দ্রনাথ ভয়ে ভয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি তখন রবীন্দ্রনাথকে

জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি না কি কবিতা লেখ?" রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করতে ক্ষণমাত্র দ্বিধা করলেন না। এরপর তিনি একটা উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখে আনতে রবীন্দ্রনাথকে আদেশ করলেন। গোবিন্দবাবুর মতো ভীষণগম্ভীর লোকের মুখ হতে কবিতা লেখার ঐ আদেশ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ হতবাক হলেন। পরদিন রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখে যখন তাঁকে দেখাতে গেলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করে নিয়ে ছাত্রবৃত্তির ক্লাসের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বলিলেন, পড়িয়া শোনাও। তাঁর আদেশমত রবীন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে তাঁর আবৃত্তি করলেন। সকলে রবীন্দ্রনাথের ঐ নীতিকবিতাটির প্রশংসা করলেন। প্রথমে তিনি "ভানুসিংহ ঠাকুর" ছদ্মনামে কিছু কবিতা লেখেন। (উৎস; জীবন-স্মৃতি, কাব্যরচনাচর্চা অধ্যায়)। তাঁর সাহিত্য সম্ভার নিয়ে লেখার আগে, আসুন আমরা জেনে নেই তাঁর বিদেশ ভ্রমণের কাহিনী

৭) বিদেশ ভ্রমণ ও বিদেশে পড়াশুনা;

১৮৭৮ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথমে তিনি ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। এরপর, তিনি ১৮৭৯ সালে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে আইনবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। তবে, সাহিত্য-চর্চার প্রতি তার গভীর আকর্ষণের কারণে তিনি আইন বিষয়ক পড়া শেষ করতে পারেন নি। প্রায় দেড় বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তাঁর পিতা চেয়েছিলেন তিনি আইনজ্ঞ হবেন, কিন্তু তিনি প্রথম থেকেই সাহিত্যচর্চার প্রতি ভীষণ আকৃষ্ট ছিলেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন শেকসপিয়র ও অন্যান্য ইংরেজ সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। এই সময় তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন রিলিজিও মেদিচি, কোরিওলেনাস এবং অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা এর মত বহু মূল্যবান ইংরেজি সাহিত্য। উল্লেখ্য, "রিলিজিও মেদিচি" হলো স্যার টমাস ব্রাউনের লেখা একটি ধর্মীয় ও আত্মজীবনীমূলক বই। 'রিলিজিও মেদিচি'র বাংলা অর্থ হলো "একজন ডাক্তারের ধর্ম"। এই বইটিতে লেখক তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস, চিকিৎসা পেশা এবং জীবনের

বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেহেতু, বইটির মূল বিষয় ছিল একজন ডাক্তারের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জীবনের অন্য দিকগুলোর মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব। এখানে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে, বিজ্ঞান এবং ধর্ম একে অপরের পরিপূরক এবং কোনোভাবেই তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সেই সময় "*রিলিজিও মেদিচি*" ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এটি আজও একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। বিদেশ যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের আর একটি আকর্ষণীয় পুস্তক ছিল কোরিওলেনা এটি হল উইলিয়াম শেকসপিয়র রচিত একটি *শেকসপিয়রীয় ট্র্যাজেডি নাটক* যা ১৬০৮ সালে রচিত হয়। এই নাটকের ভিত্তি হল কিংবদন্তি রোমান নেতা গেইয়াস মার্কাস কোরিওলেনাসের জীবনী।

তিনি সেখানে আর একটি বই মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন। সেটি ছিল *অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা।* এই বইটি হল উইলিয়াম শেকসপিয়র রচিত একটি বিয়োগান্তক নাটক। ১৬২৩ সালের ফার্স্ট ফোলিওতে প্রথম এই নাটকটি মুদ্রিত হয়। টমাস নর্থ প্লুটার্কের লাইফ অফ মার্কাস অ্যান্টনিয়াস গ্রন্থের যে ইংরেজি অনুবাদ করেন, তারই ভিত্তিতে ক্লিওপেট্রা ও মার্ক অ্যান্টনি। মূল বিষয়বস্তু হলো কর্তব্য এবং আবেগের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই নাটকে অ্যান্টনি এবং ক্লিওপেট্রা উভয়ই এই দ্বন্দ্বের সমাধান করতে অক্ষম ছিলেন। এটাও রবীন্দ্রনাথের কাছে ভীষণ আকর্ষণীয় পুস্তক ছিল। এখান থেকে বোঝা যায় যে ছোটবেলায় যেমন তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, গীতা, উপনিষদ, দর্শনশাস্ত্র থেকে শুরু করে ভারতীয় কাব্য-সাহিত্য নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছেন; তেমনি বিদেশে গিয়ে ইউরোপ সাহিত্য নিয়ে অনেক অধ্যয়ন করেছিলেন তিনি। তাই তাঁর কবিতা,গল্প, নাটক ও উপন্যাসের মধ্যে যেমন ভারতীয় পুরাণ, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার খোঁজ মিলে, তেমনি বিদেশী সাহিত্যেরও ছাপ ও পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময় তাঁর ইংল্যান্ডবাসের অভিজ্ঞতার কথা ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ চিঠি পত্রের মাধ্যমে তিনি নিয়মিত পাঠাতেন। সেই পত্রিকায় এই

লেখাগুলি তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত হত য়ুরোপযাত্রী এক বঙ্গীয় যুবকের পত্রধারা নামে। জানা যায় ১৮৮১ সালে সেই পত্রাবলি য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র নামে গ্রন্থাকারে ছাপা হয়। এটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যগ্রন্থ তথা প্রথম চলিত ভাষায় লেখা গ্রন্থ। আগেই বলেছি ১৮৮০ সালে প্রায় দেড় বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়ে কোনো ডিগ্রি না নিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। (উতসঃ উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ)

৮) বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন

১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর তথা ২৪ অগ্রহায়ণ, ১২৯০ বঙ্গাব্দে ঠাকুরবাড়ির অধস্তন কর্মচারী বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহিত জীবনে ভবতারিণীর নামকরণ হয়েছিল মৃণালিনী দেবী। রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনীর পাঁচটি সন্তান ছিলেন। এঁরা হলেন মাধুরীলতা, রথীন্দ্রনাথ, রেণুকা, মীরা এবং শমীন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যে রেণুকা ও শমীন্দ্রনাথের অল্প বয়সেই মৃত্যু ঘটে। বিভিন্ন বই পড়ে ও আলাপ-আলোচনা শুনে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাম্পত্য জীবন তেমন সুখের ছিল না। ১৮৮৩ সালে তিনি মাত্র দশ বছর বয়সী মৃণালিনী দেবী (পূর্ব নাম 'ভবতারিণী') কে বিবাহ করেন। এই বিয়েটি একটি সামাজিক বাধ্যবাধকতার কারণে হয়েছিল। মৃণালিনী দেবী ছিলেন ঠাকুরবাড়ির কর্মচারী বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা। পাঁচটি সন্তান রেখে মৃণালিনী দেবী ১৯০২ সালে মারা যান।

রবি ঠাকুর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে খুব ভালোবাসতেন। স্ত্রীর অসুস্থতার সময় রবি ঠাকুর তাঁর যেভাবে সেবা করেছিলেন তা সত্যই উল্লেখযোগ্য।এ প্রসঙ্গে মুজতবা আলী তাঁর একটি রম্যরচনায় উল্লেখ করেছেন। মুজতবা আলী লেখা থেকে পাওয়া যায় মৃণালিনী দেবী তাঁর রোগশয্যায় এবং অসুস্থাবস্থায় তাঁর স্বামীর কাছ থেকে যে সেবা পেয়েছিলেন তেমনটি কোনো রমণী কোনো কালে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছে বলে মনে হয় না। তাঁর লেখায় উল্লেখ রয়েছে যে 'স্ত্রীর মানা অনুরোধ না শুনে রবীন্দ্রনাথ নাকি রাত্রির পর রাত্রি তাকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করেছেন।'

একটা মনে রাখার মতো কথা। তবুও রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্য জীবনে বেশ কিছুটা বিষাদ ছিল, কারণ তিনি এবং মৃণালিনী দেবী একে অপরের প্রতি তেমন রোমান্টিক ছিলেন না, যদিও রবীন্দ্রনাথের জীবনে অনেক নারী ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে কাদম্বরী দেবী নামক এক সম্পর্কের কথাও শোনা যায়, যিনি ছিলেন তাঁর বৌঠান এবং তিনি খুব অল্প বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথের খুব কাছাকাছি ছিলেন. তবে, তাদের সম্পর্কটি শুধুমাত্র বন্ধুত্বের ছিল, এবং এটি কোনো প্রেমের সম্পর্ক ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে নানাধরনের মতবাদ রয়েছে, যেমন তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এটা কতখানি সত্যি কেবলমাত্র পণ্ডিত এবং গবেষকরাই বলতে পারেন। এ ব্যাপারে মন্তব্য করা আমার সাধ্য নয়। তবে গবেষকরা বলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনকালে বিভিন্ন নারীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখা গিয়েছিল, যা তাঁর সাহিত্যিক কাজের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি নারীর প্রতি গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, যা তাঁর কাব্য, কবিতা, গান, ছোট গল্প ও উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য অনুসারে ১৮৭২-৭৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তিনি বাল্য বিবাহের বিপক্ষে, স্ত্রী শিক্ষার সপক্ষে অনেক যুক্তি ও আলোচনা সংগঠিত করেছিলেন। নারী-পুরুষের সমানাধিকারের পক্ষে অনেক যুক্তি দিয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা তাঁর সাহিত্যিক কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা তাঁর কবিতা ও গানে সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছিলেন ও বিষাদ ও হতাশা অনুভব করেছিলেন তাঁর ইঙ্গিত তাঁর গান, কবিতা ও উপন্যাসে কিছুটা ফুটে উঠেছে বলে অনুমান করা যায়।

শিলাইদহে পারিবারিক, সাহিত্যিক ও জমিদারী জীবন

বিবাহের পর ১৮৯১ সাল থেকে পিতার আদেশে রবীন্দ্রনাথ নদিয়া (অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা), পাবনা ও রাজশাহী জেলা এবং উড়িষ্যার জমিদারিগুলির তদারকি শুরু করেন। কুষ্টিয়ার শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছিলেন। জমিদার রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে "পদ্মা" নামে একটি

বিলাসবহুল পারিবারিক বজরায় চড়ে প্রজাদের কাছে খাজনা আদায় ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে যেতেন। জানা যায় প্রজা বর্গের থেকে খাজনা আদায় মুলত প্রতীকী ছিল; তাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে তাদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সময় তাঁর অনেক কবিতা ও গান রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। সেগুলির মধ্যে ছিল প্রভাতসংগীত, শৈশবসঙ্গীত, রবিচ্ছায়া, কড়ি ও কোমল ইত্যাদি। (উৎস ; উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ)

১৮৯৮ সালে তার স্ত্রী ও সন্তানেরাও চলে আসেন শিলাইদহে কুঠিবাড়িতে। তাঁদের সৌজন্যে গ্রামবাসীরাও তাঁর সম্মানে প্রায় ভোজসভার আয়োজন করতেন।

শিলাইদহে জমিদার রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি (গুগুল ছবি)

শিলাইদহে কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন বহু কাব্য এবং ছোটোগল্প। তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নুতন ধারা প্রবর্তন করেন ঐ সময়। জানা যায় ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে তিনি ঊনষাটটি ছোটোগল্প লিখেছিলেন। এই সব গল্পের উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সাধারণ বাঙালির জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, আবেগ ও ব্যঙ্গাত্মক উপাদান থেকে। তাঁর *সোনার তরী* (১৮৯৪), *চিত্রা* (১৮৯৬) ও *কথা ও কাহিনী* কাব্য গ্রন্থগুলি এই সময়েরই রচনা হয়েছিল। এছাড়াও একাধিক উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন এই সময়। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত নিজের সম্পাদিত সাধনা পত্রিকায় তিনি বেশ কিছু উৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশিত

করেন। তাঁর সাহিত্যজীবনের এই পর্যায়টি "**সাধনা পর্যায়**" নামে পরিচিত।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী" কাব্য রচনা;

১৮৯১ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে অবস্থান করেছিলেন তখন তিনি অনেক বিখ্যাত কবিতা ও কাব্য রচনা করেন। সেই সকল কাব্যগুলোর মধ্যে "সোনার তরী" অন্যতম। বাংলা ও বাঙালীর জীবনের নানা অপরূপ কাহিনী এবং কবির আত্ম অহমিকা থেকে মুক্তির প্রবল বাসনা থেকেই তাঁর "সোনার তরী" কাব্যের সৃষ্টি। 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। এটি বাংলা কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক কাব্য সংকলন যা ১৮৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার "মানসী-সোনার তরী পর্ব" নামে পরিচিত।

৯; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটবেলার অসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টি;

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের একজন প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ, এবং দার্শনিক।সাহিত্যে তাঁর যুগান্তকারী অবদানের জন্য, বাংলা সাহিত্য বিশাল সমৃদ্ধ লাভ করেছে এবং বিশ্ব সাহিত্যেও এক বিশেষ স্থান পেয়েছে। এটা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়। আগেই জেনেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র সাত /আট বছর বয়সে কবিতা লিখতে শুরু করেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোট বেলার কবিতা "'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' এর কথাগুলো আজও আমাদের সবুজ ও সতেজ হয়ে রয়েছে। এখানে এই কবিতার কয়েকটা লাইন আবেগে তুলে ধরলাম;

"দিনের আলো নিবে এল,

সুয্যি ডোবে-ডোবে।

আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে

চাঁদের লোভে লোভে।

মেঘের উপর মেঘ করেছে--

রঙের উপর রঙ,

মন্দিরেতে কাঁসর ঘন্টা।

বাজল ঠঙ ঠঙ।

ও পারেতে বিষ্টি এল,

ঝাপসা গাছপালা।

এ পারেতে মেঘের মাথায়

একশো মানিক জ্বালা।

..............................."

উল্লেখ্য, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" ছড়া বা কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছেলেবেলার রচনা করেছিলেন। এটি তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি ও প্রকৃতি-প্রেমের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলন করে। এই কবিতাটি শিশুদের জন্য লিখে ছিলেন তিনি। তবে এর মধ্যে এক গভীর অনুভূতি ও সুন্দর শব্দ চয়নের জন্য, কবিতাটি সকলের কাছে জনপ্রিয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটবেলার ছড়া ও কবিতা সত্যি খুব সুন্দর। তাঁর শৈশবের আবেগ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, প্রকৃতি প্রেম এবং তার সহজ-সরল জীবনের প্রতিচ্ছবি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ছোটবেলায় বিভিন্ন ছড়া ও কবিতার মধ্যে। তাঁর ছোটবেলায় লেখা কবিতা ও ছড়াগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতা হল; **"আমাদের ছোট নদী"**: **"ছোট বড়"**, **"হিং টিং ছট"**, **"সোনার তরী"**(কাব্য) । আমাদের প্রত্যেকের হয়তো মনে আছে এই সকল কবিতাগুলো, তবুও এই জনপ্রিয় কবিতাগুলির প্রথম কয়েকটা স্তবক উদ্‌ধৃতি করলাম;

"আমাদের ছোট নদী":--- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।
পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।

চিক্ চিক্ করে বালি, কোথা নাই কাদা,
একধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।
কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।

আর-পারে আমবন তালবন চলে,
গাঁয়ের বামুন পাড়া তারি ছায়াতলে।
তীরে তীরে ছেলে মেয়ে নাইবার কালে
গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে।

সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে
আঁচল ছাঁকিয়া তারা ছোটো মাছ ধরে।
বালি দিয়ে মাজে থালা, ঘটিগুলি মাজে,
বধূরা কাপড় কেচে যায় গৃহকাজে।

এই কবিতায় তিনি ছোটবেলায় গ্রামের নদী, প্রকৃতি ও পরিবেষের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।

"ছোট বড়":- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

এখনো তো বড়ো হই নি আমি,

ছোটো আছি ছেলেমানুষ ব'লে।

দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব

বড়ো হয়ে বাবার মতো হলে।

দাদা তখন পড়তে যদি না চায়,

পাখির ছানা পোষে কেবল খাঁচায়,

তখন তারে এমনি বকে দেব!

বলব, "তুমি চুপটি ক'রে পড়ো।'

বলব, "তুমি ভারি দুষ্টু ছেলে' --

যখন হব বাবার মতো বড়ো।

তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা

ভালো ভালো পুষব পাখির ছানা।

এই ছড়ায় তিনি ছোট এবং বড় সব ধরণের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক, তাদের চাহিদা এবং জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন।

"হিং টিং ছট": **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ,

অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ।

শিয়রে বসিয়ে যেন তিনটে বাঁদরে

উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে।

একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়,

চোখে মুখে লাগে তার নখের আঁচড়।

সহসা মিলাল তারা, এল এক বেদে,

"পাখি উড়ে গেছে' ব'লে মরে কেঁদে কেঁদে;

সম্মুখে রাজারে দেখি তুলি নিল ঘাড়ে,

ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।

নীচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়্‌থুড়ি

এই ছড়ায় তিনি শিশুদের খেলা, আনন্দ এবং বিভিন্ন ঘটনার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন।

ভানুসিংহের পদাবলী

"ভানুসিংহের পদাবলী" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। এখানে তিনি "ভানুসিংহ" ছদ্মনামে অনেক কবিতা ও গান রচনা করেছেন। এই কাব্যের কবিতাগুলি মূলত বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে রচিত এবং এতে প্রেম, বিরহ, প্রকৃতি ও ভক্তিরস বিষয়ক পদ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবনে এই পদগুলি রচনা করেন। এটির রচনাকাল সম্ভবত ১৮৮৪ সাল। এটি বিভিন্ন সময়ে 'ভারতী'' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার অনেক পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। উইকিপিডিয়া প্রদত্ত তথ্য অনুসারে। প্রথম গানটি তিনি লিখেছিলেন ১৮৭৭ সালে। "জীবন স্মৃতি" গ্রন্থে "ভানুসিংহের কবিতা" অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনার প্রেক্ষাপট, ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিকতা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ব্রজবুলিতে বৈষ্ণব পদাবলী লেখার উদ্দেশ্য ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ে তিনি কিভাবে ব্রজবুলি ভাষা এবং বৈষ্ণব পদাবলীকে ব্যবহার করে নিজের সাহিত্যিক সত্তাকে প্রকাশ করেছেন, সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই পদাবলী মূলত রাধাকৃষ্ণের প্রেম এবং বিরহী রাধার হৃদয়ের কথা ও ব্যাথা নিয়ে রচিত, যেখানে তিনি ব্রজবুলির ব্যবহার করেছেন। সংগৃহীত এ আই তথ্য অনুসারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ষোল বছর বয়সে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" লিখেছিলেন; যদিও এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৪ সালে। আগেই বলেছি ১৮৭৭সালে ভারতী পত্রিকায় তরুণ রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি হল মাইকেল মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা", ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী এবং "ভিখারিণী" ও "করুণা" নামে দুটি গল্প। এর মধ্যে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অল্প বয়সে বৈষ্ণব পদাবলির ধাঁচে ভানুসিংহের পদাবলি লিখে তিনি বড় বড় পণ্ডিতদেরও অবাক করে দিয়েছিলেন। এই পদাবলী একটি অংশ

তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীকে উৎসর্গ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থে ভানুসিংহ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্রের সংকলিত *প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ* পাঠ করে তিনি মৈথিলীমিশ্রিত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সেই সূত্রে তিনি এই পদাবলী রচনা করেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থে এই পদাবলীর রচনার প্রেক্ষাপট নিয়ে যে বিরবরণ দিয়েছেন তা নিতান্তই প্রাসঙ্গিক বলে, এখানে কিছুটা অংশ উল্লেখ করা হল;-

"... *শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয়-কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। (উৎস; জীবনস্মৃতি; ভানুসিংহ অধ্যায়)*

১০; রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য-সম্ভার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য সম্ভার অত্যন্ত বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিভিন্ন ধারায় তিনি সাহিত্য চর্চা করেছেন, যেমন -কবিতা, কাব্য, উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, গান, এবং চিত্রকলা। তাঁর এই বিশাল সাহিত্য শুধুমাত্র বাংলা ভাষাতেই সীমাবদ্ধ নয়, ইংরেজি ভাষাতেও তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্য সম্ভারে তাঁর ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতা, জীবন দর্শন, এবং প্রকৃতি-প্রেম ও গভীর অনুভূতি, মানবপ্রেম, আধ্যাত্মিকতা এবং জীবনের বিভিন্ন দিক সুন্দর প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর এই বিশাল সাহিত্য সম্ভারের জন্য তাঁকে গুরুদেব, কবিগুরু ও বিশ্বকবি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ৫২টি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ, ৩৮টি নাটক, ১৩টি উপন্যাস ও ৩৬টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যসংকলন তাঁর জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। তাঁর সর্বমোট ৯৫টি ছোটগল্প গল্পগুচ্ছ নামে প্রকাশিত এবং ১৯১৫টি গান গীতবিতান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা '**রবীন্দ্র রচনাবলী**' নামে ৩২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রবর্তিত নৃত্যশৈলী "রবীন্দ্রনৃত্য" নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় পত্রসাহিত্য উনিশ খণ্ডে চিঠিপত্র ও চারটি পৃথক গ্রন্থে প্রকাশিত। এছাড়া তিনি প্রায় দুই হাজার ছবি এঁকেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে আধুনিক রূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর সাহিত্য বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং বাংলা সাহিত্যের আধুনিকীকরণ পথ তৈরি করেছে। আলোচনার সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য-সম্ভারকে এখানে সাত-ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১০-১; কাব্য-সাহিত্য:

আমরা প্রায় সকলেই জানি, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্য আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রিয়। কবিতা ও কাব্য তাঁর সবচেয়ে প্রশংসিত সৃষ্টি। তাঁর কবিতা ও কাব্যের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে প্রেম, প্রকৃতি, মানবতা, এবং আধ্যাত্মিকতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৫২টি মৌলিক কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কল্পনা, ক্ষণিকা, পলাতকা গীতাঞ্জলি, খেয়া, নৈবেদ্য, পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, কড়ি ও কোমল, কণিকা, কথা, কথা ও কাহিনী, কবি-কাহিনী, বনফুল, ভগ্নহৃদয় ইত্যাদি। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থগুলি হল-

মানসী (১৮৯০), **সোনার তরী** (১৮৯৪), **চিত্রা** (১৮৯৬), **চৈতালি** (১৮৯৬), **কল্পনা** (১৯০০), **ক্ষণিকা** (১৯০০) ও **পলাতকা** (১৯১৮)। এই সকল কাব্যগ্রন্থে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্য সম্পর্কিত রোম্যান্টিক ভাবনা। পলাতকা কাব্যে গল্প-কবিতার আকারে তিনি নারীজীবনের সমসাময়িক সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। বহির্বিশ্বে তার সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত কাব্যগ্রন্থটি হল গীতাঞ্জলি। এ বইটির জন্যই তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এই কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য, মানবজীবনের বিভিন্ন দিক এবং জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রথম তিনটি কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

সোনার তরী কাব্য

"সোনার তরী" কবিতায় কবি জীবনের গতিশীলতা, কর্মের প্রতি মনোযোগ, এবং প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কের এক সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। "সোনার তরী" জীবনের প্রতীক হিসেবে তিনি বর্ণনা করেছেন। জীবন তথা সোনার তরী যদিও ক্ষণস্থায়ী এবং সবকিছুকে সাথে করে নিয়ে চলে। প্রকৃতি, বিশেষ করে নদী, মানুষের কর্ম ও জীবনের গতিশীলতা তরান্বিত করে। এই কাব্যে তিনি কর্মের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন; তিনি এখানে বলতে ছেয়েছেন জীবনে কেবল কর্মের মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এই কাব্যে তিনি মানুষের দুঃখ-সুখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা,এবং জীবনের গতির প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

"সোনার তরী" মূলত একটি জীবনদর্শনের কাব্য যেখানে তিনি মানবজীবনে মধ্যে কর্ম ও প্রকৃতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক তুলে ধরেছেন ।

মানসী কাব্য

রবীন্দ্রনাথ গাজীপুরে থাকাকালীন "মানসী" কাব্যের বেশিরভাগ কবিতা লিখেছিলেন। সেখানকার অনুপম প্রাকৃতিক পরিবেশে কবি ছন্দোবদ্ধ কবিতাগুলি রচনা করেন। এটিই ছিল তাঁর প্রথম সম্পূর্ণ

কাব্য-গ্রন্থ যেখানে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রকার ছন্দের প্রয়োগ করেন। ১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথের এটি প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। "মানসী" কাব্যগ্রন্থে প্রায় ৬৬টি কবিতা রয়েছে। যথা-উপহার, ভুল-ভাঙা, বিরহানন্দ, ক্ষণিক মিলন, শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, আত্মসমর্পণ, নিষ্ফল কামনা, আকাঙ্ক্ষা, বিচ্ছেদের শান্তি, একাল ও সেকাল, মেঘদূত, অহল্যার প্রতি, উচ্ছৃঙ্খল, আগন্তুক, বিদায় ইত্যাদি।

চিত্রা কাব্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থটি একটি রোমান্টিক কাব্যগ্রন্থ যেখানে প্রকৃতি, প্রেম, সৌন্দর্য, জীবন ও মৃত্যু নিয়ে কবির চিন্তা, ভাবনা ও দর্শন প্রকাশ পেয়েছে। এই কাব্যে ৩৬টি কবিতা রয়েছে যেখানে জীবনদেবতা বা অন্তর্মুখী শক্তির ধারণা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের মূল কবিতা গুলি হল- চিত্রা, সুখ, জ্যোৎস্না রাত্রে, প্রেমের অভিষেক, মৃত্যুর পরে, অন্তর্যামী, সাধনা, ব্রাহ্মণ,পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমি, পূর্ণিমা, স্বর্গ হইতে বিদায়, নারীর দান, জীবন দেবতা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রতিটি মানুষের মনে একটি শক্তি বা দেবতা বিরাজ করে, যা তার জীবনকে পরিচালিত করে। এই অন্তর্যামী শক্তি তাঁর জীবনদেবতা কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১০-২; ছোটোগল্প:

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বলতে আমরা সাধারণভাবে তাঁর '*গল্পগুচ্ছ* গ্রন্থের গল্পগুলোর কথাই বুঝি। তাঁর সেরা ও বিখ্যাত গল্পগুলোর বেশিরভাগই *গল্পগুচ্ছে* সংকলিত হয়েছে। বিশ্বভারতী প্রকাশিত *রবীন্দ্র রচনাবলী*র বিভিন্ন খন্ডে এই গল্পগুলো '*গল্পগুচ্ছের*' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই *গল্পগুচ্ছে*র মাধ্যমে তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি ছোটগল্প সম্ভারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্পকার হিসেবে জনপ্রিয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন বালক বৃদ্ধ, মধ্যবয়সী সবার প্রিয় ছোটগল্পকার। তাঁর গল্পগুচ্ছ সংকলনে ৯৫টি ছোটগল্প রয়েছে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হল "কঙ্কাল", "নিশীথে", "মণিহারা", "ক্ষুধিত পাষাণ", "স্ত্রীর পত্র", "নষ্টনীড়", "কাবুলিওয়ালা", "হৈমন্তী", "দেনাপাওনা", "মুসলমানীর গল্প" ইত্যাদি। ১৮৭৭ সালে তাঁর লেখা "ভিখারিণী" গল্পটি ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প। এই গল্পটি ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। ছোটগল্পগুলিতে জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন প্রকৃতি, সমাজ, প্রেম, দুঃখ, আনন্দ, সম্পর্ক, ইত্যাদি বিষয় সহজ, সরল, স্বাভাবিক এবং আকর্ষণীয় ভাষা তিনি তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের একাধিক ছোটগল্প চলচ্চিত্র, নাটক ও টেলিভিশনে প্রায় অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর গল্পের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রায়ণ হল সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'তিন কন্যা' ও 'চারুলতা', তপন সিংহ পরিচালিত 'অতিথি', কাবুলিওয়ালা ও ক্ষুধিত পাষাণ, পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালিত 'স্ত্রীর পত্র' ইত্যাদি।

১০-৩; উপন্যাস রচনাবলী:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসগুলো তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তিনি মোট ১৪টি উপন্যাস রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বৌ-ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩), রাজর্ষি (১৮৮৭) নৌকাডুবি (১৯০৬), প্রজাপতির নির্বন্ধ (১৯০৮), গোরা (১৯১০), ঘরে বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), চোখের বালি (১৯০৩), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), দুই বোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪) ও চার অধ্যায় (১৯৩৪) ইত্যাদি। তাঁর উপন্যাসগুলোতে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং ব্যক্তিগত বিষয় উঠে এসেছে। তাঁর উপন্যাসগুলোতে প্রায়শই নারী চরিত্র, প্রেম, এবং সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস অবলম্বনে কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সত্যজিৎ রায়ের ঘরে বাইরে ও ঋতুপর্ণ ঘোষের চোখের বালি। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল এখানে:

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম উপন্যাস "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট"। এটি ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত; যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনের উপর ভিত্তি করে তিনি লিখেছেন। এই উপন্যাসে, প্রতাপাদিত্য ও তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কের জটিলতা এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। এটি শুধু একটি উপন্যাস নয়, এটি একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সামাজিক বাস্তবতার একটি প্রতিচ্ছবি।

চোখের বালি:

'চোখের বালি' উপন্যাসটি একটি সামাজিক উপন্যাস, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্যবিয়ে, বিধবা জীবন এবং সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের বিষয় "সমাজ ও যুগযুগান্তর ধরে প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের বিরোধ উঠে এসেছে এই উপন্যাসে । এটি বিনোদিনী নামের এক তরুণী বিধবা, মহেন্দ্র এবং আশালতার মধ্যে জটিল সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে ।

অতি সুন্দরী মেয়ে বিনোদিনী খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়ে সমাজের প্রচলিত নিয়ম-কানুন ও সংস্কারের মধ্যে তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করে জীবন অতিবাহিত করতে হত এবং পরে তাঁর কি পরিণতি হয়েছিল –এই উপন্যাসে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। সংসারের সর্বময় কর্ত্রী মা, এক অনভিজ্ঞা বালিকাবধূ, এক বাল্যবিধবা ও তার প্রতি আকৃষ্ট দুই পুরুষকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি রচিত। চোখের বালি উপন্যাসে সমসাময়িককালে বিধবাদের জীবনের হাজার সমস্যার কথা ও কাহিনী প্রকাশ পেয়েছে।

গোরা:

'গোরা' উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি জটিল ও গভীর ভাব ধারার উপন্যাস, যেখানে মূলত জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং

জাতীয়তাবাদের মতো গভীর বিষয়গুলি অসাধারণ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে । উপন্যাসটি উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসিত কলকাতার প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছে, যেখানে জাতিগত, ধর্মীয় এবং সামাজিক বিভেদ প্রবল ছিল। এটি ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। গোরা হল এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। এই চরিত্রে গোরা একটি হিন্দু ছেলে যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে। প্রথমে সে জাতিগতভাবে হিন্দু, কিন্তু পরে সে নিজেকে ভারতীয় হিসেবে জাহির করে। সে ধীরে ধীরে জাতিগত ও ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দিকে ধাবিত হয়। উপন্যাসটিতে ভারতীয় জাতি এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি গোরার একনিষ্ঠতা ও রক্ষণশীলতা দেখা যায়। গোরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাকে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য দিত যা সেই সময়কালে একটি গুরুত্বপূর্ণবিষয় ছিল। উপন্যাসটিতে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে সহাবস্থানের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া উপন্যাসে নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে, যা আধুনিক সমাজের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের প্রেম এবং সাংসারিক ও সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়গুলিও প্রকাশ পেয়েছে যার দ্বারা মানবিক সম্পর্কের জটিলতাও প্রকাশ পেয়েছে।

ঘরে বাইরে:

এই উপন্যাসটি জাতীয়তাবোধ, প্রেম, এবং সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা। উপন্যাসটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস, যা ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। এই উপন্যাসে একদিকে যেমন আছে জাতিপ্রেম ও স্বাদেশিকতার বিচার বিশ্লেষণ , অন্যদিকে আছে সমাজ ও প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিশ্লেষণ। এই উপন্যাসে তিনটি প্রধান চরিত্র - বিমলা, নিখিল এবং সন্দীপ। এদের মধ্যে বিমলার চরিত্রটি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। বিমলা একদিকে যেমন ঘর-সংসারের প্রতি দায়বদ্ধতা, অন্যদিকে তেমনই স্বামী নিখিলের প্রতি তার গভীর প্রেম ও ভালোবাসা রয়েছে। **বিমলা** একজন গৃহস্থ নারী,

যিনি একদিকে যেমন স্বামী নিখিলের প্রতি ভালোবাসেন, অন্যদিকে তেমনই সন্দীপের প্রতি তার আকর্ষণ রয়েছে। **নিখিল** হলেন বিমলার স্বামী, যিনি একজন আদর্শবাদী ও শিক্ষিত যুবক। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। **সন্দীপ** হলেন একজন বিপ্লবী, যিনি বিমলার প্রতি ভীষণ আকৃষ্ট হন এবং তাকে নিজের আদর্শের পথে নিয়ে যেতে চান। বিমলা, নিখিল এবং সন্দীপের মধ্যে সম্পর্ক, বিশেষত নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। উপন্যাসটি শুধু একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক উপন্যাস নয়, এটি একটি জটিল মানব সম্পর্কের চিত্রও। বিমলার চরিত্রটি উপন্যাসের মূল আকর্ষণ, কারণ তিনি একদিকে যেমন সমাজের নিয়ম-কানুন মেনে চলেন, অন্যদিকে তেমনই নিজের আবেগ ও ইচ্ছার প্রতিও সংবেদনশীল।

১০.৪; রবীন্দ্র সঙ্গীত:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, যা রবীন্দ্রসংগীত নামে পরিচিত। রবীন্দ্র সঙ্গীত বাংলা সঙ্গীতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংগৃহীত তথ্য অনুসারে তিনি প্রায় ২২৩২টি গান রচনা করেছেন, যা বাংলা গানের জগতে এক নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছে। তাঁর রচিত সব গান গীতবিতান গ্রন্থে সংকলিত। এটাও বাংলা সাহিত্যের একটা বিশাল বড় অংশ। তাঁর গানের সুর ও কথার গভীরতা বাংলা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধি করেছে। রবীন্দ্রসংগীত আজকের যে কোন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষয়ের উপর গান রচনা করেছেন যেমন- প্রকৃতি, প্রেম, দেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতা। তাঁর গানের ভাষা সহজ, সরল কিন্তু ভীষণ গভীর। রবীন্দ্রনাথ রচিত গানগুলি যেমন বাঙ্গালীদের কাছে আকর্ষণীয় তেমনি সারা বিশ্বের মানুষের কাছেও জনপ্রিয়। তাঁর গানের মাধ্যমে তিনি মানুষের বিভিন্ন অনুভূতি বা উপলব্ধি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই রবীন্দ্র সঙ্গীত বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত।

প্রসঙ্গত, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সঙ্গীতচর্চার ব্যাপক প্রচলন ছিল। রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথের দাদারা বাড়িতে নিয়মিত সংগীতচর্চা করতেন। রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সে

সঙ্গীতশিক্ষায় সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁর নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথও বাড়িতে রিতিমত রীতিমত সংগীতচর্চা করতেন। সংগৃহীত তথ্য তিনি এগারো বছর বয়সে 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে' এই গানটি রচনা করেছিলেন। এরপর প্রায় ৭০ বছর ধরে তিনি নিয়মিত গান রচনা করেছেন। তিনি প্রায় ২২৩২টি গান রচনা করে, বাংলা গানের জগতে এক নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করে গেছেন। এছাড়া তিনি বহু গানের সুরও দিয়েছিলেন। উইকিপেদিয়া তথ্য অনুসারে স্বরচিত গীতিকবিতা ছাড়াও কয়েকটি বৈদিক স্তোত্র ও বৌদ্ধ মন্ত্র এবং বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার বড়াল , সুকুমার রায় ও হেমলতা দেবী কর্তৃক রচিত বেশ কয়েকটি গানে সুরারোপ করেছিলেন তিনি। তার লেখা শেষ গানটি হল 'হে নূতন দেখা দিক আর বার'। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তার শেষ জন্মদিনে এটি পরিবেশিত হয়েছিল।

সঙ্গীত জগতের পণ্ডিতেরা বলেন তাঁর গানের সম্ভারে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের সুর, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি, টপ্পা, তরানা, ভজন ইত্যাদি ধারার সুরের প্রভাব রয়েছে। এছাড়া সঙ্গীত পণ্ডিতেরা আরও বলেন বাংলার লোকসঙ্গীত, কীর্তন, রামপ্রসাদী গান, সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য ধ্রুপদি (classical) সঙ্গীত ও পাশ্চাত্য লোকগীতির প্রভাব রয়েছে। এক কথায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীত প্রতিভা অনবদ্য ও অতুলনীয়। তিনি নিজেও সুগায়ক ছিলেন। বিভিন্ন সভাসমিতি ও সঙ্গীতানুষ্ঠানে তিনি স্বরচিত গান পরিবেশন করতেন। কয়েকটি গান তিনি গ্রামোফোন ডিস্কেও প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায়। সঙ্গীত প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবন্ধও তিনি রচনা করেন। এছাড়া স্বরচিত নাটকেও তিনি নিজের গান ব্যবহার করতেন। (উৎস; উইকিপেডিয়া)

'গীতবিতান'

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গান নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত গ্রন্থ 'গীতবিতান'। 'গীতবিতান' গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ডে

রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর গানগুলিকে ‘পূজা’, ‘স্বদেশ’, ‘প্রেম’, ‘প্রকৃতি’, ‘বিচিত্র’ও ‘আনুষ্ঠানিক’ – এই ছয়টি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর *গীতবিতান* গ্রন্থের *ঐঐ* দুই খণ্ডে অসংকলিত গানগুলি নিয়ে ‘গীতবিতান’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ড ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডে প্রকাশিত গানগুলি ‘গীতিনাট্য’, ‘নৃত্যনাট্য’, ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’, ‘নাট্যগীতি’, ‘জাতীয় সংগীত’, ‘পূজা ও প্রার্থনা’, ‘আনুষ্ঠানিক সংগীত, ‘প্রেম ও প্রকৃতি’ ইত্যাদি পর্যায়ে বিন্যস্ত। এ ৬৪ খণ্ডে প্রকাশিত **স্বরবিতান গ্রন্থে** রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র সংগীত "আমার সোনার বাংলা" বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং তাঁর "জন গণ মন" ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের সম্মান লাভ করেছে।

রবীন্দ্র সঙ্গীত ও জীবন দর্শন

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের সম্ভার বাংলা সাহিত্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর প্রতিটি গানে আমরা গভীর দর্শনের সন্ধান পাই। তাই আমরা সকলে সুখে, দুখে, প্রেম-ভালবাসায়, আনন্দ-উৎসবে, পূজা-পার্বণে বা ভক্তি-মূলক অনুষ্ঠানে আমরা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাই, শুনি বা বাজাই। তাঁর গান ও দর্শন একে অপরের পরিপূরক; তাঁর গান দর্শনের বাহন এবং দর্শন তাঁর গানের মর্মবস্তু। আমাদের কাছে রবীন্দ্র-সঙ্গীতক শুধু গান নয় সেই সঙ্গে গভীর জীবনদর্শনের বাহক। তাঁর গানের মধ্যে যে সকল দর্শনের সন্ধান পাই সেগুলো হল মানবতাবাদ, ব্রহ্মবাদ, আধ্যাত্মিকতা, প্রেম-ভালবাসা, প্রকৃতি প্রেম, এবং জীবনের নানান দর্শন ও শিক্ষা। আমরা যারা গান ভালবাসি তারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছি তাঁর গানের কথায় সুস্পষ্ট হয়েছে গীতা ও উপনিষদের দর্শন, সংস্কৃত সাহিত্য, বৈষ্ণব দর্শন ও বাউল দর্শন।

গ্রাম ছাড়া ওই রাঙ্গামাটির পথ', 'ও আমার দেশের মাটি,' 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে,' 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি','ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি' রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা, দেশপ্রেম এবং মানবতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি রচিত হয়েছে। এইসকল গানে বাউল গানের জীবনদর্শনে প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট ।

পূজা পর্যায়ের গান;

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসংখ্য পূজা পর্যায়ের গান রয়েছে মূলত ঈশ্বর-বন্দনা, ভক্তি আধ্যাত্মিকতা এবং আত্ম-উপলব্ধি উপর কেন্দ্র করে তিনি রচনা করেছেন। এই গানগুলোতে আধ্যাত্মিকতা, প্রেম, এবং প্রকৃতির গভীর অনুভূতি প্রকাশ পায়। পূজা পর্যায়ের গানগুলোতে ঠাকুর বিভিন্ন রূপে ঈশ্বরের সান্নিধ্য চেয়েছেন, তার প্রেম ও করুণা প্রার্থনা করেছেন। সেই গানগুলিতে গভীর জীবন-দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। আধ্যাত্মিকতা ও পূজা গান;

১) " কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া
তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া।
চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি
গোপনে তোমারে, সখা, কত ভালোবাসি।
ভেবেছিনু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা,............"

২) " আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান,
তার বদলে আমি চাই নে কোনো দান।
যে ফুল গেঁথে মালা দিয়েছিনু হাতে,
সে তো ঝরে গেছে কালের স্রোতে রাতে।..."

৩) তোমার বীণা আমার মনোমাঝে কখনো শুনি, কখনো ভুলি, কখনো শুনি না যে"।

৪) অরূপ, তোমার বাণী

অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক্ সে আনি ॥

৫) "ওগো দেবতা আমার, পাষাণ দেবতা, হৃদি-মন্দির-বাসী;

তোমারি চরণে উজাড় করেছি সকল কুসুমরাশি।

প্রভাত আমার সন্ধ্যা হইল, অন্ধ হইল আঁখি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পূজা ও প্রার্থনা" পর্যায়ের অসংখ্য গান রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি আমি উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরলাম।

এই সকল গানের মাধ্যমে ভক্ত আরাধ্য দেবতাকে প্রাথনার মাধ্যমে হৃদয়ে আহ্বান করেন এবং তাঁর চরণে ভক্তি নিবেদন করেন।

সুখ-দুঃখ ও প্রেমের গান

মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, প্রেম-প্রীতি, আনন্দ-বিষাদ এই সকল জীবনদর্শন যেমন তাঁর গানে উপলব্ধি করা যায় তেমনি মানবতাবাদ, বিশ্বজনীনতা, এবং আধ্যাত্মিকতার মত গভীর দর্শন ও তাঁর গানের মধ্যে সুস্পষ্ট। কিছু প্রেমের গান;

১) " জানি তোমার অজানা নাহি গো কী আছে আমার মনে ।
আমি গোপন করিতে চাহি গো, ধরা পড়ে দুনয়নে ॥
কী বলিতে পাছে কী বলি
তাই দূরে চলে যাই কেবলই,
পথপাশে দিন বাহি গো ...।"

২) "প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, মরি একি তোর দুস্তরলজ্জা ।
সুন্দর এসে ফিরে যায়, তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা ॥
মুখে নাহি নি:সরে ভাষ, দহে অন্তরে নির্বাক্ বহ্নি ।
ওষ্ঠে কী নিষ্ঠুর হাস, তব মর্মে যে ক্রন্দন তন্বী !
মাল্য যে দংশিছে হায়, তব শয্যা যে কন্টকশয্যা–
মিলনসমুদ্রবেলায় চির- বিচ্ছেদজর্জর মজ্জা ॥"

৩) " আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী ।
আমি সকল দাগে হব দাগি ॥
তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন , যেথা তোমার ধুলায় শয়ন
সেথা আঁচল পাতব আমার – তোমার রাগে অনুরাগী ॥
আমি শুচি-আসন টেনে টেনে বেড়াব না বিধান মেনে ,
যে পঙ্কে ওই চরণ পড়ে তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি ॥"

এরকম অনেক গান আছে যার মধ্যে প্রেম, ভক্তি, এবং মিলন-বিরহের বিভিন্ন অনুভূতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ..."

৪) "দুজনে দেখা হল মধুযামিনী রে–
কেন কথা কহিল না, চলিয়া গেল ধীরে॥

নিকুঞ্জে দখিনাবায় করিছে হায়-হায়,
লতাপাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে॥
দুজনের আঁখিবারি গোপনে গেল বয়ে,
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল রয়ে। ..."

৫) "এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায় ।
এমন দিনে মন খোলা যায়–
এমন মেঘস্বরে বদল-ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায় ॥"

প্রেম ও প্রকৃতির গান;

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসংখ্য গানে প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং মানুষের জীবনের উপর প্রকৃতির প্রভাব বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

1. "এসো এসো, এসো হে বৈশাখ"
2. "আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে"
3. "বাদল মেঘে মাদল বাজে"
4. "বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে। স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে।......"
5. "কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
   ওহে চঞ্চল, বেলা না যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে........."

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসংখ্য গানে প্রকৃতি ও মানব-প্রেমের অসাধারণ সমন্বয় ঘটেছে। ঐ গানগুলোতে প্রকৃতি এবং মানব মনের আবেগ, অনুভূতি ও প্রেমের গভীর সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে। কবি প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান, যেমন - ফুল, পাখি, নদী, আকাশ, প্রতি মানব মনের প্রেম, বিরহ, আনন্দ, বিষাদ সমন্বয় প্রকাশ করেছেন।

১০.৫; প্রবন্ধ ও গদ্যগ্রন্থ:

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যগ্রন্থগুলোতে তাঁর দার্শনিক ও সামাজিক ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অসংখ্য ছোট প্রবন্ধও রয়েছে।

সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছোট প্রবন্ধ হল- 'মনের বাগান বাড়ি', 'গরীব হইবার সামর্থ্য', 'দয়ালু মাংসাশী', 'অধিকার', 'অনধিকার', 'আত্মীয়ের বেড়া', 'বসন্ত ও বর্ষা', 'আদর্শ প্রেম', 'বন্ধুত্ব ও ভালবাসা', 'আত্ম-সংসর্গ', 'বধিরতার সুখ', 'স্ত্রৈণ' ইত্যাদি। তাঁর এই সকল প্রবন্ধগুলি ছোট হলেও সেখানে তাঁর অসাধারণ দর্শন ও চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে তাঁর কয়েকটি ছোট তুলে ধরা হল;

1. মনের বাগান বাড়ি।

" ভালোবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে। ভালোবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভালো তাহাই সমর্পণ করা। হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে; হৃদয়ের যেখানে দেবত্রভূমি, যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।

যাহাকে তুমি ভালোবাস তাহাকে ফুল দাও, কাঁটা দিও না; তোমার হৃদয়-সরোবরের পদ্ম দাও, পঙ্ক দিও না। হাসির হীরা দাও, অশ্রুর মুক্তা দাও; হাসির বিদ্যুৎ দিও না, অশ্রুর বাদল দিও না। প্রেম হৃদয়ের সারভাগ মাত্র। হৃ দয় মন্থন করিয়া যে অমৃতটুকু উঠে তাহাই। ইহা দেবতাদিগের ভোগ্য। অসুর আসিয়া খায়, কিন্তু তাহাকে দেবতার ছদ্মবেশে খাইতে হয়। যাহাকে তুমি দেবতা বলিয়া জান' তাহাকেই তুমি অমৃত দাও, যাহাকে দেবতা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাকেই অমৃত দাও। কিন্তু এমন মহাদেব সংসারে আছেন, যিনি তো বটেন, কিন্তু যাঁহার ভাগ্যে অমৃত জুটে নাই, সংসারের সমস্ত বিষ তাঁহাকে পান করিতে হইয়াছে, আবার এমন রাহুও আছে যে অমৃত খাইয়া থাকে।

যাঁহাকে তুমি ভাল বাস, তাঁহাকে তোমার হৃদয়ের সমস্তটা দেখাইও না। যেখানে তোমার হৃদয়ের পয়ঃপ্রণালী, যেখানে আবর্জ্জনা, যেখানে জঞ্জাল, সেখানে তাঁহাকে লইয়া যাইও না; তাহা যদি পার' তবে আর তোমার কিসের ভাল বাসা! তাঁহাকে তোমার হৃদয়ের এমন অঞ্চলের ডিস্ট্রিক্ট জজ্ করিবে, যেখানে ম্যালেরিয়া নাই, ওলাউঠা নাই, বসন্ত নাই। তাঁহাকে যে বাড়ি দিবে তাহার দক্ষিণ

দিকে খোলা, বাতাস আনাগোনা করে, বড় বড় ঘর, সূর্যের আলোক প্রবেশ করে। ইহা যে করে সেই যথার্থ ভালবাসে। এমন স্বার্থপর প্রণয়ী বোধ করি নাই, যে মনে করে, তাহার প্রণয়ীকে তুমার হৃদয়ের সমস্ত বাঁশ ঝাড়ে ঘুরাইয়া, সমস্ত পচাপুকুরে স্নান করাইয়া না বেড়াইলে যথার্থ ভালবাসা হয় না। অনেকের মত তাহাই বটে, কিন্তু সঙ্কোচে পারিয়া উঠে না। এ বড় অপূর্ব্ব মত।

অনেকে বলিয়া উঠিবেন, "এ কি রকম কথা; যাঁহাকে তুমি খুব ভালবাস', যাঁহাকে নিতান্ত আত্মীয় মনে করা যায়, তাঁহার নিকটে মনের কোন ভাগ গোপন করা কি উচিত?" উচিত নহত কি? সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় "নিজের" নিকটে স্বভাবতঃ অনেকটা গোপন করিতে হয়। না করিলে চলে না, না করিলে মঙ্গল নাই। প্রকৃতি যাহাদের চক্ষে পাতা দেন নাই, যাহারা আবশ্যকমত চোক বুজিতে পারে না, মনে যাহা কিছু আসে, যে অবস্থাতেই আসে, তাহাদের কুম্ভীর-চক্ষে পড়িবেই, তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্দ্দশা। আমরা অনেক মনোভাব ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি না, চোক বুজিয়া যাই। এরূপ করিলে সে ভাব গুলিকে উপেক্ষা করা হয়, অনদর করা হয়। ক্রমে তাহারা ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। এই ভাবগুলি, প্রকৃতিগুলি যদি ঢাকিয়া রাখা না যায়, পরস্পরের কাছে প্রকাশ করিয়া, বৈঠকখানার মধ্যে, কথাবার্ত্তার মধ্যে তাহাদের ডাকিয়া আনা হয়, তাহাদের সহিত বিশেষ চেনাশুনা হইয়া যায়, তাহাদের কদার্য্য মূর্ত্তি এমন সহিয়া যায় যে, আর খারাপ লাগে না, সে কি ভাল? ইহাতে কি তাহাদের অত্যন্ত আস্কারা দেওয়া হয় না? একেতে যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে ভাল জিনিষ দিতে ইচ্ছা করে, দ্বিতীয়তঃ তাহাকে মন্দ জিনিষ দিলে মন্দ জিনিষের দর অত্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া বিষ দেওয়া, রোগ দেওয়া, প্রহার দেওয়াকে কি দাতাবৃত্তি বলে?

দোকানে হাটে, রাস্তায় ঘাটে যাহাদের সঙ্গে আমাদের সচরাচর দেখাশুনা হয়, তাহাদের সঙ্গে আমাদের নানান্ কাজের সম্বন্ধ। তাহারে সঙ্গে আমাদের নানা সাংসারিক ভাবের আদান প্রদান চলে। পরস্পরে দেখাশুনা হইলে, হয় কথাই হয় না, নয় অতি তুচ্ছ বিষয়ে

কথা হয়, নয় কাজের কথা চলে। ইহারাত সাধারণ মনুষ্য। কিন্তু এমন এক এক জনকে আমার চখের সামনে আমার মনের প্রতিবেশী করিয়া রাখা উচিত, যে আমার আদর্শ মনুষ্য। সে যে সত্যকার আদর্শ মনুষ্য এমন না হইতে পারে; তাহার মনের যতটুকু আদর্শ ভাব সেই টুকু সে আমার কাছে প্রকাশ করিয়াছে। তাহার সঙ্গে আমার অন্য কোন কাজ কর্ম্মের সম্পর্ক নাই, কেনা বেচার সম্বন্ধ নাই, দলিল দস্তাবেজের আত্মীয়তা নাই। আমি তাহার নিকট আদর্শ সে আমার নিকট আদর্শ। আমার মনের বাগান বাড়ি তাহার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি সে তাহার বাগানটি আমার জন্য রাখিয়াছে। এ বাগানের কাছে কদর্য্য কিছুই নাই, দুর্গন্ধ কিছুই নাই। পরস্পরের উচিত, যাহাতে নিজের নিজের বাগান পরস্পরের নিকট রমণীর হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা। যত ফুল গাছ রোপণ করা যায়, যত কাঁটাগাছ উপড়াইয়া ফেলা হয় ততই ভাল। এত বাণিজ্য ব্যবসায় বাড়িতেছে, এত কল-কারখানা স্থাপিত হইতেছে, যে গাছ-পালা-ফুল-ভরা হাওয়া খাইবার জমী কমিয়া আসিতেছে। এই নিমিত্ত তোমার মনের এক অংশে গাছপালা রোপণ করিয়া রাখিয়া দেওয়া উচিত; যাহাতে তোমার প্রিয়তম তোমার মনের মধ্যে আসিয়া মাঝে মাঝে হাওয়া খাইয়া যাইতে পারেন। সে স্থানে অস্বাস্থ্যজনক দূষিত কিছু না থাকে যেন, যদি থাকে তাহা আবৃত করিয়া রাখিও।

সত্যকর আদর্শ লোক সংসারে পাওয়া দুঃসাধ্য। ভালবাসার একটি মহান গুণ এই যে, সে প্রত্যেককে নিদেন এক জনের নিকটেও আদর্শ করিয়া তুলে! এইরূপে সংসারে আদর্শ ভাবের চর্চ্চা হইতে থাকে। ভালবাসার খাতিরে লোককে মনের মধ্যে ফুলের গাছ রোপণ করিতে হয়, ইহাতে তাহার নিজের মনের স্বাস্থ্য সম্পাদন হয়, আর তাহার মনোবিহারী বন্ধুর স্বাস্থ্যের পক্ষেও ইহা অত্যন্ত উপযোগী। নিজের মনের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জমীটুকু অন্যকে দেওয়ায়, ভালবাসা ছাড়া অমন আর কে করিতে পারে? তাই বলিতেছি ভাল-বাসা অর্থে আত্ম সমর্পণ করা নহে, ভাল-বাসা অর্থে ভাল-বাসা, অর্থাৎ অন্যকে ভাল বাসস্থান দেওয়া, অনাকে মনের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জায়গায় স্থাপন করা। যাঁহাদের হৃদয় কাননের

ফুল শুকাইয়াছে, ফুলগাছ মরিয়া গিয়াছে, চারিদিকে কাঁটাগাছ জন্মিয়াছে, এমন সকল অনুর্ব্বর-হৃদয় বিজ্ঞ বৃদ্ধেরই ভালবাসার নিন্দা করেন।"

1. গরীব হইবার সামর্থ্য।

অনেকের গরীব-মানুসী করিবার সামর্থ্য নাই। এত তাহাদের টাকা নাই যে, গরীব-মানুষী করিয়া উঠিতে পারে। আমার মনের এক সাধ আছে। যে, এত বড় মানুষ হইতে পারি যে, অসঙ্কোচে গরীব-মানুষী করিয়া লইতে পারি। এখনো এত গরীব মানুষ আছি যে, গিল্টি-করা বোতাম পরিতে হয়, কবে এত টাকা হইবে যে, সত্যকার পিতলের বোতাম পরিতে সাহস হইবে! এখনো আমার রূপার এত অভাব যে অন্যের সমুখে রূপার থালায় ভাত না খাইলে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়। এখনো, আমার স্ত্রী কোথাও নিমন্ত্রণ খাইতে গেলে তাহার গায়ে আমার জমিদারীর অর্দ্ধেক আয় বাঁধিয়া দিতে হয়! আমার বিশ্বাস ছিল রাজশ্রী ক বাহাদুর খুব বড়মানুষ লোক। সে দিন তাঁহার বাড়িতে গিয়ছিলাম দেখিলাম, তিনি নিজে গদীর উপরে বসেন ও অভ্যগতদিগকে নীচে বসান, তখন জানিতে পারিলাম যে তাহার গরীব-মানুষী করিবার মত সম্পত্তি নাই। এখন আমাকে যেই বলে যে, ক রায়বাহাদুর মস্ত বড় মানুষ লোক, আমি তাহাকেই বলি, "সে কেমন করিয়া হইবে? তাহা হইলে তিনি গদীর উপর বসেন কেন?" উপার্জ্জন করিতে করিতে বুড়া হইয়া গেলাম, অনেক টাকা করিয়াছি, কিন্তু এখনো এত বড় মানুষ হইতে পারিলাম না যে, আমি যে বড় মানুষ এ কথা একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারিলাম। সর্ব্বদাই মনে হয়, আমি বড় মানুষ। কাজেই আংটি পরতে হয়, কেহ যদি আমাকে রাজাবাহাদুর না বলিয়া বাবু বলে, তবেই চোক রাঙাইয়া উঠতে হয়। যে ব্যক্তি অতি সহজে খাবার হজম করিয়া ফেলিতে পারে, যাহার জীর্ণ খাদ্য অতি নিঃশব্দে নিরুপদ্রবে শরীরের রক্ত নির্ম্মাণ করে, সে ব্যক্তির চব্বিশ ঘণ্টা, আহার করিয়াছি বলিয়া একটা চেতনা থাকে না। কিন্তু যে হজম করিতে পারে না, যাহার পেট ভার হইয়া থাকে পেট কামড়াইতে থাকে, সে প্রতি মুহূর্ত্তে জানিতে পারে যে, হাঁ আহার করিয়াছি বটে। অনেকের টাকা আছে

বটে, কিন্তু নিঃশব্দে টাকা হজম করিতে পারে না; পরিপাক শক্তি নাই, ইহাদের কি আর বড় মানুষ বলে! ইহাদের বড়মানুষী করিবার প্রতিভা নাই। ইহারা ঘরে ছবি টাঙ্গায় পরকে দেখাইবার জন্য, শিল্প-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা নাই, এই জন্য ঘরটাকে একেবারে ছবির দোকান করিয়া তুলে। ইহারা গণ্ডা গণ্ডা গাহিয়ে বাজিয়ে নিযুক্ত রাখে, পাড়া প্রতিবেশীদের কানে তালা লাগাইয়া দেয়, অথচ যথার্থ গান বাজনা উপভোগ করিবার ক্ষমতা নাই। এই সকল চিনির বলদ্‌দিগকে প্রকৃতি গরীব মনুষ্য করিয়া গড়িয়াছেন। কেবল কতকগুলা জমিদারী ও টাকার থলিতে বেচারাদিগকে বড়-মানুষ করিবে কি করিয়া?

৪ দয়ালু মাংসাশী।

" বাঙ্গালীদের মাংস খাওয়ার পক্ষে অনেক গুলি যুক্তি আছে, তাহা আলোচিত হওয়া আবশ্যক। আমার বিশ্বজনীন প্রেম, সকলের প্রতি দয়া, এত প্রবল যে, আমি মাংস খাওয়া কর্ত্তব্য কাজ মনে করি। আমাদের দেশের প্রাচীন দার্শনিক বলিয়া গিয়াছেন, আমদের এই অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব পূর্ণ-আত্মার মধ্যে লীন করিয়া দেওয়াই সাধনার চরম ফল! পূর্ণতর জীবের মধ্যে অপূর্ণতর জীবের নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রার্থণীয় নহে ত কি? একটা পশুর পক্ষে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে যে, সে মানুষ হইয়া গেল; মানুষের জীবনী-শক্তিতে অভাব পড়িলে একটা পশু তাহা পূরণ করিতে পারিল; মানুষের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মিলাইয়া গিয়া মানুষের রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, সুখ, স্বাস্থ্য, উদ্যম, তেজনির্ম্মণ করিতে পারিল, ইহা কি তাহার সাধারণ সৌভাগ্যের বিষয়! প্রথমতঃ সে নিজে স্বপ্নের অগোচর সম্পূর্ণতা লাভ করিল, দ্বিতীয়তঃ মানুষের মত একটা, উন্নত জীবকে সম্পূর্ণতর করিল। ছাগলদের মধ্যে এমন দার্শনিক কি আজ পর্যন্ত কেহ জন্মায় নাই, যে তাহার লম্বা দাড়ি নাড়িয়া সমবেত শিষ্য-শিশুবর্গকে এই নির্ব্বাণ-মুক্তির সম্বন্ধে ভ্যাকরণ-শুদ্ধ উপদেশ দেয়! আহা, যদি কেহ এমন ছাগ-হিতৈষী জন্মিয়া থাকে, তবে তাহার নিকট আমার ঠিকানাটা পাঠাইয়া দিই, এবং সেই সঙ্গে লিখিয়া দিই যে, জ্ঞানালোকিত ইয়ং-

ছাগদের মধ্যে যাঁহার মুক্তিকামনা আছে, তিনি উক্ত ঠিকানায় আগমন করিলে সদয়-হৃদয় উপস্থিত লেখক মহাশয় তাঁহাকে মুক্তি দান পূর্ব্বক বাধিত করিতে প্রস্তুত আছেন। যাহা হউক, পশুদের উপকার করিবার জন্য ব্যয়সাধ্য হইলেও দয়ার্দ্রচিত্ত লোকদের মাংস খাওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে এমন অনেক পণ্ডিত আছেন, যাঁহাদের মত এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজত্ব অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া যদি ইংরাজদের মধ্যে একেবারে লীন হইয়া যাইতে পারে, তবে সুখের বিষয় হয়।

বিখ্যাত ইংরাজ কবি বলিয়াছেন, যে, আমরা বোকা জানোয়ারের মাংস খাই, যেমন ছাগল, ভেড়া, গরু। অধিক উদাহরণের অবশ্যক নাই-মুসলমানেরা আমাদের খাইয়াছেন, ইংরাজের আমাদের খাইতেছেন। যদি প্রমাণ হইল যে, আমরা বোকা জানোয়ারের মাংস খাইয়া থাকি, তবে দেখা যাক্, বোকা জানোয়ারের। কি খায়। তাহারা উদ্ভিজ্জ খায়। অতএব উদ্ভিজ্জ যাহারা খায় তাহারা বোকা। এমন দ্রব্য খাইবার আবশ্যক? নির্ব্বোধদের আমরা, গাধা, গরু, মেড়া, হস্তিমূর্খ কহিয়া থাকি। কখনো বিড়াল, ভল্লুক, সিংহ, বা ব্যাঘ্র মূর্খ বলি না। উদ্ভিজ্জ-ভোজীদের এমন নাম খারাপ হইয়া গিয়াছে, যে, বুদ্ধির যথেষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করিলেও তাহাদের দুর্ণাম ঘুচে না। নহিলে “বাঁদর” বলিয়া সম্ভাষণ করিলে লোকে কেন মনে করে, তাহাকে নির্ব্বোধ বলা হইল? পশুদের মধ্যে বানরের বুদ্ধির প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হয় নাই, তাহার একমাত্র অপরাধ সে বেচারী উদ্ভিদভোজী। অতএব অনর্থক এমন একটা দুর্ণাম-ভাজন হইয়া থাকিবার ভাবশ্যক কি? আর একটা কথা;—উদ্ভিদ-ভোজী ভারতবর্ষকে ইংরাজ-শ্বাপদের দিব্য হজম করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু পাকযন্ত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস থাকাতে মাংসাশী কান্দাহার গ্রাস করিলেন, ভাল হজম হইল না; পেটের মধ্যে বিষম গোলযোগ বাধাইয়া দিল। মাংসাশী জুলুভূমি ও ট্রান্সবাল পেটে মূলেই সহিল না, আহার করিতে চেষ্টা করিতে গিয়া মাঝের হইতে বলহানী হইল, রোগ হইবার উপক্রম হইল। অতএব মাংসাশী প্রাণীর লোভ এড়াইতে যদি ইচ্ছা থাকে, তবে মাংসাশী হওয়া আবশ্যক। নহিলে

আত্মত্ব বিসর্জ্জন করিয়া পরের দেহের রক্ত নির্ম্মাণ করাই আমাদের চরম সিদ্ধি হইবে। মাংস খাইবার এক আপত্তি আছে যে, শাস্ত্রে মাংসকে অপবিত্র বলে। কিন্তু সে কোন কাজের কথাই নহে। শাস্ত্রেই আছে, মেদিনী মাংসেই নির্ম্মিত। আমরা মাংসের উপরেই বাস করি। এ মাংসের পৃথিবীতে মাংসেই জয়।"

রবীন্দ্রনাথের এইরূপ অসংখ্য রম্য রচনা বা হাস্যরসাত্মক রচনা রয়েছে। এছাড়াও, তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্র, প্রবন্ধ এবং অন্যান্য রচনাতেও অসাধারণ রম্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রম্যরচনাগুলি তাঁর সাহিত্যকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা আজও আমাদেরকে আনন্দ দেয়।

১০.৬; নাটক:

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত । তাই তাঁর নাটকগুলি শুধু মঞ্চের জন্য নয়, সাহিত্যিক ও দার্শনিক দিক থেকেও বিশেষ মূল্যবান। তিনি প্রায় ৩৮টি নাটক রচনা করেছেন, যার মধ্যে ডাকঘর, "চিত্রাঙ্গদা", "চণ্ডালিকা", "শ্যামা", বিসর্জন, তাসের দেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদেরমধ্যে কিছু নাটক হল নৃত্যনাট্য; যেমন- চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা।

তাঁর নাটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল- কাব্যিক ভাষা, প্রতীকী চরিত্র এবং গভীর মানবীয় ভাবনা। তাঁর কয়েকটি নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া হল;

ডাকঘর: এই নাটকটি মানুষের স্বাধীনতা এবং জীবনের প্রতি গভীর আকর্ষণ তুলে ধরেছে।

বিসর্জন: এই নাটকটি দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের মহান আদর্শের কথা বলেছে।

মুক্তধারা: এটি মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার কথা তুলে ধরেছে।

রক্তকরবী: নাটকটি মানুষের জীবন এবং সমাজের জটিলতা নিয়ে আলোকপাত করেছে।

চিত্রাঙ্গদা: নাটকটি নারী, প্রেম এবং সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছে।

নটীর পূজা: এটি শিল্পের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেছে।

তাসের দেশ: এখানে মানুষের কল্পনার জগৎ এবং বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে।

পরিশেষে বলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা বহুমুখী। তিনি ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তিনি বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত। তাঁর প্রতিভা নিয়ে হাজার হাজার মানুষ গবেষণা করেছেন এবং হাজার বই লিখেছেন। তাদের মধ্যে কিছু বই পড়ে, আমি প্রবন্ধটা লিখে তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করলাম।

১১; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা

১৯০২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী মারা যান। এরপর ১৯০৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কন্যা রেণুকা, ১৯০৫ সালের ১৯ জানুয়ারি পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ১৯০৭ সালের ২৩ নভেম্বর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।এসবের মধ্যেই ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে ছিলেন আধুনিক কৃষি ও গোপালন নিয়ে পড়াশুনা করার জন্য। ১৯০৭ সালে তিনি তাঁর কনিষ্ঠা জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও কৃষিবিজ্ঞান শেখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছিলেন। এই সময় তিনি অর্থসংকটে পড়েন। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ব্যায়ভার এই অর্থসংকটের অন্যতম কারণ ছিল। সেইসঙ্গে পুত্র ও জামাতার বিদেশে পড়াশোনার ব্যয়ভারও রবীন্দ্রনাথকে বহন করতে হয়েছিল। ঐ ভয়ঙ্কর অর্থসঙ্কটের জন্য তিনি স্ত্রীর গয়না ও পুরীর বসতবাড়িটি

বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই সময় অবশ্য বাংলা, সারা দেশ ও বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯০১ সালে নৈবেদ্য ও ১৯০৬ সালে খেয়া কাব্যগ্রন্থ এবং ১৯১০ সালে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি (ইংরেজি অনুবাদ, ১৯১২) কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য সুইডিশ অ্যাকাডেমি রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'স্যার' উপাধি (নাইটহুড) দেয়।

১২; শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। শান্তিনিকেতনে গুরুকুল পদ্ধতির অভিযোজনে ছাত্র ও শিক্ষকদের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যেখানে শিক্ষাদান ও আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হয়। যদিও শান্তিনিকেতন একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র, যেখানে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিদ্যমান, তবুও শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার কাহিনী সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মের অনেকেরই হয়তো জানা নাই। তাই এটি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহ ছেড়ে চলে আসেন বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের উপকণ্ঠে শান্তিনিকেতনে। জানা যায় এর আগে ১৮৭৮ সালে, মাত্র ১৭ বছর বয়সে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার সাথে প্রথম শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। আমরা হয়ত সকলেই জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুরু করেছিলেন একটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের মধ্যমে। এখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৮ সালে একটি আশ্রম ও ১৮৯১ সালে একটি ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার পিছনে একটা বিশেষ কাহিনী লুকিয়ে আছে।

উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ তথ্য অনুসারে উনিশ শতকের মাঝের দিকে বোলপুর একটি ছোট জন বসতি গ্রাম ছিল যা শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠার পরে এটি প্রসারলাভ করে। বোলপুরের কিছু অংশ রায়পুরের সিংহ পরিবারের জমিদারির অংশ ছিল। ভুবনমোহন সিংহ বোলপুরে একটি গ্রাম তৈরি করেছিলেন এবং তার নাম রাখলেন ভুবনডাঙ্গা। ভুবনডাঙ্গা কুখ্যাত ডাকাতদের ডেরা ছিল, যারা লোকদের মারার জন্য দ্বিতীয়বার চিন্তা করত না। এর ফলে লড়াই ও বিতর্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ডাকাতদের নেতা অবশেষে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং এলাকার বিকাশের জন্য তারা তাঁকে সাহায্য করেছিল।সেখানে একটি ছাতিম গাছ ছিল যার তলায় দেবেন্দ্রনাথ তপস্যা করতেন। দেবেন্দ্রনাথ লন্ডনের হাইড পার্কের দ্য ক্রিস্টাল প্যালেসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সেখানে ব্রাহ্ম উপাসনার জন্য এক ৬০ বাই ৩০ ফুট উপাসনা গৃহ তৈরি করেছিলেন। ছাদটি টালি করা এবং মেঝেটি সাদা মার্বেল পাথরের ছিল, কিন্তু বাকি ভবনটি কাচের ছিল। আদিকাল থেকেই এটি আশেপাশের লোকদের কাছে এক দর্শনীয় স্থান ছিল। উল্লেখ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন রায়পুরের জমিদারবাড়িতে এসেছিলেন তখন এই ছাতিম তলায় কিছুক্ষণএর জন্য বিশ্রাম করেন এবং এখানে তিনি তাঁর ***"প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ ও আত্মার শান্তি"*** পেয়েছিলেন। তখন রায়পুরের জমিদারের কাছ থেকে ষোলো আনার বিনিময়ে ২০ বিঘা জমি পাট্টা নেন। কিন্তু সেকালের সেই ছাতিম গাছ দুটি মরে গেছে। তারপর ঐ জায়গায় দুটি ছাতিম গাছ রোপণ করা হয়। সেই ছাতিম তলা বর্তমানে ঘেরা আছে সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। দক্ষিণ দিকের গেটে "তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ ও আত্মার শান্তি" এই কথাটি লেখা আছে।

এবার আসি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের কথায়। আশ্রমের আম্রকুঞ্জ উদ্যানে একটি গ্রন্থাগার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চালু করলেন "ব্রহ্মবিদ্যালয়" বা "ব্রহ্মচর্যাশ্র" নামে একটি পরীক্ষামূলক স্কুল।

১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনের অদূরে সুরুল গ্রামে মার্কিন কৃষি-অর্থনীতিবিদ লেনার্ড নাইট এলমহার্স্ট, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শান্তিনিকেতনের আরও কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ "পল্লীসংগঠন কেন্দ্র" নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল কৃষির উন্নতিসাধন, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগ নিবারণ, সমবায় প্রথায় ধর্মগোলা স্থাপন, চিকিৎসার সুব্যবস্থা এবং সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি করা। ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথ এই সংস্থার নাম পরিবর্তন করে রাখেন "শ্রীনিকেতন"।

শ্রীনিকেতন ছিল মহাত্মা গান্ধীর প্রতীক ও প্রতিবাদসর্বস্ব স্বরাজ আন্দোলনের একটি বিকল্প ব্যবস্থা। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর আন্দোলনের পন্থা-বিরোধী ছিলেন। পরবর্তীকালে দেশ ও বিদেশের একাধিক বিশেষজ্ঞ, দাতা ও অন্যান্য পদাধিকারীরা শ্রীনিকেতনের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য পাঠিয়েছিলেন।১৯৩০সালের প্রথমভাগে একাধিক বক্তৃতা, গান ও কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথা ও অস্পৃশ্যতার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। (উৎস; উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ) ।

রবীন্দ্র দর্শন ও বাণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শন চিন্তা ছিল আধ্যাত্মিকতা, মানবতা, এবং প্রকৃতি-কেন্দ্রিক। তিনি তাঁর কাব্য, কবিতা, গান, গল্প ও উপন্যাসে মানুষ, ব্রহ্ম এবং প্রকৃতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছেন। তাঁর দর্শনে সর্বজনীন মানবতাবাদের ধারণা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর বিশাল সাহিত্য সম্ভারে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে মিল-বন্ধন রচনা, করেছেন এবং ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সমন্বিত রূপ ও বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন বিশেষ করে তার কাব্য, কবিতা ও সংগীত রচনায়। তাঁর দর্শন ও চিন্তা-ধারা আজ আমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শন চিন্তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থেকে পাওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলি নীচে তুলে ধরা করা হলো:

মানবতাবাদ: রবীন্দ্রনাথের দর্শনে মানবতাবাদ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যেটা সাহিত্য সৃষ্টিতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

তাঁর অধিকাংশ কবিতার মূল বিষয়বস্তু মানুষের সুখ দুঃখ, আনন্দ, মানবতার প্রেম। মানুষের ছোট ছোট দুঃখ কষ্ট, আনন্দ বেদনার অনুভূতিগুলিকে কাব্যিকরূপে তাঁর কবিতা, কাব্য ও গানে অনবদ্য ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কোন বিকল্প দেখা যায় না। তাঁর সোনার তরী কবিতায় তিনি লিখেছেন," ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা, নিতান্তই সহজ সরল, সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি।" ঐ কবিতার এই পংক্তিগুলিতে তিনি আমাদের জীবনের ছোট ছোট দুঃখ-কষ্ট, ব্যাথা, বেদনা স্মৃতির স্রোতে ভেসে যাওয়ার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।

"ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা" দিয়ে জীবনের নিত্য দুঃখ-কষ্টকে বোঝানো হয়েছে, যা সকলের জীবনেই কমবেশি বিদ্যমান। "সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি" এই কথা দিয়ে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, প্রতিদিন মানুষ অনেক দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেগুলি ভুলে যেতে থাকে। এখানে জীবনে সুখ-দুঃখের ক্ষণস্থায়ীত্ব এবং স্মৃতি-বিস্মৃতির বিরামহীন স্রোতের সত্য প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর অধিকাংশ কাব্য, কবিতা ও গানের প্রতিপাদ্য বিষয় হল মানুষের হৃদয়ের দুঃখ, আনন্দ, মানবতার প্রেম। তাঁর লেখায় পেয়েছি " উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুপ্রভাত' কবিতা। এই কবিতার শুরুতে তিনি লিখেছেন;

" রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি

এসেছে দুয়ার ভেদিয়া;

বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ

স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।

ভাবিতেছিলাম উঠি কি না উঠি,

অন্ধ তামস গেছে কিনা ছুটি,

রুদ্ধ নয়ন মেলি কি না মেলি

তন্দ্রা-জড়িমা মাজিয়া।

এমন সময়ে, ঈশান, তোমার

বিষাণ উঠেছে বাজিয়া।

বাজে রে গরজি বাজে রে

দগ্ধ মেঘের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে

দীপ্ত গগন-মাঝে রে।

চমকি জাগিয়া পূর্বভুবন

রক্তবদন লাজে রে।"

কবিতার এই কথাগুলিতে আধ্যাত্মিকতা ও মানবতা মিলে মিশে একাকার হয়েগেছে। আবার এই কবিতার পরের স্তবক উনি লিখেছেন;

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,

"ভয় নাই, ওরে ভয় নাই--

নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান

ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

হে রুদ্র, তব সংগীত আমি

কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী--

মরণনৃত্যে ছন্দ মিলায়ে

হৃদয়ডমরু বাজাব,

ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে

তোমার অর্ঘ্য সাজাব।

এসেছে প্রভাত এসেছে।

তিমিরান্তক শিবশঙ্কর

কী অট্টহাস হেসেছে!

যে জাগিল তার চিত্ত আজিকে

ভীম আনন্দে ভেসেছে।

'সুপ্রভাত' কবিতার উপরের স্তবকটিতে আধ্যাত্মিকতার সাথে সাথে মানবতাবাদের একটি মহান প্রকাশ ঘটেছে। এইভাবে তাঁর অসংখ্য কবিতা ও গান মানবতাবাদ প্রচারের ভূমিকা পালন করেছে এবং তাঁর গুণগ্রাহী পাঠক ও শ্রোতাদেরকে মানবতাবাদের পরম আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'বলাকা' কবিতা কিছু পংক্তির কথা মনে পড়ে যায়;

মানবতাবাদ, ঈশ্বরবাদ ও সৃজনশীলতা

তাঁর অনেক কাব্য ও উপন্যাসে তিনি মানুষের মধ্যে **সম্ভাবনা, গতিশীলতা,** পরিবর্তন **এবং সৃজনশীলতার উপর বিশেষ** গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান। তাই, মানুষের প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধাই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। এটা হল মানবতাবাদের সবচেয়ে বড় দিক যা তাঁর 'বলাকা' কবিতায় সুস্পষ্ট হয়েছে। তাঁর "বলাকা" কবিতার মূল বিষয় হল গতি এবং পরিবর্তন। এই কাব্যে কবি জীবনের গতিশীলতা, সৃষ্টির রহস্য, এবং বিশ্বজগতের চিরন্তন প্রবাহকে তুলে ধরেছেন। একই সাথে, উপনিষদের 'চরৈবেতি' তত্ত্ব বা আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। এই কবিতার কয়েকটি পংক্তি তুলে ধরছি;

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে

সন্ধ্যার গগনে

শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে

মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।

হে হংস-বলাকা,

ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা

রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে

বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

ওই পক্ষধ্বনি,

শব্দময়ী অপ্সর-রমণী

গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।

উঠিল শিহরি

গিরিশ্রেণী তিমির-মগন

শিহরিল দেওদার-বন।

শুধু পলকের তরে

পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে

বেগের আবেগ।

পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;

তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি

মাটির বন্ধন ফেলি

ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,

আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি

সুদূরের লাগি,

হে পাখা বিবাগী।

বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে--

"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে।"

"বলাকা" মূলত গতি ও প্রক্রতির কাব্য। এখানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গতির প্রকাশ, পরিবর্তন এবং বিকাশের ধারাকে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে মানুষকে উপনিষদের 'চরৈবেতি' মন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, মানুষকে সর্বদা কর্মশীল ও গতিশীল থাকতে উৎসাহিত করেছেন কবি । এই কাব্যের মাধ্যমে কবি পুরাতনকে অতিক্রম করে নতুনের আবাহন করেছেন এবং একটি বলিষ্ঠ, প্রজ্ঞানময় জীবনের প্রত্যাশা করেছেন। এই কাব্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন তিনি।

আধ্যাত্মবাদ দর্শন: আগের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে রবীন্দ্রনাথের দর্শনে আধ্যাত্মিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি ঈশ্বরকে আনুষ্ঠানিক ধর্ম বা শাস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, মানুষের হৃদয়ে এবং প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নির্দেশ বলতেন তাঁর কাব্য, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধের মাধ্যমে। তাঁর মতে, মানুষ তার কর্ম ও প্রেমের মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণামূলক কিছু উক্তি

আগের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন জ্ঞানী মানুষ। তিনি একাধারে বিশ্বকবি, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের আধুনিক রূপকার । বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শন ও চিন্তাভাবনা সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে তাঁর অনুপ্রেরণামূলক কিছু উক্তি বা বাণী; এখানে তাঁর কিছু বাণী তুলে ধরা হল;

2. "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।"
3. " বিশ্বাস হলো সেই পাখি যে আলো অনুভব করে এবং ভোরের অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও গান গায়।"
4. "যা হারিয়ে যায়, তা-ও একদিন ফিরে আসে, হয়তো অন্য রূপে।"
5. "আমাদের অস্তিত্বের সেই দিক যার অভিমুখ অসীমের দিকে যা সম্পদ নয়, বরং স্বাধীনতা এবং আনন্দ খোঁজে।"
6. "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"
7. "আমি দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করে অনেক টাকা খরচ করেছি এবং উঁচু পাহাড় এবং সীমাহীন সমুদ্র দেখেছি, তবুও আমার বাড়ি থেকে কয়েক কদম দূরে ঘাসের এক ফোঁটার শিশিরবিন্দু দেখার সময় পাইনি।"
8. "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলে পাইতে পারো মানিকও মিলিতে পারে।"
9. "মৃত্যু আলো নিভিয়ে দেওয়া নয়; এটি কেবল প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া কারণ ভোর এসেছে।"
10. "যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে, সে পথপ্রান্তের এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখির বিরাজে।"
11. "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির।"
12. "ধূসর চুল জ্ঞানের লক্ষণ, যদি তুমি তোমার জিহ্বা ধরে রাখো, কথা বলো, আর সেগুলো কেবল চুলই, যেমনটা তরুণদের ক্ষেত্রে হয়।"
13. "ভালোবাসা একটি অন্তহীন রহস্য কারণ এটি ব্যাখ্যা করতে পারে এমন কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।"
14. "আমি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম যে জীবন একটি আনন্দ। আমি জেগে উঠে দেখলাম যে জীবন হল সেবা। আমি অভিনয় করে দেখলাম, সেবা হল আনন্দ।"

15. "নির্বাণ মানে মোমবাতি নিভিয়ে দেওয়া নয়। এটি হল আগুনের শিখা নিভিয়ে দেওয়া কারণ দিন এসেছে।"
16. "আমরা পৃথিবীকে ভুল বুঝি এবং বলি যে এটি আমাদের প্রতারিত করে।"
17. "সর্বোচ্চ শিক্ষা হলো সেটা যা আমাদের কেবল তথ্যই দেয় না বরং আমাদের জীবনকে সমস্ত অস্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে।"
18. "মানুষ যা চায় ভুল করে চায়, যা পায় তা চায় না।"
19. "ছোট জ্ঞান হলো কাঁচের পানির মতো: স্বচ্ছ, স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ। মহান জ্ঞান হলো সমুদ্রের পানির মতো: অন্ধকার, রহস্যময়, দুর্ভেদ্য।"
20. "যদি তুমি কাঁদো কারণ তোমার জীবন থেকে সূর্য চলে গেছে, তাহলে তোমার অশ্রু তোমাকে তারা দেখতে বাধা দেবে।"
21. "যদি আমি এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে না পারি, তাহলে অন্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করবো অথবা একটা দরজা বানিয়ে ফেলবো। বর্তমান যতই অন্ধকার হোক না কেন, ভয়াবহ কিছু আসবেই।"
22. "আমাদের স্বভাব অভাব বা ভয়ের বাধ্যবাধকতার দ্বারা সম্পাদিত কাজের দ্বারা আবৃত। মা তার সন্তানদের সেবায় নিজেকে প্রকাশ করেন, তাই আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা কর্ম থেকে মুক্তি নয় বরং কর্মের স্বাধীনতা, যা কেবল প্রেমের কাজেই অর্জন করা যেতে পারে।"
23. "গোঁড়ামি সত্যকে নিজের হাতে নিরাপদে রাখার চেষ্টা করে, এমন এক আঁকড়ে ধরে যা তাকে হত্যা করে।" "যে গাছ লাগায়, এই জেনেও যে সে কখনো গাছগুলোর ছায়ায় বসবে না, সে অন্তত জীবনের অর্থ বুঝতে শুরু করেছে।"

24. "সর্বোচ্চ শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যা আমাদের শুধু তথ্যই দেয় না বরং আমাদের জীবনকে সমস্ত অস্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে।"
25. "যখন আমরা নিজেদের জন্য কোন শাসন গ্রহণ করি, তখন আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ছাড়া সবকিছু এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি; এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিততা, যা প্রাপ্তবয়স্ক মনের অন্তর্গত, আমরা স্কুলের বাচ্চাদের উপর চাপিয়ে দিই। আমরা বলি, "কখনও তোমার মনকে সজাগ রাখো না।"
26. "শুধু দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকলে সমুদ্র পার হওয়া যায় না।"
27. "ভালোবাসা কেবল একটি আবেগ নয়, এতে সত্য থাকতে হবে, যা আইন।"

প্রয়াণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারাজীবন সুস্বাস্থ্য ভোগ করলেও জীবনের শেষ চার বছর দীর্ঘস্থায়ী পীড়ায় ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলেন। জীবনের চার বছরে দুবার দীর্ঘসময় অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকতে হয় তাঁকে । উইকিপিডিয়া তথ্য অনুসারে ১৯৩৭ সালে একবার তিনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন। সেই সময় কোমায় চলে গিয়ে তিনি নাকি মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন অত্যন্ত কাছ থেকে। আর তখন থেকেই তার এই দীর্ঘকালীন অসুস্থতার সূত্রপাত হয়। ১৯৪০ সালের শেষ দিকে আবার একই ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এবার আর সেরে ওঠেননি তিনি। এই সময়কালের মধ্যেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কিছু কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর সেই অনবদ্য কবিতাগুলির মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে মৃত্যুকে নিয়ে তাঁর অবিস্মরণীয় কিছু কথা ও উপলব্ধি। অবশেষে দীর্ঘ রোগভোগের পর, চিকিৎসার জটিলতার কারণে, ১৯৪১ সালের ৭ অগস্ট (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) বেলা ১২ টার কিছু পর কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাসভবনে প্রয়াত হন রবীন্দ্রনাথ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর ৩ মাস।

প্রসঙ্গত, জীবন প্রভাতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুকে অমৃতের স্বরূপ বলেই আহ্বান করেছিলেন ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে 'মরণ' কবিতায়। আবার তাঁর বিখ্যাত পূজা গানে তিনি গেয়েছেন; 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে/তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে'। গানটির কথায় আমরা সহজে অনুমান করতে পারি দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে অমৃতের স্বরূপ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন অনেক আগে থেকেই কারণ বালক বয়স থেকেই তিনি অনেক মৃত্যু; যেমন মায়ের মৃত্যু, বউঠানের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে সন্তান ও স্ত্রীর অকাল মৃত্যু। মৃত্যু সম্পর্কে গভীর দার্শনিক চিন্তা বেরিয়ে এসেছে তাঁর কবিতা –শেষ সপ্তক- উনচল্লিশ থেকে;

"ওরা এসে আমাকে বলে,
কবি, মৃত্যুর কথা শুনতে চাই তোমার মুখে।
আমি বলি,
মৃত্যু যে আমার অন্তরঙ্গ,
জড়িয়ে আছে আমার দেহের সকল তন্তু।
তার ছন্দ আমার হৃৎস্পন্দনে,
আমার রক্তে তার আনন্দের প্রবাহ।

বলছে সে,--চলো চলো,
চলো বোঝা ফেলতে ফেলতে,
চলো মরতে মরতে নিমেষে নিমেষে
আমারি টানে, আমারি বেগে।
বলছে, চুপ করে বস যদি
যা-কিছু আছে সমস্তকে আঁকড়িয়ে ধরে

তবে দেখবে, তোমার জগতে
ফুল গেল বাসি হয়ে,
পাঁক দেখা দিল শুকনো নদীতে,
ম্লান হল তোমার তারার আলো।
বলছে, "থেমো না, থেমো না,
পিছনে ফিরে তাকিয়ো না,

পেরিয়ে যাও পুরোনোকে জীর্ণকে ক্লান্তকে অচলকে।
"আমি মৃত্যু-রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণ-ক্ষেত্রে।
"যখন বইল জীবনের ধারা
আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে,
দিইনি তাকে কোনো গর্তে আটক থাকতে।

তীরের বাঁধন কাটিয়ে কাটিয়ে
ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে,
সে সমুদ্র আমিই। "

"বর্তমান চায় বর্তিয়ে থাকতে।

সে চাপাতে চায়

তার সব বোঝা তোমার মাথায়,

বর্তমান গিলে ফেলতে চায়

তোমার সব-কিছু আপন জঠরে।

তার পরে অবিচল থাকতে চায়

আকণ্ঠপূর্ণ দানবের মতো

জাগরণহীন নিদ্রায়।

তাকেই বলে প্রলয়।

এই অনন্ত অচঞ্চল বর্তমানের হাত থেকে

আমি সৃষ্টিকে পরিত্রাণ করতে এসেছি,

অন্তহীন নব নব অনাগতে।"

(উৎস https://tagoreweb.in/Verses/shesh-saptak-97)

15. ডঃ এ পি জে আব্দুল কালাম

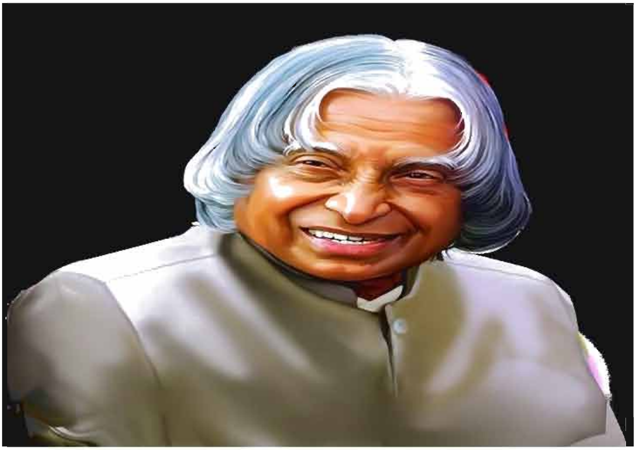

ভারতের মিসাইল ম্যান - আবদুল কালাম

পৃথিবীতে খুব কম মানুষ আছেন যাঁরা ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামের নাম শুনেন নি। এ পি জে আব্দুল কালাম যাঁর প্রকৃত নাম- আভুল পাকির জয়নুলাবেদিন আবদুল কালাম হলেন একজন ভারতীয় পরমাণু বিজ্ঞানী এবং ভারতের একাদশ রাষ্ট্রপতি। এপিজে আব্দুল কালাম, যিনি "ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র মানব" ("Missile Man of India") নামে সারা বিশ্বে বেশি পরিচিত। তিনি ভারতের মহাকাশ এবং ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে অনবদ্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি অগ্নি এবং পৃথ্বী ক্ষেপণাস্ত্র সহ ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আবার ভারতের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিমেয়। তিনি ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ভারতের ১১তম রাষ্ট্রপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

আবুল পাকির জয়নুলাবদিন আব্দুল কালাম ১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবর পাম্বান দ্বীপে ভারতের অন্যতম বিখ্যাত তীর্থস্থান

রামেশ্বরমে একটি তামিল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যা তখন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ছিল এবং বর্তমানে তামিলনাড়ু রাজ্যে অবস্থিত। তার বাবা জয়নুলাবদিন ছিলেন একজন নৌকার মালিক এবং স্থানীয় মসজিদের ইমাম; তার মা আশিয়াম্মা ছিলেন একজন গৃহিণী। তার বাবার একটি ফেরি ছিল যা হিন্দু তীর্থযাত্রীদের নিয়ে রামেশ্বরম এবং ধনুষ্কোডির মধ্যে যাতায়াত করত । আব্দুল কালাম তাঁর পরিবারের চার ভাই এবং এক বোনের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন। তার পূর্বপুরুষরা ধনী ব্যবসায়ী এবং জমিদার ছিলেন, তাদের অসংখ্য সম্পত্তি এবং বিশাল জমি ছিল। ভারতের এবং শ্রীলঙ্কা মধ্যে তাদের ব্যবসা চলত। তাদের আর একটি ব্যবসা ছিল- পাম্বানে তীর্থযাত্রীদের পরিবহণ ব্যবসা।

এই পরিবহন ব্যবসার জন্য কালাম পরিবার "মারা কালাম ইয়াক্কিভার" অর্থাৎ কাঠের নৌকা চালক এই উপাধি অর্জন করে, যা বছরের পর বছর ধরে "মারাকিয়ার" উপাধিতে রূপান্তরিত হয়। তবে, ১৯১৪ সালে মূল ভূখণ্ডে পাম্বান সেতু খোলার সাথে সাথে তাদের ব্যবসাগুলি ব্যর্থ হয় এবং সময়ের সাথে সাথে পৈতৃক বাড়ি, পারিবারিক সম্পদ এবং সম্পত্তি হারিয়ে যায়। কালামের শৈশবকালে পরিবারটি ভীষণ দরিদ্র হয়ে গিয়েছিল; অল্প বয়সেই, তাঁর পরিবারের আয়ের সহায়তার জন্য তিনি সংবাদপত্র বিক্রি করতেন।

বিদ্যা শিক্ষা

স্কুলজীবনে আব্দুল কালাম একজন মেধাবী এবং ভীষণ পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন। জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি তার পড়াশোনার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যয় করতেন, বিশেষ করে গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে। আগেই বলেছি তিনি যখন স্কুলে পড়াশুনা করতেন, তখন তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে ভীষণভাবে লড়াই করতে হয়। সেই সময় আবদুল কালামকে সংবাদপত্র বিক্রি করে পরিবারের জন্য আয় করতে হত। এছাড়া তেঁতুলের বীজ বিক্রি করেও পরিবারের জন্য আয় করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, বাজারে হঠাৎ করে তেঁতুলের বীজের চাহিদা দেখা

দেয়। ছোট ছেলে আবদুল কালাম, তখন, তেঁতুল বীজ সংগ্রহ করে তাঁর বাড়ির কাছের একটি খাবারের দোকানে বিক্রি করেছিলেন। এটিই ছিল তাঁর প্রথম আয়। তাঁর স্কুল জীবনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে; যে ঘটনা শেষ পর্যন্ত কালামের মধ্যে বিমান উড়ানের প্রকৌশল বা প্রযুক্তি বিষয়ে আজীবন আকর্ষণের সৃষ্টি করে জন্ম দেয় এবং তাকে বিমান প্রকৌশলে ক্যারিয়ার গড়তে অনুপ্রানিত করে। সেই ঘটনাটি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা না করলেই নয়।

আব্দুল কালাম পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর বিজ্ঞান শিক্ষক শিবসুব্রহ্মণ্য আইয়ার তাঁর মনোমুগ্ধকর আলোচনায় উড়ানের কৌশল সম্পর্কে ছাত্রদেরকে শিখাচ্ছিলেন, বিশেষ করে পাখিরা কীভাবে উড়ে যায় তার উপর মনোযোগ সহকারে আলোচনা করছিলেন তিনি। এরপর ঐ বিজ্ঞান শিক্ষক আইয়ার প্রথমে একটি পাখির চিত্র আঁকেন এবং উত্তোলন, ভরবেগ এবং লেজ-চালিত দিক পরিবর্তনের নীতি বা বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করেন। এরপর তিনি তার ক্লাসটি রামেশ্বরম সমুদ্র সৈকতে নিয়ে যান সামুদ্রিক পাখিদের উড়ন্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করাতে এবং পাঠের ব্যবহারিক প্রয়োগ (practical application of the lesson) প্রদর্শন করাতে। কালাম পরবর্তী সময় বর্ণনা করেছিলেন যে পাখিদের উড়ানের দৃশ্যমান প্রদর্শন, আইয়ারের ব্যাখ্যার সাথে যুক্ত হয়ে, পাখিরমত জিনিসগুলি কীভাবে উড়ে যায় তা বোঝার জন্য তাঁর বোধগম্যতা, আকর্ষণ এবং আবেগকে আরও দৃঢ় করে তুলেছিল।

পাখিরা কীভাবে উড়ে তার উপর বিজ্ঞান শিক্ষক শিবসুব্রহ্মণ্য আইয়ারের আলোচনা থেকে প্রাপ্ত কালামের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁর বিমানবিদ্যা অধ্যয়নের আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়েছিল এবং অবশেষে তাঁকে মহাকাশ প্রকৌশল এবং মহাকাশ প্রযুক্তিতে একটি বিশিষ্ট ক্যারিয়ারে নিয়ে যায়। এরপর তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির সফলতম দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কালাম সর্বদা আইয়ারকে তার ক্যারিয়ার তৈরির বিষয়ে অনুপ্রাণিত করার জন্য কৃতিত্ব দিতেন, ব্যবহারিক উদাহরণের

মাধ্যমে শেখাকে জীবন্ত করে তোলার জন্য একজন শিক্ষকের দক্ষতার গুরুত্বের উপর তিনি সব সময় জোর দিতেন। তিনি প্রায়শই শিক্ষকদের "প্রশিক্ষক" হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন যাতে তাঁরা তাদের শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে এবং পথ দেখাতে পারেন।

সেন্ট জোসেফ কলেজে পদার্থবিজ্ঞান স্নাতক ডিগ্রি;

রামানাথপুরমের শোয়ার্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করার পর, আব্দুল কালাম তিরুচিরাপল্লীর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সেন্ট জোসেফ কলেজ থেকে ১৯৫৪ সালে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক হন। ১৯৫৫ সালে তিনি মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য মাদ্রাজ চলে যান। কালাম যখন একটি সিনিয়র ক্লাস প্রকল্পে কাজ করছিলেন, তখন ডিন তার অগ্রগতির অভাব নিয়ে অসন্তুষ্ট হন এবং পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে প্রকল্পটি শেষ না হলে তার বৃত্তি প্রত্যাহার করার হুমকি দেন। কালাম সময়সীমা পূরণ করেন, ডিনকে মুগ্ধ করেন, যিনি পরে তাকে বলেন, "আমি তোমাকে চাপে ফেলছিলাম এবং তোমাকে একটি কঠিন সময়সীমা পূরণ করতে বলছিলাম" ("I was putting you under stress and asking you to meet a difficult deadline")। তিনি একজন ফাইটার পাইলট হওয়ার স্বপ্ন অর্জনে অল্পের জন্য ব্যর্থ হন, কারণ তিনি যোগ্যতা অর্জনে নবম স্থান অধিকার করেছিলেন এবং সেই সময় আইএএফ-(IAF) এ মাত্র আটটি পদ খালি ছিল।

<u>বিজ্ঞানী এ পি জে আব্দুল কালাম</u>

ডঃ এ.পি.জে. আব্দুল কালাম একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী যিনি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন কর্মসূচিতে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। ভারতের মহাকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে তিনি "ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র মানব" (Missile Man of India) উপাধি অর্জন করেন। তিনি ইন্টিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (Integrated Guided

Missile Development Program) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যার ফলে অগ্নি এবং পৃথ্বীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি হয়। আমরা প্রায় সকলেই জানি, একজন প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন ছিল অতুলনীয় , যার সমাপ্তি ঘটে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান ভারতরত্ন লাভের মাধ্যমে।

আব্দুল কালামের স্বপ্ন, অধ্যাবসায় ও আবিষ্কার

ছোটবেলা থেকেই আব্দুল কালাম পাখীর মত উড়ার স্বপ্ন দেখতেন এবং লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো তিনিও আকাশে পাখির উড়ান নিয়ে পড়াশোনা করতেন। পরে তিনি ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট ফর টেকনোলজিতে ভর্তি হলেন। সেখানেও, উড়ান যন্ত্রের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আকর্ষণ জন্মাল। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি এমআইটিতে প্রদর্শিত বিমান এবং বিমানের সিস্টেমের প্রতি তাঁর আকর্ষণের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি সেখানে লিখেছেন, "আমি তাদের (উড়ান যন্ত্রের) প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করতাম, এবং অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা তাদের হোস্টেলে ফিরে যাওয়ার অনেকপরেও আমি *ঐ* সকল যন্ত্রের কাছে বসে থাকতাম এবং পাখির মতো আকাশে মুক্তভাবে উড়ার মানুষের ইচ্ছার প্রশংসা করতাম।"

আমরা জেনেছি, শিক্ষা শেষে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে পাইলট হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে আব্দুল কালাম চাকরির জন্য আবেদন করেছিলেন কিন্তু বিমান বাহিনী নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েন কারণ বিমানচালক হওয়ার সুযোগ তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। যদিও বিমান বাহিনীতে তাঁর পাইলট হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে যায়, এপিজে আব্দুল কালাম প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি পদ গ্রহণ করেন, যেখানে তিনি কারিগরি উন্নয়ন ও উৎপাদন অধিদপ্তরের (ডিটিডিএন্ডপি) সিনিয়র বৈজ্ঞানিক সহকারী হন। সেখানে কালাম বিমান ওড়ানোর দায়িত্ব পাননি, তবে তিনি বিমানের নকশা তৈরিতে যুক্ত হলেন । একটি প্রকল্পে, কালাম একটি দলের নেতৃত্ব দেন যারা যুদ্ধক্ষেত্রের হোভারক্রাফ্ট তৈরি করেছিল এবং কালাম প্রকৃতপক্ষে এই

ডিভাইসে উড়েছিলেন, যদিও মাটি থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। অধ্যাপক বিক্রম সারাভাইয়ের একটি সাক্ষাৎকারের পর, তাঁর অদম্য অধ্যাবসায় ও দক্ষতার ফলে তিনি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কমিটিতে 'রকেট ইঞ্জিনিয়ার' পদে নিযুক্ত হলেন।

আমরা অনেকেই হয়তো জানি আবদুল কালাম তাঁর দক্ষতা, ক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতার জন্য বিক্রম সারাভাইয়ের ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সারাভাইয়ের উষ্ণতা, দূরদর্শী ক্ষমতা এবং নেতৃত্বের দক্ষতা উদ্ভাবক এবং পরীক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি কালামের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রশংসা ছিল। ৫২ বছর বয়সে বিক্রম সারাভাই হঠাৎ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনে মারা গেলে কালাম গভীরভাবে দুঃখিত হন।

পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানি করা প্রযুক্তির উপর নির্ভর না করে দেশীয় প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য আবদুল কালামের সর্বদা প্রবল আগ্রহ ছিল। এই ক্ষেত্রে ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর অদম্য প্রয়াস এবং অগ্রণী অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ করার যোগ্য। ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে একজন অভিজ্ঞ প্রকৌশলী হিসেবে, কালামকে নাসা কর্তৃক রকেট উৎক্ষেপণ কৌশলের উপর ছয় মাসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচিতেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন; যার মধ্যে পোখরান-২ পরীক্ষাও অন্তর্ভুক্ত। তদুপরি, প্রথম স্বদেশী উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যান, এসএলভি-৩-তে তাঁর গবেষণা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে রোহিণী উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণ সম্ভব হয়েছিল । ডঃ এ.পি.জে. আব্দুল কালামের অসামান্য প্রচেষ্টায় ভারত ১৮ জুলাই, ১৯৮০ সালে দেশীয়ভাবে তৈরি SLV-3 রকেট ব্যবহার করে নিজস্ব উপগ্রহ, রোহিণী উপগ্রহ (RS-1) সফলভাবে কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করে। এর ফলে ভারত উপগ্রহ উৎক্ষেপণ ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলির সাথে পা মিলায়। এই উপগ্রহটি যোগাযোগ, আবহাওয়া, টিভি এবং রিসোর্স ম্যাপিংয়ের মতো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। ১৭ টন ওজনের SLV-3

রকেটটির চারটি ধাপ ছিল এবং উৎক্ষেপণের সময় সবগুলোই চমৎকারভাবে কাজ করেছিল। এই সাফল্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO) কর্তৃক নিজস্ব উৎক্ষেপণ যানকে নিখুঁত করার এক দশক দীর্ঘ প্রচেষ্টার চূড়ান্ত পরিণতি। পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিশ্বের ষষ্ঠ দেশ হয়ে ওঠে আমাদের দেশ। সেটা সম্ভব হয়েছিল আব্দুল কালামের অসামান্য অবদানে।

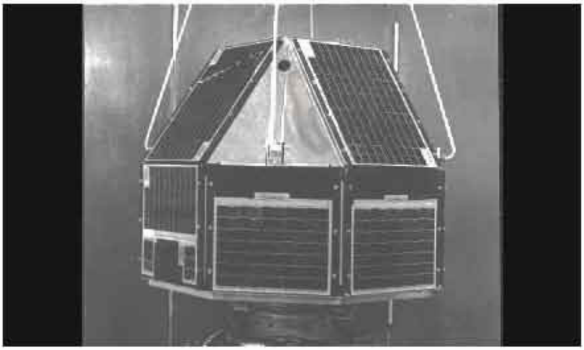

Rohini on indigenous rocket

শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এবং পরবর্তী প্রজন্ম গঠনের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের স্বীকৃতি ও সম্মানে, তাঁর জন্মবার্ষিকী বিশ্ব ছাত্র দিবস হিসেবে পালিত হয়।

জাতির প্রতি বিজ্ঞানী আব্দুল কালামের অতুলনীয় অবদান

১) ভারতের প্রথম দেশীয় হোভারক্রাফট.

ভারতের প্রথম দেশীয় হোভারক্রাফট, যার নাম "নন্দী", ডঃ এপিজে কালাম দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। আব্দুল কালাম এবং তার দল। বেঙ্গালুরুর অ্যারোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্টে গৃহীত এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল স্থল, জল এবং অন্যান্য পৃষ্ঠে ভ্রমণ করতে সক্ষম এমন একটি যান তৈরি করা। হোভারক্রাফ্ট, যা ADE GEM-1 নামেও পরিচিত, কালামের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ছিল, যা তার কর্মজীবনের এবং ভারতের আদিবাসী প্রতিরক্ষা

ক্ষমতার প্রাথমিক ধাপের প্রতিনিধিত্ব করে। দেশীয় হোভারক্রাফট তৈরির প্রেক্ষাপট নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করলে তাঁর অসাধারণ অধ্যাবসায়ের পরিচয় পাওয়া যাবে। Dr. Kalam ১৯৫৮ সালে বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত অ্যারোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্টে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (DRDO) তে বৈজ্ঞানিক সহকারী হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে তিনি হোভারক্রাফ্টের তৈরির কাজ শুরু করেন। হোভারক্রাফ্ট ডিজাইনের জন্য একটি ডাক্টেড কনট্রা-রোটেটিং প্রোপেলার (ducted contra- rotating propeller) তৈরির প্রয়োজন ছিল। তিনি কনট্রা-রোটেটিং প্রোপেলার ডিজাইন করতে জানতেন না। তিনি তখন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ানের সাথে যোগাযোগ করেন।

তিনি অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ানের সাথে দেখা করেন. অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কী সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চান? তিনি অধ্যাপক ধাওয়ানকে তাঁর প্রকল্পের কাজ সম্পর্কে সমস্যাটি ব্যাখ্যা করলেন। অধ্যাপক ধাওয়ান তাঁকে বললেন যে সেটি সত্যিই একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ এবং তিনি তাঁকে নকশা শেখাতে রাজী হলেন। পরবর্তী ছয় সপ্তাহের জন্য সমস্ত শনিবার দুপুর ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত তিনি আইআইএসসিতে অধ্যাপক ধাওয়ানের ক্লাস করলেন। এই প্রক্রিয়াটি পরবর্তী ছয় সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে এবং তিনি বিপরীত-ঘূর্ণায়মান প্রপেলার ডিজাইন করার ক্ষমতা অর্জন করেন। অধ্যাপক ধাওয়ান তাঁকে বলেছিলেন যে প্রদত্ত হোভারক্রাফ্ট কনফিগারেশনের জন্য বিপরীত-ঘূর্ণায়মান প্রপেলার তৈরির জন্য তিনি প্রস্তুত। সেই দিন কালামের কছে অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান কেবল একজন শিক্ষকই নন, তিনি বিমান ব্যবস্থার একজন দুর্দান্ত উন্নয়ন প্রকৌশলীও ছিলেন। ঐ হোভারক্রাফট প্রজেক্টের নাম দেওয়া হল নন্দী হোভারক্রাফট এরপর ডঃ কালাম, অ্যারোনটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্টের একটি দলের সাথে কাজ করে, নন্দী হোভারক্রাফট ডিজাইন এবং বিকাশ করেছিলেন। এই নন্দী

হোভারক্রাফট হল একটি উভচর যান যা ভূমি, জল, এমনকি কাদা বা বরফ সহ বিভিন্ন ভূখণ্ডে চলতে পারে। ভারতের দেশীয় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি বিকাশের যাত্রায় নন্দী হোভারক্রাফট একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ডঃ কালামের প্রকল্পের সাফল্য ভারতে ভবিষ্যতের প্রতিরক্ষা ক্ষমতার অগ্রগতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

২) ভারতের প্রথম দেশীয় উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যান, SLV-III,

স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল-৩ (SLV-3) ছিল ভারতের প্রথম পরীক্ষামূলক স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল, যা ছিল সম্পূর্ণ শক্ত, চার স্তরের একটি যান যার ওজন ছিল ১৭ টন এবং উচ্চতা ছিল ২২ মিটার এবং এটি নিম্ন আর্থ অরবিটে (LEO (নিম্ন আর্থ অরবিট) ৪০ কেজি ক্লাস পেলোড স্থাপন করতে সক্ষম।

SLV-III ভারতের এই প্রথম দেশীয় উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যানটি ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের নেতৃত্বে তৈরি করা হয়েছিল । প্রকল্প পরিচালক হিসেবে, তিনি SLV-III এর নকশা ও উন্নয়নে ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যা ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে রোহিণী উপগ্রহকে পৃথিবীর কাছাকাছি কক্ষপথে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছিল। এই সাফল্য ভারতকে একচেটিয়া "স্পেস ক্লাব" ("Space Club")-এর সদস্য করে তোলে। ডাঃ কালামের SLV-III-তৈরি ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ milestone, যা ভারতের জন্য স্বাধীনভাবে উপগ্রহ তৈরি এবং উৎক্ষেপণের ক্ষমতা প্রদর্শন করে। প্রসঙ্গত, SLV-III দ্বারা উৎক্ষেপিত রোহিণী উপগ্রহটি ভারতের মহাকাশ সক্ষমতার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় , কারণ এটি ছিল ভারতের মাটি থেকে উৎক্ষেপিত প্রথম ভারতীয় উপগ্রহ। SLV-III দ্বারা উৎক্ষেপিত রোহিণী উপগ্রহটি ভারতের মহাকাশ সক্ষমতার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কারণ এটি ছিল ভারতের মাটি থেকে উৎক্ষেপিত প্রথম ভারতীয় উপগ্রহ। প্রসঙ্গত, ইসরোর (ISRO) উৎক্ষেপণ যান কর্মসূচির সামগ্রিক উন্নয়নে, বিশেষ করে পিএসএলভি (পোলার স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ

যান) কনফিগারেশনে ডঃ কালামের অবদান ব্যাপকভাবে প্রসারিত।

৩) ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ (INCOSPAR);

মহাকাশ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিজ্ঞানী ডঃ বিক্রম সারাভাইয়ের পরামর্শে, ১৯৬২ সালে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু পরমাণু শক্তি বিভাগের (Department of Atomic Energy) অধীনে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ (INCOSPAR) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম ১৯৯২ সালের জুলাই থেকে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা এবং ডিআরডিও-র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ সালের মে মাসে পরিচালিত পোখরান-২ পারমাণবিক পরীক্ষায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক, রাজনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত ভূমিকা পালন করেন। (উৎস –A I তথ্য)। ডাঃ আব্দুল কালাম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ (INCOSPAR) এর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। বিক্রম সারাভাইয়ের নির্দেশনায় INCOSPAR, মহাকাশ গবেষণার জন্য থুম্বা ইকুয়েটোরিয়াল রকেট লঞ্চিং স্টেশন (TERLS) প্রতিষ্ঠার জন্য দায়ী ছিল, ডঃ কালাম এই তত্ত্বাবধানকারী দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৬৯ সালে, INCOSPAR ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO) তে রূপান্তরিত হয়, যা পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে মহাকাশ বিভাগের অধীনে আসে। ডঃ কালাম ISRO-তে তার কর্মজীবন অব্যাহত রেখেছিলেন, ভারতের প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ যান (SLV-III) এবং পরবর্তীকালে রোহিণী উপগ্রহ উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে তিনি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

৪) ডঃ কালামের ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রকল্পের (Ballistic Missile Project) বিরাট সাফল্য

ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম, 'ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র মানব' (Missile Man of India") নামে পরিচিত কারণ ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র

প্রকল্প,পৃথ্বী এবং অগ্নি ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে তিনি প্রথম দেশীয় উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যান তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর ইন্টিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (IGMDP) এর মাধ্যমে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্প বিশাল সাফল্য লাভ করেছিল। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য ডঃ আব্দুল কালাম "ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র মানব" নামে বিশ্ব-বিখ্যাত। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত এই প্রকল্পসারা ও কর্মসূচির ফলে অগ্নি এবং পৃথ্বী সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সফলভাবে তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল আমাদের দেশে। সে জন্য আমরা সকলে গর্বিত। বিশেষজ্ঞরা বলেন অগ্নি সিরিজ, আমদের দেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি, যার ফলে ভারত মুম্বাইয়ের মতো স্থান থেকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অবস্থিত অঞ্চলগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করতে সক্ষম হয়েছিল। আবার পৃথ্বী ক্ষেপণাস্ত্রও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য যা ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষমতাকে অনেক শক্তিশালী করেছে। অগ্নি এবং পৃথ্বী ছাড়াও, আইজিএমডিপি আকাশ, ত্রিশূল এবং নাগ সহ অন্যান্য সফল ক্ষেপণাস্ত্রও ভারত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে ডঃ কালামের নির্দেশ ও নেতৃত্বে। এছাড়া পোখরানে ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সে সঙ্গে ভারতের পারমাণবিক ক্ষমতার উন্নয়নে তিনি অসামান্য অবদান রেখে গিয়েছেন। এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার সফল উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নের ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫) **Chief Scientific Advisor ও DRDO Secretary;**

ডঃ কালাম ১৯৯২ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা এবং ডিআরডিও-র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ সালের মে মাসে পরিচালিত পোখরান-২ পারমাণবিক পরীক্ষা পরিচালনায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক, রাজনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত ভূমিকা পালন করেন। তিনি ডিআরডিও (প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা) এর "পিতা"।

তিনি ১৯৯২ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ডিআরডিও-র মহাপরিচালক ছিলেন। ডিআরডিও-তে তার কার্যকালের পর, ড. কালাম ভারতের ১১তম রাষ্ট্রপতি হন।

ডঃ আব্দুল কালাম- বিজ্ঞান ও দর্শনের ব্যখ্যা:

ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম সবসময়ই একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে তিনি ঈশ্বরের সাথে একটি সক্রিয় অংশীদারিত্ব বজায় রাখতেন। তিনি বুঝেছিলেন এবং তাঁর বইএ লিখেও গেছেন যে সর্বোত্তম কাজের জন্য তাঁর নিজের ক্ষমতার চেয়ে যে বেশি ক্ষমতার প্রয়োজন হয় তা কেবল ঈশ্বরই তাঁকে দিয়েছিলেন। তাই তিনি সেখানে লিখেছেন; "আমি আমার নিজের ক্ষমতার সঠিক মূল্যায়ন করেছি, তারপর ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যখন আমি নিজেকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করেছি। ঈশ্বরের সঙ্গে অংশীদারিত্বে, আমি সর্বদা আমার প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তি পেয়েছি এবং বাস্তবে তা আমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে অনুভব করেছি। আজ, আমি নিশ্চিত করতে পারি যে ঈশ্বরের রাজ্য এই শক্তির আকারে তোমার মধ্যে রয়েছে, যা তোমার লক্ষ্য অর্জনে এবং তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।" ঐ WINGS OF FIRE বইটিতে আরও লিখেছেন এই অভ্যন্তরীণ শক্তি প্রতিক্রিয়াকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে – এরকম তাঁর বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

"...I have always been a religious person in the sense that I maintain a working partnership with God. I was aware that the best work required more ability than I possessed and therefore I needed help that only God could give me. I made true estimate of my own ability, then raised by 50 per cent and put myself in God's hands. In this partnership, I have always received all the power I needed, and in fact have actually felt it flowing through me. Today, I can affirm that the kingdom of God is within you in the form of this power, to help achieve your goals and realise your dreams. There are

many different types and levels of experience that turn this internal power reaction critical.”
___ ‘WINGS OF FIRE’an autobiography.

তাঁর লেখা বই এবং বাণী পড়ে জানা যায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মত বিশ্বাস করতেন যে ভারত আধ্যাত্মিকতার এক পবিত্র ভূমি, সত্য সন্ধানীদের ভূমি, এবং এমন একটি ভূমি যেখানে আধ্যাত্মিকতা একজন মুচির মনে একজন বিজ্ঞানীর দিকে প্রবাহিত হয়" । তিনি তাঁর লেখা এবং বক্তৃতায় ভারতের আধ্যাত্মিক গভীরতা এবং অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দেওয়ার জন্য একই রকম বাক্যাংশ এবং বর্ণনা ব্যবহার করেছিলেন। এপিজে আবদুল কালাম বিজ্ঞানকে সামাজিক অগ্রগতির জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে দেখতেন। বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় গড়ে উঠা প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতার উপর তিনি জোর দিতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতা পরস্পরবিরোধী নয় বরং পরিপূরক, যা সকল কিছুর মৌলিক ঐক্যের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। তাঁর দর্শনে আদর্শবাদ, বাস্তববাদ এবং মানবতাবাদও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা মূল্যবোধ এবং ধার্মিক জীবনযাপনের উপর ভিত্তি করে একটি সুস্থ সমাজ গড়ে উঠে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে বিজ্ঞান জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং মানবকল্যাণের জন্য সবচেয়ে কার্যকরি উপায়। তিনি সমস্যা সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পক্ষে ছিলেন এবং সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গবেষণা ও উদ্ভাবনের গুরুত্বের উপর জোর দিতেন। তাঁর লেখা বই এবং তাঁর কর্মকান্ড থেকে আমরা সহজে বুঝতে পারি কালামের দর্শনের মূল বিষয় হল আদর্শবাদ, বাস্তববাদ এবং মানবতাবাদ । তিনি এমন ভারত দেখতে চেয়েছিলেন যেখানে হৃদয়ে অত্যন্ত ধার্মিকতা, চরিত্রে সৌন্দর্য, সমাজে সম্প্রীতি, জাতির মধ্যে শৃঙ্খলা এবং বিশ্বে শান্তি বিরাজ করে । উল্লেখ্য, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা তাঁর সারা জীবন ধরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। তিনি একজন সুন্নি মুসলিম ছিলেন এবং রমজান মাসে প্রতিদিন নামাজ ও রোজা তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। তাঁর বাবা একজন মসজিদের

ইমাম ছিলেন এবং তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে এই ইসলামী রীতিনীতিগুলি কঠোরভাবে স্থাপন করেছিলেন। এপিজে আব্দুল কালাম একবার বলেছিলেন, 'জীবনের মহান লক্ষ্য, ক্রমাগত জ্ঞান অর্জন , কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় এর চারটি হল তাঁর জীবনের স্তম্ভ। তিনি যখন ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি প্রায়শই জীবন গঠনে স্বপ্ন এবং দৃষ্টিভঙ্গির শক্তি সম্পর্কে কথা বলতেন। তিনি বলতেন যে, একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য দৃঢ় সংকল্পই প্রকৃত অর্থে একজন ব্যক্তির জীবনকে সঠিক রূপ দিয়ে থাকে।

আব্দুল কালামের বিজ্ঞান সাধনা ও আধ্যাত্মিকতা;

তাঁর প্রতিটি সাফল্যের জন্য তিনি বারে বারে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেন। তিনি বলতেন "এই সুন্দর গ্রহের প্রতিটি প্রাণীকে ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। জীবনে আমি যা কিছু অর্জন করেছি তা তাঁর (ঈশ্বরের) সাহায্য এবং তাঁর ইচ্ছার মাধ্যমে। ঈশ্বর কিছু অসাধারণ শিক্ষক এবং সহকর্মীর মাধ্যমে আমার উপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন, এবং যখন আমি এই মহান ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, তখন আমি কেবল তাঁর মহিমার প্রশংসা করি। এই সমস্ত রকেট এবং ক্ষেপণাস্ত্র কালাম নামক একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের কাজ। আমি তাই ভারতের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে বলতে চাই তারা যেন কখনও নিজেকে ছোট বা অসহায় বোধ না করে করতে বলা যায়। আমরা সকলেই আমাদের মধ্যে একটি ঐশ্বরিক আগুন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত এই আগুনে ডানা দেওয়া এবং এর মঙ্গলের আলোয় বিশ্বকে পূর্ণ করা।"

"Each individual creature on this beautiful planet is created by God to fulfil a particular role. Whatever I have achieved in life is through His help, and an expression of His will. He showered His grace on me through some outstanding teachers and colleagues, and when I pay my tributes to these fine persons, I am merely praising His glory. All these rockets

and missiles are His work through a small person called Kalam, in order to tell the several- million mass of India, to never feel small or helpless. We are all born with a divine fire in us. Our efforts should be to give wings to this fire and fill the world with the glow of its goodness."

ভারতের ১১তম রাষ্ট্রপতি মহাকাশ বিজ্ঞানী আবদুল কালাম

এপিজে ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানী এবং রাষ্ট্রনায়ক ডঃ এপিজে আবদুল কালাম ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ভারতের ১১তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁর অবদান এবং দূরদর্শী রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি আমাদের মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এর আগে ১৯৯৯ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ভারত সরকারের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসেবে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদায় দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-এর পরিচালক এবং প্রধানমন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর, ডঃ এ পি জে আব্দুল কালাম ২০০২ সালে ভারতের ১১তম রাষ্ট্রপতি হন। তিনি "জনগণর রাষ্ট্রপতি" (People's President) হিসেবে দেশবাসীর কাছে পরিচিত ছিলেন এবং ভারতীয়দের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি ছিলেন। কারণ, তিনি একজন দূরদর্শী নেতা হিসেবে ভারতের উন্নয়নের জন্য তাঁর সুস্পষ্ট ও সজাগ দৃষ্টি ছিল। তিনি একজন অসাধারণ বক্তা এবং প্রেরণাদায়ক নেতা ছিলেন, যা তাঁকে জীবনের সকল স্তরের মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করেছিল।

রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন, ডঃ কালাম ভারতের উন্নয়নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তিনি ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং ভারতকে পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে গড়ে তোলার অদম্য প্রচেষ্টা করেছিলেন । তিনি গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহারকেও উৎসাহিত করেছিলেন এবং ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রচারের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি চালু করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে, ভারত তার মহাকাশ কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে এবং

সফলভাবে মঙ্গল গ্রহে একটি মহাকাশযান প্রেরণ করে। উল্লেখ্য, ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তৎকালীন বিরোধী দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উভয়ের সমর্থনে তিনি রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ডঃ কালাম শিক্ষা এবং যুব ক্ষমতায়নের শক্তিতে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ভারতে সাক্ষরতার স্তর উন্নত করতে এবং শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ক্যারিয়ার গড়তে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) হায়দ্রাবাদ এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইআইএসটি) এর মতো বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ঐ সময়।

দুঃখের বিষয় হল, ডঃ কালাম ২০১৫ সালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম) শিলং-এ বক্তৃতা দেওয়ার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু জাতির জন্য এক বিরাট ক্ষতি এনেছিল। ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামকে এখনো ভারতের একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্মরণ করা হয়, যিনি মানবতার সেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং জ্ঞান ও শিক্ষার মাধ্যমে সর্বদা উৎকর্ষ অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি সারা বিশ্বের তরুণদের জন্য অনুপ্রেরণা ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও সর্বত্র ভারতীয় নাগরিকগণ তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

আর একটা না বললেই নয়, ডঃ কালাম তাঁর সহজ সরল স্বভাব এবং জনসেবার প্রতি অগাধ প্রেম ও নিষ্ঠার জন্য তিনি আমাদের কাছে "জনগণের রাষ্ট্রপতি" হিসেবে শ্রদ্ধেয় ও স্মরণীয়।

ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের লেখা মুল্যবান পুস্তক

ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম ২৫টিরও বেশি বই লিখেছেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে "উইংস অফ ফায়ার","ইগনাইটেড মাইন্ডস", "ইন্ডিয়া ২০২০: আ ভিশন ফর দ্য নিউ মিলেনিয়াম" এবং "মাই জার্নি"। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য

বইগুলির মধ্যে রয়েছে "দ্য লুমিনাস স্পার্কস", "গাইডিং সোলস" এবং "ইউ আর বর্ন টু ব্লসম"। যেহেতু তাঁর প্রতিটি বই তাঁর দর্শন, বিজ্ঞান মনন, প্রজ্ঞা, দেশপ্রেম ও মানবতার সাক্ষ্য ও পরিচয় বহন করে, তাই পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তাঁর কয়েকটি বই-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। তাঁর সমস্ত মুল্যবান বইগুলির বিষয়বস্তু দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত। তাঁর লেখা পঁচিশটি বইয়ের তালিকা নীচে দেওয়া হল।

1. **Wings of Fire: An autobiography (১৯৯৯)**- একটি আত্মজীবনী। "উইংস অফ ফায়ার" ডঃ আব্দুল কালাম একটি অনুপ্রেরণামূলক আত্মজীবনী যা তাঁর সাধারণ পটভূমি থেকে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি হওয়ার যাত্রা তুলে ধরে । বইটিতে কঠোর পরিশ্রম, দৃঢ় সংকল্প এবং মহান কিছু অর্জনের জন্য নিজের শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতি আত্ম বিশ্বাসের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন তিনি। বইটি জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা এবং নৈতিক নেতৃত্বের তাৎপর্য সম্পর্কেও গভীরভাবে আলোচনা করেছে। বইটিতে দেখানো হয়েছে যে ডঃ কালাম কীভাবে তাঁর লক্ষ্য অর্জনের জন্য বহু চ্যালেঞ্জ এবং বাধা অতিক্রম করেছিলেন। কোন বাধা, বিপত্তি প্রতিবন্ধক তাঁর স্বপ্ন থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তিনি সর্বদা অসাধ্য সাধনের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর অধ্যবসায় আমাদের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। তিনি বলেন- "Dream is not that which you see while sleeping, it is something that does not let you sleep." অর্থাৎ "স্বপ্ন সেটা নয় যা তুমি ঘুমিয়ে দেখো, বরং সেটাই যা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না" । এটি তাঁর বিখ্যাত অনুপ্রেরণামূলক উক্তি। এই বইটি ডঃ কালামের জীবন কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং জ্ঞানের নিরলস সাধনার শক্তির প্রমাণ ও পরিচয় বহন করে। তিনি এখানে নৈতিক নেতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নম্রতা, সততা এবং জাতির কল্যাণের উপর মনোযোগ, ডঃ কালামের এই সকল নেতৃত্বের নীতিগুলি পুরো বইটি বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি এখানে শিক্ষার গুরুত্ব এবং ব্যক্তি ও জাতি গঠনের

ভূমিকার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।

2. Ignited Minds: Unleashing the Power within India- বইটি ভারতের ভেতরে শক্তির উন্মোচন বিষয় সম্পর্কে লেখা। "ইগনাইটেড মাইন্ডস: আনলিশিং দ্য পাওয়ার উইদিন ইন্ডিয়া" বইটিতে লেখক এ.পি.জে. আব্দুল কালাম ভারতের যুবসমাজের সম্ভাবনা অন্বেষণ করেন এবং মহানতা অর্জনের জন্য জাতীর মানসিকতার পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বইটিতে শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা এবং উদ্ভাবনের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পাঠকদের বড়কিছুর জন্য স্বপ্ন দেখতে এবং সেই বড় স্বপ্ন পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য ভাল কাজ করতে লেখক উৎসাহিত করেছেন। ডঃ কালাম শক্তিশালী রোল মডেল এবং একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেছেন। দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তিনি দেশবাসীকে অধিক শক্তি অর্জন করতে এবং একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

3. India 2020: A Vision for the New Millennium. - ইন্ডিয়া 2020: এ ভিশন ফর দ্য নিউ মিলেনিয়াম বইটি ভারতের ১১তম রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম এবং ওয়াই এস রাজন 1998 সালে লিখেছেন। বইটিতে ভারতের ভবিষ্যত এবং উন্নয়নশীল ভারতের জন্য ডঃ কালামের দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গি" সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বইটির সারমর্ম হল ভারতের উন্নয়নের একটি প্রতিচিত্র বা নীলনকশা, যা ২০২০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে ভারতের একটি শীর্ষস্থানীয় অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠার সম্ভাবনার কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। এটি ভারতের শক্তি এবং দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক উন্নতির পক্ষে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। আরো সহজ করে বলা যায় বইটিতে ২০২০ সালের মধ্যে ভারতকে একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেছেন ভারতের ১১তম

রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম। তিনি তার জাতিকে জ্ঞানের পরাশক্তি এবং উন্নত জাতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। বইটিতে ভারত এবং উন্নত দেশগুলির বর্তমান এবং ভবিষ্যতের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। বইটিতে তিনি ভারতের বিদ্যমান শক্তিগুলিকে কাজে লাগানো এবং অতীতের সাফল্যগুলিকে উন্নতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার উপরও জোর দিয়েছেন, যেমন সবুজ বিপ্লব এবং উপগ্রহ-ভিত্তিক যোগাযোগের উন্নয়ন।

4. My Journey: Transforming Dreams into Actions.

"My Journey: Transforming Dreams into Actions' অর্থাৎ 'আমার যাত্রা: স্বপ্নকে কাজে রূপান্তর" বইটিতে, ভারতের একাদশ রাষ্ট্রপতি ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। এখানে মূলত স্থান পেয়েছে- রামেশ্বরমে একটি সামান্য বালক হিসেবে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। তাঁর থেকে আরও বড় পরিচয় তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন। বিজ্ঞান চর্চা ও আবিষ্কারে তাঁর অবদান এবং দূরদর্শীতার জন্য তিনি আমাদের মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। পারমাণবিক পরীক্ষা পরিচালনায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক, রাজনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত ভূমিকা পালন করেছিলেন। বইটিতে ডঃ কালামের জীবন সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই বইটিতে তিনি তাঁর শৈশব থেকে তাঁর আশি বছরেরও বেশি বয়সের জীবনের কিছু অনন্য অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। এই সমস্ত বছর এবং এই সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, তিনি যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি আমাদের দিয়ে গেছেন সেটি হল জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বপ্ন দেখতে হবে এবং তারপর সেই স্বপ্নগুলি বাস্তবায়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তাঁর এই দর্শন ও উপদেশগুলি বিভিন্ন ভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন এই বইটিতে।

5. The Luminous Sparks: A Biography in Verse and Colours- আলোকিত স্ফুলিঙ্গ: পদ্য ও রঙে একটি জীবনী;

এই বইটি তাঁর স্বপ্ন এবং তার স্ফুলিঙ্গ সম্পর্কে কথা বলে। তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন যে তিনি একটি অনুর্বর জমিতে দাঁড়িয়ে, যেখানে কেবল শক্ত পাথর ছিল। সেই জমিকে পরিবর্তন করে সেই পাথরে জীবন দানের স্বপ্ন দেখলেন। তাঁর বিশ্বাস, এমনকি পাথরগুলিও তাঁর জীবনে শক্তির কম্পন তৈরি করেছিল। স্বপনের মধ্যে তিনি এক লক্ষ চারা রোপণ করলেন।তিনি দেখলেন পৃথিবীর শুষ্ক বাদামী মুখটা বদলে গেল। পাখি, কাঠবিড়ালি এবং প্রজাপতি সেখানে বাসা বাঁধতে শুরু করল, জীবনের নূতন সুরময় সঙ্গীত বাজতে লাগল। স্বপ্নে যখন তিনি একটি অনুর্বর জমি দেখেন, তখন তিনি গাছের চারা রোপণ করেন, যখন তিনি অনুর্বর হৃদয় দেখতে পান, তখন তাঁর কলম থেকে প্রকাশিত হয় কবিতাগুলি। এ পি জে আব্দুল কালামের নির্বাচিত কবিতার সংকলন "দ্য লুমিনাস স্পার্কস" হল কবির হৃদয় পরিবর্তনের জন্য তৈরি প্রেমের চারা - অভ্যন্তরীণ দেবত্বকে প্রজ্বলিত করার জন্য স্ফুলিঙ্গ। কবিতার লাইনগুলিতে একটি লুকানো শক্তি স্পন্দিত হয়। কবিতাগুলি কবির ব্যক্তিত্বের মতোই সরল এবং ধারণাগুলিও স্বচ্ছ। স্বচ্ছ ব্যক্তিত্ব এবং সরল কিন্তু অনুপ্রেরণামূলক চিন্তাভাবনা। এটি হল নেতৃত্বের প্রথম পাঠ যা কবিতা থেকে পাঠকের মনে প্রবাহিত হয়।

তাঁর গভীর অন্তরের সাধু এবং বিজ্ঞানী যেন একসাথে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গিয়েছে এবং রহস্যের উচ্চতায় পৌঁছিয়েছেন – সেটাই প্রকাশ পেয়েছে এই বইটিতে। বিভেদ বিচ্ছিন্নতার মানবিক দেয়াল গলে গিয়ে প্রেম ও সম্প্রীতির গান তৈরি করেছেন তিনি এই বইটিতে। সেই প্রেম ও সম্প্রীতি যেন কেবল স্রষ্টার আনন্দকে বোঝে। তাঁর লেখায় কখনও কখনও নিষ্পাপ অশ্রু ঝলমল করে এবং আবার কখনো ধার্মিক ভাব প্রবল ভাবে গর্জন করে। যারা পৃথিবীতে বিচ্ছিন্নতার বিষ বপন করে তাদের তিনি 'শিক্ষিত সর্প' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এই বইটি দেশের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা তুলে ধরে, যা তাঁকে 'উন্নয়নশীল জাতি'কে 'উন্নত জাতি'তে পরিণত করার জন্য দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি জাতীয় দায়িত্ববোধের একটি দৃঢ় অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত

করেছেন এই বইটিতে এবং এখানে তিনি আন্তরিক প্রেম ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে চিন্তাভাবনাকে কর্মে রূপান্তরিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

6. Guiding Souls: Dialogues on the Purpose of Life- পথপ্রদর্শক আত্মা: জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত সংলাপ।

এপিজে আব্দুল কালাম তাঁর মাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আরও একজন মহিলাকে সারা জীবন অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি হলেন এম. এস. সুব্বুলক্ষ্মী কর্ণাটকী শাস্ত্রীয় সংগীতের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী। "গাইডিং সোলস বইটিতে তাঁর সেই গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। এম. এস. সুব্বুলক্ষ্মী ভারতীয় সংগীতকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচার ও প্রসার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন । ১৯৯৮ সালে ভারত সরকার তাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ভারতরত্ন পুরস্কারে সম্মানিত করে। তাঁর সম্পর্কে ডঃ কালাম লিখছেন "তিনি (এম. এস. সুব্বুলক্ষ্মী) তাঁর প্রজন্মের একজন অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী এবং রক্ষণশীল মহিলা ছিলেন..., তিনি ছিলেন সেই সরল, পরিপাটি, ধর্মপ্রাণ, সরল মানুষ যিনি সর্বদা, অন্যদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আগ্রহ দেখিয়েছেন।. তাঁর সঙ্গীতে আমি আমার আত্মাকে স্নান করিয়েছি," কালাম তাঁর সর্বশেষ বই, "জীবনের উদ্দেশ্যের উপর গাইডিং সোলস-ডায়ালগস"-এ কর্ণাটকী সঙ্গীত স্তবক এম এস সুব্বুলক্ষ্মীর প্রতিভার কথা উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, দক্ষিণ ভারতের প্রায় সকল ধর্মের মানুষ সুব্বুলক্ষ্মী ভজন বা ভক্তিমূলক সঙ্গীত বা সুপ্রভাতমের আবৃতি শুনে তাদের দিন শুরু করে। দক্ষিণ ভারতের প্রায় সব মন্দিরে প্রতিদিন সকালে সুব্বুলক্ষ্মীর আবৃত্তি বাজান হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সকালের অধ্যয়নে একাগ্রতা প্রদানের জন্য জাদুকরী উপায় হল সুব্বুলক্ষ্মীর আবৃত্তি। এই বইটিতে ডঃ কালাম তাঁর শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন।

ডঃ কালাম এবং সহ-লেখক, তাঁর বহু বছরের বন্ধু এবং ছাত্র, অরুণ তিওয়ারি মধ্যে সংলাপ রূপে বইটি রচিত এবং তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশটি অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা, চিন্তাভাবনা, চিত্র, আবেগ,

উপলব্ধি এবং অন্তর্দৃষ্টির ধারণা নিয়ে আলোচনা করে। দ্বিতীয় অংশে, উভয় অংশে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সারমর্ম এবং জীবন ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যারা 'মানবজাতিকে সবচেয়ে নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব দিয়েছেন'। শেষ অংশটি আত্মার যাত্রা এবং এর বিভিন্ন প্রকাশ বর্ণনা করে। গাইডিং সোলস... আমাদের রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁর জীবন, শিশু, ছাত্র, একজন বিমান প্রকৌশলী, ডিআরডিওতে তাঁর দিনগুলি এবং ভারতের একাদশ রাষ্ট্রপতি হিসাবে অন্তর্দৃষ্টি দেয়।

7. You Are Born To Blossom- তুমি ফুল ফোটার জন্য জন্মেছো;

এই বইটিতে ডঃ কালাম আমাদের জীবনে সমস্যা সমাধানে এবং সমাজে গঠনমূলক ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে উদ্ভাবন এবং সৃজনশীলতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। বইটি কার্যকর নেতৃত্বের গুণাবলী ও কৌশল এবং অন্যদের অনুপ্রাণিত করার পদ্ধতি বা কৌশল সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।বইটিতে ডঃ কালাম কীভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে গ্রামীণ প্রতিভা আহরণের কল্পনা করেছেন তারও একটি বিবরণ পাওয়া যায় । এখানে, ডঃ কালাম ২০২০ সালে ভারতের স্কুলগুলির উন্নয়নের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগকারী সিম্বিওটিক (দুই বা ততোধিক ভিন্ন জৈবিক প্রজাতির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ এবং দীর্ঘস্থায়ী মিথস্ক্রিয়া, যেখানে অন্তত একটি প্রজাতি উপকৃত হয়) স্নায়ু কেন্দ্র হিসাবে উপস্থাপন করেছেন; যা বিশ্বে বিদ্যমান জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক বলে বিবেচিত। এখানে তিনি আত্ম-আবিষ্কার , আত্ম শক্তি এবং আবেগ উপলব্ধির উপর জোর দিয়েছেন। সহজ কথায় বইটি পাঠকদের জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে এবং তা রুপায়নের জন্য কাজ করতে উৎসাহিত করে।

এই বইটি আমাদের জীবনের অনেক দিক, যথা শিক্ষা, সৃজনশীলতা, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি অনেক কিছুর উপর

আলোকপাত করেছে। ডঃ কালাম ভারতের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে এই ব্যবস্থা কতটা ফাঁকা এবং এটি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বকে কীভাবে দমন করে চলেছে। তিনি আরও বিশ্লেষণ করেছেন যে ভারতের যুবসমাজ কীভাবে চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কীভাবে তারা অন্যদের জন্য কর্ম সংস্থান তৈরি করার চেষ্টা করছে না।

এই বইটি আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে আমরা প্রত্যেকেই খুবই বিশেষ, এবং আমাদের কিছু অনন্য গুণাবলী রয়েছে কারণ আমরা একে অপরের থেকে অনেকটা আলাদা। আমরাই জানি আমাদের জন্য কী সবচেয়ে ভালো। প্রকৃতির প্রতি, নিজের দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ করা উচিত। কেবল তাদের আর্থিক উন্নতির কথা ভাবলেই চলবে না, বরং তাদের দেশের উন্নতির কথাও ভাবা উচিত এবং নিঃস্বার্থ প্রকৃতিকে রক্ষায় অবদান রাখা উচিত। ডঃ কালাম পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে সাফল্যের ভিত্তি তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে: পিতামাতা, শিক্ষক এবং পরামর্শদাতা।

8. Reignited: Scientific Pathways to a Brighter Future. রাজত্ব: উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক পথ;

9. The Scientific India: A Twenty-First Century Guide to the World around Us - বৈজ্ঞানিক ভারত: আমাদের চারপাশের বিশ্ব সম্পর্কে একবিংশ শতাব্দীর একটি নির্দেশিকা.

10. Beyond 2020: A Vision for Tomorrow's India - ২০২০ সালের পরে: আগামীকালের ভারতের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি.

11. The Family and The Nation- পরিবার এবং জাতি

12. Transcendence: My Spiritual Experiences with Pramukh Swamiji- ট্রান্সসেন্ডেন্স: মাই স্পিরিচুয়াল এক্সপেরিয়েন্সেস উইথ প্রমুখ স্বামীজী" বইটি এপিজে - আব্দুল কালাম ও সহ-লেখক অরুণ তিওয়ারির লেখা। এখানে ডঃ কালাম তাঁর আধ্যাত্মিক যাত্রা এবং BAPS স্বামীনারায়ণ সংগঠনের

আধ্যাত্মিক নেতা প্রমুখ স্বামীজির সাথে তাঁর গভীর এবং সুদীর্ঘ ১৪ বৎসরের সম্পর্কের অন্বেষণ করে। বইটিতে কালাম তাঁর ব্যক্তিগত রূপান্তর, প্রধান স্বামীজির নেতৃত্ব থেকে অনুপ্রেরণা এবং বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা সহাবস্থানকারী সমাজের জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। বইটিতে তিনি তাঁর জীবনের আধ্যাত্মিক রূপান্তরের কথা প্রকাশ করেছেন, যা তিনি প্রমুখ স্বামীজির সান্নিধ্যে লাভ করেছিলেন। বইটিতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি কিভাবে প্রমুখ স্বামীজির দ্বারা আধ্যাত্মিক দিকে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তার জীবন ও কর্মের উপর কিভাবে প্রমুখ স্বামীজির প্রভাব পড়েছিল।

13. Mission of India: A Vision of Indian Youth; মিশন ইন্ডিয়া: আ ভিশন ফর ইন্ডিয়ান ইয়ুথ" বইটিতে ডঃ কালাম ২০২০ সালের মধ্যে দেশে ইতিবাচক এবং যথার্থ পরিবর্তন আনার জন্য ভারতীয় যুবসমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন। ডঃ কালাম পাঠকদের উদ্দেশ্যে এই বলে উৎসাহিত করেন যে ভারতের ইতিহাসে এমন সময় কখনও আসেনি, যেখানে ৫৪ কোটি যুবক এবং বিশ্বজুড়ে ২০ কোটি ভারতীয় রয়েছে অবস্থান করছে। বইটিতে লেখক আব্দুল কালাম এবং ওয়াই.এস. রাজন ভারতের শক্তি এবং দুর্বলতাগুলি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে ভারতে ইতিবাচক এবং যথার্থ পরিবর্তনের লক্ষ্যটি কীভাবে বাস্তব। তাঁর এই অনুপ্রেরণামূলক বইটি যুবসমাজকে ভারতের অজানা সাফল্যের কাহিনীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই লেখক দেশের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি এখানে।

14. Inspiring Thoughts: Quotation Series

15. Failure to Success: Legendry Lives; বাংলায় বইটির নাম হল "সাফল্যের ব্যর্থতা: কিংবদন্তি জীবন" । এখানে ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম র সাফল্যের সোপান হিসেবে ব্যর্থতাকে আলিঙ্গন করার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেছেন । বইটিতে বিশেষ করে কালামের SLV-3 উৎক্ষেপণের প্রাথমিক ব্যর্থতার পর পরিশেষে ভারতের মহাকাশে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের কর্মসূচিতে

উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের যাত্রা বর্ণনা করেছেন। তিনি এখানে বলতে চেয়েছেন যে কোন বড় কাজে ব্যর্থতায় হতাশ হলে চলবে না কারণ ব্যর্থতা আমাদের প্রকৃত শিক্ষা দান করে; ব্যর্থতা পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করার এবং অধিকতর সাফল্যের সুযোগ দেয়। বইটিতে দেখানো হয়েছে যে কীভাবে কালাম এবং তাঁর দল, SLV-3 ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, পরবর্তী উৎক্ষেপণ এবং প্রকল্পগুলিতে সাফল্য অর্জনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, অবশেষে ভারতের মহাকাশ এবং ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন।

16. Target 3 Billion; টার্গেট ৩ বিলিয়ন: বইটিতে ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম ও সৃজন পাল সিং ভারতে স্থায়ী এবং দারিদ্র্য বিমোচনের উপর আলোকপাত করেছেন, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, নগর সুবিধা প্রদান মডেলের পক্ষে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। ভারতে, গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী ৩ বিলিয়ন মানুষের উন্নয়নের বাধা ও চ্যালেঞ্জগুলি তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে। এখানে সরকারি ভর্তুকির উপর নির্ভর না করে একটি স্থায়ি এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় শহুরে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই বইটিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বাস্তব উন্নয়নের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যারা সফলভাবে একই ধরণের মডেল বাস্তবায়ন করে গ্রামীণ উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

17. You are Unique: Scale New Heights by Thoughts and Actions

18. Turning Points: A Journey through Challenges

19. Indomitable Spirit; এপিজে আব্দুল কালামের লেখা "অদম্য আত্মা"বইটিতে জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের বিকাশ। বইটি জাতির উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে নৈতিক নেতৃত্বের সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা

এবং ধারণার একটি সংকলন, যা মূলত তাঁর বক্তৃতা এবং ভাষণ থেকে নেওয়া। বইটি মানবিক ও জাতীয় উদ্বেগের বিষয়গুলি অন্বেষণ করেছে এবং দূরদর্শিতা, অধ্যবসায় এবং নৈতিক নেতৃত্বের গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

20. Spirit of India এপিজে আব্দুল কালাম তাঁর "স্পিরিট অফ ইন্ডিয়া" বইটিতে সমসাময়িক ভারতের যুব সমাজের স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জের উপর আলোকপাত করেছে। যুবসমাজ এবং জাতির মধ্যে সংযোগ অন্বেষণ করেছেন। বইটি জাতীয় অগ্রগতির ও সাফল্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এখানে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি যদি উন্নতি না করে, তাহলে জাতি প্রকৃত সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। জাতির উন্নয়নের বিষয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, বৌদ্ধিক আলোচনা, যুক্তি উদাহরণের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। বইটি জাতীয় ঐক্যের এবং সমাজ গঠনে সীমান্তহীন মনের উপর তাঁর ধ্যান, ধারণা ও চিন্তাভাবনা সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

21. Thoughts for Change: We Can Do It

22. Governance for Growth in India

23. Manifesto for Change

24. Forge Your Future: Candid, Forthright, Inspiring

25. The Guiding Light: A Selection of Quotations from My Favourite Books

অসংখ্য পুরষ্কার এবং সম্মান অর্জন

ডঃ কালাম ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট বিজ্ঞানী যিনি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর অবদানের জন্য তিনি ভারত এবং আন্তর্জাতিকভাবে অসংখ্য পুরষ্কার এবং সম্মাননা পেয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ এবং ভারতরত্ন। তিনি বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিও পেয়েছিলেন।

ভারতে তিনি পদ্মভূষণ (১৯৮১) এবং পদ্মবিভূষণ (১৯৯০) এবং সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার ভারতরত্ন (১৯৯৭) পেয়েছেন। এছাড়া তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে নিম্নলিখিত পুরষ্কারও অর্জন করে ছিলেন;

2007 - The King Charles-II Medal for Science and Technology by The Royal Society, UK
2008 - Woodrow Wilson Award
2009 - International Medal by The Royal Academy of Engineering, London
2009 - Hoover Medal 2008 by The Hoover Board of Awards
2009 - International Von Karman Wings Award by The Aerospace Historical Society in collaboration with the Graduate Aerospace Laboratories (GALCIT)

সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি

ডঃ কালাম ভারত ও বিদেশের ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রির অনন্য সম্মান অর্জন করেন। প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে রয়েছে:

- নিয়েনরোড বিজনেস ইউনিভার্সিটি, নেদারল্যান্ডস
- নানইয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি, সিঙ্গাপুর
- কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটি, পিটসবার্গ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- উলভারহ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য
- কেন্টাকি বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- ওকল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, মিশিগান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা
- স্যান্স মালয়েশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া
- অস্ট্রেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
- দ্য সাইমন ফ্রেজার ইউনিভার্সিটি, ভ্যাঙ্কুভার

কালামের বিখ্যাত উক্তি ও অনুপ্রেরণা;

ডঃ আব্দুল কালাম একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, শিক্ষক, দার্শনিক এবং রাষ্ট্রনেতা যিনি দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের অনুপ্রেরণা ছিলেন। তাঁর ভাষণের শত শত উক্তি আমাদেরকে সর্বদা অনুপ্রেরণা দেয়। তাঁর উক্তিগুলি প্রধানত সততা, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের কথা বলে এবং সব ধরনের মানুষকে অনুপ্রেরনা যোগায় এবং মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। যেমন তিনি বলেছেন ১) "যদি তুমি সূর্যের মতো জ্বলতে চাও, তাহলে প্রথমে সূর্যের মতো জ্বলো।""If you want to shine like a sun, first burn like a sun." ২) "স্বপ্ন সত্যি হওয়ার আগে তোমাকে স্বপ্ন দেখতে হবে।" "You have to dream before your dreams can come true."

এই রকম কিছু তাঁর মূল্যবান উক্তি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এই উক্তিগুলি তাঁর বিভিন্ন বই বা ভাষণ থেকে সংগৃহীত।

1. "Dream is not that which you see while sleeping, it is something that does not let you sleep." "স্বপ্ন সেটা নয় যা তুমি ঘুমিয়ে দেখো, স্বপ্ন সেটা যা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না।"

2. "Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough." "যদি আমার সফল হওয়ার সংকল্প যথেষ্ট দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়, তাহলে ব্যর্থতা কখনোই আমাকে গ্রাস করবে না।"

3. "Don't take rest after your first victory because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck." "প্রথম জয়ের পর বিশ্রাম নিও না কারণ দ্বিতীয়টিতে ব্যর্থ হলে, আরও অনেক লোক বলবে যে তোমার প্রথম জয় কেবল ভাগ্যের ফল।"

4. "All of us do not have equal talent. But, all of us have an equal opportunity to develop our talents." আমাদের সকলের

সমান প্রতিভা নেই। কিন্তু, আমাদের সকলেরই প্রতিভা বিকাশের সমান সুযোগ রয়েছে।"

5. "The best brains of the nation may be found on the last benches of the classroom." "জাতির সেরা মস্তিষ্কগুলো ক্লাসরুমের শেষ বেঞ্চে পাওয়া যেতে পারে।"

6. "I am not a handsome guy, but I can give my hand to someone who needs help. Beauty is in the heart, not in the face." "আমি খুব একটা সুদর্শন নই, কিন্তু যার সাহায্যের প্রয়োজন আমি তার দিকে আমার হাত প্রসারিত করতে পারি। সৌন্দর্য হৃদয়ে, মুখে নয়।"

7. "Look at the sky. We are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work." "আকাশের দিকে তাকাও। আমরা একা নই। সমগ্র মহাবিশ্ব আমাদের প্রতি বন্ধুসুলভ এবং যারা স্বপ্ন দেখে এবং কাজ করে তাদেরকে সবচেয়ে ভালোটা দেওয়ার জন্যই ষড়যন্ত্র করে।"

8. "It is very easy to defeat someone, but it is very hard to win someone." "কাউকে পরাজিত করা খুব সহজ, কিন্তু কাউকে জয় করা খুব কঠিন।"

9. "Thinking should become your capital asset, no matter whatever ups and downs you come across in your life." "জীবনে যত উত্থান-পতনই আসুক না কেন, চিন্তাভাবনা তোমার মূলধনী সম্পদ হওয়া উচিত।"

10. "Man needs difficulties in life because they are necessary to enjoy success." "মানুষের জীবনে অসুবিধার প্রয়োজন হয় কারণ সাফল্য উপভোগ করার জন্য এগুলি প্রয়োজনীয়।"

11. "To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal." "তোমার লক্ষ্যে সফল হতে হলে, তোমার লক্ষ্যের প্রতি একনিষ্ঠ নিষ্ঠা থাকতে হবে।"

12. "Climbing to the top demands strength, whether it is to the top of Mount Everest or to the top of your career." "চূড়ায় আরোহণের জন্য শক্তির প্রয়োজন, তা সে এভারেস্টের চূড়ায় হোক বা আপনার ক্যারিয়ারের চূড়ায়।"

13. "We should not give up and we should not allow the problem to defeat us." "আমাদের হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় এবং সমস্যাকে আমাদের পরাজিত করতে দেওয়া উচিত নয়।"

14. "Let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow." "আসুন আমরা আমাদের আজকের দিনটিকে ত্যাগ করি যাতে আমাদের সন্তানরা আগামীকাল আরও ভালোভাবে কাটাতে পারে।"

15. "Great dreams of great dreamers are always transcended." "মহান স্বপ্নদর্শীদের মহান স্বপ্ন সর্বদা অতিক্রম করে এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।"

16. "Excellence is a continuous process and not an accident." শ্রেষ্ঠত্ব একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, আকস্মিক ঘটনা নয়"

17. "One best book is equal to a hundred good friends, but one good friend is equal to a library." একটি ভালো বই একশ জন ভালো বন্ধুর সমান, কিন্তু একজন ভালো বন্ধু একটি লাইব্রেরির সমান

18. "Small aim is a crime; have great aim." ছোট লক্ষ্য অপরাধ; তাই মহৎ লক্ষ্য রাখো"

19. "You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future."

“তুমি তোমার ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করতে পারবে না, কিন্তু তুমি তোমার অভ্যাস পরিবর্তন করতে পারো, এবং অবশ্যই তোমার অভ্যাস তোমার ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করবে।"

20. "Dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action." “স্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন। স্বপ্ন চিন্তায় রূপান্তরিত হয় এবং চিন্তা কর্মে পরিণত হয়।"

21. "Thinking is progress. Non-thinking is stagnation of the individual, organization, and country." "চিন্তা করলে আসে অগ্রগতি; চিন্তা-হীনতা থেকে আসে ব্যক্তি, সংগঠন এবং দেশের স্থবিরতা।”

22. "For great men, religion is a way of making friends; small people make religion a fighting tool." ধর্ম মহান ব্যক্তিদের কাছে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার একটা উপায়; সাধারণ মানুষ ধর্মকে যুদ্ধের হাতিয়ার করে তোলে।"

23. "If you fail, never give up because FAIL means 'First Attempt In Learning'." "যদি তুমি ব্যর্থ হও, কখনো হাল ছাড়ো না কারণ ব্যর্থতার অর্থ 'শিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা'।"

24. "Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great." শিক্ষা সৃজনশীলতা দান করে; সৃজনশীলতা চিন্তাভাবনার দিকে পরিচালিত করে; চিন্তাভাবনা জ্ঞান প্রদান করে। জ্ঞান তোমাকে মহান করে তোলে।"

25. "Love your job, but don’t love your company, because you may not know when your company stops loving you." "তোমার কাজকে ভালোবাসো, কিন্তু তোমার সঙ্গকে ভালোবাসো না, কারণ তুমি হয়তো জানতেও পারবে না কখন তোমার সঙ্গ তোমাকে ভালোবাসতে বন্ধ করে দেবে।"

26. "You see, God helps only people who work hard. That principle is very clear." দেখো, ঈশ্বর কেবল কঠোর পরিশ্রমী লোকদেরই সাহায্য করেন। নীতিটি খুবই স্পষ্ট।"

27. "We are all born with a divine fire in us. Our efforts should be to give wings to this fire." "আমরা সকলেই আমাদের মধ্যে একটি ঐশ্বরিক আগুন নিয়ে জন্মগ্রহণ করি। আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত এই আগুনকে ডানা দেওয়ার।"

28. "I am not a saint, but I am trying to be a good human being." আমি সাধু নই, কিন্তু একজন ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছি।"

29. "To become 'unique,' the challenge is to fight the hardest battle which anyone can imagine until you reach your destination." "'অনন্য' হয়ে ওঠার জন্য, চ্যালেঞ্জ হল সবচেয়ে কঠিন লড়াই করা যা যেকেউ শুধু কল্পনা করতে পারে যতক্ষণ না আপনি আপনার গন্তব্যে পৌঁছান।"

30. "Confidence and hard work are the best medicine to kill the disease called failure." "ব্যর্থতা নামক রোগকে মেরে ফেলার জন্য সেরা ওষুধ হল আত্মবিশ্বাস এবং কঠোর পরিশ্রমই"

31. "My message, especially to young people, is to have courage to think differently, courage to invent, to travel the unexplored path, courage to discover the impossible and to conquer the problems and succeed." বিশেষ করে তরুণদের প্রতি আমার বার্তা হলো, ভিন্নভাবে চিন্তা করার সাহস, উদ্ভাবনের সাহস, অনাবিষ্কৃত পথে ভ্রমণ, অসম্ভবকে আবিষ্কার করার সাহস এবং সমস্যাগুলিকে জয় করে সফল হওয়া।"

32. "A fool can become a genius when he understands he is a fool. But a genius can become a fool when he understands he is a genius." "একজন বোকা তখনই প্রতিভাবান

হতে পারে যখন সে বুঝতে পারে যে সে একজন বোকা। কিন্তু একজন প্রতিভা যখন বুঝতে পারে যে সে একজন প্রতিভাবান, তখনই সে বোকা হতে পারে।"

33. "Black color is sentimentally bad, but every blackboard makes the student’s life bright." কালো রঙ আবেগগতভাবে খারাপ, কিন্তু প্রতিটি ব্ল্যাকবোর্ড শিক্ষার্থীর জীবনকে উজ্জ্বল করে তোলে।"

34. "Life and time are the world’s best teachers. Life teaches us to make good use of time, while time teaches us the value of life." "জীবন এবং সময় পৃথিবীর সেরা শিক্ষক। জীবন আমাদের সময়ের সদ্ব্যবহার করতে শেখায়, আর সময় আমাদের জীবনের মূল্য শেখায়।"

35. "Never stop fighting until you arrive at your destined place—that is, the unique you. Have an aim in life, continuously acquire knowledge, work hard, and have perseverance to realize the great life." তোমার নির্ধারিত স্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত কখনো লড়াই থামিও না। তবেই অনন্য তুমি; জীবনে একটি লক্ষ্য রাখো, ক্রমাগত জ্ঞান অর্জন করো, কঠোর পরিশ্রম করো এবং মহান জীবনকে উপলব্ধি করার জন্য অধ্যবসায় রাখো।"

36. "Be active! Take on responsibility! Work for the things you believe in. If you do not, you are surrendering your fate to others." "সক্রিয় থাকো! দায়িত্ব নাও! তুমি যে বিষয়গুলোতে বিশ্বাস করো তার জন্য কাজ করো। যদি না করো, তাহলে তুমি তোমার ভাগ্য অন্যদের হাতে সমর্পণ করছো।"

37. "Knowledge with action converts adversity into prosperity." "কর্মের সাথে জ্ঞান প্রতিকূলতাকে সমৃদ্ধিতে রূপান্তরিত করে।"

38. "Winners are not those who never fail but those who never quit." "বিজয়ী তারা নয় যারা কখনও ব্যর্থ হয় না বরং তারা যারা কখনও হাল ছাড়ে না।"

39. "A nation's strength ultimately consists in what it can do on its own, and not in what it can borrow from others." একটি জাতির শক্তি নির্ভর করে শেষ পর্যন্ত সেই জাতি নিজে কী করতে পারে তার উপর, অন্যদের কাছ্ থেকে কী ধার করতে পারে তার উপর নয়।"

40. "There is no greater power in heaven or on earth than the commitment to a dream." স্বপ্নের প্রতি অঙ্গীকারের চেয়ে স্বর্গে বা পৃথিবীতে আর কোনও বড় শক্তি নেই।"

41. "War is never a lasting solution for any problem." "যুদ্ধ কখনোই কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়।"

42. "The purpose of education is to make good human beings with skill and expertise. Enlightened human beings can be created by teachers." শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো দক্ষতা ও দক্ষতার সাথে ভালো মানুষ তৈরি করা। শিক্ষকদের মাধ্যমেই জ্ঞানী মানুষ তৈরি করা সম্ভব।"

43. "To be a successful team leader, one has to shed one's ego." একজন সফল দলনেতা হতে হলে, নিজের অহংকার ত্যাগ করতে হবে।"

44. "Problems are a part of life. Suffering is the essence of success."- "সমস্যা জীবনেরই অংশ। দুঃখই সাফল্যের মূলমন্ত্র।"

45. "When you speak, speak the truth; perform when you promise; discharge your trust. Withhold your hands from striking, and from taking that which is unlawful "যখন তুমি কথা বলো, সত্য বলো; যখন তুমি প্রতিশ্রুতি দাও, তা পূরণ করো;

তোমার প্রতি আস্থা বা বিশ্বাস রক্ষা করো। কাউকে আঘাত করা এবং অবৈধ জিনিস গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকো।"

মৃত্যু

ভারতের রকেট ম্যান বা ভারতের মিসাইল ম্যান এবং ভারতের ১১তম রাষ্ট্রপতি ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম ২৭ জুলাই, ২০১৫ তারিখে ৮৩ বছর বয়সে শিলংয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম) তে একদল ছাত্রের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ৩০ জুলাই ২০১৫ তারিখে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য তাঁর জন্মস্থান রামেশ্বরমে অনুষ্ঠিত হইয়েছিল।

এপিজে আব্দুল কালামের মৃত্যুর সময় খবরের কাগজে একটা বিশাল কথা এসেছিল যা হয়তো আমার মত মনে রেখেছে। সেটি হল; আমি এখনো "**people's president joins the stars**" যার অর্থ হল "জনগণের রাষ্ট্রপতি তারকাদের সাথে যোগ দিলেন"। মৃত্যুর বিষয়টি একটি রূপক রূপে প্রকাশ করা হয়েছে, যা যথার্থরূপে ইঙ্গিত করে যে তিনি মৃত্যুর পর পার্থিব অস্তিত্বের বাইরে একটি সুউচ্চ স্থানে রয়েছেন।

সারা জীবন দেশের মানুষের জন্য অজস্র কাজ করেছেন; তাঁর লেখা বইগুলো পড়লে আমরা সহজেই বুঝতে পারি সারা জীবন তিনি দেশবাসির কি ভাবে ভাল হয় তার চিন্তা করে গেছেন। এমনকি তাঁর শেষ নিঃশ্বাসও জনগণের সেবা এবং তরুণ মনকে জাগিয়ে তোলার জন্য নিবেদিত ছিল। তাঁর মৃত্যুতে ভারত যদিও একজন মহান পুত্রকে হারিয়েছে, তবুও এপিজে আব্দুল কালামের সেবা এবং দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে এগিয়ে যাওয়ার এবং দেশের জন্য কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর বিশেষ মুল্যবান উক্তি। তিনি বলেছেন "মৃত্যুকে মানুষের ভয় পাওয়া উচিত নয়, বরং তাকে কখনোই বাঁচতে শুরু না করার ভয় পাওয়া উচিত । মৃত্যু কিছুই নয়, বরং পরাজিত ও অপমানজনক জীবনযাপন করা হল প্রতিদিন মৃত্যু। জীবনের ভয়

থেকেই মৃত্যুর ভয় আসে। যে মানুষ পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকে সে যেকোনো সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে।"

উপসংহারে তাঁর সম্পর্কে আর কিছু কথা না বললেই নয়; এপিজে আব্দুল কালাম সর্বদা সরল জীবনযাপন করতেন। বাস্তবে তিনি কখনও টেলিভিশন বা রেডিওর মালিক ছিলেন না। তাঁর জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল তাঁর অসংখ্য বই, একটি ল্যাপটপ, তিন জোড়া পোশাক এবং একটি 'বীণা' যা তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর জীবন ছিল 'সরল সরল জীবনযাপন এবং চিন্তাভাবনা ছিল সুউচ্চ' এক উদাহরণ। তিনি হলেন সরল জীবনযাপন, উচ্চ চিন্তার মানুষের (plain living and high thinking mam) প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর, তিনি জনহিতকর কাজ এবং শিক্ষার কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। আমরা দেখেছি তিনি বেশ কয়েকটি আত্মজীবনীমূলক বই লিখে গেছেন। সেগুলি দূর-দূরান্ত থেকে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছে । উইংস অফ ফায়ার, ইগনাইটেড মাইন্ডস, ইন্ডিয়া ২০২০ এর মতো তাঁর বইগুলি ১৩টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিজ্ঞানে তাঁর কাজ এবং অবদান এতটাই প্রশংসিত হয়েছিল যে তিনি ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তাই তিনি পৃথিবী চলে গেলেও, দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বপ্রথম আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সকল মহান লেখকদের বা জীবনীকারদের যাদের মূল্যবান গ্রন্থ্ থেকে আমি প্রামানিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করেছি এই বইটি লেখার জন্য।

এই বইটি লেখার জন্য AI Search Lab Authority এবং Google Search Authority কে আমি বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই কারন তাদের থেকে আমি অনেক অজানা প্রামানিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করেছি।

স্বর্গীয় পিতামহী বিধুমুখী গুড়িয়া এবং মাতা তুলসীরানী গুড়িয়াকে জানাই আমার গভীর শ্রদ্ধা;তাঁরাই আমার শৈশবে আমার মধ্যে প্রথম আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা সঞ্চারিত করেছিলেন।

আমার স্ত্রী দীপ্তি গুড়িয়াকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ; তিনি আমার এই বইটির পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন।

আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাই সি এ অরুণ চন্দ মহাশয়কে যিনি আমার লেখা প্রতিটি বই পড়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং উপযোগিতা বিশ্লেষণ করে আমাকে আরো বই লিখতে উৎসাহিত করেন।

আমার দুই মেয়ে স্মিতা ও পারমিতা,আমার ছোট জামাতা জিৎ মণ্ডলকে জানাই বিশেষ ধন্যবাদ; তারা আমার এই বইটির জন্য অনেক ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করেছে। পরিশেষে আমার দুই নাতি অকসত ও আরভের প্রতি রইল আমার অশেষ ধন্যবাদ-তারা আমার বই লেখার বিশেষ অনুপ্রেরনা।